"উইম্বলডনের মিস্ নোবল একজন ভাল কর্মী। তিনিও মাদ্রাজের দুইটি পত্রিকার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবেন। তিনি তোমায় পত্র লিখবেন। এই সব কাজ ধীরে ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠবে। অল্পসংখ্যক অনুগামীরাই এই-জাতীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষক হয়। এখন কথা এই—এরূপ আশা করা চলে না যে, তারা একসঙ্গে অত্যধিক কাজের ভার নেবে। ইংলণ্ডের কাজের জন্য তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বই কিনতে হবে, এখানকার পত্রিকার জন্য গ্রাহক যোগাড় করতে হবে এবং সর্বশেষে ভারতের পত্রিকার চাঁদা দিতে হবে। এতটা করা চলে না। এরূপ করলে তা ধর্মপ্রচার না হয়ে বরং ব্যবসার মতই দেখাবে। সুতরাং তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমার মনে হয়, এখানে জনকয়েক গ্রাহক পাওয়া যাবে। ভারতের লোকেরাই ভারতের কাগজগুলির পৃষ্ঠপোষক হবে। সব জাতির নিকট সমানভাবে গ্রহণীয় কোন কাগজ প্রকাশ করতে হ'লে সব জাতিরই লেখক সংগ্রহ করতে হবে, আর তার মানে হচ্ছে—বছরে অন্ততঃ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। তা ছাড়া আমার অনুপস্থিতিতেও এখানকার লোকদের কাজ থাকা চাই; তা না হলে সব ভেঙেচুরে যাবে। অতএব একখানি পত্রিকা চাই; ক্রমে আমেরিকাতেও চাই।

"এ কথা ভুলে যেও না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়।"

ইংলণ্ড বা আমেরিকা থেকে স্বামীজীর জীবিতকালে ঠিক কতগুলি ও কি জাতীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। ইণ্ডিয়ান মিরারে ১৮৯৬, জুলাই, আমেরিকা থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্পের কথা পাই। পত্রিকাটি মাসিক; 168, Brottle Street. Cambridge, Mass. U.S.A. তার প্রকাশস্থান, এমন লেখা হয়েছিল। সত্যই এই পত্রিকা বেরিয়েছিল কি না জানি না। স্বামীজীর দেহত্যাগের অল্প পূর্বে ১৯০২ সালের প্রথম দিকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে Pacific Vedantin নামে একটি পত্রিকা সত্যই প্রকাশিত হয় এবিষয়ে ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসের ব্রহ্মবাদিনে সংবাদ পেয়েছি। (ক্রমশঃ)

বিকাশ

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

সহসা কিসের গন্ধে ভেঙে গেল ঘুম,
নিবিড় তখন নিশি নিথর নিঝুম।
বাহিরে আসিনু ছুটি; উন্মাদের প্রায়
ধেয়ে গেনু শরতের ফুল্ল বাগিচায়
দূর্বার কৌতুকভরে। অগণিত ফুল
সদ্যফোটা শুচি-শুভ্র অপূর্ব অতুল
সুনির্মল চন্দ্রালোকে; উদগ্র উচ্ছ্বাসে
কুসুমে কুসুমে ফিরি, প্রখর নিঃশ্বাসে
কাহারে খুঁজিনু বৃথা। ক্ষিপ্ত দিশেহারা
স্রোতস্বিনী পাশে আসি' স্ফীত শান্ত ধারা
নেহারি' রহিনু বসি। সব গেছি ভুলে
নির্জন সে রজনীর তটিনীর কূলে।
চকিতে কে কয়ে গেল শ্রবণকুহরে
ফুটেছে সে ফুল তোর আপন অন্তরে।

অভিব্যক্তি ও অনুস্যূতি*

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিখিল বিশ্বে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে নিরন্তর। দুটিই যুগপৎ; সুতরাং একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির আলোচনা করলে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। অথচ গত প্রায় দুশো বছর ধরে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে একটির ওপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; অপরটির ওপর আলোচনা প্রায় নেই-ই বললে চলে। এর ফল কিন্তু ভাল হয়নি এবং তা' খুব সংগত কারণেই। তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে এক-পেশে; দৃষ্টিকোণ হয়েছে সংকীর্ণ, অসহিষ্ণুতা গিয়েছে বেড়ে এবং মানুষ পারস্পরিক সংগ্রামকে ধরে নিয়েছে অনিবার্য। এই প্রক্রিয়া দুটিকে বলতে পারি—(১) অভিব্যক্তি (Evolution ও (২) অনুস্যূতি (Involution)। কেউ কেউ এদের নাম দিয়েছেন ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ। ব্যক্তির জীবনে যেমন, তেমনি একটি জাতির জীবনে, মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাসে, এমনকি গোটা জাগতিক সৃষ্টিব্যাপারে এই দ্বৈতক্রিয়ার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

একটি মানুষের কথাই ধরা যাক্—তার শিশু অবস্থা থেকে একটা বয়স পর্যন্ত ক্রমাগতই দৈহিক ও মানসিক প্রসার ও প্রকাশ দেখা যায় (ব্যক্তির কর্ম ও প্রবণতা অনুযায়ী এই প্রসার-কাল দীর্ঘ বা হ্রস্ব হতে পারে, তবে প্রসার-কাল যে একটা আছে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই)। একেই বলতে পারি তার ব্যক্তিজীবনের অভিব্যক্তি-কাল। আবার একই জীবনে দেখা যায়, ক্রমশঃ গুটিয়ে নেবার কাল যার শেষ পরিণাম মৃত্যু; একে বলতে পারি তার অনুস্যূতি কাল। সুতরাং সাংখ্যকার যখন বলেন, "বিনাশঃ কারণলয়ঃ", তখন তিনি ঠিকই বলেন। এদিক্ থেকে আধুনিক পদার্থবিদ্ ও সাংখ্যকারের মতের মিল লক্ষণীয়। এমনকি দৈহিক দিক দিয়েও শুধুমাত্র বিশেষ রূপ বা অবয়বটি ছাড়া সত্যিকারের কিছু বিনাশ হয় না মৃত্যুতে, রূপান্তর হয় মাত্র। স্বামী শিবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "You have to complete the circuit"। এখানেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

একই ধরনের ব্যাপার জাতীয় জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসে এইমত যুগবিভাগ দেখানও হয়ে থাকে। এক একটা যুগ আসে যখন জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগে আশ্চর্য বিকাশ ও প্রসার হতে থাকে, তারপর একটা উচ্চতম সীমা পর্যন্ত এসে সে যেন আর এগোতে পারে না। শুরু হয় অপ্রকাশ ও সংকোচের কাল, তারও নিম্নতম সীমা একটা আছে যার নীচে আর সে যেতে পারে না। কোন সময়েই কিন্তু সব কিছু প্রকাশ হচ্ছে না (রেনেশাঁস বা বিপ্লব হলেও না) বা সব কিছু লুপ্তও হচ্ছে না (এমনকি মহাপ্রলয় হলেও না, শুধুমাত্র অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত থাকছে—ঠাকুর যাকে বলেছেন —"মা সব সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রেখে দেন।")

মহাজাগতিক ব্যাপারে হিন্দুদের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্বও একই ধরনের কথা বলে থাকে। বিপুল বিশ্বের সৃজন হল (স্বামীজী বলেছেন, 'Projection, not creation'—'সৃষ্টি'র যথাযথ অনুবাদ), প্রসার হল, তার স্থিতিও হল আমাদের সীমিত বিচারে (হয়তো কোটি কোটি বছর ধরে); কিন্তু মহাপ্রলয়ে

---

* লেখকের ইচ্ছানুসারে 'অনুস্যূতি' শব্দটি রাখা হইল। —সঃ

আবার সব বিলীন হয়ে গেল। তারপর আবার নতুন বিশ্বের সৃজন হল (কারণ সৃষ্টির বীজ সবই সূক্ষ্মতমভাবে থেকেই গিয়েছিল, প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল মাত্র)। অনাদিকাল থেকে এই-ই চলে আসছে; অনন্তকাল ধরে চলবে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যাও এরূপ মতকে বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। জেম্‌স্ জীন্‌স্-এর "The Mysterious Universe" (বিশেষ করে, তার 'The Dying Sun' অংশটি) পড়ে তাই তত্ত্বজ্ঞানীর মনে কোন শঙ্কা জাগে না। স্বামীজী বলেছেন, শূন্যের থেকে কিছুরই উৎপত্তি হয় না। থাকে সবই, আছেও সবই—শুধু প্রকাশ আর অপ্রকাশ, ব্যক্ত আর অব্যক্ত, অভিব্যক্ত বা অনুস্যূত।

এই সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শুধু দার্শনিক ব্যাখ্যাই যে সন্তোষজনক হয় তা নয়, ব্যবহারিক দিক্ থেকেও অনেক উপকার হয়। জীববিজ্ঞানে অভিব্যক্তিবাদ বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। আজ লেখাপড়া-জানা লোকমাত্রই ল্যামার্ক, ডারউইন, প্যাভলভ ও জুলিয়ান হাক্সলির নাম জানে। ডারউইনের দৌলতে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural selection), 'যোগ্যতমের টিঁকে থাকা' (Survival of the fittest), 'অস্তিত্বের লড়াই' (Struggle for existence) প্রভৃতি ধারণা বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনাতেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, 'Class struggle' অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম। কার্ল মার্ক্‌স্-এর সমাজদর্শনের এটি প্রধানতম স্তম্ভ [অবশ্য মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্-এর The Communist Manifesto ডারউইনের The Origin of Species-এর ৮।৯ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব যে ডারউইনের তত্ত্বের থেকে বেশ শক্তি পেয়েছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য]। ইতিহাসের নজীরও তিনি এর প্রচুর দিয়েছেন। শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থাকে (Class-less society) তাই তিনি লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন এবং তার ব্যবস্থা কিভাবে করা যেতে পারে তার বিধানও দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতে সেইমত চেষ্টা বিভিন্ন দেশে হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাও হয়েছে। সাধারণ মানুষের অগ্রগতির পথ এতে করে মুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। আবহমান কাল নিপীড়িত, শোষিত চাষী-মজুর, অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষ এই প্রথম যথার্থ স্বাধীনতার স্বাদ এতে করে পেয়েছে একথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু মূল প্রশ্ন একটি থেকেই গেছে। সেটি হল—শ্রেণীহীন সমাজ কী সত্যিই গড়ে উঠেছে? কোন কোন দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে দিয়ে সামন্তশ্রেণী বা ধনিক-মালিক শ্রেণীকে তুলে দেওয়া হয়েছে ঠিকই; কিন্তু শাসক (শ্রেণী) ও শাসিত (শ্রেণী) কী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও একই মর্যাদার অধিকারী? একজন সাধারণ মজুর বা চাষী এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বাধিনায়ক কী একই রকম সুবিধা ঐ দেশগুলোতে ভোগ করে থাকেন? এক কথায় উত্তর, না এবং কোনকালেই তা' হবেও না। সুতরাং যা করা হয়েছে এবং অন্য দেশেও কালক্রমে হবে তা হল শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা। বংশানুক্রমিক শ্রেণীব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে লুপ্ত হতে চলেছে সর্বত্র; কিন্তু 'গুণকর্মবিভাগশঃ' শ্রেণী বোধহয় থেকেই যাবে চিরকাল।

এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যে এখন ফিরে আসছি। তা'হল সংক্ষেপে অভিব্যক্তিবাদের

সঠিক মূল্যায়ন এবং একই সঙ্গে অনুস্যূতির স্বীকৃতি ও গুরুত্ব-নির্ধারণ। প্রথম, অভিব্যক্তির কথাই ধরা যাক। প্রাণিজগতে মানুষ নিঃসন্দেহে যোগ্যতম এবং এজন্য সে শুধু টিকে আছে তাই নয়, তার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি বেড়েই চলেছে। কিন্তু আধুনিক কালে অস্তিত্বের সংগ্রাম তাকে তত করতে হচ্ছে না অন্য প্রাণীদের সঙ্গে (একমাত্র রোগবীজাণু ছাড়া) যতটা করতে হচ্ছে নিজেদের (অর্থাৎ অন্য মানুষদের) সঙ্গে। সুতরাং সংগ্রামতত্ত্বকে বেশীদূর ঠেলে নিলে বিপর্যয় অনিবার্য। পারমাণবিক যুগে অস্তিত্বের সংগ্রাম (Struggle for existence) অবলোপের সংগ্রামে (Struggle for extinction) পর্যবসিত হতে পারে। নিছক সংগ্রামকে তাই কাম্যবস্তু মনে করা যায় না। [মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্-লেনিন অবশ্য তা বলেনওনি]। মানুষের জীবনে সংগ্রাম আছে ঠিকই। এ সংগ্রাম বাহ্যিক ও আন্তর দুই-ই। কিন্তু এ তার চূড়ান্ত কথা নয়। তার সংগ্রামও আছে, অসংগ্রামও আছে; যুদ্ধও আছে, শান্তিও আছে। সুতরাং যাঁরা perpetual revolution বা নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের কথা বলেন তাঁরাও যেমন ভুল বলেন, perennial peace বা শাশ্বত শান্তির প্রবক্তারাও তেমনই ভুল বলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ। প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামকে ডারউইন প্রমুখ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা অভিব্যক্তির কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। স্বামীজী বলেছেন, অভিব্যক্তির মূল কারণ হল প্রকাশ ও প্রসারের বাসনা; প্রতিযোগিতা তার ফল মাত্র; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অনিবার্য নয়, অভিব্যক্তির কারণ তো নয়-ই। তাঁর মতে পতঞ্জলির অভিব্যক্তিবাদ যদিও বহু প্রাচীন তথাপি আধুনিক (ডারউইন-প্রবর্তিত) অভিব্যক্তিবাদ অপেক্ষা অনেক বেশী যুক্তিসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য। পতঞ্জলিও বলেছিলেন এক জাতি (species) কালক্রমে অপর জাতিতে রূপান্তরিত হয় তবে তা' সংগ্রাম করে নয়, প্রকৃতিকে আপূরণ করে ("জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ")। স্বামীজী এই 'প্রকৃত্যাপূরাৎ'-এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন 'The infilling of nature'. এটি কিভাবে হয় তার ব্যাখ্যাও পতঞ্জলি করেছিলেন—"ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"। মনে করা যাক, একজন ক্ষেত্রিক অর্থাৎ চাষী তার জমির পাশেই অবস্থিত জলাশয় থেকে নালা কেটে বা পাম্প বসিয়ে বা লক্‌গেট খুলে দিয়ে তার জমিতে জল আনয়ন করে। অনুরূপভাবে এক জাতি অপর জাতিতে রূপান্তরিত হয় প্রকৃতিতে পূর্ব-নিহিত শক্তিকে আকর্ষণ ও আপূরণ করে। যেমন জলাশয়ে আগেও জল ছিল; কিন্তু ক্ষেত্রে জল আসেনি কারণ আসার পথে বাধা ছিল। প্রাণিজগতেও মানুষের উদ্ভব অনেক পরে হয়েছে অনেক প্রাণীর তুলনায় (কারণ বাধা ছিল)। তার পূর্বসূরী বিভিন্ন জাতি (species) অবশ্য ছিল। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির যে বিস্ময়কর বিকাশ মানুষের মধ্যে দেখি তা' মানুষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এমন কিছু নয়। প্রকৃতিতে এর সবটাই ছিল (যেমন পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে জলাশয়ে আগেও জল ছিল), শুধু প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। উপযুক্ত দেহ না পাওয়া পর্যন্ত অপ্রকাশ ছিল মাত্র, প্রকৃতিতে অব্যক্ত বা অনুস্যূত অবস্থায় ছিল। স্বামীজী আরো বিশ্লেষণ করে বলেছেন, একটি অ্যামিবাতে যে মৌল বস্তু আছে একজন বুদ্ধতেও ঠিক তাই আছে; শুধু manifestation বা প্রকাশের তারতম্য। একটি ক্ষুদ্র বীজে যা আছে, এক বিশাল মহীরুহেও তাই আছে। অর্থাৎ বীজ হচ্ছে

যেন effect involute বা অনুস্যূত পরিণাম আর মহীরুহ যেন cause evolved বা বিকশিত বীজ। দুয়েতে একই মৌলবস্তু রয়েছে, শুধু প্রকাশমাত্রার পার্থক্য।

তাহলে দেখা গেল প্রকৃতিতে সব কিছুই আছে—কখনো খুব সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, এমন কি ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায়; কখনো বা খুব স্থূল, ব্যক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায়। প্রথমটিকে বলছি অনুস্যূতি, দ্বিতীয়টিকে অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তির জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য নয়, অন্ততঃ মানুষের ক্ষেত্রে। সংগ্রামের নামে, প্রগতির নামে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বহু অনুষ্ঠান মানুষের ইতিহাসে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। সুতরাং অভিব্যক্তির মূল কারণ ও প্রধান হাতিয়ার হিসেবে সংগ্রামকে ধরে নিলে যে বিপদ হয় তা আমরা বর্তমানে বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। স্বামীজী তাই ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বলেছেন প্রকাশ ও অভিব্যক্তির এরাই সর্বোত্তম হাতিয়ার। আধুনিক মানব-সভ্যতা নিঃসন্দেহে একটি গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন। সংগ্রামকেই টিঁকে থাকার একমাত্র উপায় হিসেবে মোটামুটি ধরে নিয়েছেন অনেকেই। এর পরিণামে অভিব্যক্তি কী হবে সঠিক বলা যাচ্ছে না (অবশ্য স্বামীজী বলেছেন, 'শূদ্রযুগ'—আধুনিক পরিভাষায় dictatorship of the proletariat—'আসছে; কিন্তু কী গোলমালের মধ্য দিয়েই না আসছে!' অর্থাৎ এর পরবর্তী রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক অভিব্যক্তি হল সমাজতন্ত্র), তবে অশান্তি, যুদ্ধ, বিসংবাদ ও রক্তপাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদের সঠিক মূল্যায়ন ও প্রচার অবিলম্বে প্রয়োজন। ডারউইনের মতবাদের যে সব পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা করেছেন তা সমধিক প্রচারিত হওয়া দরকার। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের, যথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির, ওপর ডারউইন তত্ত্বের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজ ফলতে শুরু করেছে। জীববিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে মনে হয়। তাঁরাই অধিকারী, তাঁরাই বলুন—অভিব্যক্তির জন্য সংগ্রাম (বিশেষ করে মানুষে মানুষে) অপরিহার্য একথা সত্য কি না। যদি সত্য না হয় তো জোরগলায় তা প্রচার করুন এবং জনসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য ভাষায় ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা যথাশীঘ্র করুন।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই প্রবন্ধের—অনুস্যূতির স্বীকৃতি ও গুরুত্বনির্ধারণ। একথা অসংশয়ে বলা যায় যে, অভিব্যক্তি যে পরিমাণ স্বীকৃতি ও গুরুত্ব বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে গত একশো বছর বা ততোধিক কাল ধরে পেয়ে আসছে অনুস্যূতি তার শতভাগের একভাগও পায়নি, এর কারণ সহজেই অনুমেয়। যে কারণে আমরা জীবনকে ভালবাসি, ঠিক সেই কারণেই জীবনান্তকে বা মরণকে দূরে ঠেলে রাখতে পছন্দ করি। জীবনকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা যতখানি স্বাভাবিক, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাও ঠিক ততখানিই স্বাভাবিক। জীবনমুখতা ও মৃত্যুবিমুখতা একই মুদ্রার দুই পিঠ মাত্র। অভিব্যক্তির আলোচনায় আমাদের উৎসাহ কেন—না, এতে প্রকাশ, প্রসার ও প্রচারের কথা আছে। অনুস্যূতির আলোচনায় অনাগ্রহ কেন—না, এতে সংকোচ, অপ্রকাশ ও (আপাত) অনস্তিত্বের কথা আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় উভয়েরই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। উপনিষদের ঋষি যেমন বলেছেন, জীবনও যাঁর ছায়া, মৃত্যুও তাঁরই ছায়া; এ ক্ষেত্রেও তেমনই বলা যায়, অভিব্যক্তিতে যার প্রকাশ ও অভ্যুদয়, অনুস্যূতিতে তারই

সঙ্কোচ ও সংহরণ। অভিব্যক্তি ও অনুস্যূতি দুই-য়ে মিলিয়ে পূর্ণ জীবনচক্রের ব্যাখ্যা। এ যেন পূর্ণিমার চাঁদকে বাদ দিয়ে অষ্টমীর চাঁদকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি—যখন শুধু অভিব্যক্তিরই আলোচনা করছি। বাকী চক্রার্ধ বা অর্ধবৃত্তকে অর্থাৎ অনুস্যূতিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে, তবেই না আলোচনা হবে সম্পূর্ণ—জ্ঞানের দিক্ থেকে হবে সার্থক, দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে হবে অখণ্ড, প্রেমের দিক্ থেকে হবে পূর্ণ। আজ সময় এসেছে অনুস্যূতির দিকেও দৃষ্টি দেবার—নির্মানমোহ হবার এই একমাত্র উপায়। অনুস্যূতির ক্রিয়া কিভাবে জীবদেহে চলে তার সম্পর্কে যথাযথ বিশদ গবেষণা হওয়া দরকার। অভিব্যক্তির গতি-প্রকৃতি ও দেশকালে তার সীমাকে বুঝবার জন্যও এর প্রয়োজন। এতে করে যে শুধু আমাদের তাত্ত্বিক কৌতূহল চরিতার্থ হবে তাই নয়, ব্যবহারিক দিক্ থেকেও প্রচুর লাভ হবার সম্ভাবনা এতে আছে। তা' হল প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের দৌড় কতদূর, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কখন শুধু সম্ভবমাত্র নয়, অবশ্যগ্রহীতব্য তা' জানতে পারা যাবে। পরমাণুবিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন সাম্প্রতিক আবিষ্কারকে জীববিজ্ঞানের অনুস্যূতিক্রিয়ার (process of involution) ব্যাখ্যায় নিয়োজিত করা যেতে পারে বলে মনে হয়। নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid)-এর গবেষণা, ডাঃ খোরানার Genetic Code প্রভৃতি এবিষয়ে আলোকপাত করবে কিনা তাও এ-প্রসঙ্গে বিচার্য।

একটি পুরনো উপমা মনে আসছে। কোন পাখি যেমন তার এক পাখায় উড়তে পারে না, উড়তে গেলেই উভয়পক্ষের যুগপৎ সঞ্চালন অবশ্য প্রয়োজন; তেমনই কোন জীববিদ্যার গবেষণা শুধু অভিব্যক্তির ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ হতে পারে না, অনুস্যূতিরও যুগপৎ সমান্তরাল বিশ্লেষণ, গবেষণা ও উপলব্ধি অবশ্য প্রয়োজন। প্রথমটির ওপর প্রায় সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আলোচনা হয়েছে খণ্ডিত, সিদ্ধান্ত হয়েছে ভ্রান্ত, মানবসভ্যতা হয়েছে বিভ্রান্ত। তাই স্বামীজীর অভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার টানছি—

"... evolution must be brought in accordance with the more exact science of Physics, which can demonstrate that every evolution must be preceded by an involution." (C. W., Birth Centenary Edition, Vol. VIII, pp. 362-63).

'সুখের লাগিয়া'

শ্রীরবি ঘোষ

সাধক কবি গেয়ে গেছেন, "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু···"—এ শুধু কবিকণ্ঠেরই বাণী নয়, বিশ্বমানবের হৃদয়ের মণিকোঠায় যে ব্যথাবেদনার সকরুণ সুর চিরকাল বেজে চলে, সেই শাশ্বত সুরেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। অন্য এক বিদেশী কবিও লিখেছেন, "···যে গান আমাদের মনে করুণতম ভাব জাগিয়ে তোলে, তাহাই মধুরতম।"

কেন এমন হয়? মানব-জীবনের সুর কি শুধুই বেদনার? জীবনের মরুপথে মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে যখন আমরা মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করি যে তা শুধুই মায়া, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের অনর্থক প্রলোভিত ও ক্লান্ত করছে, তখনই হৃদয়-তন্ত্রীতে সেই বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হয়, "সুখের লাগিয়া···"। এই দুর্বলতাকে যদি আমরা প্রশ্রয় না দিই, তবে মায়ার প্রভাব আমাদের কখনও অভিভূত করতে পারবে না। আমাদের শাস্ত্রের অন্যতম সারকথা স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে প্রচার করে গেছেন এবং তাঁর মহৎ জীবন দিয়ে দেখিয়েও গেছেন যে দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই আমাদের সব দুঃখের আকর। কিন্তু মানবমনের এমনই বিচিত্র গঠন যে, এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বীরের মত দৃঢ়পদে আনন্দময় ও মঙ্গলময় জীবন-পথে অগ্রসর হতেও সে চায় না। এ ত মায়া। আপাত-মনোরম এই মাটির পৃথিবী ও তার যাবতীয় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সুখ-সম্ভার, ভোগৈশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এই সবের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে এই মায়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে ভুলিয়ে রেখেছে। এই মায়ার গণ্ডী নির্মম হস্তে ভেঙ্গে না দিতে পারলে মুক্তি নেই।

"সুখের লাগিয়া।" কি সে সুখ, কতক্ষণ তা থাকে, তার স্বরূপ কি, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন নিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে আমরা তা ক্ষণিকের জন্যও বিচার করতে বসি না। বসব কখন? আমি-আমার করেই যে ব্যস্ত! নিজকে, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরে বসে আছি! বারে বারে আঘাত পাই, দেখতে পাই এই আপাত সুখ বড়ই চঞ্চল। একটুতেই যায় ফসকে। প্রতিবারেই ব্যর্থমনোরথ হবার পর তাই মনের সেই তন্ত্রবীণায় লাগে আঘাত, "সুখের লাগিয়া"···। তবু বিচার করি না, অন্ধ হয়ে আবার ছুটি সেই সুখেরই পিছনে।

কথা হল, কেবল সুখলাভের জন্য আমরা সবাই উন্মুখ; কিন্তু তা পাই কি? না। তবু অশেষ দুঃখের পর নামমাত্র সুখ পেলেও আমরা আশা করি পরে অবাধিত সুখই পাব। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়:

"সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল
তবু নাহি ছাড়ে আশা।"

আমরা দুঃখকে বাদ দিয়ে কেবল সুখই পেতে চাই। কিন্তু সুখ ও দুঃখ যে একসঙ্গে জড়িত, একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ। একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করা যায় না, এককে নিলে অপরটিও নিতেই হবে। এই পৃথিবীতে আমরা যে-সুখই পাই না কেন তাহা দুঃখমিশ্রিত থাকবেই। এটি ভুলে যাই বলেই সুখের পর দুঃখ এলেই আমাদের মনে আক্ষেপ জাগে, "সুখের লাগিয়া···।"

প্রশ্ন জাগে, তবে কি অবিমিশ্র, প্রকৃত ও

স্থায়ী এবং কল্যাণময় সুখের অস্তিত্বই নেই ? আছে। এমন মধুময়, কল্যাণময়, অফুরন্ত, স্থায়ী সুখ আছে, যার আস্বাদ পেলে জাগতিক সব সুখ তুচ্ছ বলে বোধ হয়। সেই অমৃতোপম সুখ, সেই অবাধিত সুখের নাম 'আনন্দ', এবং সেই আনন্দই আমাদের স্বরূপ ! এই স্বরূপে, আনন্দের সাগরে পৌছতে পারলে জীব শিব হয় —সুখ-দুঃখের অতীতে চলে যায়। এই আনন্দের কণিকামাত্রই আমাদের জাগতিক সুখে প্রকাশ পায়—জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আমাদের ভেতর থেকেই মনে এর সামান্য বিকাশ ঘটে। আমরা তা বুঝতে পারি না, আমরা ভাবি বিষয়েই বুঝি সুখ নিহিত।

তাই, শ্রান্ত ও বিভ্রান্ত পথিক আমরা ছলনার কবলে পড়ে পথ ভুলে বিপাকে পড়ে ঘুরে ঘুরে দিশেহারা হই। যাঁরা এই আনন্দের সাগরে অবগাহন করে ফিরে এসেছেন তাঁরাই সেখানে পৌছবার পথের সন্ধান দিতে পারেন। আন্তরিকভাবে খোঁজ করলে, ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে তেমন দেবদুর্লভ লোকোত্তর মহাপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র বেদ, পুরাণ, বেদান্ত যে অমৃত ও আনন্দলোকের সন্ধান ও সেখানে পৌছুবার পথনির্দেশ দিয়েছেন, উপলব্ধিমান সত্যদ্রষ্টাগণ যুগে যুগে বারে বারে নিজ জীবনের সাধনা ও প্রত্যক্ষের দ্বারা সেগুলির সত্যতা প্রমাণিত করে গেছেন। তাঁদের নির্দেশিত পথে চলে আমরাও তা যাচাই করে নিতে পারি।

দুঃখের দ্বারা কোন প্রয়োজনই কি আমাদের সিদ্ধ হয় না ? নিশ্চয় হয়। দুঃখই আমাদের আনন্দধামে যাবার জন্য ব্যাকুলতা জাগায়। আগুনে পুড়ে সোনা খাঁটি হয়, নিখাদ হয়। দুঃখানলে পুড়ে জীবও খাঁটি হয় ; তার মনের যাবতীয় আবিলতা পুড়ে যায়। অহমিকা, দম্ভ, স্বার্থপরতা, নীচতা, অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস আদি যত মলিনতা সব ধুয়ে মুছে যায়। মনে তখন প্রসুপ্ত দেবত্বের জাগরণ ঘটে। সত্য প্রেম পবিত্রতা ও শ্রদ্ধাবিশ্বাসের অবরুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়। মানুষ তখন সেই সত্যিকারের অবিকারী ও অবিনাশী সুখের, আনন্দের জন্য লালায়িত হয়। যে সুখ চেয়ে আমরা ভিখারীর মত মানুষের, বিষয়ের দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই, তখন তার স্বরূপ বুঝে বাইরে খোঁজা ছেড়ে দিয়ে তার আসল আলয়ে, নিজেরই অন্তরমাঝে চোখ ফেরাই।

জীবনের প্রারম্ভ হতেই জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সাথে শাস্ত্রানুমোদিত ও গুরূপদিষ্ট পথ ধরে এদিকে যাত্রা শুরু করলে, জীবন-সায়াহ্নে এসে জীবনের হিসাব মেলাতে কোনও ব্যর্থতার অবকাশ থাকে না। কারণ সেই জীবনে কোনও খুঁত নেই, গোজামিল নেই। সেই জীবন-নদী মরুপথে শুকিয়ে যায় না, অমৃত-সাগরে মিলিত হয়। সূক্ষ্ম বিচার ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জীবনের প্রতিটি ঘটনা, মনের প্রতিটি গতি ও তার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে মনই সত্যপথ ধরতে চাইবে। আপাতদৃষ্টিতে সুখ বলতে আমরা সাংসারিক প্রাচুর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, নীরোগতা, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, শান্তি- ও সমৃদ্ধিপূর্ণ পরিবার ও অনুকূল অবস্থাকেই বুঝি। এর সামান্যতম ব্যতিক্রম আমাদের মনে যে বিপরীত প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা দুঃখ। আমাদের চাওয়ার শেষ নাই, যতই পাই না কেন আমরা আরও চাইবো ; তৃপ্তি, শান্তি কখনো এপথে আসতে পারে না। সুখের নিত্যতাও নেই, দুঃখেরও নেই। ইহারা সীমাবদ্ধ ও ক্ষণিকের। যাঁরা এই চাওয়ার পারে গেছেন, যাঁরা ভূমানন্দের স্বাদ পেয়েছেন, তাঁদের কাছে জাগতিক সুখ অতি তুচ্ছ বস্তু। তাঁরা সুখ-দুঃখের পারের

লোক। আপেক্ষিক সুখে তাঁরা উৎফুল্ল হন না; আবার আপেক্ষিক দুঃখও তাঁদের বিচলিত করতে পারে না। সুখে দুঃখে তাঁরা অবিকার, নিরাসক্ত। কারণ তাঁদের কাম্য কিছু নেই, অপ্রাপ্য কিছু নেই। আমাদের চাওয়া আছে, আমরা বাসনার দ্বারা চালিত। কাম্যবস্তু পেলে সুখী, না পেলে দুঃখী। বাসনাই সুখ-দুঃখের মূল বলে যেখানে বাসনা নেই, সেখানে সুখ-দুঃখও নেই। এই বাসনাকে মন থেকে চির নির্বাসিত করার প্রচেষ্টার নামই সাধনা, তপস্যা। এর দ্বারাই আমরা আমাদের আনন্দময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারি।

সংসারতাপে ক্লিষ্ট ও তাপিত আমরা, জরা ও মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত। রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য সংসারে আমাদের সাথী। সংসারে আমরা একা এসেছি, একাই আবার এই সাধের ধরা থেকে বিদায় নিতে হবে। শুধুমাত্র কর্মফল নিয়েই এসেছি—আবার যাবার বেলায় কর্মফলই নিয়ে যেতে হবে। এই কর্মফল যাতে শুভ ও শুদ্ধ হয় তারই প্রচেষ্টা করতে পারলেই লাভবান হওয়া যায়। আপাতমনোরম ক্ষণিক সুখের জন্য নিত্য আনন্দলাভের পথ থেকে অধিকতর দূরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের অসদ্ব্যবহার যেন না করি আমরা, অশুভ কর্মফলের বোঝা বাড়িয়ে না তুলি।

তবুও যাত্রা হয়নিক অবসান

সেখ সদরউদ্দীন

আর যে পারি না ক্লান্ত এ আমি চলেছি অনেক পথ,
আমার তরীর হাল ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে মোর রথ।

সুদূর আমায় ডাক দিয়েছিল থাকিতে পারিনি ঘরে,
অসীমের ডাকে স্থলে আর জলে চলিবার নেশা ধরে।
যৌবন যবে ছিল আতপ্ত, শিরায় তপ্ত রক্ত,
সাগরের ডাকে দিয়েছিনু সাড়া অভিযান-অনুরক্ত।
দিনেতে পেয়েছি সূর্যের আলো, রাতে ছিল কোটি তারা,
আপনার বেগে আপনি এ-আমি ছিলাম আত্মহারা।
আজিকে আমার নেই সেই বেগ, নেই দুর্বার গতি—
আজি যেন আমি শক্তিবিহীন, দুর্বল ক্ষীণ অতি।

থেমে গেছি আজ, তবুও যাত্রা হয়নিক অবসান—
অদৃশ্য এক ইঙ্গিতে নিয়ে চলিয়াছ ভগবান!
যাত্রা যেখানে ভেবেছিনু শেষ, দেখি শুরু সেখানেই,
বিশ্ব-চক্র কোথায় থামিবে ঠিকানা সে জানা নেই।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের রূপায়ণ-প্রসঙ্গে

স্বামী জীবানন্দ

শিক্ষাসঙ্কটে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ

অনেক চিন্তাশীল মনীষী বলেছেন, এখনও অনেকে অভিমত প্রকাশ ক'রে থাকেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র পথে স্বামীজীর সঞ্জীবনী বাণী আমাদের প্রকৃত পথ দেখাবে।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন দেশবাসীর জীবনে সর্বক্ষেত্রে উন্নতি এবং উপলব্ধি করেছিলেন এই উন্নতির মূলে শিক্ষা। স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ নিয়ে অনেক সুচিন্তিত আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তার রূপায়ণ-প্রচেষ্টা কমই হয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষাসঙ্কট সারাদেশব্যাপী। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েক বৎসর যাবৎ মনে হয় যেন একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। একটি পরিকল্পনা কিছুকাল স্থায়িত্ব লাভ করতে না করতেই অন্য পরিকল্পনা সম্মুখে রাখা হচ্ছে এবং তাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টাও চলছে। ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা আবার শুধু ভারতে নয়, ভারতেতর দেশসমূহেও ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছে। এই অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ শিক্ষানায়কদের অনুধ্যানের বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ছাত্র-সমাজের অসন্তোষের কারণ কি, তাদের অভাব কি, শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক নেই কেন?—এই সমস্ত বিষয়ের সমাধানকল্পে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা থেকে অনেক কিছু যে পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার অর্থ

শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? শিক্ষা বলতে এই বোঝায় - যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, সে 'মানুষ', সে লিখতে পড়তে পারে, দেশ-বিদেশের খবর রাখে এবং যে জগতে সে বাস করছে তার সঙ্গে পরিচিত হয়।

আরও বলা যায়, যাঁর দেহমনের সুষম গঠন হয়েছে, যাঁর বুদ্ধিবৃত্তি সুমার্জিত, যিনি বুদ্ধিবৃত্তি ঠিকমত পরিচালনা করতে পারেন, ইন্দ্রিয়গুলি যাঁর বশে আছে, যিনি ইন্দ্রিয়ের বশে নন, তিনি শিক্ষিত। শিক্ষার দ্বারা মানুষ স্বাবলম্বী হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে সমর্থ হয়, পরনির্ভর হতে চায় না। বলা হয়ে থাকে, যিনি সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান এবং কতকগুলি বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন তিনিই শিক্ষিত।

Education বা শিক্ষা শব্দটির মানে bringing forth what is within—অর্থাৎ অন্তরস্থ বৃত্তি-সমূহের বিকাশ-সাধন। স্বামীজী যে শিক্ষা-সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে education শব্দটির তাৎপর্য পুরোপুরি তো আছেই, আরও গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে এর অর্থ। 'Education is the manifestation of perfection already in man.'—শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। সব মানুষেরই ভেতর পূর্ণতা সুপ্ত রয়েছে, তার বিকাশ-সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ছাত্রদের অভিভাবকেরা কি চান? তাঁরা চান ছেলেমেয়েরা 'মানুষ' হোক। তারা স্বাস্থ্যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, এই-ই

হ'ল সকলের আকাঙ্ক্ষা। 'মানুষ করা' যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে শরীর, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়—এই তিনটির সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। স্বামীজী তাঁর 'man-making education'-এ এই তিনটির বিকাশ সাধনের কথা বলেছেন। শরীর হবে সুগঠিত, দ্রঢিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, তার সঙ্গে থাকবে ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং হৃদয়বত্তা অর্থাৎ সংবেদনশীল মন। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ তিনি চেয়েছেন—যার মধ্যে থাকবে চারিত্রিক দৃঢ়তা, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের মধ্যে একদিকে পরা-বিদ্যা অর্থাৎ অধ্যাত্ম-বিদ্যার কথা, অন্য দিকে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ইতিহাস, শিল্প, ললিতকলা, কারীগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির কথাও আছে। পরা ও অপরা—উভয় বিদ্যারই অনুশীলন প্রয়োজন, তিনি বলেছেন। সমগ্র মানবজীবনের বিকাশ-সাধন সব দিক দিয়ে না হলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম্য শিল্প, সঙ্গীত, কথকতা, লোকগাথা প্রভৃতির পুনরুজ্জীবনও তিনি চেয়েছেন। এই সবের মধ্যে গ্রাম্য জীবনের প্রাণশক্তি নিহিত আছে। গ্রামগুলিকে বাঁচাতে গেলে এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষা অতীত সংস্কৃতির বাহক, বর্তমান সভ্যতার পোষক এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির জনক।

শিক্ষার ক্ষেত্র ও সময়

শিক্ষার ক্ষেত্র বলতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতিকে বোঝায়। বিদ্যায়তনগুলি শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র হলেও শিক্ষা শুধু সেইখানেই সীমাবদ্ধ হতে পারে না। গৃহ ও সামাজিক পরিবেশকেও শিক্ষালাভের স্থান হিসাবে ধরতে হবে, কারণ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করা হবে তার অনুশীলনের যথার্থ ক্ষেত্র ও পরিবেশ যদি গৃহে ও সমাজে না থাকে তাহলে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষকবৃন্দ, বাড়ীতে অভিভাবকগণ, সমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যদি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ-রচনায় সচেষ্ট থাকেন তবে শিক্ষার ক্ষেত্রও শুচিসুন্দর হয়ে উঠবে।

যেখানে পারা যায়, বিদ্যায়তনগুলি যথাসম্ভব কোলাহলপূর্ণ ও চিত্তবিক্ষেপকর স্থান থেকে দূরে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হ'লে খুব ভাল হয়। প্রকৃতির গ্রন্থপাঠে যে শিক্ষা লাভ হয়, তার আর তুলনা নেই! শরীর ও মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব যুগপৎ ক্রিয়াশীল।

শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজীর যে-সব বাণী তাঁর রচনা, পত্র এবং বক্তৃতাবলীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় শুধু ছাত্রজীবনই শিক্ষালাভের সময় নয়, সমগ্র জীবনটিই শিক্ষালাভের সময়। প্রসিদ্ধ উক্তিও আছে 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' অবশ্য ছাত্রজীবনই শিক্ষার মুখ্য এবং উপযুক্ত সময়। ছাত্রজীবন বলতে বোঝা যায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল পর্যন্ত। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে শরীর-মনের গঠন হ'তে থাকে, এই সময় যে ছাঁচে শরীর-মনকে তৈরি করা যায় সেইভাবে তারা রূপ নেয়। যারা ছাত্রজীবনের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে, তাদেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়।

শিক্ষার স্তরভেদে শিক্ষানীতি

স্তরভেদে বয়সানুপাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। প্রাথমিক স্তরে শিশুশিক্ষার ভার অভিজ্ঞ শিক্ষিকাদের উপর

অর্পিত হ'লে ভাল হবে, তাঁরা সন্তানস্নেহে ও প্রয়োজনানুযায়ী শাসনে সযত্নে শিশুদের গড়ে তুলতে পারবেন।

স্বামীজীর মতে সমস্ত শিক্ষাস্তরেই মনঃ-সংযোগের উপর জোর দেওয়া উচিত এবং সেইরূপ পরিবেশও যাতে থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তাঁর মতে 'Concentration is the key to success.'—একাগ্রতাই সিদ্ধিলাভের চাবিকাঠি। এক বিষয়ে যদি মন ঠিক ঠিক একাগ্র করতে পারা যায়, তবে অন্য বিষয় যত কঠিনই হোক না কেন, তাতেও মনঃসংযোগ করা যাবে। শিক্ষানীতিতে যত বেশী একাগ্রতার দিকে লক্ষ্য রাখা যাবে ততই শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হবে। স্বামীজীর কথা: To me the very essence of education is the concentration of mind, not the collection of facts. —আমার কাছে শিক্ষার সারকথাই হচ্ছে মনঃসংযোগ, তথ্যসংগ্রহ নয়।

মানুষের অন্তরে যে জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে, তাকে খুলতে সাহায্য করাই হ'ল শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। একটি মালী যেমন বাগানে কতকগুলি চারা গাছ লাগিয়ে প্রত্যেকটি গাছের যত্ন নেয়, সার জল আলো ঠিকমত পাচ্ছে কিনা দেখে, ছাগল-গরুতে পোকামাকড়ে নষ্ট করছে কিনা লক্ষ্য রাখে, তেমনি প্রত্যেকটি বালক-বালিকার জীবন-বিকাশে সাহায্য করতে হবে এবং বিকাশের পথে অন্তরায়গুলি দূর করতে হবে। গাছ যেমন অন্তর্নিহিত শক্তিবলে যথাসময়ে ফলেফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে, তেমনি মানবশিশু উপযুক্ত শিক্ষা লাভ ক'রে মানবতার বিকাশে ভবিষ্যতে জ্ঞানে গুণে সকলের বরণীয় হবে—এই হচ্ছে স্বামীজীর কথা।

জীবন-গঠনের মূল রহস্য হ'ল শক্তির অপচয়-নিবারণ অর্থাৎ সর্ববিষয়ে সংযম। এই দিকে যত বেশি লক্ষ্য রাখা হবে ততই বিদ্যার্থীর মধ্যে শান্ত ও সংযত ভাব আসবে এবং মেধা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান শিক্ষানীতিতে এই দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না, এই উপেক্ষার ফলস্বরূপ দেখা যায় উচ্ছৃঙ্খলতা।

নিয়মিত পরিমিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যচর্চা, মুক্ত বায়ুতে খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে শরীরকে নীরোগ ও সবল রাখা প্রয়োজন। স্বামীজীর ভাষায়, চাই: 'Muscles of iron and nerves of steel.' —পেশীসমূহ লোহার মতো শক্ত এবং স্নায়ুগুলি ইস্পাতের মতো দৃঢ়। শরীরের যেমন পুষ্টিসাধন প্রয়োজন, তেমনি মনেরও। মনের স্বাভাবিক গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

জ্ঞানলাভের পারম্পর্য মোটামুটি এইভাবে বলা যেতে পারে: প্রথমে বস্তুবিশেষের উপর মনঃসংযোগ, ক্রমশঃ বস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার। কৌতূহল জাগলে পর্যবেক্ষণের ইচ্ছা হবেই। আবার কৌতূহল এলে একাগ্রতা আসতে বাধ্য। একাগ্রতা দ্বারাই চিন্তার সার্থকতা।

মানসিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি ও স্বাধীন চিন্তার সুযোগ এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকা চাই। শিক্ষার প্রত্যেক বিভাগেই স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার প্রচুর সুযোগ থাকা দরকার।

আমাদের মস্তিষ্কে কেবল কতকগুলি ভাব প্রবেশ করানো হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি কার্যে কিভাবে পরিণত করা যায়, তার কোন উপায় নির্ধারিত হয় না। স্মরণ রাখতে হবে, মনুষ্যজীবনে শিক্ষার আনন্দ—প্রয়োগে, সৃষ্টিতে, গবেষণায়, উদ্ভাবনে ও আবিষ্কারে। কাব্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান শিল্প ললিতকলা প্রভৃতি সর্ববিভাগেই একথা

প্রযোজ্য। অতএব উচ্চশিক্ষার সর্ববিভাগেই এই সমস্ত সুযোগ যদি পূর্ণমাত্রায় দিতে পারা যায়, তবে শিক্ষাজগতে স্বর্ণযুগ আসবে। এই দিকে মনোনিবেশ ক'রে ভারতের বর্তমান শিক্ষানীতি সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

ছেলেদের মতো মেয়েদেরও প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। সকলেই জানেন স্বামীজী স্ত্রীশিক্ষার উপর খুব জোর দিয়েছেন।

শিক্ষক ও ছাত্র

একদিকে শিক্ষক, অপর দিকে ছাত্র, মধ্যে বিদ্যা। বিদ্যা হচ্ছে ছাত্র ও শিক্ষকের মিলন-সেতু। প্রাচীন কালে আচার্য ও শিক্ষক প্রার্থনা করতেন তাঁদের অধীত বিদ্যা যেন ফলপ্রসূ হয়, তাঁদের মধ্যে যেন বিদ্বেষভাব না থাকে, তাঁরা যেন বিদ্যার ফল সমভাবে ভোগ করেন। বর্তমানে আবার শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সেই প্রাচীন আদর্শ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে স্নেহের সম্পর্ক কমই দেখা যায়। শিক্ষককে কেমন হ'তে হবে আর ছাত্রেরই বা জীবনচর্যা কেমন হবে সে-সম্বন্ধে স্বামীজীর অনেক কথা আছে। তিনি বলেছেন, 'শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই কতকগুলি বাধ্যতামূলক নীতি পালন করা প্রয়োজন। চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। ছাত্রের পক্ষে প্রকৃত জ্ঞানতৃষ্ণা এবং অধ্যবসায়ের অনুশীলন প্রয়োজন।' যদি শিক্ষক আদর্শচরিত্র হন তবে তাঁর উপদেশে কাজ হবেই। শিক্ষক সত্যাশ্রয়ী হ'লে ছাত্রেরও সত্যের প্রতি অনুরাগ আসবে। শিক্ষক যদি শ্রদ্ধাবান হন, তবে ছাত্রও হবে শ্রদ্ধাবান, ছাত্রেরও আত্মবিশ্বাস জাগবে। বলা বাহুল্য, শিক্ষকগণকে যাতে অন্নচিন্তায় বিব্রত না হ'তে হয়, তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানদানে ব্রতী থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'। যে ছাত্র মন দিয়ে অধ্যয়ন করে তার তপস্যার ফল সে লাভ ক'রে থাকে এখনও। বর্তমানে ছাত্রজীবনে রাজনীতি যেন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে! রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদানের আগে লেখাপড়া শেষ করা সবচেয়ে ভাল। ছাত্র-জীবন হ'ল জীবনের প্রস্তুতির সময়। রাজনীতির বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন না ক'রে কোন মতবাদে সক্রিয় অংশগ্রহণও বাঞ্ছনীয় নয়। স্কুল-কলেজগুলি যাতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার পবিত্র স্থান হয় এবং রাজনীতির কবলমুক্ত থাকে, সেই দিকে শিক্ষক ছাত্র জননায়ক সকলেরই দৃষ্টি দিতে হবে। বর্তমানে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যাও বাড়ছে। বিরাট ছাত্রসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'লে বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। দরিদ্র ছাত্রগণ যাতে উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার পায়, তাদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব না হয়—এ সবও দেখতে হবে রাষ্ট্রকে। পাঠ্য বিষয় অনর্থক ভারাক্রান্ত না ক'রে অল্প বিষয়ও যদি খুব ভালভাবে শেখানো যায় তাতেই সুফল হবে। প্রতি বৎসর যত কম পুস্তক পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয় ততই ভাল।

জনশিক্ষা

প্রতিটি মানুষ একদিকে নিজের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবে, সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে যে অগণিত জনসাধারণ রয়েছে তাদেরও যাতে শরীর-মনের প্রকৃত উন্নতি হয় তার জন্য সমভাবে যত্নশীল হ'লে তবেই হবে প্রকৃত কল্যাণ। স্বামীজী

বলেছেন, 'Be and make.'—নিজে ভাল হও এবং অপরকে ভাল হবার পথে সাহায্য কর। এই মহাবাণী প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য-পালনীয়। ভারতে এখনও ৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ লোক নিরক্ষর! কী ভয়াবহ অবস্থা! প্রত্যেকে যদি প্রতিজ্ঞা করেন—জীবনে অন্ততঃ দু-চার জনেরও নিরক্ষরতা দূর করব, তাহলেই অনেক কাজ হবে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর ছুটি থাকে, সেই অবকাশের সময় ছাত্রগণ গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিরক্ষরতা-দূরীকরণের কাজে লাগলে অদূর ভবিষ্যতে দেশ থেকে সহজেই নিরক্ষরতা নির্বাসিত হতে পারে। শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের মধ্যে যে কৃত্রিম অচলায়তন ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে রয়েছে, গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তার বন্ধন শিথিল হবে। ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী-লাভের পর কিছুদিন গ্রামে গ্রামে সেবার কাজ করা যেতে পারে; গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ভাল রাখার উপায় ব'লে দেওয়া, তাদের ঘরবাড়ী কিভাবে ভাল করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু করার আছে। একথা স্মরণে থাকা দরকার যে, আমিই কেবল বড় হব বিদ্যায় স্বাস্থ্যে অর্থে সম্পদে, আর অন্যেরা বঞ্চিত থাকবে—এরূপ বুদ্ধি স্বার্থপরতারই নামান্তর এবং তা উৎকট আকার ধারণ করলে মারাত্মকও। স্বামীজী বলেছেন, বিদ্যা অর্থ যা তোমার আছে অপরের কল্যাণে তা দিতে পারলেই তার সার্থকতা। গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক ল্যানটার্ন নিয়ে অবসর-সময়ে শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রগণ গ্রামবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন সাধারণভাবে; তাদের জানাবেন—ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ ও জৈন মহাপুরুষগণের জীবনচরিত, বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান, কায়িক শ্রমের মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়; তবেই একদিকে তাঁরা পাবেন জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে আনন্দ, অপরদিকে তাঁদের অভিজ্ঞতাও বাড়বে প্রচুর এবং জনসাধারণেরও সেবা হবে প্রকৃত।

বিশেষ চিন্তনীয় কয়েকটি বিষয়

বর্তমানে মানুষের মনে সিনেমা-শিল্পের প্রভাব অস্বাভাবিক। একে যদি জনশিক্ষার কাজে লাগানো যায় তার ফল হবে খুবই ভাল। স্বামীজী ম্যাজিক ল্যানটার্নকে কাজে লাগাতে বলেছেন। এখন সিনেমার প্রসার ও *প্রচার সর্বাধিক। বিজ্ঞান-শিক্ষায় ও অন্যান্য* শিক্ষণীয় বিষয়ে যদি সিনেমাকে ঠিক ঠিক কাজে লাগানো যায় তবে অনেক কঠিন বিষয়ও সহজে শিক্ষা দেওয়া যাবে। মানুষের মধ্যে সুবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি দুই-ই আছে, শিক্ষার লক্ষ্য থাকবে সুবৃত্তিগুলিকে জাগানোর দিকে। আমাদের চোখ যদি ভাল জিনিস দেখতে অভ্যস্ত হয়, কান যদি ভাল জিনিস শুনতে অভ্যস্ত হয়, তবে অশোভন ও অরুচিকর বস্তুর দিকে তারা আকৃষ্ট হবে না। ভালোর পরিবর্তে মন্দ জিনিস পরিবেশিত হ'লে তার প্রতিই আকর্ষণ ও আগ্রহ বাড়বে, কারণ মানুষ অভ্যাসের দাস। এইদিকে দৃষ্টি রেখে ফিল্ম তৈরি করতে পারলে ক্রমে তার চাহিদাও বাড়বে। আর শুধু অর্থাগমই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

শুধু সিনেমা নয়, পত্র-পত্রিকায় এমন সব লেখা থাকা উচিত যার দ্বারা বাস্তবিকই মন ভাল দিকে যায়, বিজ্ঞাপনের ছাবগুলিও যাতে সুরুচির পরিচায়ক হয় সে-সম্বন্ধে চিন্তা করারও প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃত-শিক্ষার মাধ্যমে নীতিবোধ ধর্মপরায়ণতা ও শ্রদ্ধার ভাব রক্ষিত হয় কিনা, তাও ভেবে দেখতে হবে এবং সংস্কৃতকে অবশ্যশিক্ষণীয় করতে হবে। সংস্কৃতের

মধ্যে এমন জিনিস আছে, যা আমাদের সমাজ-জীবনকে ধরে রেখেছে ; সংস্কৃতকে বর্জন করলে সমাজ-জীবনও বিপর্যস্ত হবে। সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করলে ভারতের সংস্কৃতি রক্ষা পাবে। যদি চারদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার খোরাক জোগানো হ'তে থাকে তবে তার ফল বিষময় হবেই।

স্বামীজী বলেছেন, ভারতের সনাতন আদর্শ —ত্যাগ ও সেবা। বাল্যকাল থেকেই তার অনুশীলন প্রয়োজন। যে ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে নিজেদের খাবার অন্যের সঙ্গে ভাগ ক'রে খায়, নিজেদের জিনিসপত্র অপরের প্রয়োজনে দিতে পারে, অর্থাৎ যাদের ত্যাগ ও সেবার ভাব আছে অথচ স্বার্থপরতা নেই, তাদেরই প্রতি সকলের স্নেহ-ভালবাসা বেশী দেখা যায়। কর্ম-জীবনেরও সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় ত্যাগ ও সেবার প্রভাব, তাই ত্যাগী এবং সেবাপরায়ণ ব্যক্তি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। ছোটবেলা থেকেই যাতে এই ভাব ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশুনা শেষ করার পূর্বে অন্ততঃ ছমাসের জন্য ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া দরকার।

জাপান থেকে জাপানীদের সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে প্রশংসা ক'রে স্বামীজী চিঠি লিখেছেন। জাপানীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখবার জিনিস, তাদের রাস্তাঘাট শহর গ্রাম—সব পরিচ্ছন্ন, ছবির মতো সুন্দর, একথা অনেকেই ব'লে থাকেন। লক্ষণীয় যে, ভারতে মন্দিরের ভেতর পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করা হয় কিন্তু মন্দিরের চারদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রাখা হয়। এই সব বলবার উদ্দেশ্য—স্বামীজীর মতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও শিক্ষার একটি বড় অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত। দেখা যায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্তূপীকৃত জঞ্জাল, পথঘাট সব অপরিচ্ছন্ন—যেন নরককুণ্ড ও রোগবিস্তারের ক্ষেত্র ক'রে রাখা হচ্ছে! মানুষের civic sense যেন বিলুপ্ত হ'তে চলেছে! সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ, করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বয়স্ক অল্পবয়স্ক সব নাগরিককে অবশ্য-পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নির্দেশসূচক পুস্তিকা দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে বিধিগুলি যেন সযত্নে পালিত হয়।

মানুষ শিক্ষিত হ'ল কিনা বোঝা যাবে তার কার্যকলাপের মাধ্যমে। 'ফলেন পরিচীয়তে।' ফলেই বৃক্ষের পরিচয়—সুবৃক্ষ না কুবৃক্ষ। শিক্ষা লাভ করার পর কেমন মানুষ হ'ল বোঝা যাবে তার আচরণের দ্বারা, সে সুশিক্ষা লাভ করেছে না কুশিক্ষা পেয়েছে। তার আচার-আচরণে শালীনতা, রুচিবোধ, সৌন্দর্য-জ্ঞান, সংযত-জীবনচর্যা, শ্রদ্ধা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিস্ফুট হবে সুশিক্ষা ; কুশিক্ষা দ্বারাও তেমনি এর বিপরীত ভাবগুলি চরিত্রের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠবে।

ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় *বিদেশের খারাপ জিনিসগুলি অনুকরণ করা* হয়েছে। স্বামীজী বলেছেন—নিয়মানুবর্তিতা, কর্মশীলতা, উদ্যম, ঐক্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ পাশ্চাত্যবাসীদের উন্নতির মূলে। ভারত-বাসী মাত্রেরই এগুলির অনুশীলন প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

উপসংহার

আজ যারা ছাত্র তারাই হবে ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাদেরই উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাদের জীবনে অনেক দায়িত্ব আসবে, তারা যদি সে-সব দায়িত্ব বহনের যোগ্য না হয় তবে উন্নতি ব্যাহত হবে নিঃসন্দেহ।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ-রূপায়ণের মূল কথা হ'ল প্রাচীন আদর্শকে পুরোপুরি মর্যাদা দিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নব নব পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে

যুগোপযোগী ক'রে শিক্ষার সংস্কার করা। বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে শিক্ষিতব্য বিষয় পরিবেশিত হলে একঘেয়েমি দূর হবে এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। এর জন্য চাই প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃত আন্তরিকতা।

বর্তমানে ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সকলেই চিন্তান্বিত, এর প্রশমন সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব। স্বামীজীর বলিষ্ঠ চিন্তাধারার সঙ্গে তরুণদের পরিচয় ঘটাতে পারলে তাদের মনে ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে এবং তারা ভুল পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবে। আর কালক্ষেপ না ক'রে স্কুল-কলেজে এবং বাড়ীতেও স্বামীজীর গ্রন্থাবলী-পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ-অবলম্বনে বাংলা তথা ভারতের সর্বত্র বিদ্যায়তন গড়ে তুলতে হবে—প্রাথমিক স্তর থেকে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত। ব্যাপকভাবে শিক্ষায়তন-পরিচালনা যেমন দেশের উন্নতির জন্য, দেশবাসীকে সাক্ষর করবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন, তেমনি কতকগুলি আদর্শ ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস এবং বিদ্যায়তন প্রভৃতিও রাখতে হবে। এই আদর্শ বিদ্যায়তন ও ছাত্রাবাসগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সমগ্র দেশের বিদ্যায়তন ও ছাত্রাবাসসমূহ পরিচালনা করতে হবে, যখন কোন সমস্যার উদ্ভব হবে তখন এই আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকেই তার সমাধান মিলবে। আদর্শ প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে লক্ষ্যের দিকে ঠিকমত অগ্রসর হতে পারে সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

"ভারতে এমন কোন সমস্যা নাই, শিক্ষার যাদুকাঠির স্পর্শে যাহার সমাধান হয় না।"

"উপায় শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐকথা বললেই যে জটাজুট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার বক্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ, এ সকল তো মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' এই আত্মবিদ্যার সামান্য অনুষ্ঠানেও মানুষ মহা ভয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়। মানুষের অন্তরে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে মানুষ অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে শুরু করিয়া সব কিছুই অনায়াসে করিতে পারে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিদেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমতী বনবালা মুখোপাধ্যায়

প্রতীচ্যে যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব কতদূর প্রসারিত তা দেখবার সুযোগ করিয়ে দিয়ে বেলুড় মঠের স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজ আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। শুধুমাত্র আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যুগাবতারের মন্দিরগুলি দর্শনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়ে দিয়েছেন।

৬ই অগস্ট, ১৯৬৭ সাল। কলকাতা থেকে আমার স্বামী শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রওনা হলাম। অনেকবার আমাদের বিদেশে যেতে হয়েছে, তবে এবারে আমাদের আকর্ষণ শুধু বিদেশ ভ্রমণ নয়—তীর্থযাত্রীর মন নিয়েই আমরা বেরিয়েছি। দমদম বিমানঘাঁটি থেকে প্লেনে কলকাতা ছেড়ে আমরা মাত্র কয়েক দিনের জন্য ব্যাংকক্, হংকং, টোকিও ও হনুলুলু ছুঁয়ে সানফ্রান্সিস্কোতে পৌছলাম।

সানফ্রান্সিস্কোতে পৌছেই হোটেল থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ ক'রে পরিচয়পত্রটি সঙ্গে নিয়ে বেদান্ত আশ্রমের দিকে যাত্রা করলাম। অতি সুন্দর সাজানো শহর সানফ্রান্সিস্কো। মনোরম একটি বাড়ীর দরজার সামনে আমরা কলিং বেল্ বাজালাম। একজন বিদেশী দরজা খুলে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে খবর দিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী অসুস্থতার জন্য কারো সঙ্গে দেখা করেন না। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজই স্বাগত জানালেন আমাদের। আমরা আশ্রমের মন্দির দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্রই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আশ্রমের গাড়ী ক'রে জনৈক আমেরিকান সন্ন্যাসীকে দিয়ে পাঠালেন মন্দির দর্শনের জন্য। মন্দিরে প্রায় আট নয় জন সন্ন্যাসিনী থাকেন। এঁদের মধ্যে যিনি বয়স্কা (আমেরিকান মহিলা) তিনি সাগ্রহে আমাদের সব দেখালেন। ওখানেও মন্দিরের মধ্যে জুতো খুলে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের ভেতর ঢুকে ঠাকুর দর্শন ক'রে এই কথা ভেবে মনে মনে গর্বে আনন্দে আপ্লুত হলাম যে, কামারপুকুর পল্লীর এক দরিদ্র, প্রায়-নিরক্ষর ব্রাহ্মণসন্তান কিভাবে সারা বিশ্বে বিরাজ করছেন—শুধু মন্দিরে নয়, বহু জনের হৃদয়মন্দিরেও। বেদীর মাঝখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর একদিকে শ্রীশ্রীমা ও অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ; দুধারে যীশুখৃষ্ট এবং ভগবান বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত।

মন্দির-সংলগ্ন বাগানটি সন্ন্যাসিনীদের হাতে তৈরী। ঠাকুরের ভোগও রান্না করেন তাঁরাই। আমাদের দেশের আশ্রমজীবন থেকে ওদেশের আশ্রমজীবনের কোনও পার্থক্য চোখে পড়ল না। যত দেখছি তত অভিভূত হয়ে পড়ছি।

সানফ্রান্সিস্কো থেকে আমরা শিকাগো রওনা হলাম। যেখানে দাঁড়িয়ে স্বামীজী ঠাকুরের বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই পবিত্র স্থানটি না দেখা পর্যন্ত যেন আমাদের তীর্থযাত্রা পূর্ণ হচ্ছে না। সন্ধ্যায় শিকাগোর হোটেলে পৌছেই আশ্রমে টেলিফোন করলাম। স্বামী ভাষ্যানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। তিনি তখন সদ্য ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসেছেন। বেলুড় মঠে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল।

আমেরিকার বাণিজ্যকেন্দ্র শিকাগো এক মস্ত শহর। বিরাট বিরাট বাড়ী, রাস্তাও খুব চওড়া। শিকাগো শহরটি হ্রদ-পরিবেষ্টিত।

রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে কখন যে আকাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে গিয়েছি খেয়াল ছিল না। হঠাৎ চোখে পড়লো—'বিবেকানন্দ বেদান্ত আশ্রম'। দরজার বেল্ বাজাতেই জনৈক আমেরিকান যুবক এসে অভ্যর্থনা ক'রে আমাদের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, স্বামীজীকে খবর দিলেন। স্বামী ভাষ্যানন্দের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। তাঁকে তখন বড় পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিলো, কেননা তিনি মাত্র আগের দিনই ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসেছেন। অনেক কথা হ'ল তাঁর সঙ্গে। কথার ফাঁকে তিনি আমাদের ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ জানালেন। চারজন আমেরিকান ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এই চারজন কুমার কিশোরদের দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। যাঁর আকর্ষণে এঁরা এই অল্প বয়সে বিলাসোন্মত্ত, প্রলোভনে ভরা দেশে সংসারধর্ম ত্যাগ ক'রে বেদান্ত আশ্রমের শান্তি-নিলয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁর মহিমার কথা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল।

স্বামী ভাষ্যানন্দের সঙ্গে আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পূজার ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। বহুপরিচিত ধূপধুনার গন্ধ সাত সমুদ্দ্র তেরো নদীর পার থেকে দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় মঠের স্মৃতিকে ডেকে আনলো যেন। চেতনার ওপর আচ্ছন্নতা নেমে এলো—শ্রদ্ধা, বিস্ময় আর আনন্দের আচ্ছন্নতা। মনে পড়লো শ্রীরামকৃষ্ণেরই সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরই বাণী প্রচারের জন্য এসে একদিন স্থূলদেহে ঘুরে বেড়িয়েছেন এই শহরে, তাঁর পদধূলি মেখে শিকাগো শহর ধন্য হয়েছে। পরের দিন আশ্রমের অপর একটি বাড়ী দেখার এবং আশ্রমে প্রসাদ পাওয়ার জন্য স্বামী ভাষ্যানন্দ মহারাজ আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, আমরাও তা সানন্দে গ্রহণ করলাম।

পরদিন দুপুরের একটু পরেই রওনা হয়ে গেলাম। মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর নির্দেশমত শিকাগো দেখতে গেলাম। জনৈক আমেরিকান আশ্রমবাসী গাড়ী চালিয়ে আমাদের শিকাগো শহর দেখালেন। অনেকক্ষণ ঘোরার পর রেস্টুরেণ্টে চা-পানের জন্য থামলাম। কথায় কথায় আমরা আমেরিকান আশ্রমবাসীটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আশ্রমবাসী হলেন কেন। তিনি জানালেন যে, তিনি পূর্বে নিউইয়র্কে কাজ করতেন। সেখানে দুচারবার আশ্রমের মহারাজের বক্তৃতা শুনে এবং স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে তাঁর মনে হলো, 'আমি যেন এই জিনিসটাই খুঁজছি! চাকরি আর ভাল লাগল না। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক উদাস হয়ে থাকতাম, কি যেন খুঁজে বেড়াতাম!' যে দেশ পার্থিব সুখ ও ঐশ্বর্যের চরমে উঠেছে, তাই নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে, সেই আমেরিকার মতো জায়গায় এধরনের ভাবান্তর বিস্ময়জনক মনে হ'ল। তিনি এখনও অনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য দীক্ষা পাননি, তবে আশ্রমে ব্রহ্মচারীর মতো থাকেন। আর একটি কথা ভেবে তৃপ্তি পেলাম যে, বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের ফলে কত সন্তপ্ত হৃদয়ই না অমৃতধামের পথের সন্ধান পেতে পারছে!

হোটেল থেকে বেরিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম যে বাড়ীতে ছিলেন এবং যে পার্কের পাশে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলেন তা দেখলাম। সেখান থেকে একটি বাড়ীতে গেলাম যেখানে উপনিষদ্ এবং বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সেখানে গিয়ে দেখলাম মাটিতে আসনের মতো ছোট ছোট গদি পাতা। তার ওপর বসে ওদেশের আধ্যাত্মিকতা-পিপাসুরা ধ্যান করেন। হলের মধ্যে ঠাকুরের একটি রঙিন পট স্থাপিত, ফুল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো। অতি

শান্ত পরিবেশ।

সেখান থেকে আশ্রমে ফিরে আমরা রাত্রের খাওয়া সমাধা করি ; আয়োজন ও ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। আমরা বড়ই আনন্দ পেলাম ব্রহ্মচারী-দের সুন্দর ব্যবহার ও যত্ন দেখে। তাঁদের শান্ত স্বভাব এবং মহারাজের সঙ্গে ব্যবহার খুব মধুর মনে হ'ল। ব্রহ্মচারীরাই ঠাকুরের আরতি, ঠাকুরকে সাজানো, ভোগ দেওয়া প্রভৃতি সবই করেন গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে।

আশ্রম থেকে রাত্রে আমাদের গাড়ী ক'রে পৌঁছে দিয়ে গেলেন একজন ব্রহ্মচারী। পরের দিন আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা দেওয়ার হলটি দেখতে গিয়েছিলাম। ১৮৯৩ সালে যে হলে ধর্মমহাসভার অধিবেশন হয়েছিল, সেটি এখন আর্ট ইনষ্টিট্যুটের অন্তর্ভুক্ত। ইনষ্টিট্যুটের পরিচালকগণের কাছে হলটির কোন গুরুত্ব নেই। তাই আমরা যখন সেখানে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ককে হলটি খুলে দেবার জন্যে অনুরোধ করলাম, তখন সেই বৃদ্ধা মহিলা খানিকটা অবাক হয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভারতীয়রা কেন এই হলটি দেখতে চায়। তখন আমরা বুঝিয়ে দিলাম যে, ভারতবর্ষের একজন মহান সাধু এই হলে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে বিদেশীর চোখে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পূর্ণ গৌরবে তুলে ধরেছিলেন। হলটির মধ্যে ঢুকে আমরা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম যে, এইখানেই একদিন স্বামীজীর জলদগম্ভীর কণ্ঠে ওজস্বিনী ভাষা ধ্বনিত হয়েছিল, ধর্মের বিশ্বজনীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ঘোষিত হয়েছিল।

শিকাগোতে শুনে এলাম, স্বামী ভাষ্যানন্দ প্রায় ৪০ একর জমির ব্যবস্থা করেছেন এবং সেখানে মঠ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের যে-সব সাধুরা আছেন, তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী ধীরে ধীরে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে. ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়, এঁদের কাছ থেকেই তার সঠিক পরিচয় তাঁরা পাচ্ছেন। দেশে ফিরে এসে আমরা চেষ্টা করছি, যদি শিকাগোর হলে স্বামী বিবেকানন্দের কোন প্রতিকৃতি বা চিহ্ন রাখা যায়।

শিকাগো থেকে কানাডার মন্ট্রিয়ল্ শহরে গেলাম, তখন সেখানে Expo '67 হচ্ছিল, তাই শহরে খুব ভীড়। আমরা তিনদিন ওখানে ছিলাম এবং প্রায় সব সময়ই 'এক্সপো'-৬৭টির মধ্যে কাটাতাম। 'Expo' একটি বিরাট ব্যাপার, এক মাস দেখেও শেষ করা যায় না। সারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশই নিজের নিজের দেশের উন্নতি তুলে ধরেছে ভিন্ন ভিন্ন প্যাভিলিয়নে ; বিজ্ঞানের উন্নতি দেখে মানুষ যে আজ জ্ঞানের পথে কত এগিয়ে গিয়েছে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। আমেরিকার ও রাশিয়ার প্যাভিলিয়নে বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল 'Space Craft' (মহাকাশযান), যেগুলি পৃথিবীর বাইরে পরিক্রমা ক'রে ফিরে এসেছে। ভারতবর্ষের প্যাভেলিয়নটিও বেশ সুন্দর। ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পরিচয় এখানে গেলে পাওয়া যায়। ভারতীয় খাদ্যের চাহিদাও এখানে প্রচণ্ড।

কানাডা থেকে রওনা হয়ে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ক'দিন থেকে আমরা লণ্ডনে গেলাম। নিউইয়র্কে রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি বাইরে থাকার জন্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

লণ্ডনে এসে আমরা মিশনের দুটি শাখাতেই গিয়েছিলাম। 'হল্যাণ্ড পার্ক'-এর স্বামী পরহিতানন্দ ও Muswell Hill-এর স্বামী ঘনানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি। এখানকার বাগানে নানারকম ফুল ও ফলের গাছ আছে এবং সবই ব্রহ্মচারিণীদের তত্ত্বাবধানে তৈরী।

লণ্ডনে কয়েক দিন থেকে প্যারিসে গেলাম এবং সেখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। প্যারিস থেকে জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালী হয়ে আমরা দেশে ফিরে আসি।

সুদূর বিদেশের এই সব কেন্দ্ররূপ উৎসগুলি থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা অবিরাম নিঃসৃত হচ্ছে। কত তৃষ্ণার্ত এসে সে স্নিগ্ধ সলিল পান ক'রে তৃপ্ত হচ্ছে, ধন্য হচ্ছে! আজ তাঁদের সংখ্যা হয়তো তুলনায় খুবই কম। কিন্তু একদিন তা অগণিত হবেই, একদিন এই ভাবধারা বিপুল প্লাবনে জগৎ ভাসিয়ে দেবেই। সারা পৃথিবীর মানুষ সেদিন নির্ভুল পদক্ষেপে অগ্রসর হবে এক পরম শান্তির, পরম মিলনের দিকে।

স্বামীজী

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

তোমার সম্ভব আজ প্রয়োজন ক্ষয়িষ্ণু এ কালে।
স্বামীজী! আজকে দেশে পুঞ্জীভূত সত্যের বিকার।
মহাকার্যসম্পাদনে আজ শুধু চালাকিই সার
স্বার্থভরা দিনবৃত্তে। সৌম্য মুখোশের অন্তরালে
কামনায় পিঙ্গল দুচোখ। অদৃশ্য বাসনাজালে
চেতনার বন্দিত্ব অটুট। আত্মঘাতী মিথ্যাচার
সংশয়ী জীবনে ব্যাপ্ত। ঘোরতর তামসিকতার
মোহাবেশে নিদ্রাগত দেশ। হিংসা মারী বিষ ঢালে॥

হে বীর সন্ন্যাসী! এই আত্মভ্রষ্ট বীর্যহীন দেশে
তোমার সম্ভব হোক ভাবদেহে। পৌরুষ-সাধনা,
সেবার মহৎ চর্যা জীবরূপে শিব-আরাধনা
ত্যাগব্রত সুপ্রতিষ্ঠ হোক। গাঢ় আলস্য আবেশে
আজকে যে জাতি মগ্ন, শক্তিলভ্য সত্যের উদ্দেশে
তার উজ্জীবন হোক। স্ফূর্ত হোক শাশ্বতী প্রেরণা॥

স্থাপকায় চ ধর্মস্য

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

ধর্মের সংস্থাপক, সকলধর্মস্বরূপ, অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হে রামকৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম করি।

প্রণাম-মন্ত্রটির রচয়িতা স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু যুগক্রান্তির কী বিচিত্র বৈপরীত্যের প্রহসন! যে-যুগে হিন্দুধর্ম নিন্দিত, মূর্তি-পূজা ঘৃণিত, গুরুবাদ পরিত্যক্ত, অবতারবাদ অবহেলিত হ'ল, সে-যুগেই সে-নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার উপকণ্ঠে হিন্দুধর্মের সারস্বরূপ, মূর্তিপূজক, গুরুবাদ-অবতারবাদে বিশ্বাসী, নিরক্ষরপ্রায়, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে অর্পিত হ'ল অমানব ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণামমন্ত্র।

যুগপ্রয়োজনে ধর্মরক্ষার জন্য ঈশ্বরের অবতার হওয়া শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও ইতিহাসসিদ্ধ ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। কিন্তু বরিষ্ঠ কেন? এ কি কেবল নিজ গুরুর প্রতি অতিমান-আরোপ? না। স্বামীজীর ভাষাতেই বলছি: তোমরা যত মহাপুরুষ দেখেছ, স্পষ্ট করেই বলছি যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করেছ, তন্মধ্যে ইঁহার জীবন পবিত্রতম।[১]...

অহো, জগতের কোন দেশে সার্বভৌম ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের প্রসঙ্গ আলোচিত হবার অনেক পূর্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন এক ব্যক্তি বাস করতেন, যাঁর সমস্ত জীবনটাই একটি ধর্ম-মহাসভা-স্বরূপ ছিল।[২]

১ বাণী ও রচনা, ৫ম, ২১২ পৃঃ
২ ঐ ঐ ২১১ পৃঃ

ভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখাতে যুগ-প্রভাবে মানব-মনীষার বিকাশ অনুযায়ী ভাবধারার প্রচার করেন অবতারপুরুষ। তাই বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারার প্রতি জোর দেওয়া হয়। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর সর্বভাবময়। তথাপি ভাববিশেষের প্রচারে ভাববিশেষের মূর্ত বিগ্রহ হওয়া তাঁর সীমা নির্দেশ করা। এ-কারণে, বর্তমান আবির্ভাব সর্বভাবময় হওয়ায় তাঁকে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ বলা যায়।

আবার সর্বপ্রকার ভাবধারার আপাত-বৈচিত্র্যের মধ্যেও যিনি স্বীয় স্বকীয়তা ঠিক রাখতে পারেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর বই অপর কেহ নন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে আমরা এই বহুধা বৈপরীত্যের সমাবেশ দেখে বিস্মিত হই। তাই তিনি অবতারবরিষ্ঠ।

স্বামীজী লিখেছেন: এই নবোত্থানে নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ শ্রীভগবান পরম কারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যাসহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।[৩]

অবতার স্বয়ং নিজ পরিচয় ব্যক্ত করে যান। নতুবা তাঁকে ধরা বোঝা জীবের সাধ্য নেই। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার। দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

৩ ঐ ৬ষ্ঠ ৬ পৃঃ

কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে, তাই তিনি সর্বধর্মস্বরূপ। সর্বধর্ম কেন? তিনি একটি মত বা ধর্মের কথাই বলেননি—বলেছেন সকল ধর্মমতের সত্যতার কথা। সব মতই পথ। বলেছেন: সাকার নিরাকার দুই-ই সত্য। পুকুরের জলের উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন—জল এক, দেশভেদে নামভেদ মাত্র। সত্তা এক। বোঝালেন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত জীবের আত্মিক বিকাশের মাত্রাভেদে সত্য। শেষে এক—অদ্বৈত।

'যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি গুণের অতীত, তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, বাক্য-মনের অতীত বলা যায়; পরব্রহ্ম।' শুনিয়েছেন মানুষের যথার্থ স্বরূপের কথা, বলেছেন: মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। 'জীব শিব'।

এ-সব যে বলেছেন—এ কী কেবল কথার কথা? তাঁকে কি জানা যায়, দেখা যায়? কি তাঁর স্বরূপ? তিনি সাকার কি নিরাকার? সম্প্রদায়ভেদে ঈশ্বর কি অনেক? এ-সবের সমাধান তিনি যে অনবদ্য সরলতার সঙ্গে করেছেন তা কী কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা মাত্র? এ তো তিনি বহু অধ্যয়ন করে, বহু শ্রবণ করে বলেননি। বলেছেন নিজ উপলব্ধির আলোকে—নানা পথের সাধনার ধারায় বারে বারে একই সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎলাভ করে। তিনি চৌষট্টিখানি তন্ত্রসাধনা, বৈষ্ণবভাব-সাধনার সব কটি, বেদান্তসাধন, যোগ, ইসলাম, খৃষ্টান প্রভৃতি বহু প্রকার সাধনা করেছেন। সে সাধন-উপার্জিত উপলব্ধির সহায়েই 'যত মত তত পথ'—এই মহাবাণী উচ্চারণ করেছেন। ঐ সাক্ষাৎকারের প্রত্যয়-দৃঢ়তা নিয়ে তাল ঠুকে বলেছেন: যেমন 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'···(তেমনি) তিনি এক, কেবল নাম তফাত। তাঁকে কেউ বলে 'আল্লা'; কেউ বলে 'গড'; কেউ বলছে, 'ব্রহ্ম'; কেউ 'কালী'; কেউ রাম হরি যিশু দুর্গা।

বেদ বলছেন—'যঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' —যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি ব্রহ্মই হ'য়ে যান। তেমনি, ধর্মের স্বরূপকে যিনি জানেন তিনি সাক্ষাৎ ধর্মবিগ্রহ—ধর্মস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো কেবল হিন্দুধর্মকেই জানেননি, তিনি জেনেছিলেন সকল ধর্মমত, হয়েছিলেন সর্বধর্ম-স্বরূপ। তাই প্রণামমন্ত্রে বলা হয়েছে 'সর্বধর্ম-স্বরূপিণে'—এই তো সগুন-ঈশ্বরত্ব।

বেশ কথা, তিনি সবধর্মস্বরূপ হোন, কিন্তু অবতার যে ধর্মসংস্থাপক—তিনি কি কোন নূতন ধর্ম স্থাপনা করেছেন? উত্তরটি হাঁ-বোধকও বটে, না-বোধকও বটে। সত্যকথা এই যে, তিনি বুদ্ধাদি মহাপুরুষগণের মত কোন ব্যক্তি-নাম-কেন্দ্রিক ধর্মের প্রচলন করেননি বা সনাতন ধর্মের তত্ত্বকেও আবিষ্কার করেননি। সে-অর্থে কোন নবধর্মের সংস্থাপক তিনি নন। কিন্তু যে-ধর্মের আঙ্গিনায় পৌছাবার বিভিন্ন পথ হিসাবে জগতের শত শত সম্প্রদায় বহুধা বিভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন—সেই সনাতন ধর্ম কালবশে মলিন ও নানাসংশয়জালে পূর্ণ হয়েছিল, তিনি তার পূর্ণস্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। সংশয়ছেদনকেই প্রতিষ্ঠা বলে। এই অর্থে তিনি ধর্মসংস্থাপক। স্বামীজী লিখছেন: 'কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্য-সন্তান···বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে

বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধে প্রজ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততবিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক, ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।' এই তো সনাতনধর্ম-সংস্থাপনা।

সনাতন ধর্মের অর্থ হচ্ছে, শাশ্বত সত্য—যা স্বাভাবিকভাবেই জীব-জগতের স্বরূপ। এ এক বৈজ্ঞানিক সত্য। এ সত্যে পৌঁছাবার জন্যই জগতের নানা দেশে ভিন্ন কালে বহু অবতারের ভাববিশেষের প্রচার। এভাবে জগতে আজ পর্যন্ত যত ধর্মমত প্রচারিত হয়েছে, তাতে করে মনে হয়েছিল ধর্মগুলি বুঝি এক কথা বলে না, বুঝি বা এক সত্যের নির্দেশ করে না। এই বিভ্রান্তি-সংশয়। এই সংশয়-তমসার নাশ করেছেন সনাতন ধর্মতত্ত্বকে স্বীয় সাধনায় উদ্দীপিত করে। তাই তিনি ধর্মসংস্থাপক।

আরো কথা, জাগতিক বিজ্ঞান সহায়ে দেহাত্মবাদী মানব নানা বাগ্‌বিস্তার ও দর্শন সহায়ে ঈশ্বরের শাশ্বত অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিল। মানবই শ্রেষ্ঠ, তার উপর কোন তত্ত্ব নেই—এই তাদের ধারণা। তাদের যুক্তি বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ প্রমাণগুলির এবং ঐ সহায়ে জগতিক উন্নতির চোখ-ঝলসানো ঐশ্বর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপযোগবাদ নিরীশ্বর মানববাদ—এরই উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পরবর্তীকালে এল অর্থনীতিভিত্তিক সমাজবাদ। মানুষ বিভ্রান্ত হ'ল। জীব-জগতের উর্ধ্বে কোন সত্তার ক্ষেমংকর অস্তিত্বে সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। বিজ্ঞানের এক একটি আবিষ্কার তখন ধর্মমতের উপর যেন এক একটা বোমাবিশেষ বলে বোধ হচ্ছিল। তাই সর্বদেশের সকল ধর্মপথের পথিক এক অশান্ত নিশ্চয়তায় মৃতপ্রায় ও ধর্মসঙ্ঘগুলি জীর্ণ ভগ্নস্তূপের মতন প্রাণহীন হয়ে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য যেন প্রহর গুণছিল। মানুষ ক্রত বিজ্ঞানকে ধর্মের আসনে বসিয়ে জগৎজীবনের স্বরূপ উন্মোচনে এগুতে চাইলে। কিন্তু জড়বিজ্ঞান মানুষকে তার শেষ প্রশ্নগুলির মীমাংসা তখনও দিতে পারেনি, আজও যেমন পারছে না। তবু বিজ্ঞানবুদ্ধি-বিমূঢ় মানব ধর্মে বিশ্বাস হারাতে পেরেছিল—কিন্তু বিজ্ঞানে পায়নি তার অবাধ মুক্তির, নিরঙ্কুশ আনন্দের সন্ধান। তাই বীতশ্রদ্ধ মানব জড় সহায়ে যে-জীবনচর্যার রূপরেখা আঁকতে চলেছিল তাতে ক্রমাগত ছন্দপতন ঘটছিল। সে ব্যর্থ হচ্ছিল। এ-কারণেই ধর্মের কাছেই মানুষ তার শেষ প্রশ্নগুলির জন্য বিশ্বাস হারিয়েও উত্তর চাচ্ছে। প্রশ্ন ছিল তার: জড় জীবন-সত্তার অতীত কোন নিয়ামক আছেন কি?

> মানুষের স্বরূপ কি? ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? কেউ কি দেখেছে? যদিই তিনি থাকেন তবে সমাজের ক্ষেত্রে, জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কি? ইত্যাদি

জবাব তাকে কে দেবে? যুগবাহিত সংশয়ের ছেদক একজনই। তিনি ভগবান করুণাধৃতবিগ্রহ হয়ে আসেন মানুষের মাঝে—

মানবের বেদনার উত্তাপে তাঁর অন্তর কাঁদে। তারই জন্য তিনি অবতীর্ণ হ'ন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে ঐ প্রশ্নগুলির জবাব দিয়েছিলেন। দুই মহামানব। দুইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ পেল আশ্বাস। একজন যুগ-প্রশ্নের মূর্তি, অপর জন পুরা অপি নব—পুরাতন হ'য়েও নবীন, তাই বারে বারে আসেন উত্তর হয়ে।

তিনি বললেন: ঈশ্বর আছেন। তাঁকে দেখা যায়। মানুষ সত্তায় ব্রহ্মই।

ঈশ্বরলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। বললেন: অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যাও।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: 'তোমাকে যেমন দেখছি, তোমাদের সাথে যেমন কথা বলছি, এরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়,…'একথা আমি শপথ করে বলতে পারি।'

বলেছিলেন: মানুষের সকরুণ প্রার্থনা ঈশ্বর সর্বদা শুনে থাকেন।

বলেছিলেন: দেখ, ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য, ব্যাকুল হয়ে নির্জনে গোপনে তাঁর ধ্যান চিন্তা করতে হয় ও কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়—ঠাকুর, আমায় দেখা দাও।

লোক-উন্নয়নকর কর্ম করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। মানববাদের যুগ তখন। কিন্তু তার সঙ্গে নেই অনন্ত স্পর্শ, নেই ঈশ্বরাশ্রিত দৃষ্টি। ঠাকুর বললেন: আগে ঈশ্বর দর্শন কর। নিরাকার সাকার দুই দর্শন। বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনিই আবার ভক্তের জন্য রূপ ধারণ করে দর্শন দেন আর কথা কন। দর্শনের পর তাঁর আদেশ লয়ে লোকহিতকর কর্ম করতে হয়।

মানব নিজ স্বরূপ জানতে চায়। সে-জানাকে অপেক্ষা করেই গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিক ও সমষ্টি জীবনাদর্শ। জড়বাদের জড়ত্ব কাটিয়ে যে চৈতন্য শিবত্ব, ব্রহ্মত্বের ভূমাস্পর্শ তার জীবনে এল—এ কেবল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনকৃপায়।

তিনি বলেছেন: 'জীব তো সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।' 'মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম।' এই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা তিনি করেছেন। এই তো ধর্মের সংস্থাপনা।

ঐ অন্তশ্চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সমাজকে রাষ্ট্রকে গঠন করতে হবে। এই ধর্মধৃত সমাজচেতনা-সংস্থাপনা তিনিই করেছেন। এ-জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন:… ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের মনুষ্যজাতির অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না। এইরূপ কোন মহান্ আদর্শ পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি কোন কাজই করিতে পারে না। …রাজ-নীতিক, এমন কি সামাজিক বা বাণিজ্য-জগতেরও কোন আদর্শ পুরুষ কখন ভারতে সর্বসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। …যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে।

অন্ধ—সে অতি অন্ধ, যে সময়ের সঙ্কেত দেখিতেছে না, বুঝিতেছে না; দেখিতেছে না, সুদূরগ্রামজাত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতামাতার এই সন্তান এখন সেই-সকল দেশে সত্য সত্যই পূজিত হইতেছেন, যে-সকল দেশের লোকেরা

শত শতাব্দী যাবৎ পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে।···ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্ম এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে।

তাই তিনি স্থাপকায় চ ধর্মস্য।

তিনি যুগোপযোগী মোক্ষধর্ম-সংস্থাপনই কেবল করেননি। করুণাবিগলিত চিত্তে ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের ঐহিক দুঃখমোচনের কথাও ভেবেছেন। সর্বভূতান্তর্যামিত্বগুণে সকল প্রাণীর বেদনায় অধীর হতেন তিনি। তাদের সর্ববিধ দুঃখ দূরীকরণের প্রয়াসও তিনি পেয়েছেন। দেওঘরের ক্ষুধাকাতর হতশ্রী দরিদ্রের মধ্যে, রাণাঘাটে অর্থহীন প্রজার দুঃখমোচনে তাঁর ব্যথাকাতর দীপ্ত মূর্তি আমরা দেখেছি। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এ বাণী তিনি স্বয়ং আচরণ করে দেখিয়েছেন। ধর্মকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় করা তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করত। তিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্যই ব্যাকুল হতে বলেছেন। কেবল 'ডুব দাও', 'ডুব দাও'—এই উৎসাহ-বাণীতে তিনি সাধককে উদ্বুদ্ধ করতেন। যে যে-অবস্থায় আছে তাকে সে-অবস্থা থেকে টেনে তুলতেন ঈশ্বর-সত্তায়—এই অদ্ভুত কর্ম তাঁরই জীবনে সম্ভব ছিল।

এভাবে আরও একবার ভারতের বুকে এই আত্মসত্তা নূতন করে উন্মোচিত হ'ল—সনাতন ধর্মকে সঞ্জীবিত করে স্থাপনা করলেন এমন প্রত্যয়দৃঢ় ভিত্তির উপর যে, যার বলে ভারত ও বিশ্ব জড়বাদের ভীম আক্রমণকে প্রতিহত করে তাকেই মানবমুক্তির নির্মোক-মোচনেরই কাজে নিয়োজিত করে জড়বাদের ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আনতে পারল। যেমন করে অতীতেও বিভিন্ন ভাবধারার আক্রমণে ভারতের অন্তঃপ্রবাহিত অধ্যাত্মচেতনা ঐ সকল বিজাতীয় ভাবধারাকে অপূর্ব সমন্বয়ে স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়ে স্বীয় অপ্রতিহত প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, তেমনিভাবে জড়বাদ মানবের বাহিরের অভাব-মোচনের কাজে দাসবৎ নিযুক্ত থেকে মানবকে তার স্বধাম পরব্রহ্ম-সত্তায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে।—এই ভীম কর্মই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন—

তাই আরবার নিবেদন করি প্রণাম সহস্র সহস্র মানবের সাথে।

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিজ্ঞানভিক্ষু

৩

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে*

"আমরা ঠাকুরকে যখন দেখেছিলাম, তখন তাঁর দোহারা চেহারা ছিল, গায়ের রং খুব বেশী ফর্সা ছিল না।"

"দেখতে সাধারণ মানুষের মতনই কিন্তু মুখের হাসি ছিল অপূর্ব। অমন হাসি কারো কখনো দেখিনি। যখন হাসতেন তখন তাঁর মুখে চোখে এমন কি সর্বাঙ্গে যেন একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যেত, আর সেই দিব্য আনন্দময় হাসি প্রাণ থেকে দুঃখকষ্ট শোকতাপ যেন চিরতরে মুছে দিত। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল মধুর। এতই মধুর যে, ইচ্ছা হত বসে শুধু তাঁর কথাই শুনি। কানে যেন সুধাবর্ষণ করে। আর তাঁর চোখ দুটিও খুব উজ্জ্বল, দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ ও প্রেমপূর্ণ ছিল। যখন তাকাতেন, মনে হত যেন ভেতরকার সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন।"

"ঠাকুর ছিলেন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি।" "ঠিক যেন একটি শিশু। শিশুর চেয়েও সরল এবং পবিত্র।···তাঁর সংস্পর্শে এসে মনে হত যেন মনের সব ময়লা ধুয়ে গেছে।"

"তাঁর নিজের অহং পুরোপুরি মিশে ছিল মায়ের সঙ্গে। মা ছাড়া আর নিজের কিছুই নেই।"

"ঠাকুরের প্রাণে ব্রহ্মানন্দের যে স্ফূর্তি, যে আনন্দে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন—আনন্দে অট্টহাস্য করতেন—সকলকেই সেই আনন্দের অধিকারী করতে পারছেন না বলে তিনি কতই না দুঃখ প্রকাশ করেছেন! তিনি যে আনন্দ-সাগরে ভেসে থাকতেন—জীবকেও সেই আনন্দের ভাগী করবার জন্য তাঁর অন্তর সদাই ব্যাকুল ছিল।"

"তাঁর ছবি ষট্‌চক্রভেদের মূর্তি।···আমি ঐ ছবিতে নানা জিনিস দেখতে পাই, তাই বলি"

"ঠাকুর আমায় বলেছেন, 'দেখ, কাঁচের আলমারীর ভিতর জিনিস রাখলে যেমন সব কিছুই দেখা যায়, আমিও সকলের মনের ভেতরটা ঠিক তেমনি দেখতে পাই।'"

"ঠাকুরের যখন মাকালীর দর্শন হল তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, আমার যদি ঠিক ঠিক দর্শন হয়ে থাকে তো তিনবার এই বড় পাথরটা লাফ দিয়ে উঠুক। যেই মনে করা আর অমনি তাই হওয়া।"

"ঠাকুরের মুখে কেবল একটি কথা শোনা যেত—জ্ঞান হোক, ভক্তি হোক। তাছাড়া অন্য কোন কথা শুনিনি। টাকাকড়ি সিদ্ধাই ইত্যাদি হোক—এসব কখনই কেউ তাঁকে বলতে শোনেনি।"

"আমার ভাল থাক সুখে থাক-র অর্থ, আর ঠাকুরের ভাল থাক সুখে থাক-র অর্থে ঢের তফাৎ। ভাল থাকার অর্থে আমি বলি টাকা-কড়ি হোক, গাড়ীজুড়ী হোক ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুরের কথায় বুঝতে হবে—ভক্তি বিশ্বাস লাভ হোক, ভগবদ্দর্শন হোক, ইত্যাদি।"

"বেদান্তমতে সংসারত্যাগ করতেই হবে,

---

*শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যে-সব কথা বলিয়াছিলেন, সেগুলি এখানে একত্র করিয়া দেওয়া হইল। এগুলি এবং তাঁহার অন্যান্য প্রসঙ্গগুলি অধিকাংশই স্বামী গম্ভীরানন্দ-রচিত 'ভক্তমালিকা—২য় ভাগ' এবং স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত 'সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

তবেই ভগবান লাভ সম্ভব। ঠাকুর কিন্তু তা বলেন না। তিনি বলেন—সংসারত্যাগ না করলেও হবে; কর্মফল ত্যাগ করে অনাসক্ত-ভাবে সংসারে থাকতে দোষ নেই। অথচ কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে তিনি বলেছেন।"

"ঠাকুর ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ। তাই তিনি বলেছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' আবার আসবেন তা-ও বলে গেছেন।"

"আমরা তো তাঁকে (ঠাকুরকে) বুঝতে পারিনি, স্বামীজী কিছুটা বুঝতেন।"

"ঠাকুর আমাদের কত ভালবাসতেন! আমরা আর তোমাদের ভালবাসতে পারছি কই? আমরা তাঁকে দেখেই পাগল হয়েছি; কিন্তু তোমরা তাঁকে না দেখেও তাঁর নাম শুনেই পাগল! আহা, তোমরা কত ভাগ্যবান!"

"ঠাকুরকে যখন ধরেছ, ঠিক পথই ধরেছ। তিনি জীবকে ত্রাণ করতেই এসেছিলেন। তাঁর নাম জপ করে যাও, শান্তি পাবে। তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকালেই দেহ-মনের সব পাপ ধুয়ে যায়। তিনি অন্তর্যামী—সব বোঝেন। তাঁকে মনের কথা জানাবে। কিন্তু স্বার্থ নিয়ে তাঁর কাছে যাবে না।"

"ঠাকুরকে মনে মনে ডাকবে অন্তরের সহিত। আর তাঁর চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেবে। তাহলেই সব হবে। আমাদের পক্ষে যা মঙ্গলের, তিনি তার বিধান করবেন।"

"ঠাকুরকে ডাকার মানে কি না—ঠাকুরের গুণের কতকাংশের অধিকারী হওয়া। যে যাঁর চিন্তা করে সে তাঁর গুণ পায়।"

"ঠাকুর তো বলেছেন, আমার এই ছবিতে ধ্যান করবি তাহলেই হবে।" "ঠাকুরকে ডাকলে কত জ্যোতির্দর্শন হয়! মন-প্রাণ দিয়ে ডাকলে তবে তো? তিনি তো জ্যোতির্ময় স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী। তাঁর প্রকাশ সর্বত্র বিরাজমান।"

"যে যত পবিত্র হবে ঠাকুর তার কাছে ততই প্রকাশিত হবেন।"

শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে

"ঠাকুর চৈতন্য-স্বরূপ, মা চিন্তা-স্বরূপিণী।"

"ঠাকুর ও মাকে অভেদ-দৃষ্টিতে দেখবে। মনে রাখবে, ঠাকুরের কৃপা না হলে মাকে পাওয়া যায় না, আবার তেমনি মায়ের কৃপা না হলেও ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী। মার কাছে শক্তি চাইতে হয়। শক্তি না হলে কোন কাজ হয় না। ঠাকুরের কাছে শ্রদ্ধা ভক্তি চাইবে।"

"মা সর্বশক্তিময়ী।"

"আমাদের মা-ই Law (ভগবদ্‌বিধান) রূপে বিরাজমানা।…একেই (এই ভগবদ্-বিধানকেই) খৃষ্টানরা Holy Ghost (ঈশ্বরের আত্মা) বলে, আর হিন্দুরা বলে শক্তি।"

"আমরা যা কিছু করি তা যেন মায়ের চরণকমলে অর্পণ করি। তাঁরই বাহ্যিক অভিব্যক্তি হচ্ছে দেশ-কাল-নিমিত্ত। তিনি বুদ্ধিরূপিণী হয়ে কি কর্তব্য তা বলে দেন; আমাদের তা-ই করতে হবে দাদা, তা-ই করতে হবে!"

"মাকে ডাকবে। তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা বড় ভাল।"

"মায়ের নাম জপ করি 'মা আনন্দময়ী' বলে।…তাঁর নামেতে ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ধন, দৌলত সবই লাভ হয়। চণ্ডীতেও আছে—তিনি ঋদ্ধি সিদ্ধি সব দিতে পারেন। ঠাকুরের নামের চাইতে মায়ের নামে আমি

বল পাই বেশী।"

"মা তো রক্ষা করছেনই, ডাক আর নাই ডাক। তবে ডাকলে আরো আনন্দে বিভোর হবে।...মাকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে পারলে ভারি আনন্দ। এতে দাদা কোন সন্দেহ নেই।...মায়ের সেই আনন্দজ্যোতিঃ তো চারদিকে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে; আশ্চর্যের বিষয় মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারছে না।"

"আমি মা-ঠাকরুনের কাছে বেশী যেতাম না। স্বামীজী কি করে তা জানতে পারেন। শ্রীশ্রীমা তখন বলরাম-মন্দিরে। সেখানে স্বামীজী একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'পেসন, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?' আমি বললাম, 'না, মশাই।' স্বামীজী বললেন, 'সে কি? এক্ষুণি যাও মাকে প্রণাম করে এসো।' তাই শুনে আমি তো মাকে প্রণাম করতে গেলাম; মনে মনে ভাবছি—কোন রকমে টিপ করে একটা প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বলছেন, 'সে কি, পেসন—মাকে এই করে প্রণাম করতে হয়? সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর; মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।' বলেই তিনি সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। ......আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে, স্বামীজী আবার পেছনে পেছনে আসবেন।"

"পূর্বে ভগবানকে পিতৃভাবে আরাধনা করারই ঝোঁক ছিল। মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা সবই করতাম, কিন্তু বাপের দিকেই টান ছিল বেশী। এখন 'মা মা' বলি সকাল সন্ধ্যায়—আর মনে হয়, ঠিক যেন মায়ের কোলে শিশুর মতন আছি। তাঁর কোলেই বসে রয়েছি।"

"মা আমায় কোলে করে রেখেছেন—সদা রক্ষা করছেন। দেখ না, এই তিপ্পান্ন বছরের মধ্যে মা নিজের মোহিনী মূর্তি আমায় দেখাননি। এমন কি অনেক দূরে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও চট্‌ করে তা বুঝিয়ে দেন, আর আমায় চতুর্দিকে বেষ্টন করে রাখেন। তার ভেতর অমঙ্গল আসার সাধ্য নেই।"

"সব রকমই তো কিছুটা করা গেল, এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাঁদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে পড়ে আছি। এখন এই মনে হচ্ছে, যেন তাঁদের নাম করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।"

স্বামীজী-প্রসঙ্গে

"স্বামীজীকে শিবজ্ঞানে পূজা করবে।"

"স্বামীজী বলতেন—'আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। ঠাকুর বলেছেন তাই কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমার চিত্ত সর্বক্ষণ ব্রহ্মে লীন হয়ে থাকে।'

"স্বামীজী মহারাজকে দেখেছি দুপুর রাত্রে ধ্যান করছেন। ঘর একেবারে আলো হয়ে গেছে। আমি পাশের ঘরে শুতাম। রাত্রে বাইরে যাবার জন্য উঠে দেখি স্বামীজীর ঘর আলো হয়ে রয়েছে।"

"স্বামীজীর বক্তৃতার একটি বিশেষত্ব দেখেছি। তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন যেন নিজেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়ে আর একজন লোক হয়ে যেতেন।.. তাঁর ক্ষমতা ছিল অতি অদ্ভুত। লোকে তাঁর কাছে যেন কেঁচো হয়ে যেত।...এখন তাঁর কথামতন কাজ হয়ে যাচ্ছে।"

"একবার দশহরার দিন; নীলাম্বর মুখুজ্জের বাড়ীতে তখন মঠ। স্বামীজীর সঙ্গে আমরা ওখানে রয়েছি। স্বামীজী তখন এমন উচ্চ ভাবভূমিতে থাকতেন যে, তা আর কি বলব!

একদিন তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে ইলেকট্রিক শকের মতো শক পেয়েছিলাম। …ওঁদের (স্বামীজীর ও রাজামহারাজের) পরিবেষ্টনীর মধ্যে গেলে মনে হত, যেন একটা spiritual zone (আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী) সৃষ্টি করে বসে আছেন। তার মধ্যে যে কেউ যাবে সেই-ই বুঝতে পারবে যে—যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি বাহির হতে এসে তার ভিতর প্রবেশ করছে। এটা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব হয়ে যেত।"

"একবার স্বামীজীকে আমেরিকার মিশনারীরা মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে বিষমেশানো সরবত খেতে দিয়েছিল। স্বামীজী সরবত খেতে ভাল-বাসতেন। তিনি তো ওদের কু-অভিসন্ধির বিষয় কিছুই জানতেন না। সরবত দেখে খুশী হয়ে যেই গেলাস তুলে সরবত খেতে যাচ্ছেন, —আর দেখলেন ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সরবত খেতে বারণ করছেন। তিনি সেই সরবত আর খেলেন না।"

"স্বামীজী খুব কড়া লোক ছিলেন। একটু এদিক ওদিক হলেই বকুনি দিতেন।"

"স্বামীজী-মহারাজ অকারণে কাউকে বকতেন না। ভালর জন্যই বকতেন, আর ভালও বাসতেন খুব।"

"এখন তো সেরকম বকুনি মঠে আর নেই। তখন বকুনিও যেমন, পরস্পরের জন্য ভালবাসাও ছিল তেমনি।"

"স্বামীজী গুরুভাইদের এত বেশী ভাল-বাসতেন, যেন মায়ের মতন! সেজন্য কারো এতটুকু দোষ বা ক্রটি দেখতে পারতেন না। তিনি চাইতেন, তাঁর গুরুভাইরা সকলেই তাঁর মতন হোক—তাঁর চাইতেও বড় হোক। স্বামীজীর ভালবাসার তুলনা নেই।"

"রাখাল মহারাজ আর বাবুরাম মহারাজকে স্বামীজীর বেশী ঝক্কি সামলাতে হত, আর বকুনিও খেতে হত বেশী।"

"আমি রাজা মহারাজের আওতাতে থাকতাম বলে, স্বামীজীর বকুনি বড় বেশী খাইনি।

"একবার…(স্বামীজীর একটি কথা ঠিকমত বুঝতে না পেরে তাঁর কথার) প্রতিবাদ করে বললাম—'না মশাই, আপনি ঋষি-মুনিদের সম্বন্ধে ভুল বুঝেছেন।' দেখলাম, স্বামীজীর মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠল। রাখাল মহারাজ সেখানে পায়চারী করছিলেন। তাঁকে বললেন, 'রাজা, দেখ পেসন বলে যে আমি কিছু জানিনে বুঝিনে।' রাখাল মহারাজ তাতে উত্তর দিলেন, 'তুমিও যেমন! পেসনের কথা কি ধর্তব্যের মধ্যে? ও-তো ছেলেমানুষ, ও কি বোঝে?' অমনি স্বামীজী ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন—একেবারে বালকের মতন! রাখাল বলেছে পেসন ছেলেমানুষ ও কি বলতে কি বলে ফেলেছে, ব্যস্ তাতেই সব মিটে গেল।"

"স্বামীজী বাইরে এত জ্ঞান কর্ম প্রচার করেছেন; কিন্তু তাঁর ভিতরে ছিল প্রেমের ভাব। ভিতরটা খুবই কোমল ছিল। বাইরে পৌরুষ বিক্রম কিন্তু তাঁর প্রাণ ছিল মায়ের প্রাণের মতো কোমল, আর গুরুভাইদের প্রতি তাঁর কী গভীর ভালবাসাই না ছিল! বিশেষ করে মহারাজকে তিনি খুবই ভালবাসতেন, খুব মান্যও করতেন। ঠিক 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' এই ভাব। তাই বলে কারো দোষ বা ক্রটি দেখলে তা সইতে পারতেন না। যে-রাখাল মহারাজকে এত প্রাণের সহিত ভাল বাসতেন, তাঁকেই একবার এমন গালমন্দ করলেন যে মহারাজ তো একবারে কেঁদে আকুল। অবশ্য

সে ব্যাপারে পুরোপুরি দোষ ছিল আমারই। (গঙ্গার ঘাট ও পোস্তা নির্মাণের কাজে বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর ভয়ে এষ্টিমেট কম করে দিয়েছিলেন। হিসেব দেখতে গিয়ে স্বামীজী টের পান যে, এষ্টিমেটের চেয়ে খরচ অনেক বেশী হবে। তাই এই বকুনি।) আমায় বাঁচাতে গিয়ে মহারাজ দোষটা নিজের ওপর টেনে নিলেন। …(ঘরে গিয়ে মহারাজ কাঁদছেন শুনে) "স্বামীজী একেবারে পাগলের মতন ছুটে মহারাজের ঘরে গিয়েই মহারাজকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর ভাই।…কী অন্যায়ই না করেছি, তোমায় গালাগাল দিয়েছি।'…স্বামীজীকে অমন ধারা কাঁদতে দেখে তিনি (মহারাজ) তো অবাক!…বললেন, 'গালাগাল দিয়েছ তাতে হয়েছে কি? আমায় ভালবাস বলেই তো এসব বলেছ?' স্বামীজী তখনো মহারাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন আর বারবার বলছেন, 'আমায় ক্ষমা কর ভাই। ঠাকুর তোমায় কত আদর করতেন! তিনি কখনো তোমায় একটা কড়া কথা বলেননি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জন্য তোমায় গালাগাল করেছি…।' …এইভাবে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে দুজনে শান্ত হলেন। সেদিনকার দৃশ্য জীবনে আর ভুলতে পারব না।"

"স্বামীজীকে আমি যেমন ভালবাসতাম তেমন ভয়ও করতাম। যখন দেখতাম যে তাঁর মেজাজটা একটু অন্য রকমের, তখন পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম। স্বামীজী হয়তো ডাকছেন, 'পেসন, পেসন, শোন! এদিকে আয়।' আমি দূর থেকেই 'এখন মশায় কাজে বড্ড ব্যস্ত আছি; পরে আসব' বলেই সরে পড়তাম।"

"আমি স্বামীজীর কাছে খুব বেশী যেতাম না। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে তিনি আমায় ডেকেছেন। আমি বললাম—এখন ধ্যান করতে যাব।"

"আমি তখন বেলুড় মঠে গঙ্গার পাকা ঘাট তৈরি করছি। একদিন খুব রোদ—স্বামীজী মহারাজ মঠে উপরের বারান্দায় বসে সরবত খাচ্ছেন। আমারও তেষ্টা খুব পেয়েছে। এমন সময় স্বামীজীর একজন সেবক এসে একটি গ্লাস দিয়ে বললে—স্বামীজী আপনার জন্য সরবত পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে তো ভীষণ নিরাশ হলাম—মনে দুঃখও হল যে তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে—আর স্বামীজী এখন এই করে ঠাট্টা করছেন! যাই হোক, মহাপুরুষের প্রেরিত প্রসাদ বলে যা দু-চার ফোঁটা ছিল গ্রহণ করলাম। খুব তৃপ্তি হল—সব তেষ্টা যেন নিমেষে মিটে গেল। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম।"

"কিছুদিন যাবৎই আমার মনে হচ্ছিল যে, স্বামীজী তো দেশবিদেশ ঘুরে কত শত বক্তৃতাদি দিয়ে এলেন, সব রকম লোকজনের সঙ্গেই তাঁকে মেলামেশা করতে হত, মেয়েদের সঙ্গেও। …তাই আমি ভাবতাম যে তিনি যা করে এলেন একি ঠিক ঠাকুরের ভাবানুযায়ী? তিনি এত সব মেয়েদের সঙ্গে কেন মিশলেন? এসব খুবই মনে হচ্ছিল। তাই একদিন স্বামীজীকে নিরিবিলি পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা মশাই, আপনি তো পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছেন। কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা ও উপদেশ তো অন্য রকম ছিল! তিনি বলতেন, সন্ন্যাসী মেয়েমানুষের পট পর্যন্ত দেখবে না। আমাকেও তিনি বিশেষ করে বলেছিলেন যে, খবরদার, কখনও মেয়েদের সঙ্গে মিশবিনি—হাজার ভক্তিমতী হলেও না। তাই আমার মনে হচ্ছিল যে আপনি কেন এমন-

ধারা করলেন ?' আমার কথা শুনে স্বামীজী খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই আমার তো তখন খুব ভয় হতে লাগল যে, কি বলতে কি বলে ফেললাম! তাঁর মুখচোখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। খানিক-ক্ষণ পরে তিনি বলে উঠলেন, 'দেখ্ পেসন, ঠাকুরকে তুই যতটুকু বুঝেছিস, ঠাকুর কি ততটুকুই ? আর তুই ঠাকুরকে কতটুকুই বা বুঝেছিস ? জানিস, ঠাকুর আমার স্ত্রী-পুরুষের ভেদ মেরে দিয়েছেন! আত্মাতে আবার স্ত্রী-পুরুষ কিরে ? তাছাড়া ঠাকুর এসেছেন সারা দুনিয়ার জন্য। তিনি কি বেছে বেছে কেবল পুরুষদের উদ্ধার করতেই এসেছিলেন! তিনি সকলকেই উদ্ধার করবেন—স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই। তোরা নিজ নিজ বুদ্ধির মাপ-কাঠিতে মেপে ঠাকুরকে এত ছোট করতে চাস্! তাঁর কৃপা এ দুনিয়ার সকল নরনারী তো পাবেই; অন্য লোকেও গিয়ে পৌঁছুবে তাঁর কৃপার প্রভাব। তিনি তোকে যা বলেছেন তা তো মিথ্যে নয়! সে খুবই সত্যি। তিনি তোকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন তুই ঠিক সেইভাবেই চলবি। কিন্তু আমাকে বলেছেন অন্যরূপ। বলেছেন কিরে—স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন! তিনি হাত ধরে আমায় যা করাচ্ছেন আমি তাই করছি।' ...আমি আর কি বলব! ...তখন পালাতে পারলে বাঁচি।

"আমার অবস্থা দেখে স্বামীজীর দয়া হল। তিনি একটু হাসিমুখে বললেন, 'মেয়েদের ভেতর সেই আত্মাশক্তি না জাগলে কখনও কি কোন জাত জাগে, না কোন জাত উঠতে পারে ? আমি তো সারা দুনিয়াটা ঘুরে দেখলাম; সব দেশেই মেয়েদের প্রায় একই অবস্থা, বিশেষ করে আমাদের এ পোড়া দেশে।...মেয়েরা জাগলেই দেখবি সমগ্র জাতটা জেগে উঠেছে। তাই তো রে মা এসেছেন। মার আগমনের পর থেকেই সবদেশের মেয়েদের ভেতর ঠিক ঠিক জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। এই তো সবে আরম্ভ, আরও কত কি হবে দেখবি!'...

বাস্তবিকই তো স্বামীজী ঠাকুরকে যেমন বুঝতে পেরেছিলেন তেমনটি আর কে বুঝবে ? তাঁকে দিয়েই ঠাকুর তাঁর সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন। স্বামীজী একজনই হয়!"

"আমরা দেখেছি, স্বামীজী এবং রাখাল মহারাজ এ দুটি মহাপুরুষের কি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি! জোর করে যেন তাঁদের দিকে টেনে নিচ্ছেন!...এঁদের ইচ্ছাশক্তিতে জীবের সব অশুভ সংস্কার ক্ষয় হয়।"

"স্বামীজীর ভাবরাশিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও কর্মে প্রতিফলিত করেছেন রাখাল মহারাজ।"

সমালোচনা

মধুমুরলী : শ্রীদিলীপকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, পৃঃ ২১৯+১০, মূল্য : দশ টাকা।

বাংলাদেশে আজ সুরসাধক দিলীপকুমারের পরিচয় সর্বজনবিদিত; কিন্তু সাহিত্যসাধক দিলীপকুমারকে আমরা বোধ হয় ততটা স্মরণ করি না। এজন্য দিলীপকুমার রায়ের নিজস্ব জীবনসাধনাই অনেক পরিমাণে দায়ী। তিনি সংগীতকে যতটা সর্বময় করে তুলেছেন, সাহিত্যকে ততটা সর্বস্ব করে তোলেননি। কিন্তু তাঁর অমৃতকণ্ঠ একদা জনশ্রুতির অগোচর হলেও হতে পারে, তবু তাঁর লেখা গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সর্বোপরি স্মৃতিচারণ বহুকাল পাঠকসমাজের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকবে। সেদিক থেকে সাহিত্যে অমরতার মূল্য বোধ হয় এখনও বেশী। আনন্দের বিষয় সাহিত্যে তাঁর অপরিমেয় দানের মহনীয় দিকটি সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধির দ্বারা অভিনন্দিত। ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি উপাধিগত স্বীকৃতির ঊর্ধ্বে। তবে যোগ্যজনের সম্মাননায় সমকালীন স্থির-বুদ্ধির পরিচয় মেলে—এই যা লাভ।

'অনামী' থেকে 'মধুমুরলী' অবধি দিলীপ-কুমারের কাব্য- ও সংগীত-রচনার অফুরান প্রবাহ যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা জানেন তিনি একান্তভাবে ভক্তিরসের কবি। বাংলার বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-ঐতিহ্যে আধুনিক মনন ও চিরন্তন স্বপ্নাভিসারের মধ্যে এক অপূর্ব মেলবন্ধন সাধিত হয়েছে দিলীপকুমারের কবিতায়। হয়তো সুরধর্মের প্রাধান্যের ফলে তাঁর কবিতায় কল্পনাবৈচিত্র্য ততটা নেই, কিন্তু অন্তরঙ্গ অনুধ্যানের স্বাক্ষর তাঁর প্রথম যুগ থেকে জীবনসায়াহ্নের সব রচনাতেই সমুজ্জ্বল। সাধনা ও সাহিত্যের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে কখন তাঁর সাহিত্যই সাধনা হয়ে উঠেছে, তা হয়তো কবি নিজেও খেয়াল রাখেননি। তবু ভারতীয় সাহিত্যের ঔপনিষদিক যুগ থেকে আমরা মানবচেতনার গভীরতম উপলব্ধি-রূপায়ণের যে প্রচেষ্টাকে সাহিত্যের সর্বোত্তম সার্থকতা বলে জানি, দিলীপকুমারের রচনায় সেই সার্থকতার ভক্তিরসস্নিগ্ধ প্রকাশ আধুনিক বাংলাসাহিত্যের একটি বড় অভাব পূরণ করেছে। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁর সাম্প্রতিক সৃষ্টির একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"তোমারে কী বলো বলিব শ্যামল? বলিবার
কথা কিছু কি আছে?
একই কথা শুধু বলি তাই বঁধু : তনু মন প্রাণ
তোমারে যাচে।
তনু গায় : "প্রতি কণিকা আমার
তোমার পূজার হোক দীপাধার,
জ্বালায়ে নামের শিখাটি তোমার ঘোষিব
উছলি : আছে সে আছে,
সুদূর আকাশে শুধু থাকে না সে, মাটির বুকেও
রাজে সে রাজে।" (ডুবারি, পৃঃ ৪৮)

গান হলেও কবিতা হিসাবে এ রচনাটির নিজস্ব মূল্য রসিকচিত্তে ধরা দেবে। গানে ও কবিতায় কৃত্রিম পার্থক্যের প্রাচীর আমরা অনেক সময় তুলে থাকি; কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাসে সঙ্গীতেই কাব্যের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালী কি গান বলে কেউ কবিতার ইতিহাসে বাদ দিতে পারেন?

তেমনি দিলীপকুমারের এ গ্রন্থেও 'কবিতা' অংশে বেশ কিছু গান আশ্রয় পেয়েছে। তাহলেও সুর-প্রাধান্য বাদ দিয়ে এমন কিছু কবিতা আছে, যা কবির অন্তর্লোকের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভ্রান্তি ও আলোকের বিচিত্র মায়াজাল বুনে পাঠককে মুগ্ধ করে রাখার মতো। 'স্খলন-সিদ্ধি' কবিতাটিতে কবি-অন্তরের উন্মোচন তাই হৃদয়স্পর্শী—

আমি যে জেনেছি—মৃন্ময়তার অলীক দোলার
ওপারে নিত্য
ঝলে অম্লান তোমার মহান্ চিন্ময় বরাভয়
আদিত্য।
বাহিরে ছন্দপতন আমার হয়েছে পূজায়
বরি' অসত্যে
তবুও তোমার ধ্রুবতারাধ্যানে পাইনি
কি কূল তুফানাবর্তে ? (পৃঃ ১৪৬)

সঙ্গীতময় সাহিত্যসাধনায় দিলীপকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি-নিবেদনে স্মরণ করেছেন শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীমা সারদামণিকে ; আবার ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এমনি অনেক বন্দনীয় ব্যক্তিত্বকেও। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রথম অধ্যাত্ম-ইঙ্গিতবাহী।

"তোমাকে প্রণাম চির-অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ
যুগাবতার !
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু
জানে না আর।
দুহাতে কেবল বিলালে অমল, জগন্মাতার
মহাপ্রসাদ,
ভুলিয়া মায়ায় ভুলিয়া ধরায় ছিলাম আমরা
যাহার স্বাদ।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৭)

বাংলাকবিতায় ছন্দোবৈচিত্র্য এবং অনুবাদের নৈপুণ্যে দিলীপকুমারের বিশেষ স্থান সুধীজনের স্বীকৃত। পয়ারের অতিপ্রাধান্য থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করার প্রধান অন্তরায় এই যে, সংস্কৃত ছন্দের লঘু-গুরু উচ্চারণ-পদ্ধতি বাংলা ভাষার উচ্চারণক্ষেত্রে কৃত্রিম ঠেকতে বাধ্য। তবু ভারতচন্দ্র থেকে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিকুল যাঁরাই ছন্দোবৈচিত্র্যের সাধনা করেছেন, তাঁরাই সংস্কৃত ছন্দকে আশ্রয় করে বাংলা ছন্দের গতানুগতিকতা-মোচনে ব্রতী হয়েছেন। দিলীপকুমারের এ জাতীয় শুভপ্রচেষ্টার অন্যতম উদাহরণ—

হে শরণাগতি-সাধন-সারথি,
সূর্যশশাঙ্কগ্রহাধিপতি !
যার অনিন্দ্য অসাঙ্গ নিরঞ্জন বর্ণ চিরন্তন-
দীপ্তিব্রতী !
হে চিরভক্ত-অধীন ! ঝরে
যার কৃপা নিতি স্নেহভরে
শঙ্কিত ম্লান বিষণ্ণ শিরে, নমি' পাদতলে ভুলি
তাপ ক্ষতি। (পার্থসারথি, পৃঃ ৬৯)

বহুভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী তীর্থমধুপ দিলীপকুমার বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকে নানা-ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন সন্দেহ নেই। 'মধু-মুরলী'তে ইন্দিরাদেবীর ভজন-সঙ্গীতের অপূর্ব অনুবাদগুলি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সমগ্র কাব্যটি পরিক্রমার শেষে দিলীপকুমারের সর্বযুগবন্দ্য সেই কীর্তনটির কথাই মনে পড়ে, যে কীর্তনে অন্তরের নিত্যবৃন্দাবনে মুরলীধ্বনির নিশ্চিত সংকেত শুনতে পেয়ে কবি গাইতে পারেন—

'আমি অন্তরে তোমার বাঁশরি শুনেছি
তাই বঁধু আমি জানি।'

বাংলাসাহিত্যের অন্তরাকাশে এই নিত্য-নিঃস্বনিত মুরলীধ্বনির বাণীবহরূপে কবি ও সুরসাধক দিলীপকুমার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। —মায়াতীত সিংহ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত মে, ১৯৬৯ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্তসেবাকার্যে বিতরিত দ্রব্যসমূহ: ধুতি ও শাড়ী ১০১ খানি, গম ২০ কুইণ্টাল, স্কুল টেক্স্ট বুক ৬৪৫টি, শ্লেট ও পেন্সিল ১০০ সেট এবং ১৮টি এক্সসার-সাইজ বুক।

বরনেশ বাজার, মণ্ডলঘাট ও পাহাড়পুর অঞ্চলে মিশন কর্তৃক ১১৩টি কুটির নির্মিত হইয়াছে এবং ৪৯টি কূপ-খননের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: বন্যায় বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণের প্রথম পর্বে সুরাট জেলায় ২২টি কলোনীতে ১,৩২৮টি পরিবারের বাসোপযোগী ৩৩২টি কুটির তৈরির কাজ আগামী জুলাই মাসের মধ্যে সম্ভবতঃ শেষ করিতে পারা যাইবে। সমাজ-মন্দির নির্মাণ এবং জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করা দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত; এই কার্য সম্পূর্ণ হইতে আরও কয়েক মাস লাগিবে। গত ২৮শে জুন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী তিনটি কলোনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। যাহারা এখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে বস্ত্রাদি, কম্বল, গৃহ-স্থালির জিনিসপত্র দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে।

জুন, ১৯৬৯ পর্যন্ত মিশন কর্তৃক সুরাট জেলার ৪৫টি গ্রামে ১১,২৬০টি পরিবারের মধ্যে ৩৩,৩৮১ কেজি গম, ৪০০ কেজি চাল, রান্নার জন্য তেল ১,৭০৩ লিটার, বাসনপত্র ২০৮ সেট এবং ১৮,৩২৫ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রস্থ স্কুলের ছাত্রগণ পশ্চিমবঙ্গের গত উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিভিন্ন শাখার প্রথম দশটি স্থানের অনেকগুলি অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। কেন্দ্র-গুলির নাম ও বিভিন্ন শাখায় তাহাদের অধিকৃত স্থানগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

রহড়া: বিজ্ঞান—৩য় ও ৪র্থ।

নরেন্দ্রপুর: হিউম্যানিটিজ—৯ম, চারু-কলা—১ম। কৃষি—১ম, ৪র্থ ও ৫ম।

পুরুলিয়া: টেকনোলজি—২য়, ৪র্থ, ৭ম ও ১০ম। কৃষি—২য় ও ৮ম।

সরিষা: চারুকলা—২য়।

নরেন্দ্রপুর হইতে মোট ১০৬ জন পরীক্ষা দিয়াছিল, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে—৪৯ জন প্রথম বিভাগে এবং ৫৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে।

রহড়া হইতে মোট ৯৩ জন পরীক্ষা দিয়া-ছিল; সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে—৩৩ জন প্রথম বিভাগে, ৫৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ২ জন তৃতীয় বিভাগে।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের একজন ছাত্র গত পি. ইউ. পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি

জামসেদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। সোসাইটি-পরিচালিত পাঁচটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাবোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কেবল দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে, উত্তীর্ণ

ছাত্রদের ভরতি করা হয়। কারণ এই ছাত্রেরা অন্যত্র ভরতি হইবার সুযোগ প্রায়ই পায় না, অধিকন্তু মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গে একত্র পডাইলে উভয় প্রকার ছাত্রেরই উন্নতি ব্যাহত হয়।

অপর একটি বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদিগকে বিশেষ উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতিটি ছাত্রের অভিভাবকের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া মিশন কর্তৃপক্ষ কিভাবে সাহায্য দান করিলে কোন ছাত্রের বেশী উপকার হইবে তাহা স্থির করিবেন। এই অতিরিক্ত সাহায্যের ব্যয় মিশন কর্তৃপক্ষ বহন করিবেন।

হরিজনদিগের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় মিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। উহাতে ছাত্রছাত্রীরা সরকারের সাহায্যে অবৈতনিক বিদ্যার্জন করে; তাহাদের পাঠ্য-পুস্তকাদির সমুদয় ব্যয়ভার বহন করে রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে সকলেই পড়িবার সুযোগ পায়।

স্থানীয় রোটারি ক্লাবের আনুকূল্যে মিশন একটি 'বুক ব্যাঙ্ক' খুলিয়াছেন। ইহাতে দুঃস্থ পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হইবে।

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে সাধারণ-ভাবে এই কেন্দ্রের সূচনা হয় এবং ১৯৩৫ খৃঃ অক্টোবরে নিজস্ব স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও সাময়িক বক্তৃতাদির মাধ্যমে আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব প্রচারিত হইয়াছে

তুলসী-রামায়ণ অবলম্বনে হিন্দীতে ৫০টি আলোচনা হয়; মোট ২২,৬০০ জন শ্রোতা যোগদান করেন।

দিল্লী কেন্দ্রের পরিচালনাধীন গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, অবৈতনিক যক্ষ্মা-ক্লিনিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা (শিশুবিভাগসহ) মোট ১৯,৪৩৭; আলোচ্য বর্ষে ২,৭৯৭ খানি গ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে। পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা ১৭,৭৬৫। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৩৬৭। পাঠাগারে ১৪টি সংবাদপত্র এবং ১৪২টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। নানা দিক দিয়া গ্রন্থাগারটির উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

গ্রন্থাগারের বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রবিভাগটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করা হয়। এখানে ২,৬৬২ খানি পুস্তক রাখা হইয়াছে। দৈনিক গড়ে ১০৭ জন বিদ্যার্থী এখানে পড়াশুনা করে। আলোচ্য বর্ষে ৯১৬ জন ছাত্রছাত্রী এই গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যক্ষ্মা-ক্লিনিকে (আর্যসমাজ রোড, কারলবাগে অবস্থিত) বহির্বিভাগে ১,৩৮,৬০৩ (নূতন ১,৯০৬) জন রোগী চিকিৎসিত হয়। অন্তর্বিভাগের পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে ২৪৬ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩২,৮২৭, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৬,০০০।

সারদা মহিলা-সমিতির উদ্যোগে প্রতি রবিবার সারদা মন্দিরে ৬ হইতে ১২ বৎসরের বালক-বালিকাদিগকে ভজন, অভিনয়, সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে গড়ে ৪০টি বালক-বালিকা এই ক্লাসে যোগদান

করিয়াছিল। সারদা মহিলা-সমিতির সেবা- ও কৃষ্টিমূলক কার্যাদিও প্রশংসনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, গুরুনানক ও আচার্য শঙ্করের জন্মদিন সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর ১০৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আবৃত্তি- ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় ১,৬৬৫ জন অংশগ্রহণ করিয়াছিল, উহাদের মধ্যে কৃতকার্য প্রতিযোগীদিগকে ১,১৮১৲ টাকা মূল্যের ২১৮টি পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৩৩তম শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব উপলক্ষে নারায়ণসেবা-দিবসে তাহিরপুর কুষ্ঠকলোনীর ১৮০ জন রোগীকে এবং সীমাপুর কলোনীর শিশু সহ ৬০০ জন দুঃস্থকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও দিল্লীতে যে-সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, দিল্লী কেন্দ্র কর্তৃক তাহার জন্য অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হয়।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৬১তম বর্ষের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৭—মার্চ, ১৯৬৮) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমে বর্তমানে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, রেডিওলজি, এক্স-রে, ফিজিওথেরাপি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগে অ্যালোপ্যাথিক মতে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

অন্তর্বিভাগে ১০৩টি শয্যা আছে; এই বিভাগে চক্ষুরোগী সহ আলোচ্য বর্ষে ২,২৬৬ জন রোগী ভরতি হয় এবং ১,৮১২ জন আরোগ্য-লাভ করে। অন্তর্বিভাগে চক্ষু অস্ত্রোপচার সহ মোট ৯৯৫টি অস্ত্রোপচার করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ১,৪৮,৭৫৪ জন রোগী (পুরাতন ১,২০,০০৬) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগী-সহ মোট ৮০৭ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪০৬।

আলোচ্য বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ১,০৭৩টি এক্স-রে করা হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১৬,৬২১টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২৪৯ জন রোগী চিকিৎসালাভ করে।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৩৩৬ ও ১৫,১৬২।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সুপরিচালিত চক্ষুবিভাগটিতে সহস্র সহস্র চক্ষুরোগী সুচিকিৎসা লাভ করিয়া নিরাময় হইতেছে।

রোগীদের জন্য একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার করা হইয়াছে; এখানে উপযুক্ত পুস্তকাবলী ও পত্রপত্রিকা রাখা হয়।

উৎসব-সংবাদ

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল, যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ও আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম দিবস অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। এই দিন সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত আশ্রমের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ আবৃত্তি, বিতর্ক, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

পরদিবস ছাত্রগণ উদয়াস্ত একটানা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করে। বৈকালে

৪ টায় শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন। পরে শ্রীনুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্যামাসঙ্গীত গীত হয়।

সন্ধ্যা ৬ টায় ধর্মসভায় স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পন্থা-অবলম্বনই মানবের চরম এবং পরম লক্ষ্য। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশিত হয়।

বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গ ২৩শে মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম শুভ জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, পাঠ, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জেলাশাসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়। সভার প্রারম্ভে আশ্রমের কার্য-বিবরণী পাঠ ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এ যুগের অবতার' বিষয় অবলম্বনে একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন শ্রীবিমলাংশু রায়, শ্রীপরমানন্দ রায়, অধ্যাপক বিনোদবিহারী দাস, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী সেন ও শ্রীঅজিত-কুমার ঘোষ। সভাপতির ভাষণান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়। পরে পদাবলীকীর্তন হয় রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে বার্ষিক উৎসব এবং ভক্তসম্মেলন এ বৎসর ৬ই হইতে ৮ই জুন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় ৩০০ ভক্ত এবং ১০ জন সাধু সমবেত হইয়াছিলেন। ভক্তগণ তিনটি সম্মেলনে একত্র হইয়া আদর্শ জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের উৎকর্ষসাধন এবং সমষ্টিগতভাবে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে এই আশ্রম-পরিচালিত দুইটি নার্সারী স্কুল, দুইটি নিম্ন-বুনিয়াদী, দুইটি প্রাথমিক এবং তিনটি নৈশ বিদ্যালয়, একটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও তিনটি হোমিও-প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার কথা বর্ণনা করেন।

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী গদাধরানন্দ, স্বামী ঈশানানন্দ ও স্বামী আপ্তকামানন্দ শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, যুগাচার্য বিবেকানন্দ এবং ধর্মসমন্বয়াবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ জীবন ও বাণী সম্বন্ধে অতি মনোরম যুগোপযোগী বক্তৃতা করেন। তাঁহারা বলেন, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম প্রীতি ভালবাসা যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন মানবসমাজে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। ইহার জন্য আমাদিগকে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অমোঘ বাণী—ঈশ্বর-জ্ঞানে মানবসেবাকে জীবনে সার্থক করিয়া তুলিবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বামী রঘুবীরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি, গত ১লা জুলাই, ১৯৬৯ রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় স্বামী রঘুবীরানন্দ (সারদা মহারাজ) ৬৭ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হইয়া গিয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত আর্তত্রাণকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সময়ে শ্রীহট্ট, মনসাদ্বীপ ও রামহরিপুর আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চির শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

'অ্যাপোলো-১১'-র চন্দ্রাভিযান

গত ১৬ই জুলাই নীল এ. আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডুইন ই. অ্যালড্রিন 'অ্যাপোলো-১১' মহাকাশ যানে চড়িয়া চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া যন্ত্রপাতি সহ উহার পরীক্ষা, ফটো তোলা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে কিছু উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া আসা। এইটিই হইবে মানুষের পৃথিবীর বাহিরের অপর ভূমিখণ্ডে প্রথম পদার্পণ। মনুষ্যজাতির ইতিহাসের দিক হইতে ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এবং সাহসের অতুলনীয় নিদর্শন। পার্ল এস. বাক এবিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন, "'অ্যাপোলো-১১' নিছক প্রতিযোগিতার বহু ঊর্ধ্বে। সর্বজনীন জিজ্ঞাসার উত্তর ওতে মেলে।"

অভিযানের নায়ক আর্মস্ট্রং; তিনি এবং অ্যালড্রিন মূল যান হইতে অপর একটি যানে চড়িয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে সেই যানটিকে নামাইবেন। পরে বিশ্রামান্তে চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ করিবেন আর্মস্ট্রং; তাহার আধঘণ্টা পরে অ্যালড্রিন নামিবেন। দুইজনে প্রায় তিন ঘণ্টা চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটিয়া বেড়াইয়া তথ্যসংগ্রহাদি করিবেন।

উৎসব-সংবাদ

খুলনা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২রা মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ণে পূজাপাঠাদি ও বেলা ১টায় সমাগত আটশতাধিক ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সারাদিন শিল্পিবৃন্দ ভজন পরিবেশন করেন। বৈকালে ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী যোগদানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপে (শ্যামপুকুর, কলিকাতা) গত ৩০শে মে হইতে ২রা জুন পর্যন্ত চারদিন বিশেষ পূজা-পাঠাদি, ধর্মসভা, লীলাকীর্তন, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর শুভ প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীসারদাদেবীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং ধর্মসভার সভাপতি স্বামী বীতশোকানন্দজী, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী অমলানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং মণ্ডপের সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল মণ্ডপের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তৃতীয় দিন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ কথকতা করেন এবং ধর্মসভায় সভাপতি শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ও কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। বিভিন্ন দিনে ভজন-সঙ্গীত, লীলাকীর্তন, বন্দনাগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁপাপুকুর পল্লীতে (২৪ পরগণা) গত ৮ই জুন সুসজ্জিত মণ্ডপে বেলুড় মঠের স্বামী জীবানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ

ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও উপদেশ প্রাঞ্জল ভাষায় ভক্তগণসমক্ষে পরিবেশন করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা পটলডাঙ্গা 'শক্তি-সঙ্ঘের' সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য সুমধুর সঙ্গীতে পরিবেশিত হয়।

পরলোকে আশুতোষ সেনগুপ্ত

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য আশুতোষ সেনগুপ্ত গত ১৫ই মে শেষ রাত্রে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে দেড়মাস কাল তিনি জনডিস্-এ ভুগিতেছিলেন। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

পরলোকে প্রমথকুমার নাথ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বনগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপ্রমথ-কুমার নাথ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৪ঠা জুলাই পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে যেন চিরশান্তি লাভ করে।

এই সংখ্যার লেখকগণ

১। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২। শ্রীকানাইলাল সামন্ত :
কলিকাতা

৩। শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় :
অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি।

৪। শ্রীরবি ঘোষ :
নিউ দিল্লী

৫। সেখ সদরউদ্দীন :
খড়দহ (২৪ পরগণা)

৬। স্বামী জীবানন্দ :
উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

৭। শ্রীবনবালা মুখোপাধ্যায় :
কলিকাতা

৮। ডক্টর তারকনাথ ঘোষ, সাহিত্যভারতী :
শ্রীরামপুর (হুগলী)

৯। স্বামী অমৃতত্বানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড়

দিব্য বাণী

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৮ম অধ্যায়

(শ্রীহরি-স্মরণ-অমিয় না পিয়ে, ভোগের নেশায় রাঙায়ে মনে
শুভকাজে যারা ব্রতী রয় রাখি দৃষ্টি পুণ্যফলার্জনে,
স্বর্গাদিলোকে গিয়ে তারা পুনঃ সে-পুণ্যফল ভোগের শেষে
আবার মাটির শরীর লইয়া এই মাটিতেই ফিরিয়া আসে;—
ফিরিতেই হয় গেলেও ব্রহ্মা-নিলয়ে, সর্ব উচ্চ দেশে।)

আজীবন ধরি সতত আমার পানেই যাহার চিত্ত ধায়,
আমার স্মরণ ছাড়া যার মন অন্য কোনও কিছু না চায়
মোর সনে সদা যুক্ত সে যোগী, সুলভে আমারে পায় সেজন।
নিম্নে ভূলোক হইতে ব্রহ্ম-লোক যা সর্ব-ঊর্ধ্বতন
(সকাম যে জন তাহার নিকট) বারে বারে করে আবর্তন;
আমার পরমপদ যে পেয়েছে, ভগবানলাভ হয়েছে যার,
মুক্ত মহান্-আত্মা যে, শুধু পুনর্জন্ম হয় না তার,
অনিত্য সব দুঃখ-নিলয় ভুবনে ঘুরিতে হয় না আর।

কথাপ্রসঙ্গে

জন্মাষ্টমী

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভাদ্র কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে এক দুর্যোগময় নিশার গভীর অন্ধকারের অবসানে বিমল চন্দ্রোদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরার কারাগৃহে নরদেহে অবতীর্ণ হন। ভারতের, সনাতন অধ্যাত্ম ভারতের ভাগ্য-গগনও তখন ঘন-অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার জীবন অবলম্বনে বৃন্দাবনে শুদ্ধাভক্তির পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে এবং কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে 'অনন্যা', জ্ঞানমিশ্রা, ভক্তি-ভিত্তিক বিপুল কর্মোদ্যমের সূর্যোদয়ে সে অন্ধকার অপসৃত হয়।

শুদ্ধাভক্তিপথের অধিকারী অতি বিরল। আত্মীয়স্বজন, মান-অপমান সব ভুলিয়া, অতি তুচ্ছবোধে সব ছুড়িয়া ফেলিয়া, 'আমার' বলিতে আমাদের যাহা কিছু আছে তাহার সব কিছু শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে আপন হইতেও আপনার বোধে সর্বক্ষণ তাঁহার চিন্তায় মনকে নিমগ্ন রাখিতে পারে কয়জন! সর্বসাধারণের মধ্যে এই পথে, বিশেষ করিয়া মধুরভাবে সাধনের প্রচেষ্টায় তাই অধিকাংশ সময়ে দেহাভিমানী দুর্বল মন আমাদের প্রতারণা করে—ভগবানের দিকে আগাইয়া না দিয়া পিছাইয়াই আনে—সত্ত্ব-গুণের আবরণে মহাতামসিকতা আনিয়া দেয়।

বর্তমানে আমাদের জাতির এই তমো-ভাবাপন্ন অবস্থায় তাই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন তত নাই যত আছে কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের—যিনি বিন্দুমাত্র বিপথগামিত্ব দেখিলেও বজ্রকণ্ঠে গর্জিয়া উঠেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ!" যিনি সর্বক্ষণ আমাদের বিপুল উদ্যমে কর্ম করিতে বলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎস্মরণও করিতে বলেন—একহাতে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধরিয়া রাখিয়া অপরহাত দিয়া কাজ করিতে বলেন।

তামসিকতা কাটাইয়া সত্ত্বগুণের উদ্বোধনের ইহাই রাজপথ, আমাদের প্রায় সকলেরই আজ ইহাই প্রয়োজন। আজ তাই প্রার্থনা জানাই অর্জুনের রথের সারথিকে, ভারতের চির-সারথিকে, ভারতের জনচিত্তে আবির্ভূত হইয়া তিনি যেন আমাদের জীবনরথকে কল্যাণপথে চালিত করেন!

সফল চন্দ্রাভিযান

গত ১৬ই জুলাই নীল আর্মষ্ট্রং, এড্উইন অ্যালড্রিন ও মাইকেল কলিন্স অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানে আমেরিকার কেপ কেনেডি উৎ-ক্ষেপণ-কেন্দ্র হইতে চন্দ্রে যাত্রা করিয়াছিলেন; গত ২১শে জুলাই মধ্যরাত্রে আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিন সেখানে চন্দ্রযান নামাইয়া ও সকালে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করিয়া মানুষের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিলেন। পৃথিবীর বাহিরে যাইয়া অপর কোন জ্যোতিষ্কে মানুষের এই প্রথম পদার্পণ। ইহা মানুষের বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার বিরাট সাফল্য, মানুষের সাহসিকতার ও উদ্যমের গৌরবময় বিজয়। আর্মষ্ট্রং, অ্যালড্রিন ও কলিন্সের নাম মানব-জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

মহাকাশ-অভিযানের এই বিজয়-উৎসবে আজ আমরা সগৌরবে স্মরণ করি ১৯৫৭

খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখের মহাকাশ-অভিযানের উদ্বোধন-উৎসবকে—যেদিন রাশিয়া হইতে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করি পরলোকগত য়ুরী গ্যাগারিনকে, যিনি ১৯৬১র ১২ই এপ্রিল মহাকাশে উঠিয়াছিলেন মানুষের প্রথম প্রতিনিধিরূপে।

মহাকাশ-অভিযানে সহস্র সহস্র কোটি টাকা ব্যয়িত হইতেছে; ইহার সার্থকতা আছে কি না, এ প্রশ্ন আজ বহু চিন্তাশীল লোকের মনে জাগিতেছে; কিন্তু অন্য কোন সার্থকতা যদি নাও থাকে, পৃথিবীর মানুষ আজ পথের অগণিত বাধা জয় করিয়া আড়াই লক্ষ মাইল দূরের জ্যোতিষ্কে পদার্পণ করিয়া ফিরিয়া আসিল—এ ঘটনাটিই কি একটি অমূল্য সার্থকতা নহে? মহাকাশ-অভিযানে ব্যয়িত না হইলেই কি এই অর্থ অনুন্নত দেশগুলির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইত?

সে প্রশ্ন ভিন্ন প্রশ্ন। সে প্রশ্ন হইল বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করিতে আমরা আজ যতখানি তৎপর ও সফল হইয়াছি, অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য সমভাবে তৎপর হওয়া তো দূরের কথা, এরূপ করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করিতেছি কিনা সন্দেহ। যদি মনুষ্যজাতিকে বাঁচাইতে হয়, তাহা হইলে মানুষের বহিঃপ্রকৃতি-বিজয়ের পথরোধ নহে, তাহাকে অন্তঃপ্রকৃতি-বিজয়ের পথেও অগ্রসর করাইতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

ক্রমমুক্তি ও পরলোক

দেহাত্মবুদ্ধিহীনতাই মুক্তি

বন্ধন থাকিলে তবে মুক্তির প্রশ্ন উঠে। আমাদের বন্ধন কি?—এ প্রশ্নের বোধ হয় সংক্ষিপ্ত উত্তর দেহাত্মবোধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে, দেহমনবুদ্ধিকে 'আমি' বলিয়া ভাবা। আমরা স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময়, অমর। দেহমনকে আমি বলিয়া ভাবি বলিয়াই আমরা দেহমনের সীমায় নিজেদের আবদ্ধ করিয়া ফেলি এবং তাহারই ফলে দেহমনের চাহিদাকে আমাদেরই চাহিদা, দেহমনের রোগ-জরা-মৃত্যু, দুঃখভয় প্রভৃতিকে আমাদেরই মৃত্যু, দুঃখ প্রভৃতি মনে করিতে বাধ্য হই।

এই দেহাত্মবোধের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাদের প্রয়োজন দেহমনের দাসত্বকে,-উহাদের বন্ধনকে, উহাদের চাহিদাকে অস্বীকার করা,—ভোগ ও ভোগেচ্ছা কমাইয়া আনা। আর মনকে বহির্বিষয় হইতে গুটাইয়া আনিয়া সত্যের চিন্তায় বা ভগবানের চিন্তায় একাগ্র করিবার প্রয়াস। এই দুইটিরই প্রয়োজন। কারণ, দেহমনের মাধ্যমে যত বেশী ভোগ করা যায় দেহমনে আমি-বোধ তত বেশী বাড়ে, বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। আর বিষয় বা ভোগ্যবস্তুর চিন্তা যত কম করা যায়, একদিকে সেগুলিকে ভোগ করিবার ইচ্ছা বা বাসনা তত কমে, এবং অপরদিকে মন ভিতর হইতেই বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের, বিষয়ের সংস্পর্শ ছাড়াও জীবনকে তৃপ্তিতে ভরাইয়া রাখিবার মত একটা অবলম্বনও পাওয়া যায়; আনন্দের, তৃপ্তির, প্রসন্নতার একটা অবলম্বন ছাড়া জীবনে কোন চেষ্টাই সর্বান্তঃকরণে করা যায় না। বন্ধন-মুক্তির সর্ববিধ শাস্ত্রোক্ত বিস্তারিত বিধিনিষেধের মূল লক্ষ্য ইহাই।

কিন্তু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বিষয়ভোগজনিত সুখের স্মৃতি আমাদের মনে সংস্কাররূপে এত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে যে, আমরা ইচ্ছামাত্র

ভোগ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইতে বা ভোগ্যবস্তুর চিন্তা হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বরচিন্তায় বা আত্মচিন্তায় একাগ্র করিতে পারি না। প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী অল্পসংখ্যক কয়েকজনমাত্র পূর্ণ সংযম ও পূর্ণ একাগ্রতা সহায়ে এই জন্মেই, এই দেহে থাকাকালেই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণাদি সর্ববিধ দেহাত্মবোধের বন্ধন এককালে ছিন্ন করিয়া সরাসরি মুক্ত হইয়া যান—দেহ থাক বা না থাক, নিজেকে কখনো তাঁহারা আর দেহমন বলিয়া ভাবেন না, সর্বাবস্থায় নিজেকে নিত্যমুক্ত নিত্যানন্দময় সত্তারূপে প্রত্যক্ষ করেন।

ক্রমমুক্তির অধিকারী ও পথ

কিন্তু সে কয়জন? তাই অধিকাংশের জন্য ব্যবস্থা—শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে সংযত ভোগ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য ভগবচ্চিন্তা ও সৎকর্মের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে ভোগেচ্ছা কমাইয়া আনিয়া, মনকে ত্যাগমুখী করিয়া দেহাত্মবোধের বন্ধন ক্রমে ক্রমে ছিন্ন করা। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ।

এভাবে চলিতে চলিতে আমাদের মন যখন অন্তরস্থ বিষয়নিরপেক্ষ অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডারের দ্বার খুলিতে সমর্থ হয়, যখন ইহলোকের এবং স্বর্গাদি পরলোকেরও ভোগসমূহে বীতভৃষ্ণ হয়, নিষ্কাম হইয়া, প্রতিদানে কিছু না চাহিয়া আমরা যখন শাস্ত্রনির্দিষ্ট শুভকার্যগুলি করিবার মত বিশুদ্ধ হই, তখন আর আমাদের মৃত্যুর পর স্থূলদেহ লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে, এই স্থূলজগতে আসিতে হয় না (কারণ বিষয়ভোগের ইচ্ছা বা বাসনাই পুনর্জন্মের কারণ), স্থূলবন্ধনকে আর বরণ করিয়া লইতে হয় না। তখন সূক্ষ্মদেহে আমরা সূক্ষ্মজগতে বা উচ্চলোকে গমন করি এবং সেখান হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর লোকে গমন করিয়া শেষে সর্বোচ্চ লোকে যাইয়া মুক্ত হই, আমাদের নিত্য-মুক্ত স্বভাব ফিরিয়া পাই। ক্রমমুক্তির পথে এভাবে ধাপে ধাপে মুক্তি আসে।

শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে চলিয়া যাঁহারা ভগবচ্চিন্তা ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন, অথচ ভোগেচ্ছা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না, সৎকর্মের প্রতি-দানে শুভফল বা পুণ্য অর্জন করিতে চান, তাঁহারাও উচ্চলোকে গমন করেন। এই লোকের নাম 'চন্দ্রলোক' বা স্বর্গধাম। ইহা দেবতাদের আবাসভূমি। এখানে দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল তাঁহারা সুখভোগ করেন, কিন্তু শুভকর্মের ফল, পুণ্য, শেষ হইলে আবার তাঁহাদের স্থূলদেহ লইয়া এই স্থূল জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়; সেখান হইতে তাঁহাদের নিম্নগতি হয়, উর্ধ্বগতি হয় না, মুক্তি হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতাদের যে অমর বলা হয় উহা আপেক্ষিক অর্থে, আমাদের জীবনের তুলনায় তাঁহাদের জীবন অতি দীর্ঘ, এই অর্থে।

আধুনিক অবিশ্বাস ও স্বামী বিবেকানন্দ

এই শাস্ত্রোক্ত পরলোক সম্বন্ধে আজ অধি-কাংশ লোকের মনেই অবিশ্বাস। আদিকাল হইতে মানুষ কোন-না-কোন আকারে পর-লোকে বিশ্বাসী ছিল। জড়জগতের সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির ফলে মানুষের মন হইতে অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সহিত পরলোকে বিশ্বাসও অপসৃত হইয়াছে। শাস্ত্রের কথা এখন অধি-কাংশ মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না। এখন 'বিজ্ঞানসম্মত' কথাটি মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদনে ম্যাজিকের মতো কাজ করে, যেমন একদিন করিত 'বেদবাক্য' কথাটি। এই

বিশ্বাসের কারণ অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক—বিজ্ঞানী বা সত্যদ্রষ্টা কেহই নিজে ভালভাবে না যাচাইয়া-বাজাইয়া, না প্রত্যক্ষ করিয়া কোন সত্যই প্রচার করেন না, বা করেন নাই। তথাপি নানা কারণে এরূপ ঘটিয়াছে। আজ নয়, এই 'আধুনিক' মনোভাব উনবিংশ শতাব্দী হইতেই প্রকট। স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার করিতে যান তখন আধুনিক মনের এই প্রবণতাটি সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাই বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াই, আধুনিক মননের পাত্রে ঢালিবার উপযোগী করিয়াই বেদান্তাদি শাস্ত্রের উচ্চ তত্ত্বগুলিকে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন: "আমি এখন বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের ঐ তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি; তাদের একটা পরিষ্কার হলে সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে।" "আমি এ বিষয়ে এমন আলোক দেখতে পাচ্ছি যা সমস্ত ভোজবাজী থেকে মুক্ত। আমি সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল করে তীব্র কর্মের মশলাতে সুস্বাদু করে এবং যোগের পাকশালায় রান্না করে পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে।"

বলা বাহুল্য, শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয় তৎকালীন সর্ববিধ আধুনিক চিন্তার সহিত সুপরিচিত, আবার সর্ববিধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বেরও প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন আধুনিক চিন্তার সহিত অধ্যাত্মচিন্তার সেতুবন্ধনের যোগ্যতম ব্যক্তি ও অগ্রদূত। তাঁহারই ভাবানুসরণ ও কথাই তাই প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করার শ্রেষ্ঠ সহায়ক। সেজন্য সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের কথা সামান্য আলোচনা করিয়া তাঁহারই ভাব ও কথা আমরা উপস্থাপিত করিতেছি।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎ

আধুনিক বিজ্ঞান জড়জগতের বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে যাহা বলে এবং তাহারই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু অনুমান করে, তাহা খুব সংক্ষেপে এভাবে বলা চলে:

জগতে যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে তাহাকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—জড় ও শক্তি; অথবা বলা ভাল জড়ধর্মী ও শক্তিধর্মী। কারণ যাহাকে জড় বলি তাহা ইলেকট্রন-প্রোটনাদি অতি ক্ষুদ্র কণারূপে বা অণুপরমাণুরূপে বা উহাদের সমবায়ে গঠিত আমাদের সচরাচরদৃষ্ট স্থূল বস্তুরূপে—যেরূপেই থাকুক না কেন, সর্বাবস্থায় তাহার সহিত শক্তিকে সংযুক্ত দেখা যায়—উহাদের সংযোজক- ও ধারকরূপে বা যে কোন রূপেই হউক না কেন। আবার শক্তিকেও দেখা যায় জড়ের সহিত সংযুক্ত। একমাত্র তরঙ্গ বা স্পন্দনাকারে শক্তির বিচ্ছুরণের সময় উহার সহিত জড়ের সংস্পর্শ থাকে না বলিয়াই বিজ্ঞানীরা আজকাল অনুমান করেন; পূর্বে কিন্তু তাঁহাদের ধারণা ছিল ইথার নামক অতি সূক্ষ্ম সর্বব্যাপী কোন জড় সত্তাকে শক্তি তরঙ্গাকারে স্পন্দিত করে এবং সেই তরঙ্গ অবলম্বনেই বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা যে পরে আবার পরিবর্তিত হইবে না, তাহা জোর করিয়া কেহই বলিতে পারেন না; আলোকের কার্যের ব্যাখ্যায় কণাতত্ত্বকে গ্রহণ, পরে উহাকে বর্জন করিয়া তরঙ্গতত্ত্বের গ্রহণ এবং তাহারও পরে পুনরায় তরঙ্গতত্ত্বের সহিত কণাতত্ত্বের পুনর্গ্রহণের ন্যায় বিদ্যুৎশক্তির বিচ্ছুরণের ব্যাখ্যায় যে ইথার নামক কোন অতিসূক্ষ্ম

সর্বব্যাপী জড় সত্তার মাধ্যম ভবিষ্যতে পুনরায় গৃহীত বা প্রমাণিতই হইবে না, তাহা জোর করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। বস্তুর গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি তো এখনো শেষ কথা বলিবার মতো চরম অবস্থায় আসিয়া থামে নাই।

সে যাহাই হউক, জড় ও শক্তিই যে জড়-জগতের সব বস্তুর মূল উপাদান এবং জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়াশীল হওয়ার ফলেই যে জড়জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, পরিবর্তন ও ক্ষয়, রূপান্তর বা বিনাশ ঘটিতেছে—একথা বিজ্ঞান নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে।

বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে পরলোক

আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বও তাহাই বলে। সমস্ত জড়ধর্মী সত্তার সূক্ষ্মতম অবস্থাকে বলা হয় 'আকাশ', আর তাপ আলো বিদ্যুৎ, প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত সমস্ত শক্তির সূক্ষ্মতম অবস্থাকে বলা হয় 'প্রাণ'। আকাশ বলিতে 'স্পেস' বা দেশ সম্বন্ধে আমাদের যাহা ধারণা, তাহাকে শূন্য না ভাবিয়া অতিসূক্ষ্ম কোন জড় সত্তায় পূর্ণ ভাবিলে যাহা হয়, অনেকটা তাহাই।[১] আকাশ জড়ধর্মী বলিয়া উহা নিজে নিজে স্পন্দিত হইতে পারে না। প্রাণ বা শক্তি যখন উহার উপর ক্রিয়াশীল হয়, তখনই সৃষ্টি শুরু হয়। প্রাণের স্পন্দন বলিতে প্রাণ কর্তৃক উত্থাপিত আকাশের স্পন্দনই বোঝায়। প্রাণ ও আকাশ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত না হইলে স্পন্দনই হয় না, সৃষ্টিই হয় না। স্পন্দনমাত্রই হইল ক্রিয়াশীল-প্রাণ-সংযুক্ত আকাশ। এই স্পন্দন স্থূল সূক্ষ্ম বিভিন্ন পর্যায়ের আছে। স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎ ও সেগুলির অন্তর্গত বস্তু বলিতে এই স্থূল সূক্ষ্ম স্পন্দনচয়ই বুঝায়। এগুলি ছাড়া কোন জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না।

আমাদের চন্দ্র-সূর্য-তারকাদি-মণ্ডিত এই জগৎ বা 'লোক' স্থূলজগৎ। ইহার শাস্ত্রীয় নাম 'আদিত্যলোক'।[২] ইহা প্রাণ ও আকাশের স্থূলতম স্পন্দন সঞ্জাত। প্রাণ ও আকাশের সূক্ষ্মতম স্পন্দন সঞ্জাত জগৎগুলির নাম 'চন্দ্রলোক' 'বিদ্যুল্লোক' প্রভৃতি।

তাহার পরেরও যে জগৎ তাহা প্রাণ ও আকাশ যে সত্তার দুটি বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, সেই সত্তা দিয়া গঠিত; প্রাণ ও আকাশ এই সত্তায় মিলিত হইয়াছে। বোধ হয় বলা চলে মূল ইচ্ছা, ভগবদিচ্ছাই সে জগতের উপাদান। তাহার পরে স্থূল সূক্ষ্ম সর্ববিধ জগতের সব কিছুর মূল সত্তা—শুদ্ধ চেতনা। উহাই চরম সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরম তত্ত্ব।

এই লোকগুলির অবস্থান একটি অপরটির ঊর্ধ্বে বা নিম্নে, এভাবে বলা হইয়াছে। এখানে ঊর্ধ্ব বা নিম্ন বলিতে বুঝায় সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্ব, কোন দূরত্ব নয়। একই স্থানে বিভিন্ন স্পন্দনবিশিষ্ট বহু জগৎ থাকিতে পারে। যেমন এই স্থূল জগতেই, এখানেই এখনই স্থূলবস্তু বাতাসের সঙ্গে স্থূল জগতের অন্যান্য

---

১ শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানের মতোই প্রত্যক্ষজ্ঞান-ভিত্তিক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি অব্যাহত হইলে শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি যে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়াই গৃহীত হইবে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; বিশেষ করিয়া স্থূলজগতের তত্ত্বগুলি যখন সবই এখনো অবিরোধী দেখা যাইতেছে। শাস্ত্রোক্ত 'আকাশ' বিজ্ঞানীদের পূর্ব-অনুমিত 'ইথারে'রই সদৃশ (স্থূল আকাশ); আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এখন না করিলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে ভবিষ্যতে একদিন 'ইথার' বা সমজাতীয় কোন তত্ত্বকে বিজ্ঞানীদের পুনর্গ্রহণ করিতেই হইবে।

২ বিভিন্ন ভাবে সূক্ষ্মলোকগুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এখানে স্বামীজী 'অদ্বৈতভাবে' ব্যাখ্যা করিবার সময় যে নাম ও ক্রম দিয়াছেন, তাহাই দেওয়া হইল। প্রসঙ্গের শেষাংশে উদ্ধৃত তাঁহার কথারই ইহা বিস্তৃতি মাত্র।

বস্তুগুলির তুলনায় সূক্ষ্মতর বহু আকারের বেতারতরঙ্গ, আলোকতরঙ্গ প্রভৃতি একই সঙ্গে অবস্থান করিতেছে।

সব জগৎগুলিই প্রাণ ও আকাশের স্থূল বা সূক্ষ্ম বিভিন্ন স্পন্দনবিশিষ্ট বলিয়া আমাদের মন যখন সেভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে তখন সেই স্পন্দনের অনুরূপ জগৎটিকেই শুধু সে দেখিতে পায়, অন্যগুলিকে পায় না। মনের স্থূল অবস্থায় সূক্ষ্ম জগৎ দেখা যায় না, আবার জগতের সূক্ষ্ম অবস্থা যখন দেখি তখন তাহার স্থূল রূপ আর নজরে পড়ে না। একই সঙ্গে দুটি দেখা যায় না। যেমন কোন রেডিওতে এককালে একটি মাত্র বেতারতরঙ্গই আমরা গ্রহণ করিতে পারি; যেমন খুব বেগে বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত আলোক-বিন্দুকে যখন আলোকের বৃত্তরূপে দেখি, তখন আলোকবিন্দু বা তাহার ঘূর্ণন দেখিতে পাই না, এবং যদি বেগে ঘূর্ণিত আলোকবিন্দুকে দেখিবার মত আমাদের দৃষ্টিশক্তি সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে তখন আর আমরা বৃত্তটিকে দেখিতে পাইব না, দেখিব শুধু ঘূর্ণমান আলোকবিন্দুটিকে। ঘূর্ণমান ইলেকট্রনকে দেখিবার মত যদি আমাদের দৃষ্টি-শক্তি সূক্ষ্ম হয় তখন এই জগৎকেই আর বিচিত্র রূপ ও আকার বিশিষ্ট রূপে দেখিব না— দেখিব কতকগুলি বিভিন্নপ্রকার ঘূর্ণিবিশিষ্ট কণার সমুদ্ররূপে। তাই 'চন্দ্রলোক' 'বিদ্যুল্লোক' প্রভৃতি সূক্ষ্ম জগৎ দেখিবার ও তাহাতে প্রবেশ করিবার মতো যোগ্যতা মনকে সূক্ষ্ম, বা শুদ্ধ না করিলে আসে না। একাগ্রতা ও সংযম অভ্যাসের দ্বারাই তাহা সম্ভব। শাস্ত্রে এই সব লোকে যাইবার জন্য সেই ব্যবস্থাই দেওয়া আছে এবং পরিষ্কারভাবে বলা আছে, আমরা কেবল সূক্ষ্মদেহেই সেখানে যাইতে পারি।

পরলোক সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য দেখাইয়া বেদান্তাদি শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে "প্রশ্নোত্তরাকারে" একখানি বই লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় আমেরিকার বিখ্যাত তড়িৎ-তত্ত্ববিদ্ মিঃ নিকোলা টেসলা আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ ও বিশেষ-ভাবে ঐ তত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "তিনি গণিতের সাহায্যে দেখাইয়া দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে।" ইহা শুনিয়া স্বামীজী মিঃ ষ্টার্ডিকে লিখিয়াছিলেন (১৩ ফেব্রুআরি, ১৮৯৬), "তা যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে।" পূর্বোক্তভাবে বই লেখা স্বামীজীর আর হইয়া উঠে নাই, কিন্তু বহু বক্তৃতা ও লেখায় এবিষয়ে তিনি প্রচুর আলোক-পাত করিয়া গিয়াছেন। এই পত্রেই বইটির পরিকল্পনারূপে পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত আভাস তিনি দিয়াছেন, তাহা এই:

"পরলোকতত্ত্ব কেবল অদ্বৈতবাদের দিক থেকে দেখানো হবে; অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন—(ক্রমমুক্তির পথে) মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে, পরে চন্দ্রলোকে ও সেখান থেকে বিদ্যুল্লোকে যান; সেখানে এক-জন পুরুষ এসে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান। অদ্বৈতবাদী বলেন, তারপর তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

"এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার যাওয়া-আসা নেই, আর এই যে-সব বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ—এগুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপন্ন মাত্র। অর্থাৎ সর্বনিম্ন বা অতি স্থূল স্তর হচ্ছে আদিত্যলোক বা এই

পরিদৃশ্যমান জগৎ—এখানে প্রাণ জড়-শক্তিরূপে ও আকাশ স্থূলভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রলোক—তা আদিত্যলোককে ঘিরে আছে। এ আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নয়, এ দেবগণের আবাসভূমি—অর্থাৎ এখানে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে ও আকাশ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত-রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এরও ওপর বিদ্যুল্লোক—অর্থাৎ এমন এক অবস্থা, যেখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বললেই হয়, আর তখন বলা কঠিন যে, বিদ্যুৎ জিনিসটা জড় না শক্তি। তারপর ব্রহ্মলোক—সেখানে প্রাণও নেই, আকাশও নেই ; সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আত্মাশক্তিতে সম্মিলিত হয়েছে। আর এখানে প্রাণ বা আকাশ না থাকায় (ব্যষ্টি) জীব সমস্ত বিশ্বকে সমষ্টিরূপে অথবা মহত্তের বা বুদ্ধির সংহতিরূপে কল্পনা করে। এঁকেই 'পুরুষ' বলে বোধ হয়—ইনিই সমষ্টি আত্মাস্বরূপ, কিন্তু ইনিও সেই সর্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন—কারণ এখানেও বহুত্ব রয়েছে। এইখান থেকেই জীব তার চরম লক্ষ্য স্বরূপ একত্বকে অনুভব করে"—বহুত্বের বন্ধন হইতে সর্ববিধ দেহাত্মবুদ্ধি হইতে চিরমুক্ত হইয়া যায়।

"তোমার আমার মধ্যে বিভিন্ন স্তরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও আমাদিগকে কখনো দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখনো দেখিতে পাইব না। একপ্রকার চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন একই লোকে অবস্থিত প্রাণীকেই আমরা দেখিতে পাই। যে যন্ত্রগুলি এক সুরে বাঁধা, সেইগুলির মধ্যে একটি বাজিলেই অন্যগুলি বাজিয়া উঠিবে। মনে কর আমরা যেরূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা 'মানবকম্পন' নাম দিতে পারি ; যদি উহা পরিবর্তিত হইয়া যায়, তবে আর মনুষ্য দেখা যাইবে না, পরিবর্তে অন্যরূপ দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আসিবে—হয়তো দেবতা বা দেবজগৎ, কিংবা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ ; কিন্তু ঐ সবগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিশ্ব-শান্তি কোন্ পথে ?

স্বামী তেজসানন্দ

আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন-আদর্শপুষ্ট শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ এক হস্তে শান্তির প্রতীক জলপাই (olive) বৃক্ষের শাখা ও অপর হস্তে আণবিক অস্ত্র ধারণ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। সেই সঙ্গে তাহারা আবার অহর্নিশ শান্তির বাণী প্রচার করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে শান্তি-সভারও অনুষ্ঠান করিতেছে! কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ কার্যকলাপে মনে এ-সন্দেহ স্বতই জাগিতেছে—তাহাদের অন্তর সাম্রাজ্য-লিপ্সা ও হিংসা হইতে মুক্ত কিনা।

নভোমণ্ডলে ধ্বংসাত্মক-অস্ত্রসংবলিত সন্ত্রাস-সৃজনকারী বোমারু-বিমান বজ্রনিনাদে বিচরণ-শীল, প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যসমূহে আণবিক অস্ত্রের ধ্বংসকারিণী শক্তি পরীক্ষার্থে ভীতিপ্রদ বিস্ফোরণ, কোন মহদুদ্দেশ্যের মুখোশ পরিয়া অপর দেশকে আক্রমণের প্রচেষ্টা, জনমানসে তীব্র উত্তেজনা সর্বদা জাগরূক রাখিবার উদ্দেশ্যে বিরামবিহীন যুদ্ধ-প্রস্তুতি এবং জল-পথেও নৌ-বলবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ও ইহার মহড়ার তৎপরতা বিশ্বজগতের প্রতিটি শক্তিশালী জাতির দৈনন্দিন জীবনের যেন একটি স্বাভাবিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, ধর্মীয় জগতেও অনেক বিদেশী শক্তির সমষ্টিগত জীবনে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শগত নীতি-বোধেরও অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এইসকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিংশ-শতাব্দীর শেষার্ধে দাঁড়াইয়া মনে স্বতই জিজ্ঞাসা জাগিতেছে,—মানবিক সভ্যতা কি পুনঃ বর্বতার শেষস্তরে নামিয়া আসিতেছে? ইহা কি শুধু ধ্বংস ও মৃত্যুই পৃথিবীর এই বিশাল বক্ষে সৃজন করিতে থাকিবে?

আজ শান্তিপ্রিয় মানবমনে প্রশ্ন উঠিয়াছে—'বিশ্ব-শান্তি কোন্ পথে?' বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'এই পৃথিবীতে শান্তির জয় হইবে কিংবা যুদ্ধবিগ্রহের? প্রেম, মৈত্রী, ভালবাসা জয়ী হইবে কিংবা দানববৃত্তি প্রাধান্য লাভ করিবে? আধ্যাত্মিকতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে কিংবা স্বার্থ-দ্বেষ-কলুষিত মোহান্ধ মানবের পাশবিক বুদ্ধি জয়ী হইবে?' তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলিয়াছিলেন,—ভারত বহুযুগ পূর্বেই ইহার সম্যক্ সমাধান করিয়াছে এবং আমরা শত বাধা-বিপর্যয়ের মধ্যেও সেই সিদ্ধান্তেই কটিবদ্ধ হইয়া অবিচলিত থাকিব। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন,—ত্যাগের মাধ্যমেই প্রকৃত শান্তি-সৌধ নির্মিত হইবে, ভোগের দ্বারা নহে। ভারতের ইহাই হইল শাশ্বত সনাতন মর্মবাণী এবং ইহাই তাহার দুর্জয় শক্তির একমাত্র আধার ও অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। ভবিষ্যৎ কালে ত্যাগবুদ্ধি-প্রসূত আধ্যাত্মিকতাই বিশ্ব-মানবকে প্রকৃত শান্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণান্তে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সকলকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা চক্ষু খুলিয়াছেন, যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে

সবিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের এই ভাব, গতি, চালচলন এবং সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে! তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব আছে···আমরা কখনও বন্দুক বা তরবারির সাহায্যে ভাব প্রচার করি নাই,··· লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ ঊষাকালীন ধীর শিশিরসম্পাতের ন্যায় এই শান্ত সহিষ্ণু সর্বংসহ ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তাজগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে।" তিনি তাঁহার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিসহায়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—প্রাচ্যের বেদান্ত ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞানের সমবায়ে অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি মহতী সংস্কৃতির উদ্ভব হইবে যাহা বিবিধ ধর্ম ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একত্বের ভিত্তিতে অনন্ত বিস্তারের পথ উন্মুক্ত রাখিবে, যাহা পারস্পরিক হিংসা- ও ধ্বংসাত্মক স্বার্থ-সংঘাত সৃষ্টি না করিয়া মানবজাতিকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। এই অভেদজ্ঞান বা একাত্মানুভূতিই অনন্ত প্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও নৈতিক ধর্মের মূল উৎস। শান্তিপ্রিয় মানব বেদান্তের এই উদার গম্ভীর অভয়বাণী শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার তিরোধানের কয়েক বৎসর পূর্বে ইহাও বলিয়াছিলেন,— যদি এই আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি না করিয়া পাশ্চাত্যের ধ্বংসাত্মক জড়সভ্যতার তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে, তবে আগামী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই এই সভ্যতা-সৌধ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। আজ হইতে কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর পূর্বে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, পর পর দুইটি মহাযুদ্ধে কি তাহাই প্রমাণিত হয় নাই? রাজনৈতিক আকাশ পুনঃ ঘনঘটাচ্ছন্ন,—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী আজ আতঙ্কিত।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সর্বদেশের ও সর্বযুগের ত্রিকালদর্শী মহামানবগণ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন— হিংসার দ্বারা কখনও হিংসার নিবৃত্তি হয় না। অবৈরী ভাব দ্বারাই মৈত্রী সাধিত হয়,—ইহাই ধর্ম। ভগবান যিশু তাঁহার প্রিয় প্রধান শিষ্য পিটারকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন,— প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে যে অসি উত্তোলন করে তাহাকে সেই অসির আঘাতেই প্রাণ হারাইতে হয়। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অতিমানবগণের এই বাণী বিশ্বসমাজে রূপায়িত করা প্রত্যেক শান্তিকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিরই আজ প্রধান কর্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া ধর্মজগতে উদারতা, সহনশীলতা ও সৌভ্রাত্রের বাণী শুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্য ধর্মের সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষা-পূর্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত হইবে। যদি এই ধর্মসম্মেলন জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তবে তাহা এই: সুন্দর-ভাবে ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, পবিত্রতা চিত্ত-শুদ্ধি বা দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেই অতি মহানুভব উদারচরিত্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইসকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ কল্পনা করে যে, অন্যান্য ধর্মের

বিনাশ হইয়া তাহার ধর্মই সকলকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিবে, তবে সে বাস্তবিকই কৃপার পাত্র ; তাহার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত ; আমি তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, তাহার ন্যায় লোকেরা বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি-ধর্মের পতাকার উপর লিখিত থাকিবে—'বিবাদ করিও না, পরস্পর সহায়তা কর ; বিনাশের চেষ্টা না করিয়া পরস্পরের ভাব অঙ্গীভূত ও স্বায়ত্ত কর ; কলহ ছাড়িয়া মৈত্রী ও শান্তির আশ্রয় গ্রহণ কর।' "

ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অষ্টাদশ অধিবেশনের প্রাক্কালে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে যে সুচিন্তিত ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"At no time in human history has the possibility of world peace and welfare been so great as at present. Science and Technology have released sources of power of remaking the world. We can now achieve ways of life under law and order that will usher in a golden era. The sources—human and material—for the achievement of this goal are today available to us. On the other hand, the potential for total destruction of human civilization is equally great. In a nuclear war there will be neither victors nor vanquished. Both of them will perish together. A war in such circumstances is sheer madness···. If we wish to avoid wars, we will have to work for peace. The only defence against war is peace. I am certain that a total ban on nuclear war will soon be adopted by all countries and prepare the way for general and complete disarmament."—অর্থাৎ বর্তমান জগতে বিশ্ব শান্তি ও বিশ্বকল্যাণ প্রতিষ্ঠার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে, মানুষের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে কখনও তদ্রূপ হয় নাই। বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জগৎকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রভূত উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিয়ম ও শৃঙ্খলার সাহায্যে আমরা নূতন স্বর্ণযুগের সূত্রপাত করিতে সমর্থ। বাস্তবিক পক্ষে, একদিকে যেমন মানবিক ও জড় উপাদানের সাহায্যে আজ কল্যাণসাধন করিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, অপর দিকে সমগ্র মানবজাতির সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংসের কারণও সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্তমান আণবিক যুদ্ধে বিজয়ী ও বিজিতের কোন চিহ্নই থাকিবে না। উভয়েই ধ্বংসের কুক্ষিগত হইবে। এমতাবস্থায় যুদ্ধের পরিকল্পনা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ···যদি যুদ্ধ বন্ধ করিতে চাই, তবে প্রকৃত শান্তির জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই যুদ্ধ বন্ধ করিবার একমাত্র পন্থা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতিপুঞ্জের সামগ্রিকভাবে আণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের চুক্তিগ্রহণই নিরস্ত্রীকরণের পথ সুগম করিয়া তুলিবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের গোধূলিলগ্নে তাঁহার অশীতিতম জন্মবার্ষিকীর শুভবাসরে বর্তমান সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া উৎসবমুখর শান্তিনিকেতনের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে তাঁহার সারগর্ভ মনোজ্ঞ ইংরেজী ভাষণের মাধ্যমে মানবজাতির সম্মুখে যে চিন্তাসম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এস্থলে আংশিক-

ভাবে পরিবেশন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছিলেন,—বর্বরতা-পিশাচ আজ মিথ্যাভান পরিহারপূর্বক বিশ্বজগৎকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিষদন্ত ও তীক্ষ্ণধার নখররাজি প্রকট করিয়াছে। বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাহার উদ্গীর্ণ বিষাক্ত দুর্গন্ধ সমগ্র আবহাওয়াকে দূষিত ও অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যন্তরে অপরকে ধ্বংস করিবার যে হীনবৃত্তি এতদিন লুক্কায়িত ছিল, তাহা মানবের নীতিবোধ ও শুভবুদ্ধির ব্যাপক বিলোপ-সাধনকল্পে আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এক শক্তির বিরুদ্ধে অপর শক্তির যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে ইহার যে কি ভয়াবহ পরিণাম, তাহা কেহ কল্পনা করিতেও সমর্থ নহে।

বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠাকল্পে ডঃ রাধাকৃষ্ণন ১৯৬৩ সালের ১৩ই মে কাবুলের এক মহতী জনসভায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাও বলিয়াছিলেন—আমরা ব্যাবিলন, আসিরিয়া, গ্রীক প্রভৃতি জাতির সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, যে-সকল দেশ কেবল অস্ত্রের সাহায্যে পার্থিব উন্নতির প্রয়াস করিয়াছে, তাহারা অতীতের অতলগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহারা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, প্রীতি, ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বকে মূলমন্ত্র করিয়া উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছে, তাহারাই এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি ইতিহাস আমাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া থাকে তাহা এই যে, মানুষের মধ্যে শুভ ও অশুভ বুদ্ধি দুই-ই পাশাপাশি বিদ্যমান। অর্ধমানবিক বা পশুস্তরের অধিবাসিবৃন্দ সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্ধ-প্রেরণায় কার্য করিয়া থাকে,—তাহাদের মধ্যে ভালমন্দের বিচারহীনতা সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যজগতে সকলের ভিতর উভয় প্রকার বৃত্তির সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের বিচারবুদ্ধির সাহায্যে শুভকার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ। আমরা বর্তমানে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা যদি অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করি, তবে এই শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণবেদীমূলে আমাদিগকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। উহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

তিনি আরও বলিয়াছেন—যাঁহারা শান্তিকামী তাহারা যদি সমবেত ও সংঘবদ্ধভাবে শান্তি ও সম্প্রীতিস্থাপনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞান শান্তির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তবেই আণবিক অস্ত্র আজ যে বিশ্বশান্তিস্থাপনের প্রবল বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করা বহুল পরিমাণে সহায়ক হইবে। মানুষের ভীতি ও সংশয় আত্মবিশ্বাসে পরিণত হইবে। Red Cross, Red Crescent এবং এবংবিধ শান্তিস্থাপক সংস্থাসমূহ বিশ্বশান্তির পক্ষে খুবই শক্তিপ্রদ সহায়ক হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

এই বিশ্বশান্তি-স্থাপনপ্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক A. J. Toynbee তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Study of History' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই- যে-অসি একবার কোষ-মুক্ত হইয়া শোণিতের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে আর কোষবদ্ধ করা সম্ভব নহে; যেমন, যে-ব্যাঘ্র মনুষ্যরক্তের আস্বাদ পাইয়াছে, সে শুধু মনুষ্যই ভক্ষণ করিবে; শিকারীর হস্তে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও সে দুর্জয় মনুষ্যরক্ত-পিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। মানব-সমাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। হিংসা ও অস্ত্রের সাহায্যে মুক্তি ও শান্তির সন্ধান যাহারা করে তাহাদের পরিণাম এই মনুষ্যরক্তলোলুপ

হিংস্র ব্যাঘ্রের মতোই।

ভূয়োদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কতকগুলি শুষ্ক নিয়মকানুন দ্বারা প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। মানব-সমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ, অন্ততঃ তাঁহাদের পরিচালকগণ, বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন যে তাঁহাদের ধনসাম্যাত্মক ও সমানাধিকারমূলক মতবাদসমূহের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকা সঙ্গত এবং একমাত্র বেদান্তই এই ভিত্তি হইবার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন —কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ মঙ্গলস্থাপনের একটি মাত্র সূত্র বিদ্যমান, যে-সূত্র হইতে জানা যায় যে, 'আমি ও আমার ভাই এক'। তিনি বেদান্তের এই আত্মিক একত্বমূলক সাম্যকে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃত শান্তি তাঁহারাই প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, যাঁহাদের মধ্যে সর্বজনীন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয়-মন প্রকৃত নিঃস্বার্থ-পরতা, সেবা ও সৎসাহসে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। সেইসকল উন্নতচরিত্র ব্যক্তিগণই দেশ-বিদেশে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত (Cultural Ambassador) রূপে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া বেদান্তের গণতান্ত্রিক একাত্মতানুভূতিমূলক শাশ্বত বাণী প্রচার করিয়া সকলের হৃদয়ে শান্তির আকাজ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ। বস্তুতঃ যাঁহারা এই উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত, তাঁহারাই প্রকৃত শান্তি-সংস্থাপক ও মানবপ্রেমিক, অপরে নহে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—এই সমুন্নত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণই প্রত্যেক ধর্মের ও ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা মুসলমানদের মসজিদে বা খ্রীষ্টানদের গির্জায় যাইতে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করিবেন না, তাঁহারা বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করিতে বা হিন্দুর মন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতেও দ্বিধাবোধ করিবেন না। শুধু ইহাই নহে, বেদ বাইবেল কোরান আবেস্তা গ্রন্থসাহেব এবং এবংবিধ সর্বপ্রকার ধর্মগ্রন্থ হইতে প্রভূত জ্ঞানাহরণপূর্বক আমাদের সকলকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করিয়া প্রীতি, ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। এই উদারতাই বস্তুতঃ স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রকৃত নিদান।

যুগযুগান্তর হইতে ভারতের ঋষি-মুনি-কণ্ঠে যে-শান্তির বাণী উদ্গীত হইয়াছে, আজ আমরা বহু চিন্তাশীল রাজনীতিবিশারদগণের কণ্ঠেও প্রায়শঃ সেই মৈত্রীর বাণীই শুনিতে পাইতেছি। আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বর্গত প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের কণ্ঠেও পঞ্চশীলের কথা ও সহাবস্থানের বাণী শুনিতে পাইয়াছি। শান্তি-কামী মানব এখনও গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেই উদাত্ত গম্ভীর মর্মবাণী সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই-সকল দূরদর্শী মনীষিবর্গের নীতিবাক্য ও উপলব্ধ-সত্যসমূহ যদি আমরা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অনুশীলন করিয়া বাস্তবায়িত করিয়া তুলিতে পারি, তবে এই মানব-সভ্যতা সুনিশ্চিত ধ্বংসের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং বিশ্বে প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইবে। ইহাই জাতিপুঞ্জের প্রকৃত শান্তি-সনদ (Magna Carta of Peace)—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচিন্তা

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

আমরা বর্তমানে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ে বাস করছি। এই যুগে নানা যুগান্তকারী আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানের প্রতিটি ভাণ্ডারকে ক'রে তুলেছে স্ফীত। প্রতিদিনই আমরা নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। অজ্ঞানতার অন্ধকার ক্রমেই অপনোদিত হচ্ছে এবং বহু যুগের কুসংস্কার যে চিরন্তন সত্যের জ্ঞানসূর্যকে আবৃত ক'রে রেখেছিল তার মুক্তি হ'লো সত্য প্রকাশিত হ'লো। মহাকাশে যেখানে আমাদের দৃষ্টি হয়ে যায় অতি সীমিত, অথবা আমাদের দৃষ্টির খুব সামনে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তাদের প্রায় সবকিছুর সম্বন্ধে অনেক জানা হয়ে গেছে বিজ্ঞানের দৌলতে। প্রকৃতির নিয়মাবলী আরও ভালভাবে জানা হয়েছে, যেসব ধারণা কুসংস্কারের বাঁধনে জড়িয়ে ছিল তার মুক্তি ঘটেছে।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ বর্তমান—একথা দীর্ঘকাল ধ'রে প্রচারিত। অথচ সত্যিই তেমন বিরোধ বর্তমান নয় এবং ভবিষ্যতে উভয়ের সম্মিলন হবার সম্ভাবনা প্রবল—একথা দৃঢ়ভাবে বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিজ্ঞানী সত্যের অনুসন্ধানী। দর্শন এবং প্রকৃত ধর্মও তাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—ধর্মের উদ্দেশ্য যেমন 'একেকে' উপস্থিত হওয়া, তাকে উপলব্ধি করা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও তাই। বিজ্ঞানিপ্রবর আর্নেষ্ট হেকেল বলেছেন, 'খাঁটি বিজ্ঞানের প্রতিটি কার্যকলাপ হচ্ছে সত্যকে জানবার প্রচেষ্টা।' —Every effort of genuine science makes for a knowledge of Truth. বিজ্ঞান কুসংস্কারের তমিস্রা বিদীর্ণ ক'রে সত্য-সুন্দরকে প্রকাশিত করে। অধ্যাপক হাক্সলি বলেছেন, 'প্রকৃত বিজ্ঞান' মানুষকে ধর্মের ছদ্মবেশে আবৃত ভেজাল বিজ্ঞানের বোঝা থেকে বিমুক্ত করে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, বেদান্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মে, মেজাজে, উদ্দেশ্যগতভাবে এক। উভয়ই আধ্যাত্মিক অনুশাসন। এমন কি পার্থিব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে উভয় মতবাদের সাদৃশ্য বর্তমান।

লণ্ডনে থাকাকালে স্বামী বিবেকানন্দ অনেকদিন বিজ্ঞানের বিষয়ের অবতারণা করেছেন আশ্চর্যভাবে এবং তার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন বিজ্ঞানীর মতো। তিনি জানতেন পাশ্চাত্যখণ্ডে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অগ্রসর হতে হবে, বিজ্ঞানকে দূরে হটিয়ে দিয়ে প্রাচ্যের বক্তব্য পেশ করা সম্ভব হবে না। শুধু এজন্যেই নয়, আমার তো মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দই হলেন প্রথম সন্ন্যাসী যিনি ধর্মের বক্তব্যকে বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে আবর্জনা দূর ক'রে সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষাংশে যখন বিজ্ঞান ভারতবর্ষে তার পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ চিন্তাধারায় আধুনিক কালের মানুষ। লণ্ডনে থাকাকালীন একদিন তিনি বলেছিলেন: পৃথিবীতে আমরা মানুষ ও নানাধরনের জীব দেখতে পাচ্ছি এবং বহুবিধ জীবে এই পৃথিবী পরিপূর্ণ, এই পৃথিবী ছাড়া সৌরমণ্ডলে বহু খগোলমণ্ডল আছে। সবগুলিই এই সূর্য

থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কোনও-না-কোন প্রকার জীব এইসকল গ্রহে থাকা সম্ভব। পৃথিবীস্থ প্রাণীর সঙ্গে অপর গোলোকের জীবাদির সৌসাদৃশ্য বা মিল না থাকতে পারে,·· নিশ্চয়ই সেখানে কোনপ্রকার প্রাণী আছে যা আমরা আজ পর্যন্ত বিশেষভাবে অবগত নই।

১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চিন্তা করেছিলেন, আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরাও এর থেকে বেশি অগ্রসর হতে পারেননি বলেই আমার ধারণা।

পূজ্যপাদ ৺মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এক গ্রন্থে[১] লিখেছেন, 'স্বামীজী এই দিনে অনন্তস্থানের একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা বা জ্ঞান সকলকে দিয়াছিলেন। যখন তিনি নীহারিকা-তথ্যের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন তখন বোধ হইল, কি অসীম স্থান পড়িয়া রহিয়াছে যাহা আমরা কখনও উপলব্ধি করিতে পারি না! এই দিনে স্বামীজী পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। দার্শনিক ভাব বা ভক্তিভাব তখন তাঁহার আদৌ ছিল না। একজন মহাবৈজ্ঞানিক বা astronomer হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিষয়ে তাঁহার কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান ছিল—সেই রাত্রে তিনি তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়াছিলেন! অসীম ও অনন্ত-স্থানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তিনি করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃগণ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল।'

লণ্ডনে একদিন বক্তৃতাকালে স্বামীজী বলেছিলেন 'Life everywhere' অর্থাৎ প্রাণ সর্বত্র। ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেন, 'এই সূর্য থেকে পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, যা কিছু আমরা দেখতে পাই, বুঝতে পারি বা উপলব্ধি করতে পারি, সমস্তই প্রাণ বা জীবে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম যে-কোন বস্তু নিরীক্ষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার মধ্যে প্রাণ আছে! অণুমাত্র স্থানেও জীবন্ত শক্তি বা প্রাণ আছে! যেমন বীজ থেকে প্রাণ, পরে অবয়ববিশিষ্ট প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে। বায়ুতে প্রাণী বা জীবাণু পরিপূর্ণ রয়েছে। সূর্যরশ্মিও এমনি প্রাণে পূর্ণ। আকাশ বাতাস সর্বত্র প্রাণী আছে। বড়ো আকারের জীব যেমন পরিবর্ধিত ও সম্মিলিত, এইসব অণুপ্রাণী তেমনি না-ও হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে জীবন্ত শক্তি বর্তমান। এই রকম অণুপ্রাণী মিলে বড়ো আকারের প্রাণী উৎপন্ন হচ্ছে। সমস্ত সৌরমণ্ডল প্রাণীতে পরিপূর্ণ এবং খগোল থেকে এই অণুপ্রাণী বা সূক্ষ্মপ্রাণী অন্য খগোলে যাচ্ছে। সমস্ত সৌরমণ্ডল জীবন্ত ও প্রাণবিশিষ্ট। প্রাণহীন কোনও বস্তু হতে পারে না। আমাদের এই দেহকে কতগুলি চেতন জীবসমষ্টি বলা যেতে পারে। আবার তা বিশ্লেষিত হলে অন্য বস্তুতে সেই বীজসমূহ চলে যাচ্ছে। এই ভাবে বীজপরমাণুসমূহ সর্বত্র যাতায়াত করছে।'[২]

'Life everywhere' কথাটির তাৎপর্য যথেষ্ট। আপাত দৃষ্টিতে আমরা যাকে প্রাণহীন ব'লে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেখানেও প্রাণের সাড়া বিরাজিত। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু থেকে বিরাটকায় শরীরীর মধ্যে একই প্রাণের স্রোত ব'য়ে চলেছে, তার স্তব্ধতা নেই। অনাদি, অনন্ত কাল থেকে যে-প্রাণের সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত, তার তরঙ্গ-বিক্ষোভ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—সর্বত্র।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন একটা স্পন্দন এক স্থানে উঠলে ব্রহ্মাণ্ডময় তার গতি হয়।

---

১ লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩

২ ঐ—পৃঃ ১২

লণ্ডনে একদিন স্বামীজী বলেছিলেন, 'একটা wave বা ঢেউ যদি একস্থানে দেওয়া (তোলা) হয়, তাহা হইলে সেই ঢেউ বা স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডময় চলিবে। আমরা যদি নিভৃতে কোনও সৎ চিন্তা করি এবং সেই চিন্তা যদি প্রবলবেগ বা দৃঢ়ভাব ধারণ করে তবে সেই স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডময় চলিবে। এই স্পন্দনের উপরই সৃষ্টিটা চলিতেছে। রূপ ও অবয়ব এই স্পন্দনই সৃষ্টি করিতেছে এবং সমস্ত সৃষ্টিটা ইহাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এইজন্য একস্থানে স্পন্দন উপস্থিত হইলে সর্বত্র উহা চলিবে।'[৩]

কথাটি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক। আমরা বেতার-তরঙ্গের কথাই ধরি না কেন। বিশ্বের সুদূরতম কোণ থেকে যে-কথা উচ্চারিত হচ্ছে, আমার ঘরের রেডিও-যন্ত্রটি খুলে দিলেই তা বুঝতে পারি। সুদূর প্রান্ত থেকে যে স্বরগ্রামে কথা বলা হ'লো তা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, তারপর হ'লো চলমান। যে-কোন প্রান্ত থেকে সেই কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার বাড়িতে যদি রেডিও-গ্রাহক যন্ত্রটি না থাকে তাহলে কথা ধরা যাবে না। আমরা যখনই কোন চিন্তা করি সেই চিন্তা তরঙ্গাকারে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আমাদের সৎ বা অসৎ সব চিন্তাই সূক্ষ্মাকারে থেকে যায়, কোনটিই নষ্ট হয় না। যখন কোন মন সেই সৎ বা অসৎ চিন্তার সমস্তরে স্পন্দিত হয়, তখন সেগুলি সেই মনের উপর ক্রিয়াশীল হয়।

লণ্ডনে একদিন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামীজী একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক উপমা দিয়েছিলেন—'একটি ঢিল ছুঁড়লে (পথে বাধা না পেলে) তা আবার আগেকার জায়গাতে ফিরে আসে।' তিনি বলতেন প্রায়ই, 'যদি একটা উপলখণ্ড শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং লোকটি যদি জীবিত থাকিতে পারে, তবে তাহা পুনরায় তাহার হস্তে ফিরিয়া আসিবে। কারণ, motion বা গতি বর্তুলাকারে হইয়া থাকে। যদি পথিমধ্যে কোন প্রতিবন্ধক বা retardation না ঘটে, তাহা হইলে গতি বর্তুলাকারে প্রধাবিত হইয়া পুনরায় নিজ কেন্দ্রে প্রত্যাগমন করিবে। কারণ গতি কখনও straight line বা সরল-রেখায় হয় না।'[৪]

কথাটি একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে তা কতটা বৈজ্ঞানিক। সমস্ত গতিই বর্তুলভাবে চলছে। যে-পথকে আমরা সরলরেখা ব'লে চিহ্নিত করি, প্রকৃতপক্ষে তা বক্রপথের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। গতি যদি অনবরত স্পন্দিত হয় তবে বর্তুলের সৃষ্টি হয়। সৌরজগৎকেও বড়ো আকারের বর্তুল বলা যেতে পারে। যদি তার কেন্দ্রাভিগ গতি থাকে তাহলে পক্ষান্তরে কেন্দ্রাতিগ গতিও থাকবে এবং দুয়ে মিলে বর্তুলের সৃষ্টি। আলোক সরলরেখায় চলে অথচ সময়বিশেষে তার পথরেখা যে বেঁকে যায় তার প্রমাণ করেন মহাবিজ্ঞানী আইন-স্টাইন।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে এক বক্তৃতায় স্বামীজী যে কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা তার থেকে এগিয়ে যেতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। স্বামীজী বলেছেন, 'সৃষ্টিটা সমস্তই একটা undifferentiated mass of energy বা অবিভক্ত শক্তিরাশি। নূতন একটা বস্তু যদি সৃষ্টির বাহিরে তৈয়ারী করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টিমধ্যে উহা রাখিবার স্থান নাই। কারণ সৃষ্টিটা সর্বত্রই পরিপূর্ণ, বিচ্ছেদ বা ব্যবধান কুত্রাপি নাই।'

এই বক্তব্যের সঙ্গে স্থির-তত্ত্ব বা Steady

৩ ঐ—পৃঃ ১৩

৪ ঐ—১৭ পৃঃ,

State Theory-র বেশ মিল আছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে বিশ্ব অনন্তকাল ধরেই ছিল এবং থাকবেও। প্রাচীন নক্ষত্রসমূহ অন্তিমদশা প্রাপ্ত হলে তার স্থানে নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে এই মহাবিশ্বের আদি নেই, অন্ত নেই। আদিতে যে-সংখ্যক নক্ষত্র ছিল, এখনও তাই-ই আছে।

একদিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'The sumtotal of the Cosmic Energy is the same.'[৫] অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে শক্তি রয়েছে তার পরিমাণ সব সময়েই সমান। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কোন-এক অংশ ধ্বংস হলে, সেই শক্তি আর একটি অনুরূপ অংশ সৃষ্টি ক'রে দেয়। এতে বিশ্বশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি কিছু হলো না।

বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল মনে করেন যে, বিশ্ব বিস্তারশীল—একথা সত্যি। কিন্তু বিস্তারের ফলে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তর্নীহারিকার শূন্যতা বেড়ে যাচ্ছে, তা তিনি মানেন না। তিনি বলেন, নব নব সৃষ্টির ফলে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের ধাক্কাতে বিশ্ব বেড়ে চলেছে। যদিও নক্ষত্র এবং নীহারিকাগুলি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকা স্থান মুহূর্তে ভরতি ক'রে দিচ্ছে নতুন বস্তু এসে।

বেলজিয়মের বিজ্ঞানী Abbe Lemaitre বলেন যে, মহাকাশ কখনও গ্যালাক্সি-বর্জিত অবস্থায় থাকবে না। হয়তো দূরবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে অনেক গ্যালাক্সি দেখা যাবে না, কারণ তারা ক্রমে হটে যাচ্ছে। তাদের জায়গা দখল ক'রে নিচ্ছে নতুন ব্রহ্মাণ্ড। যে হারে বস্তু স'রে যাচ্ছে, ঠিক সেই হারে নতুন বস্তু তৈরী হচ্ছে। তবে এই হার খুব কম।

এই যে অনবরত বস্তুসৃষ্টি হচ্ছে তা আসবে কোথা থেকে? পদার্থ যদি শক্তির অভিব্যক্তি হয় তাহলে বিশ্বের মূল কি? এবং মধ্যেকার পরমাণু, ইলেকট্রন ইত্যাদির নাম করা কেন? কেবলমাত্র শক্তিকেই তো বিশ্বের মূল উপাদান বলা চলে। এই ব্রহ্মাণ্ড যত বিরাট হোক, যত কল্পনাতীত হোক, তার মূলে মাত্র একটি কথা—শক্তি। পদার্থ শক্তির রূপান্তরিত অবস্থামাত্র। আবার পদার্থের ধ্বংসে শক্তির উৎপত্তি। শক্তির হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই, তা অবিনশ্বর। প্রশ্ন জাগে—শক্তির উৎস কোথায়, কত দূরে? এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তরে বিজ্ঞানী স্যাপলে বলেছেন:[৬]

'...With bold advances in Cosmogony we may in future hear less of a creator and more of such things as 'antimatter,' 'minor world', and 'closed space-time.' Finality, however, may always elude us. That the whole universe evolves, or from where, or where to—the answers to these questions may be among the unknowable.'

স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যের সন্ধান দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু-নিচয় বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে বস্তু-কণিকা, এই শক্তির (energy) উৎসের কথা বেদান্তে রয়েছে। ব্যক্ত-অব্যক্তের মাঝামাঝি 'হিরণ্যগর্ভ' কি না কে জানে। বিজ্ঞান আর অগ্রসর হতে পারে না। বিশ্রুত বিজ্ঞানী

---

৫ ঐ—পৃঃ ২৪;

৬ Harrow Shapley: On the Evidence of Inorganic Evolution

৺ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের কথায়[৭], 'The scientist has come to a stage beyond which he cannot proceed...Boundaries of knowledge appear to have been reached which cannot be crossed. ...The situation has made the scientist face questions which belong to the realm of metaphysics and philosophy.

বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোক-কণা যেমন দূর করে অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার, ঠিক তেমনি ধর্মচেতনার আলোকতরঙ্গ স্পর্শে অপসারিত হয় অজ্ঞানতার কুজ্ঝটি। বিজ্ঞানের বাস্তব সন্ধান এবং ধর্মের সত্যানুসন্ধান যে পরস্পর-বিরোধী নয়, একটি সত্য ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্র দিয়ে গ্রথিত—এই পরমবোধ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সংস্কারমুক্ত চিত্তে অনুভব করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছেন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক রমণীয়। জড়বিজ্ঞান চিন্তাজগতের যে প্রান্তে পৌঁছে খেই হারিয়ে ফেলছে, ধর্মবিজ্ঞানের অনুভূতি উপলব্ধি সেই অসমাপ্ত পথরেখাকে নিয়ে গেছে সুদূরে, মিলিত করছে জ্ঞানের এক পরম জ্যোতির্লোকে। শেষেরটি প্রথমের পরিপূরক, পরিপন্থী নয়। এই জ্যোতির্ময়ী চেতনার রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিলেন সত্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ।

[৭] Presidential address at the Silver Jubilee Session of National Institute of Science, Delhi, 1960

'মামেকং শরণং ব্রজ'

শ্রীগুরুদাস দাশ

গভীর শান্তির মাঝে কর্মে যাঁর অভাবিত প্রবণতা হেরি
কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে, অনাসক্ত দয়াল যে পুরুষ মহান্
জীবন-মৃত্যুর যত সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান করি'
শুনালো মুক্তির বাণী—'ধর্মাধর্ম ছাড়ি' লহ আমার শরণ!'

আপন অন্তরে হের, হে মানব, জ্ঞাননেত্রে দৃষ্টিপাত করি'
পশু-ও দেবতামনে অহরহ কুরুক্ষেত্র—সংগ্রাম ভীষণ!
গভীরে তাকাও আরও—করুণার পারাবার সেথা সে সারথি
শুনায় অমৃতবাণী—'প্রণমি' শরণ লও নিখিল-শরণ।'

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিজ্ঞানভিক্ষু

৪

উপদেশ

মন ও সংযম

"সমগ্র জগতের জন্য সচ্চিন্তাধারা প্রবাহিত করবে। সকলকার মঙ্গল হোক, এটি রোজ প্রার্থনা করা উচিত।" "সকলের মঙ্গল হোক, জগতের মঙ্গল হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল হোক—এ শুভেচ্ছা সদাসর্বদা রেখো।"

"যেমন চিন্তা তেমনি কর্ম হয়ে থাকে। প্রেমপূর্ণ চিন্তা যেমন আত্মবিকাশের সহায়ক, তেমনি রাগদ্বেষপূর্ণ চিন্তা আত্মসঙ্কোচনের কারণ।"

"ভগবানকে জানা ও বোঝা অন্তর শুদ্ধ না হলে হয় না। খুব সাবধানে থাকতে হয়। একটা খারাপ ভাব মনে এলে তাতে শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত হয়ে যায়।"

"কখনো কুচিন্তা কোরো না। কুচিন্তা এলে কাতর প্রাণে ঠাকুরের নাম জপ করবে। দেখবে সব কুচিন্তা পালিয়ে যাবে।"

"কামক্রোধাদি দমন না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যেতেই পারে না। কর্তব্য হচ্ছে, সৎ জীবন যাপন কর, পবিত্র জীবন যাপন কর, স্বার্থহীন জীবন যাপন কর এবং সর্বোপরি সেবকের জীবন যাপন কর।…সেবা করবে কিন্তু প্রতিদানে কোন আশা রেখো না। নিজ ধর্মে আস্থাসম্পন্ন, পরধর্মে বিদ্বেষহীন আর সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে যে-কোন অবস্থাতেই থাক না কেন, মা ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।" "রিপুদমন করতে হবে আর দৃঢ় বিশ্বাস করতে হবে যে ভগবান সর্বত্র ওতপ্রোত আছেন। ওহে, ভগবান যে অহরহ আমাদের ভিতরে ও বাইরে থেকে বলছেন—ভয় কি? ওরে, তোরা আমায় ছেড়ে যাবি কোথায়? খানিক খেলতে ইচ্ছে হয়েছে, খেলে নে; তারপর হৃদয়মধ্যেই আমাকে পাবি। যে মুহূর্তে রিপু বশীভূত হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তেই আমাকে পাবি—জাজ্বল্যমান আনন্দময় পুরুষ রূপে ভিতরেই পাবি।" "তিনি তো কাছেই আছেন, তিনি তো প্রকাশ হয়ে আছেনই। আমরা স্ব-ইচ্ছায় তাঁকে দেখছি না। রিপুর বশবর্তী হয়ে থাকলে তাঁকে কি করে দেখা যাবে?"

"যে যত পবিত্র হবে, ঠাকুর তার কাছে তত বেশী প্রকাশিত হবেন।"

"মার কাছে চিত্তশোধনের জন্য প্রার্থনা করবে। তিনি সব ঠিক করে দেবেন।… মনকে পবিত্র কর, ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে। মন যখনই পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই ভূমানন্দের আস্বাদ পাবে। সে-আনন্দের তুলনা নেই। এই পার্থিব সুখ সেই জমাটবাঁধা আনন্দের পাহাড়ের কাছে একটা কণার তুল্য। সে সুখ একবার যে পেয়েছে, সে কি আর জাগতিক সুখে ভোলে? যে ইন্দ্রিয়সংযম করেছে তার হয়ে যাবে। সে নিজেই টের পাবে যে, ভগবানের দিকে এগিয়ে চলেছে।"

"স্বাধীন সেই, যে ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করেছে। পরাধীন সে, যে ইন্দ্রিয়ের দাস।" "যার নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়েছে, সে যথার্থই

মৃত। এ মৃত্যুর তুলনায় দেহের মৃত্যু কিছুই নয়। যে নৈতিকচরিত্রভ্রষ্ট তার এ জীবনের কর্মফল জন্ম-জন্মান্তরে সঙ্গে যাবে।"

"সবাই বলে মন স্থির হয় না, মন স্থির হয় না। কেন? 'প্রবেশ নিষেধ' লিখে দাও না! দুশ্চিন্তাগুলিকে মনে আসতে না দিলেই হল।"

"মন যখন কুচিন্তা দ্বারা অধিকৃত হয়, তখন ইঁদুরের বেড়ালের মুখে পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ধারা হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়। তা কেন হতে দেবে? সে সময় সিংহবিক্রম প্রকাশ করে কুচিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবে, তবে তো!" "আপনার মন আপনার বশে থাকবে না, একি একটা কথা হল? মনকে আপনার ওপরে উঠতে দেবেন কেন?" "ঈশ্বর এই মনের গঠন এমনই করেছেন যে, সে তোমাকে মেনে চলবেই। মন স্বভাবতঃ যদি অবাধ্য হত, তাহলে আমরা কোন কাজের জন্য দায়ী হতাম না। তাহলে মানুষ স্বাধীনও হত না আর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীও হত না। তুমি তোমার মনের সম্পূর্ণ প্রভু। তুমি যেমনভাবে ইচ্ছা তাকে গড়ে পিটে নিতে পার। মন যখন আমাদের মুঠোর ভেতর, তখন সচ্চিন্তা ছাড়া আর কোন খাদ্য তাকে দেওয়া হবে না। (শরীরের পুষ্টির জন্য যেমন আমরা কুখাদ্য পরিহার করে তাকে পুষ্টিকর খাদ্য দিই) তেমনি মনকে পবিত্র চিন্তা সদ্‌বুদ্ধি ও সদালোচনার দ্বারা পুষ্ট করতে হবে— অখাদ্যরূপ কুচিন্তা বা কুসঙ্গ মনকে দেওয়া হবে না।" "মনকে ঠারে ঠোরে বোঝালে সে তো নিজেকে নিজেই ঠকানো হয়।"

"মনের কর্তা তুমিই। মনকে পবিত্র রাখ।"

"মনকে সর্বক্ষণ শ্রীভগবানে নিবিষ্ট রাখাই মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে আমরা যেন তাঁকে স্মরণ রাখি।"

"হৃদয়ের কাজ হচ্ছে ভালবাসা আর মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে বিচার—সদসৎবিচার। এই প্রেম ও বিচারকে এক করতে হবে। ভগবানলাভের জন্য দুটিই চাই।"

"মনটা ভয়ানক পাজী। যতক্ষণ না একটা কঠোর আঘাত লাগে ততক্ষণ ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকে না। ঘা খেলে তখন ঠিক ভগবন্মুখী হয়।"

"বিষয় থেকে মনকে পৃথক করতে পারলেই সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন হয়। বিষয়ই জীবকে ভগবান থেকে বিমুখ করে সংসারের দাবানলে, বাড়বানলে পুড়িয়ে মারছে।" "যখনই মনটা সংসার ও বিষয় থেকে আলাদা হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র হয়, তখনই সেই মনে ভগবজ্জ্যোতি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। যার এই প্রকার ভগবদ্দর্শন হয়, তার কাছে জগৎ-সংসার অন্তর্হিত হয়ে যায়। আমাদের মন সংসার ও বিষয়ের গণ্ডি দ্বারা অবরুদ্ধ রয়েছে বলেই আমরা ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"মন যখন higher law-এর (উচ্চতর নিয়ম স্বতঃ সত্যের) সঙ্গে vibrate করে (স্পন্দিত হয়), তখন ভ্রূমধ্যে ইষ্টের বা চিন্ময় দেবদেবীর দর্শন হয়।"

"মহাপুরুষগণ নিম্নভূমি থেকে উচ্চভূমিতে— সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে—যাবার জন্য আমাদের সাহায্য করেন। আর এইভাবেই আমরা ভবসাগর থেকে জ্যোতিঃসাগরে যাবার প্রেরণা পাই। এ তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, মন আপনা-আপনি ঐ দিকে উঠে পড়ে। এ জাগতিক জিনিস দেখে মন তাতেই আকৃষ্ট আছে, স্থূল জড় পদার্থের আকর্ষণের জন্য। আবার যখন উচ্চভূমির জিনিসের দিকে, আলোকের দিকে আকর্ষণ হবে তখন সেই মনই আবার উপরে উঠতে চাইবে। জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডই

তখন ধীরে ধীরে তার কাছে অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

"ধ্যানে মনকে উর্ধ্বে তুলে নিতে হয়—বাহ্যেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এইভাবে পরে পরে মনকে নিয়ে লয় করতে হবে আত্মবস্তুতে।"

"মানুষের চিন্তাশক্তির কেন্দ্র হচ্ছে মন, ইন্দ্রিয়গুলি যেন মনের চাকর। দেখা শোনা বোঝা ইত্যাদি সব মনের দ্বারাই হয়ে থাকে।... যে মন যত শুদ্ধ সে মন অন্যের চিন্তাধারা তত ধরতে পারে। বেতারবার্তা ধরার যেমন ব্যবস্থা ঠিক তেমনি। একটি মনে কোন চিন্তা হলে অমনি সে চিন্তা একটা স্পন্দনের সৃষ্টি করে। যে মন ভাল receiver (গ্রাহক-যন্ত্র) সে মনে ঐ চিন্তা-স্পন্দন তখনই স্পন্দিত হয়, সে তা ধরতে পারে ও বুঝতে পারে। কেবলমাত্র দরকার মন শুদ্ধ হওয়া।" "কাম ক্রোধ এসব রিপু দমন করতে হলে ঠাকুরকে স্মরণ করতে হয়, মাকে স্মরণ করতে হয়। তাহলেই মন থেকে ওসব হীন ভাব চলে যায়।" "ইষ্টমন্ত্র জপ করলে (চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি) সব হবে, সব হবে।"

"অন্তরে বাহিরে তিনিই। তাঁর দর্শন ভিতরে হলেই রিপুদমন হয়।" "তাঁর দর্শন ঠিক ঠিক হলেই রিপুদমন হয়। খুব নাম কর দাদা, কিছু ভয় নেই।"

সত্য, বিশ্বাস

"সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করতে হলে সম্পূর্ণরূপে সত্য কথা বলতে হবে, সত্য আচরণ করতে হবে।" "সত্য পথে থেকো, আর কারো অনিষ্ট কোরো না। তাহলে ভগবান কোলে টেনে নেবেন।" "সত্যকে আঁকড়ে ধরতে হয়—একেবারে ঠিক ঠিক ধরা। মন আর মুখ এক হবে। মুখে যা বলা, কাজেও তাই করা।" "মন মুখ এক করতে না পারলে তাঁকে পাওয়া যায় না। মন মুখ এক করতে পারে তিন জন—ছেলে, পাগল আর ব্রহ্মজ্ঞানী।"

"ভগবানের কথা বেশী শুনে কি হবে? মনোমত দু-একটি কথা শুনে সাধনে লেগে পড়।" "গাদা গাদা শুনবো অথচ কোনটিই পালন করব না, এতে কোন ফল হয় না। যেটুকু শুনবে তাই জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা চাই।"

"খুব বিশ্বাস চাই, ভরসা চাই, ধৈর্য চাই। ক্রমে সব হয়ে যাবে।" "বিশ্বাসের খেই ধরে থাকতে হবে।" "জগতে এমন কোন লোক নেই যার বিশ্বাস আদৌ নেই। বিশ্বাস ছাড়া আপনি একটি নিঃশ্বাসও নিতে পারেন না।"

"বিশ্বাসই ধর্মজীবনের ভিত্তি।" "তর্ক বেশী করা ভাল নয়। এইটুকুন তো মস্তিষ্ক!... চাই বিশ্বাস, অনন্ত বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাস আনার জন্য একটু-আধটু সৎ তর্ক করতে পারেন। কিন্তু বেশী নয়।" "বিশ্বাস চাই, নইলে শুধু তর্ক করতে গেলে গুলিয়ে যায়, পাক ওঠে। কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকদের অবস্থাই দেখুন না কেন! শেষকালটায় তাঁরা বললেন, 'ঈশ্বর আছেন কি না তা ঠিক জানা যায় না। তবে সৃষ্টিরহস্যের পশ্চাতে এমন একটা কিছু আছে, যার অবস্থিতিতে সব এমন সুশৃঙ্খলায় চলছে।' ওতে কি হল? ভগবানের সঙ্গে যে কথা বলা যায়, তাঁকে যে দর্শন স্পর্শন করা যায়! এসব কি তাঁদের আছে? তবে আর কি দার্শনিক বিচার? এসব দর্শনশাস্ত্র পড়ে লাভ কি?" "বই-পড়া বিদ্যা দ্বারা কাজ হয় না—বস্তুলাভ অসম্ভব। শুধু চাই বিশ্বাস।"

"প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা ছিলেন

ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। সত্যকে উপলব্ধি করে সকলের কাছে সত্যলাভের পথ উন্মোচন করে গেছেন। ঋষিরা যা বলেছেন তার পিছনে ছিল তাঁদের অলৌকিক জীবন। ধর্ম জিনিসটা বিচার- বা পাণ্ডিত্যমূলক নয়, তা হল অনুভূতিমূলক। কাণ্ট তো অত বড় দার্শনিক, অথচ বলেছেন বিয়ে না করে থাকা যায় না।" "ঋষিরা যা বলেছেন, সবই অনুভূতির উপর স্থাপিত, তথাকথিত অর্থে নয়।"

"পবিত্রতা, সত্যপরায়ণতা ও সততার ওপর জীবন গঠন করবে। আর চাই বিশ্বাস। এই ধরে থাকলে মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার তৃপ্তি থাকবে। এই হল ধর্ম-জীবনের লক্ষণ—সর্বাবস্থায় তৃপ্তি।"

জপ, ধ্যান, প্রার্থনা

ধর্মপিপাসুর পক্ষে দীক্ষা কি একান্ত প্রয়োজন?—এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলেন, "হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে।" কিন্তু দীক্ষা নিয়ে যদি কেউ ঠিকমত কাজ না করে?—"একজন জিনিসটি নিলে। ব্যবহার করে না, কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো ব্যবহার করতে পারে। অপরজন ইচ্ছে হলেও জিনিসটি নেই বলে ব্যবহার করতে পারবে না।"

"বীজমন্ত্রের শক্তি অমোঘ। হ্রীং, শ্রীং, ক্রীং প্রভৃতি বীজের সত্যিই বিশেষ শক্তি আছে।"

"ঠাকুর ও মা-র নাম জপ করলে তাতে স্বামীজী, রাখাল মহারাজ প্রভৃতি সকলের নাম জপ করা হয়ে গেল।"

"তাঁর নাম কর, তাতেই আত্মার শান্তি।"

"জপ করা মানে তাঁর নাম উচ্চারণ করা। তা মনের অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, তুমি নিয়মিত জপ করে যাবে। মনে করে নিও তুমি মন থেকে আলাদা। মনে আনন্দ বা দুঃখ যে ভাবই আসুক না, তুমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। নিজের কাজ ঠিক করে যাবে।"

"জপ করার জন্য যেরকম ইচ্ছা বসতে পার। আসনপিঁড়ি হয়ে, পা ঝুলিয়ে, চেয়ারে বা যে-কোন রকমে বসলেই হবে।"

"যখন খুশি জপ করতে পার। সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলে।…তবে রাত্রে একলা ঘরে নিশ্চিন্ত মনে জপ করলে খুব শীঘ্র আনন্দ পাবে।" "সময়ের জন্য ভাবনা কি? রাস্তায় চলতে চলতেও জপ-ধ্যান করা যেতে পারে। তাঁর স্মরণ-মনন নিয়ে কথা। সর্বদা তাঁর দিকে যাতে মনটি পড়ে থাকে তার জন্য চেষ্টা করা উচিত।"

"সংসারে সব কাজ করতে হবে, কিন্তু মনটি রাখতে হবে সর্বক্ষণ ভগবানের দিকে। চেষ্টা করতে হবে যাতে সর্বদা প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর নাম করা হয়।" "এরূপ করতে পারলে তখন আর কর-জপ বা মালা-জপের প্রয়োজন হয় না। এভাবে সর্বক্ষণ জপ করার চেষ্টা করা উচিত।"

"প্রত্যহ নিয়মিতভাবে জপ-ধ্যান করার অভ্যাস বিশেষ দরকার। তাহলে ক্রমে মন স্থির হয়ে আসে।" "মন নিবিষ্ট না হলেও নিয়মিত-ভাবে সকাল-সন্ধ্যা জপ করে যাবে। ধ্যান ঠিক ঠিক না হলেও জপ ধ্যান কখনো ছাড়তে নেই। নিরাশ হবারও কোন কারণ নেই, ক্রমে সব হবে। মন সব সময় স্থির হয় না সত্য, কিন্তু কখনো কখনো স্থির হয়ও তো? পনেরো মিনিটের মধ্যে এক মিনিটও তো মন স্থির হয়? তাতেই হবে। ধ্যান হোক আর নাই হোক, ধ্যানের চেষ্টা ছেড়ো না। জপ ধ্যানে পরিণত হয়, ধ্যান সমাধিতে। গভীর ধ্যানেই দিব্য দর্শনাদি হয়।" "বেলুড় মঠে তিনচার দিন নিরিবিলিতে এবং একান্তে বসে জপ করলে অলৌকিক অনুভূতি হয়।"

"এই তিন স্থানেই ধ্যান প্রশস্ত—হৃদয়ে, ভ্রূমধ্যে আর সহস্রারে। ঠাকুর বলতেন, হৃদয়ই ডঙ্কামারা জায়গা।" "হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ধ্যান বিধেয়। আরে বাপু, কতই বা অন্তরতম প্রদেশে যাবে? ঠাকুর বলেছেন, 'আমার এই ছবিতে ধ্যান করবি, তাহলেই হবে।'"

"ধ্যানের প্রকৃষ্ট সময় গভীর রাত্রি। শীঘ্র শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। তখন প্রকৃতি নিস্তব্ধ থাকে, মন সহজেই স্থির হয়ে আসে।"

"খুব বিশ্বাস চাই, ধৈর্য চাই, ভরসা চাই। ক্রমে সব হয়ে যাবে।···তাঁর নাম জপ করে যাও, শান্তি পাবে।"

"শ্রীভগবানকে ভাবতে ভাবতে তন্ময় ও উন্মত্ত হতে হবে। ঈশ্বরই প্রাণের উৎস। যাঁরা মহামানব, তাঁরা সকলেই ঐ অমৃতের উৎসে অবগাহন করেছেন। তাঁর সঙ্গে সর্বতোভাবে এক না হলে সাধক বড হয় না। ···রাত্রে উঠে ধ্যান করবে।···তাঁকে এমনি কাতর প্রাণে ডাকবে, যেন ওপারে যাবার ডাক এসেছে, আর তাঁর সাক্ষাৎকার হচ্ছে।"

"ত্রিসন্ধ্যা মাকে ডাকবে—মা, বুদ্ধি দাও, যে-বুদ্ধি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় তাই আমাদের দাও। গায়ত্রী-ধ্যানে যেমনটি আছে, তেমনিভাবে প্রার্থনা করবে।"

"আমি যে মন্ত্রটি তোমায় দিয়েছি, সেটি জপ করলেই তোমার জগৎরূপ স্বপ্নটি ভেঙ্গে যাবে।" "মূর্তিদর্শন? তা মন একটু স্থির হলেই হবে। আরো এগিয়ে যেতে হবে। জ্যোতিঃসমুদ্রে আনন্দ করতে হবে"

বাসনা, ত্যাগ

"দেখ, ভগবান সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান। তাঁর অদেয় কিছুই নেই। লোকে যা চায়, তিনি যেন ভৃত্যের মতো তা যোগাড় করে দেন। সেইজন্যই তাঁর কাছে কিছু চাইতে নেই। তিনি স্বেচ্ছায় যা দেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।"

"ভগবানের কাছে টাকাকড়ি তুচ্ছ জিনিস কি চাইবে? তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে যেন তিনি তোমায় পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হওয়ার জন্য, সত্যলাভের জন্য শক্তি দেন।"

"বাসনাই যত অনিষ্টের মূল।" "বাসনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সন্তোষধন পাওয়া যায় না। বাসনার নাশ হলে তবে নিস্তার।"

"মৃত্যুর পর মানুষের ভোগবাসনা সূক্ষ্মভাবে থাকে। মৃত্যুকালে স্থূল দেহটারই কেবল নাশ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি, মনবুদ্ধি সবই থাকে সূক্ষ্মভাবে। তখন ভোগ আরও তীব্রভাবে হয়ে থাকে। সূক্ষ্মের পর কারণ-অবস্থায়ও মন প্রভৃতি বীজাকারে থাকে। তুরীয় অবস্থায় পৌছুলেই পূর্ণ জ্ঞান হয়। সেজন্য কেবলমাত্র শারীরিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখলে হবে না, চাই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।"

"বাসনা থেকেই পুনর্জন্ম হয়। সমস্ত বাসনাকে যদি একেবারে বিসর্জন দেওয়া যায়, তাহলে আর জন্ম হয় না। দেখুন না, কোন জিনিসকে ধরে আমি জোরে ধাক্কা দিয়ে চালিয়ে দিলাম—ধাক্কার সেই বেগ যতক্ষণ থাকবে, জিনিসটা চলতে থাকবে। তাতে যদি আবার ধাক্কা না দেওয়া হয়, তাহলে ঐ গতিবেগ কোন-না-কোন সময় বন্ধ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আমরা জন্মে জন্মে নতুন impetus (বেগ) দিয়ে থাকি—তাই জন্মান্তর চলতে থাকে। কিন্তু তা যদি বন্ধ করি, অর্থাৎ বাসনার পারে চলে যাই, তাহলে আর পুনর্জন্ম হবে না।"

"ত্যাগ না করলে ধর্মজীবনে কিছুই হবার

আশা নেই।" সব কিছু ত্যাগ করার চেষ্টা করতে হয়।"

"যদি ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে আমাদের মস্তকে শান্তিবারি বর্ষণ করতে চান, তথাপি আমরা তাঁকে বরণ করে নিতে পারবো না—তাঁর আশীর্বাদ মাথা পেতে নেবো না। কারণ তিনি আসেন ত্যাগের মূর্ত বিগ্রহরূপে—তিনি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেন জগতের সমস্ত বিভব—আমাদের বলতে যা কিছু সংসারে আছে, সব কিছু। কিন্তু ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেই প্রস্তুত। কারণ ঈশ্বর-প্রদত্ত অনন্ত বৈভব অপেক্ষা আমরা বেশী ভালবাসি জাগতিক ধনসম্পদকে।"

"ত্যাগের মতো জিনিস নাই।"

কর্ম, দেশসেবা

"সকলকে আমার এটুকু বলার আছে যে, অলস হইও না। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।' খুব মন দিয়ে সব কাজ করতে হয়।"

"সব সময় কাজ করতে হয়। কিন্তু ফলের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখতে নেই; কর্তব্যজ্ঞানে কাজ করে যাওয়া।...এই যে বসে আছ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, এও কাজ। এর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম করতে পারলে আরো বড় কাজ হয়।"

"আমাদের সব কর্মই জ্ঞানালোক বা ভগবান বা পরমহংস-অবস্থা লাভ করার জন্য। সে প্রচেষ্টা কর্মের ভেতর দিয়েই হোক অথবা সাধন-ভজনের দ্বারা হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য জ্ঞানানন্দ লাভ করা।"

"এ দুনিয়া কি বসে থাকবার জন্য? এখানে কুঁড়েমি করলে চলবে কেন? যখন তুমি নিঃস্বার্থভাবে কর্মরত হবে, তখনই প্রকৃত বিশ্রামসুখ অনুভব করবে। বীরের মতো কাজ করে যাও।"

"পাশ্চাত্য জাতিরা সময়ের ঠিক ঠিক ব্যবহার করছে বলে তারা জগতে বলীয়ান হয়েছে। তোমরাও যদি সময়ের ঠিক ঠিক ব্যবহার কর তো তোমরাও অনেক কাজ করতে পারবে; শ্রীভগবান পিছনে আছেন—তাঁকে সদাসর্বদা স্মরণ করে কাজ করবে। প্রত্যেক কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, এটি ভুললে চলবে না।"

"নিজের কাজ নিজেই করতে হবে।

"দৈব ও পুরুষকার দুই-ই আছে।... পাশ্চাত্যজাতীয়রা যাকে দৈব বলেছে, আমরা সেখানে মানি কর্মফল। কালের স্রোত বয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে কেন? তোমাকে নদী পার হতে হবে। স্রোতের সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করে সাঁতার দিলে তবে তো পার হয়ে যাবে! হাল ছাড়তে নেই বা হতাশ হতে নেই। অধ্যবসায় না থাকলে কোন বড় কাজ হয় না। ভগবানলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য—এত বড় কাজ কি সহজেই হয়? অলসতা আর কপটতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেবে না। হয়তো পারের কাছেই এসে পড়েছ, কিন্তু তখনো যদি সাঁতার না দাও তোমাকে আবার স্রোতে টেনে নিয়ে যাবে আর নদীর গর্ভে ডুবিয়ে দেবে। নিজের সাধ্যমতন চেষ্টা করলে ভগবান দশগুণ শতগুণ অনন্তগুণ অধিক শক্তি দেবেন; তখন ডাঙা পেয়ে যাবে।...ব্যক্তিগত জীবনে যা, জাতিগত জীবনেও তাই।"

"জগতে কত রাজত্বই না কালের গর্ভে

বিলীন হয়ে গেছে! আমাদের দেশেরও ঐ দশা হবে যদি না দেশবাসী নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী দেশের সেবায় লাগে। দেশ তো আর ব্যক্তিবিশেষের নয়, দেশ হল সমগ্র দেশবাসীর। যে যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন, দেশমাতৃকার সেবা, জনসাধারণের সেবা ও সর্বোপরি ভগবৎ-সেবা সকলেই অল্পবিস্তর করতে পারে। সকলের মঙ্গল হোক, জগতের মঙ্গল হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল হোক —এ শুভেচ্ছা সদা-সর্বদা রেখো।"

"কর্মী হতে গেলে খাঁটি ও সৎ হওয়া চাই। অপরের দোষ দেখবে না, বরং নিজেরই দোষের দিকে দৃষ্টি রাখবে।" "মানুষ নিজের দুর্বলতা দেখতে পায় না, দেখতে চায়ও না। নিজের অন্যায় আচরণের সপক্ষে অনেক বৃথা যুক্তি প্রয়োগ করে।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কানপুর কংগ্রেস দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন, 'কংগ্রেস কি এতই প্রয়োজনীয় ব্যাপার যে দেখতে যেতেই হবে?' উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলেন, "যেখানে কোন সৎ কাজের জন্য এত লোকসমাগম হয়, সেখানে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পূজা হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করাও ঈশ্বরের পূজা বলে জানবে।…একতাতেই ভগবানের শক্তির বিকাশ হয়।…আমাদের উন্নতি প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ভারত-সন্তানকেই নেতা হবার উপযুক্ত হতে হবে—অর্থাৎ চরিত্রবান, স্বার্থত্যাগী, পবিত্রাত্মা, উদারচেতা; আর ভালবাসতে হবে দেশের লোকদের। দশের যাতে ভাল হয় সেরকম কাজ যাতে প্রত্যেকে করতে পারি তার জন্য যত্নবান হতে হবে। আত্মসংযমী হয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে হয়; তিনিই কাজের শক্তি দেবেন।…ওদেশে যেমন যীশুখৃষ্টের কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তাঁকে সত্যের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল, তেমনি এদেশেও আমাদেরও হতে হবে—তবেই ভারত আবার উঠবে। ভারতের গৌরব-সূর্য আবার উদিত হবে।"

"স্বার্থপরতা সমগ্র জাতিকে যেন অভিভূত করে ফেলেছে। আবার স্বার্থপরতা যদি না থাকে তো সংসার চলেও না।…ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যে জীবন, সে তো মৃত্যুতুল্য। আর যে মৃত্যুর দ্বারা বহুর কল্যাণ হয়, তা-ই প্রকৃত জীবন। নিজের শরীর ও পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করে যে স্বার্থপরতা গড়ে ওঠে তাতে জগতের কোন কল্যাণ হয় না। যে যত মহান, তাঁর অহং তত বিরাট।" "ত্যাগশীল হতে হবে। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা একটু কমাতে হবে। যত বিবাদ মারামারি ছিনাছিনি—এই ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা নিয়ে। দৃষ্টিকে প্রসারিত কর—সকলের ভিতর সেই পরমপিতার প্রকাশ দেখবার চেষ্টা কর।"

"আপনারা জাগতিক নানা আন্দোলন ও ঘটনাপ্রবাহের ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেন কেন?… স্বাধীনতালাভ যদি হয়েই যায় তাহলেই কি সব শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই তা হবে না। বহির্জগতের সংগ্রাম আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করে না, পরন্তু জাগতিক বিষয়ের প্রতি আমাদের অত্যধিক আসক্তি এবং ঐগুলি পাবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে মানসিক চাঞ্চল্য। …আপনারা রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলছিলেন? তা মহাত্মা গান্ধীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন তো! তিনি তো সংগ্রামের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনি কি বলতে চান যে, এত বহুবিধ বাহ্যিক সংগ্রামের মধ্যে থেকেও তিনি মানসিক প্রশান্তি-লাভের সাধনা বা ভগবানের স্মরণ-মনন করেন না? প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামের ভেতরও মানসিক

সাম্যরক্ষার সাধনা করুন। জগতে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের এ একমাত্র উপায়। গান্ধীজীর জীবনের এ ভাবটি সম্যক্‌রূপে বোঝা উচিত।"

"প্রকৃত শান্তিলাভ করতে হলে ত্যাগ চাই, আত্মসংশোধন চাই, এই হল সনাতন সত্য। তা আধ্যাত্মিক জীবনেই বলুন বা রাজনৈতিক জীবনেই বলুন—স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত না থাকলে কোন কার্যেই সফলতা আশা করা সুদূরপরাহত। বাস্তবিকপক্ষে এই বিরাট জগৎ স্বার্থত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

"স্বোপার্জিত ধনের কিছু অংশ জগতের হিতের জন্য দেওয়া সকলেরই অবশ্যকর্তব্য, কারণ এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। তুমি যা দেবে, তাই ফিরে পাবে।"

"বুদ্ধিমান লোক বলেন—তোমার কর্ম তোমাতেই থাক। আমি অকর্তা মাত্র—যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে কাজ করছি।"

"তাঁর কাজ তিনিই করবেন। আমরা কি কারো উপকার করতে পারি?" (ক্রমশঃ)

আমার কৃষ্ণ

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং—কৃষ্ণচন্দ্র নিজে ভগবান্"
এ বাণী প্রচার ক'রে হে ঋষি, হে শুদ্ধ মতিমান্,
আমার কৃষ্ণকে তুমি পাঠাইয়া দিলে নির্বাসনে
মানুষের কাছ হতে বৈকুণ্ঠের সুদূর কাননে?
মানুষ কৃষ্ণেরে আমি সকাতরে ডাকি তাই আজ,
নিপীড়িত মানবতা চায় তাঁরে। স্বদেশ, সমাজ,—
সর্বসাধারণ তাঁর আদর্শ ও সহানুভূতির
আশ্রয় প্রার্থনা করে, যুক্তপাণি নম্র নতশির।
প্রপন্নের পারিজাত, দীনার্তের একান্ত আত্মীয়,
দাম্ভিকের দর্পহারী, অসত্যের ত্রাস, সত্যপ্রিয়,
সুবিশাল জ্ঞানমূর্তি, পৌরুষের জলন্ত প্রতীক,
দেবত্ব হতেও যাঁর নরত্বের মূল্য সমধিক,
দুর্গত ভারতে আজ জাগিয়াছে তাঁর প্রয়োজন
ন্যায়-দণ্ডাঘাতে যাঁর অন্যায়ের পাপ-সিংহাসন
লুটায়েছে ভূমিতলে বার বার; যাঁর প্রীতি প্রেমে
মহাভারতের বুকে ধর্মরাজ্য আসিয়াছে নেমে।
অন্ত্যজেরে ভালবেসে "মানবত্বে সম অধিকার
আছে সব মানবের"—একদা এ মহামন্ত্র যাঁর
জগতে এনেছে সুখ, শান্তি, প্রাণ, প্রতিষ্ঠা, অভয়,
আমি সে কৃষ্ণকে চাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্রিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

তিন

উদ্বোধন

স্বামীজীর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তিনি তাঁর অভিপ্রেত বস্তুকে ব্যাপক ও নির্দিষ্ট উভয় ক্ষেত্রেই আঘাত করতেন। বেদান্তের প্রথম মুখপত্র নিশ্চয়ই ইংরেজীতে হবে, যার ফলে তা সর্বভারতীয়, কিংবা আন্তর্জাতিক প্রচার পাবে, কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হতে গেলে তাদের মাতৃভাষাকেই অবলম্বন করতে হবে। মাতৃভাষায়, জনগণের মুখের ভাষায়, কথা না বললে তাদের অন্তর স্পর্শ করা যায় না; বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরাই লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা জনগণের ভাষাতেই কথা বলেছেন,—একথা স্বামীজী তৎকালীন শিক্ষাভিমানীদের দৃপ্ত ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং ইংরেজীতে একটি পত্রিকা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরেই তিনি দেশীয় ভাষায় পত্রিকার কথা ভাববেন, তাই স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণ মিশনের সেই প্রথম দেশীয় ভাষায় পত্রিকার নাম 'উদ্বোধন'। তার ভাষা বাংলা, কারণ স্বামীজী স্বয়ং বাঙালী, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের হেড-কোয়ার্টার বাংলাদেশে; কিন্তু স্বামীজী যে ভারতের সকল দেশীয় ভাষাতে পত্রিকা চাইতেন, তা তাঁর পত্রাবলী থেকে বোঝা যায়।

দেশীয় ভাষায় পত্রিকার কল্পনা যে স্বামীজীর মনে প্রথমাবধি সক্রিয়, তার প্রমাণ—১৮৯৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্রে বিষয়টির উল্লেখ ছিল। এই কালে, স্মরণ রাখতে হবে, ব্রহ্মবাদিন প্রকাশিত হয়নি। স্বামীজী লিখেছিলেন—"তোমাদের একটা কিনা কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর?... একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit করতে হবে, আদ্দেক বাংলা আদ্দেক হিন্দি—পারো তো আর একটা ইংরেজীতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ—খবরের কাগজের subscriber সংগ্রহ করতে ক'দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে, subscriber যোগাড় করুক। গুপ্ত—হিন্দি দিকটা লিখুক, বা অনেক হিন্দি লিখবার লোক পাওয়া যাবে। মিছে ঘুরে বেড়ালে চলবে না।" এখানে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের (যাঁরা বাঙালী) বাংলা ও হিন্দির দ্বিভাষী কাগজ করতে বললেন;[১] সেই সঙ্গে ইংরেজী কাগজও। এর পরে স্বামীজী ১৮৯৫-তে লেখা এক চিঠিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে খবরের কাগজ প্রকাশের ব্যাপারে তাগিদ দেন। ঐ বৎসরের ১১ এপ্রিল রামকৃষ্ণানন্দকে একই বিষয়ে লেখেন—"মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পারো, তার চেষ্টা দেখ দিকি।... অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত উদ্যোগ যাহার সহায়, সেই কার্যে সিদ্ধি হবে। পড়াশুনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শশী? মেলা মুখ্য-ফুখ্যু জড়ো করিস্‌নি বাপু। দুটো চারটে মানুষের মতো--এককাট্টা কর্ দেখি। একটা মিউও যে শুনতে পাইনি। তোমরা মহোৎসবে তো লুচিসন্দেশ বাঁটলে, আর কতকগুলো নিষ্কর্মার দল গান করলে,...

---

১ স্বামীজীর কালে ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ পশ্চিম ভারতে দ্বিভাষী পত্রিকার চল ছিল।

তোমরা কী spiritual food দিলে, তা তো শুনলাম না? তোদের যে পুরানো ভাব nil admirari—কেউ কিছুই জানে না ভাব—যতদিন না দূর হবে, ততদিন তোরা কিছুই করতে পারবিনি, ততদিন তোদের সাহস হবে না। Bullies are always cowards,—(যারা লোককে তর্জন ক'রে বেড়ায়, তারা চিরকাল কাপুরুষ)।" ১৮৯৫-র আর এক চিঠিতে হিন্দি কাগজের ব্যাপারে স্বামী অখণ্ডানন্দকে,—হিন্দি ভাষা ও হিন্দিভাষী অঞ্চল যাঁর নখদর্পণে—পুনশ্চ তাগিদ দিলেন, "যজ্ঞেশ্বর বাবু মীরাটে একটা কি সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করতে চান। ভাল, তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কালীকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও, কালী যদি পারে মীরাটে একটা centre করুক এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দি ভাষাতে হয়, এমন চেষ্টা করুক—আমি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব।" একই বৎসরে মঠে লিখলেন—"হরমোহন নাকি একটা কাগজ বার করবার যোগাড় করছিল, তার কি হ'ল? কালী, শরৎ, হরি, মাষ্টার, G. C. Ghosh (গিরিশবাবু) যোগাড় ক'রে একটা যদি পারো তো ভালই বটে।"

এখানে স্বামীজী যাদের নাম করলেন, তাঁরা বাংলাদেশে সত্যই কাগজ বার করতে সমর্থ ছিলেন। এঁদের মধ্যে গিরিশ ঘোষ বাংলাদেশের প্রধান নট ও নাট্যকার; মাস্টার মহাশয় বা মহেন্দ্র গুপ্ত শিক্ষাব্রতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র। সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কালী অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দ, শরৎ অর্থাৎ স্বামী সারদানন্দ, হরি অর্থাৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ যথেষ্ট শিক্ষিত, এবং এঁরা তিনজনই স্বামীজীর প্রচারে সহায়তা করবার জন্য তাঁর জীবিতকালেই পাশ্চাত্ত্যে গিয়েছিলেন! হরমোহন মিত্রের সঙ্গে পাঠকদের ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে। এই 'পাগলা হরমোহন' রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সংক্রান্ত বহু পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশক, এবং কিছু ছিটগ্রস্ত হওয়ার জন্য উদ্যমে উন্মত্ত।

এই চিঠিতে একজনের উল্লেখ নেই—তাঁর নাম স্বামী ত্রিগুণাতীত। শ্রীরামকৃষ্ণের অল্প-বয়সী এই শিষ্যকে কাজের ব্যাপারে বিশেষ কেউ গণনার মধ্যে আনেননি। কিন্তু বিবেকানন্দ জানতেন, কোথা থেকে কি হয়। গুরুভাইদের সস্নেহ কৌতুকের পাত্র ঐ যুবকটির সামনে ছিল গৌরবময় কর্মজীবন, এবং পরিণতি—মর্মান্তিক কিন্তু মহান। ইনি ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সানফ্রানসিস্কোয় জনৈক উন্মাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে যখন নিহত হন, তার পূর্বেই অন্ততঃ দুটো বড় কীর্তি রেখে যেতে পেরেছিলেন—উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশ এবং পাশ্চাত্ত্যে প্রথম হিন্দু-মন্দির-স্থাপনা। স্বামী ত্রিগুণাতীতই, আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র শহীদ।[২]

---

২ উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের সংবাদ এইভাবে বেরিয়েছিল:

"আমরা অতীব শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত প্রবীণ সন্ন্যাসিগণের অন্যতম, উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠাতা, কালিফোর্নিয়ার বেদান্ত-প্রচারক বহুগুণাধার শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীত গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। শরীরত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কোর হিন্দু-টেম্পলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি একদিন সমবেত ভক্তবৃন্দ সমক্ষে বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাবরা নামক এক ব্যক্তি আসিয়া সহসা তথায় এক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটা ফাটিয়া অনেককে আহত করে। ভাবরা নিজে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ভাবরা কেন এই দুষ্কার্যের অনুষ্ঠান করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনও মূল্যস্বরূপে প্রদান করিল, তাহা নিশ্চয়

ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ সারদা, স্বামীজীকে জানান, স্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী তিনি বাংলায় পত্রিকা বার করতে চান। ১৮৯৫-তে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখেন—"সারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে; যেখানটা ভাল না বোধ হয়, ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল! দল ভাঙবার ঐটি মূলমন্ত্র: 'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' 'তুই আবার কি করবি?'—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র।" স্বামীজী কিভাবে মানুষের ভিতরের শক্তি দর্শন ও আকর্ষণ করতেন, এই পত্র তার আর একটি প্রমাণ।

১৮৯৬-এর জানুয়ারীতে স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে তাঁর বাংলা পত্রিকা বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখলেন—ভিতরের ব্রহ্ম জাগানো বিবেকানন্দের স্বাভাবিক রচনা—"তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০৲ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো, ভাবনা নাই টাকার জন্য। আপাততঃ এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার ক'রে নে। এই চিঠির জবাব-চিঠির উত্তরে আমি ৫০০৲ টাকা পাঠিয়ে দেবো। ৫০০৲ টাকায় কিছু আসে যায় কি? খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশী ধর্মের প্রচার এখন ক'রে ওঠ দিকি। তবে কোনও আরবীজানা মুসলমান-ভায়া ধরে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পারো, ভাল হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক Indian History আছে। যদি সে-গুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল। উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধরে কাগজ গছিয়ে দিবি।...চালাও কাগজ, কুছ্‌ পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে (মিলে) লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস! গুঁজগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ ক'রে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর! মোচ্ছব এমনি মাতাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন, যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন; কিন্তু কাজের বেলা তো 'খোঁজ খবর নহি পাওয়ে।' লেগে

করিয়া বলা যায় না। এই ব্যক্তি বড় অস্থিরচিত্ত ছিল এবং কয়েক বৎসর যাবৎ একটির পর একটি করিয়া ধর্মমত ও সমিতিতে যোগদান করিয়া আসিতেছিল এবং বৎসরাধিক পূর্বে কিছু দিন হিন্দু-টেম্পলেও ছিল। অনুমান হয় ধর্ম-বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়াই সে এরূপ করিয়াছে। বিশেষ যত্নে স্বামী ত্রিগুণাতীতের চিকিৎসা হইতে থাকিলেও, বিষাক্ত বিস্ফোরক দ্রব্যের সংস্পর্শে রক্ত দূষিত হইয়া সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্কানুসারী কর্মবীর কর্মক্ষেত্রেই বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায় জীবন বিসর্জন করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে মিশনের যে ক্ষতি হইল, তাহা বর্ণনাতীত। বারান্তরে আমরা ইঁহার অপূর্ব জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।"

১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, ক্রিশমাসের তিন দিন পরে 'হিন্দু-মন্দিরে' যখন খ্রীষ্টোৎসব হচ্ছিল, সেই সময়ে বোমাটি ছোঁড়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ত্রিগুণাতীতকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন পথমধ্যে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'বেচারা ছেলেটি! ও এখন কোথায়?' তাঁর দেহত্যাগের দিন ১০ই জানুয়ারী সেবার স্বামীজীর জন্মতিথি পড়েছিল। আগের দিন সেবক শিষ্যকে ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন—পরদিন, স্বামীজীর জন্মতিথিতে তাঁর দেহান্ত হবে।

যা, যত পারিস। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় এসে তোলপাড় ক'রে তুলব। ভয় কি? 'নাই নাই বললে সাপের বিষ উড়ে যায়।'—নাই নাই ব'লে যে নাই হয়ে যেতে হবে।···

"গঙ্গাধর খুব বাহাদুরি করছে। সাবাস! কালী তার সঙ্গে কাজে লেগেছে। খুব সাবাস! একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্ দুনিয়া। কি ব'লব আপসোস—যদি আমার মতো দুটা তিনটা তোদের মধ্যে থাকত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম্। কি করি, ধীরে ধীরে যেতে হচ্ছে। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্। একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা। এ গৃহস্থদের কাজ নয়।···এ সন্ন্যিসীর দলকে হুঙ্কার দিতে হবে: 'হ-র, হ-র, শম্ভো!'"

১৭ই জানুয়ারী স্বামীজী আবার লিখলেন ত্রিগুণাতীতকে—"তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাও।···হুটোপাটিতে কি কাজ হয়?···লোহার দিল্ চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মতো হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেবো—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল; যে না আসবে, সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে, থাকুক। তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। তুই আর শশী আর গঙ্গাধর—এই তিনজন দেখছি faithful···তোদের মুখে হাতে বাগ্-দেবী বসবেন—ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে।"

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৬, স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে লিখলেন, তিনি যেন সারদার সংকল্পে উৎসাহ দেন।

কিন্তু এর পরে কয়েক মাস চিঠিতে 'সারদার কাগজ' সম্বন্ধে উল্লেখ দেখি না। এর দুটি কারণ সম্ভবপর। আমরা আগেই বলে এসেছি, বাংলাদেশের সন্ন্যাসী বা গৃহী গুরুভাইদের ইংরেজী পত্রিকা বার করবার সামর্থ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে কিছু সন্দেহ ছিল। এ ব্যাপারে তিনি মাদ্রাজীদের উপযুক্ততর ভেবেছিলেন। মঠ-গঠন ইত্যাদি কাজকেই সন্ন্যাসীদের পক্ষে অধিকতর সম্ভবপর বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং ইংরেজী পত্রিকার ব্যাপারে আলাসিঙ্গা প্রভৃতির উপর নির্ভর করেন এবং ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশ করে মাদ্রাজী ভক্তগণ স্বামীজীর সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন বাংলা পত্রিকার ব্যাপারে উঠে পড়ে লাগলেন, তখন স্বামীজী নতুন করে উৎসাহিত হলেন, কিন্তু একটা নতুন প্রতি-বন্ধক দেখা গেল—অর্থের অভাব। স্বামীজীকে ব্রহ্মবাদিনের টাকার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ক্রমে তিনি দেখলেন, তাঁর পক্ষে নতুন টাকার ঝুঁকি নেওয়া আর সম্ভব নয়। এই বিষয়ে ১৮৯৬, ১৪ এপ্রিল ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে লেখেন—"কলকাতায় বাংলা ভাষায় একখানি পত্রিকা আরম্ভ করতে সাহায্য ক'রব ব'লে কথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার এই—প্রথম দু'বছরই মাত্র বক্তৃতার জন্য টাকা আদায় করেছি; গত দু'বছর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাওনার কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে আপনাকে বা কলকাতার লোকদের পাঠাবার মতো টাকা আমার মোটেই নেই।" কয়েক দিন পরে ২৭ এপ্রিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে দেখি, বাংলা পত্রিকার সম্পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণে তাঁর যেন সম্পূর্ণ ইচ্ছা নেই; "সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে; কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পার তো আমরা

সম্মতি আছে।"

বাংলা কাগজের মতই অন্যান্য দেশীয় ভাষার পত্রিকায় স্বামীজীর কতখানি আগ্রহ ছিল, তার কিছু নিদর্শন হিন্দি পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছা থেকে দেখে এসেছি। দক্ষিণভারতীয় ভাষায় পত্রিকা সম্বন্ধে ডাঃ ননজুণ্ডাকে ২৬ অগস্ট, ১৮৯৬ লিখলেন—"যখন এই পত্রিকাটি (প্রবুদ্ধ ভারত) দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন, তখন তামিল, তেলুগু, কানাড়া প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ঠিক ঐ ভাবের কাগজ বের করুন।" আলাসিঙ্গাকে ২০শে নভেম্বর লিখলেন—"এখন তো আমাদের ইংরাজি পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে গেছে, অতঃপর ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় কয়েকখানি আরম্ভ করতে পারি।"

স্বামীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী মাদ্রাজে তামিল পত্রিকা বার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাজম আয়ার এই পত্রিকারও ভারগ্রহণ করবেন ঠিক হয়; পত্রিকার নামকরণ করা হয়েছিল—'প্রবোধচন্দ্রিকা'। রাজমের মৃত্যুর সঙ্গে সেই বাসনার সমাপ্তি ঘটে।৩

বাংলা পত্রিকার ব্যাপারে আরও অগ্রগতির সংবাদ পাই স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে শুদ্ধানন্দকে লেখা তাঁর ১৮৯৭, ১১ জুলাই-য়ের পত্রে—"ব্রহ্মানন্দকে বলবে, তিনি যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে—মঠে তাদের সাপ্তাহিক কার্য-বিবরণী পাঠাতে লেখেন, যেন তা পাঠাতে ত্রুটি না হয়, আর যে বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান যেন তারা পাঠায়। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র করছেন? অদম্য ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে কাজ ক'রে যাও ও প্রস্তুত থাকো।"

এই চিঠি থেকে মনে হয়, বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তখনি। কিন্তু তিন মাস কেটে যাবার পরেও পত্রিকা বেরোয়নি। ১৮৯৭, ১১ অক্টোবর স্বামীজী নানা বিষয়ে অত্যন্ত নৈরাশ্য ও অভিমান প্রকাশ করে ব্রহ্মানন্দকে যে পত্র লেখেন, তাতে ছিল—"সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি ক'রব?…আমি গাল দিই; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে। …আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর প্রবন্ধ লিখেছি।" মনে হয় এটি উদ্বোধনের বিখ্যাত প্রস্তাবনা-প্রবন্ধ।

নানা কারণে উদ্বোধনের প্রকাশ ক্রমেই পেছোতে থাকে। মূল কারণ অর্থকষ্ট। উদ্বোধন প্রকাশিত হতে আরও প্রায় দেড় বছর লেগে যায়। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী। এই দেড় বৎসরের মধ্যে পত্রিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা থামেনি। ১৮৯৮ খৃঃ মার্চ মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে দেখতে পাই, স্বামীজী ডন পত্রিকার ব্যাপারে (পরবর্তীকালে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় যা বিখ্যাত হয়েছিল, স্বামী স্বরূপানন্দ গোড়ার দিকে যার সম্পাদক ছিলেন), উৎসাহ দেখাচ্ছেন—"ডন কাগজখানির প্রতি সংখ্যার জন্য ৪০৲ টাকা খরচ হইবে, এবং দুইশত গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারিবে, ইহা মস্ত খবর।" এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী ডন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং পত্রিকাখানি স্বামীজীর আদর্শে পরিচালিত হবে, এমন স্থির হয়েছিল।

ডন পত্রিকার সতীশ মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-

---

৩ "Of course the proposed Tamil journal, Probodha Chandrika, which promised to give full scope to the rich imagination, fine critical faculty and ecstatic outpouring of the departed genius, will not be started." (P. B., June, 1898)

মণ্ডলীতে পরিচিত ব্যক্তি। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত নন, অথচ তার ভাবধারার প্রতি সহানুভূতি আছে, এমন সকলকে স্বামীজী কাজের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ করতে চাইতেন। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পুরানো ভক্ত অথচ রামকৃষ্ণ সংঘের বহির্বর্তী নৃত্যগোপালের পত্রিকা-বিষয়ক পরিকল্পনাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ২৩ এপ্রিল, ১৮৯৮ লেখেন—'নৃত্যগোপাল বলে, ইংরাজি কাগজটায় খরচ অল্প, অতএব প্রথম উহা বাহির করিয়া পরে বাংলাটা দেখা যাবে। এ-সকলও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যোগেন কাগজের ভার লইতে রাজি আছে?··· শরৎকে জিজ্ঞাসা করবে—জি. সি., সারদা, শশীবাবু প্রভৃতি প্রবন্ধ তৈয়ার রেখেছেন কিনা।"

'কলকাতা থেকে ইংরাজি কাগজ'-এর বদলে যখন আলমোড়া থেকে ইংরেজী কাগজ প্রবুদ্ধ ভারতের পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হল, তখন স্বভাবতই আবার বাংলা কাগজের ব্যাপারে স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ল। বাংলা কাগজ প্রকাশের দরকারও হয়ে পড়েছিল। স্বামীজীর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আক্রমণ তখন বাংলা কাগজে সবেগে চলেছে, এবং বেদান্ত-আন্দোলনকে হয় ঔদাসীন্যে, নয় আঘাতে বিধ্বস্ত করার চেষ্টার সীমা ছিল না। জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হবার মত কোনো বাংলা পত্রিকাবাহন স্বামীজীর নেই।[৪] সহজেই থাকতে পারত, যদি স্বামীজী কোনো দলীয় স্বার্থকে তোয়াজ করতে রাজী হতেন। স্বভাবতই তা তিনি পারেন না। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয়ে গেছে, এবং তার প্রধান কার্যালয় হয়েছে বাংলা দেশে। সুতরাং বাংলা ভাষায় জনগণের কাছে মত ও পথের কথা উপস্থিত করার আশু প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগ তো ছিলই। অথচ সংকল্পের পথে প্রধান বাধা টাকার। স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডকে অনুরোধ করে লিখলেন (২৯ এপ্রিল, ১৮৯৮): "প্রভাত আমি কলকাতায় একখানি কাগজ চালাব। তুমি যদি ঐ কাগজ চালু করতে আমায় সাহায্য কর, তবে খুবই কৃতজ্ঞ হব।" ম্যাকলাউড নিশ্চয় অর্থসাহায্যে রাজী হয়েছিলেন। স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কিছুদিন পরেই (২০ মে) লিখলেন: "কাগজের জন্য টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০৲ টাকা তোমায় কাগজের জন্য দিয়াছি, তাহা ঐ হিসাবেই যেন থাকে।" কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কাগজের ব্যাপারে সমস্যার শেষ হয়নি। প্রায় এক মাস পরে ব্রহ্মানন্দকে আবার লিখলেন: "সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, বাঙলা ভাষার magazine paying করা মুশকিল, তবে সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া subscriber যদি যোগাড় করা যায় তো সম্ভব বটে। এ বিষয়ে তোমাদের যে-প্রকার মত হয় করিবে। সারদা বেচারা একেবারে ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছে। যে লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য এক হাজার টাকা যদি জলেও যায় তো ক্ষতি কি?"

উদ্বোধন শেষ পর্যন্ত বেরিয়েছিল।[৫] আগেই জানিয়েছি, ১৮৯৯-এর জানুআরি মাসের মাঝা-

---

৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাপ্তাহিক বসুমতী ১৮৯৬ সালে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে পত্রিকা স্বামীজীর ইচ্ছাপূরণ করতে সমর্থ ছিল না। উপেন্দ্রনাথের সাপ্তাহিক বসুমতী সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছি পরিশিষ্টে।

৫ তখন উদ্বোধনের "আয়তন ছিল ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে এক মাস (দুই সংখ্যা) পাক্ষিক উদ্বোধন-প্রকাশ বন্ধ থাকিত।"

মাঝি সময়ে (১৩০৫ সনের ১লা মাঘ) পাক্ষিক পত্রিকারূপে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল দৈনিক পত্র প্রকাশ করবেন। অর্থাভাবে তা করা সম্ভব হয়নি। স্বামীজী-প্রদত্ত এক হাজার টাকার উপরে হরমোহন মিত্রের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়।* প্রথম কার্যালয় —"কলিকাতা, কম্বুলেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, গিরীন্দ্রমোহন বসাকের বাড়িতে।" "প্রথম হইতেই 'উদ্বোধন প্রেস' নামে উদ্বোধনের একটি নিজস্ব প্রেস ছিল। এই প্রেসটিও গিরীন্দ্র বাবুর বাটীতেই স্থাপন করা হইয়াছিল।" প্রথম সম্পাদক (এবং প্রকাশকও) স্বামী ত্রিগুণাতীত। তিনি চতুর্থ বর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা (১৩০৯) পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন।

'স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখকবর্গ' উদ্বোধনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় পত্রিকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অচিরে। প্রথম পর্বে স্বামীজী ছাড়া উদ্বোধনের উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, ক্ষীরোদ-

---

"প্রথমে পাক্ষিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া পরে দশম বর্ষ হইতে উদ্বোধন মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।" "প্রথম বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষের অষ্টাদশ সংখ্যা পর্যন্ত উদ্বোধন নিজস্ব প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। পরে নানা কারণে প্রেসটি বিক্রয় করিয়া দিতে হয়।"

কেন প্রেসটি বিক্রয় করে দিতে হয়েছিল, তার কিছু কারণ পরে উদ্ধৃত কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথায় পাওয়া যাবে।

উদ্বোধনের জন্য ত্রিগুণাতীত কি ধরনের প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন তা দেখা যায় ঢাকার যতীন্দ্রচন্দ্র দাসকে লেখা তাঁর দুটি চিঠি থেকে। উদ্বোধন প্রকাশিত হবার আগে, ১৯শে পৌষ, ১৩০৫ তারিখে তাঁকে লেখেন :

"আগামী ১লা মাঘ হইতে কাগজ ('উদ্বোধন' নামে বাঙ্গলা পাক্ষিক পত্র) বাহির হইবে। ছাপা হইয়া গিয়াছে।...আপনি যথার্থই নিঃস্বার্থ কার্য হিন্দুধর্মের জন্য করিতেছেন, নচেৎ 'উদ্বোধনে'র জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ঢাকায় যাবতীয় কলেজ, স্কুল ও আফিসে এবং স্টেশনে হাণ্ডবিল বিতরণ করাইবেন। তাহার দরুন পৃথক হাণ্ডবিল অদ্য পাঠাইলাম।"

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ তারিখে একই জনকে লেখেন :

"অদ্য ডাকে এক হাজার হাণ্ডবিল আপনাকে পাঠাইয়াছি।...আপনাকে পদে পদে কষ্ট দিতেছি, মনে করিবেন না। আপনাদের দ্বারাই পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ প্রচারকার্য হওয়া সম্ভব এবং হইতেছেও।...যাহা হউক, ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক এক খানি হাণ্ডবিল দিয়া 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হাণ্ডবিলে কি আছে তাহা সকলকেই খুব ভালরূপ বুঝাইয়া দিবেন, নচেৎ কেহ হাণ্ডবিল বুঝিতে পারিবে না। রীতিমত লেকচার দেওয়ার মত হাণ্ডবিলে কি কি বিষয় আছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন।"

(উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫৫)

* উদ্বোধন-প্রেস কেনা হয়েছিল মিস ম্যাকলাউডের টাকায়। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে মিস ম্যাকলাউডের নাম অবিস্মরণীয়। প্রথম পর্বে বহির্ভারতে এই আন্দোলনের তিন শ্রেষ্ঠ সহায়িকা—তিনজনই মহিলা—দুইজন আমেরিকান, মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড, তৃতীয় জন আইরিশ, সিস্টার নিবেদিতা। মিসেস ওলি বুল প্রধানতঃ আর্থিক সাহায্য করেছেন, এবং সিস্টার নিবেদিতা তাঁর রচনাদির দ্বারা প্রচার চালিয়েছেন (নিবেদিতা ভারতকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র করেছিলেন); মিস ম্যাকলাউড সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যখণ্ডে এই আন্দোলনের ধাত্রীর কাজ করেছেন। স্বামীজীর ভারতীয় কাজকেও তিনি নিজের কাজ বলে নিয়েছিলেন। অর্থে ও সামর্থ্যে তিনি যৎপরোনাস্তি করতেন—কতখানি করেছেন সে ইতিহাস যদি সম্পূর্ণ জানা যায়, দেখা যাবে প্রতিষ্ঠানগতভাবে রামকৃষ্ণ মিশন অ-সন্ন্যাসী যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদের মধ্যে মিস ম্যাকলাউডের স্থান সর্বাগ্রে।

উদ্বোধন-প্রেস কেনার বিষয়ে ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথায় পাই :

"মিসেস ওলি বুল মঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক সহস্র ডলার দিয়েছিলেন। আমার সামর্থ্য অল্পই, আটশো ডলার সংগ্রহ করতেই কয়েক বছর লেগে গেল। একদিন স্বামীজীকে বললাম, 'এই আমার অল্প কিছু টাকা, আপনি প্রয়োজনে লাগাতে পারবেন।' তিনি বললেন, 'কী? কি বললে?' আমি বললাম, 'হাঁ।' 'কত?'—জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, 'আটশো ডলার।' তখনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের দিকে ফিরে বললেন, 'এই তোমার টাকা, যাও, প্রেস কেনো গিয়ে।' ত্রিগুণাতীত প্রেস কিনলেন, তাই দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র উদ্বোধন বেরুল।" (*Reminiscences*)

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনার প্রকাশক্ষেত্ররূপে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছিল। তার পিছনে পরোক্ষ সাহায্য ছিল এক ইংরেজীভাষী মহিলার।

প্রমাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি। স্বামী সারদানন্দের ওজস্বিতাপূর্ণ রচনাতেও এইকালে উদ্বোধন সমৃদ্ধ। স্বামী শুদ্ধানন্দের অনুবাদ-রচনারও উল্লেখ করতে হয়। শুদ্ধানন্দ আত্মবিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন। স্বামীজী তাঁর ইংরাজী রচনা ও ভাষণাদির অনুবাদের কথা যখন বলেন, তখন অনেকে অতি সম্ভ্রমে পেছিয়ে যান,—এগিয়ে আসেন 'ঝাঁপ না দিলে সাঁতার শেখা যায় না' নীতিতে বিশ্বাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ।[৭] তাঁর অনুবাদের ভাষাগত ওজস্বিতার জন্য 'জ্ঞানযোগ', 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতিকে অনেকে স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলে মনে করেছেন। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের নাম প্রথম সারিতে।[৮]

কিন্তু আর কারো নয়, স্বামীজীর রচনাই উদ্বোধনকে মহিমান্বিত করেছিল। উদ্বোধনই বিবেকানন্দকে বাংলা লেখক করেছিল, এ গৌরব তার চিরদিনের। পত্রিকাটির প্রতি স্বামীজীর অসীম মমত্ব ছিল, সদ্য-প্রবর্তিত সংঘ-মুখপত্রের প্রতি দায়িত্বও ছিল অশেষ। অন্তরের তাগিদে যদি নাও হয়, পত্রিকার প্রয়োজনেও তাঁকে লিখতে হয়েছে। না, অন্তরের তাগিদ অল্প ছিল না। পরম প্রিয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যে-যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তা পুনঃস্থাপনের ইচ্ছাও তাঁর মনে জেগেছিল। স্বামীজীর প্রায় সকল মৌলিক বাংলা লেখাই উদ্বোধনে বেরিয়েছে, উদ্বোধনের পক্ষে

---

৭ এই অনুবাদকার্যের সূচনা সম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখেছেন :

"সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন হইতে ই. টি. স্টার্ডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—মঠেও উহার দুই-এক কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে তখনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহ সহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরাজী জানেন না—কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'নরেন' বেদান্ত সম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাংলা অনুবাদ কর না।' তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত pamphleগুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতিমধ্যে স্বামীজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন প্রেমানন্দ-স্বামী স্বামীজীকে বলিলেন, 'এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।' পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও দেখি।' তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু'একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই-একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, 'রাজযোগটা তর্জমা কর্ না।' আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? আমি তাহার বহুদিন পূর্ব হইতে রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম…রাজযোগের অনুবাদ করিলে…আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া, সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল।…যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" ('স্বামীজীর কথা' গ্রন্থ)

৮ শোনা যায় স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রথমাবধি উদ্বোধনের সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। ত্রিগুণাতীতের পরে তিনি উদ্বোধনের সম্পাদক হন। এ বিষয়ে 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়' পুস্তিকায় কিছু সংবাদ পাই, সেই সঙ্গে উদ্বোধন পত্রিকার সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের সম্পর্কের সংবাদও :

"১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি (ত্রিগুণাতীত) আমেরিকা গমন করিবার পর উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশন লইয়া গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এমন কি পত্রিকাটির প্রকাশন বন্ধ হইবার আশঙ্কাও দেখা দেয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের একান্ত ইচ্ছা ও স্বামী সারদানন্দের প্রচেষ্টার ফলে এই সঙ্কট কাটিয়া যায়। স্বামী শুদ্ধানন্দকে পত্রিকা-সম্পাদনার ও প্রকাশনের ভার দেওয়া হয়। তাঁহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা এবং অধ্যবসায় সহকারে সুযোগ্য পরিচালনার ফলেই উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশন অতি সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকে। স্বামী সারদানন্দ এই সময় হইতেই উদ্বোধনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন; অবশ্য ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন-এ তাঁহারই প্রচেষ্টায় নির্মিত নিজস্ব ভবনে উদ্বোধন কার্যালয় উঠিয়া আসিবার সময় হইতে উদ্বোধন কার্যালয় পরিচালনার ভার তিনি পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন।"

তা সম্পদ, মানব-চিন্তার ক্ষেত্রেও; সে রচনা-গুলির গুরুত্ব এমনই ছিল যে, ইংরেজীতে অনুবাদ করেও অন্য পত্রিকা প্রকাশ করত। স্বামীজী কেবল চিন্তা-বস্তুতেই উদ্বোধনকে গরীয়ান করেননি, রীতির ক্ষেত্রেও বাংলা গদ্যে নূতন ধারার সূচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে অন্য এক অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

স্বামীজী তাঁর মনের কতখানি উদ্বোধনকে দিয়েছিলেন দেখতে পাই নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে (১৯ জুলাই, ১৮৯৯) :

"রাজা (স্বামীজী) তাঁর বাংলা পত্রিকার জন্য ঘাড় গুঁজে দাসের মত খাটছেন ক্যাবিনে বসে। ...বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী না আশীর্বাদের মত হয়েছে, তোমাকে তা বলা দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এর জন্য একটি দীর্ঘ পত্র রচনা করছেন—মজাদার রসিকতায় তা পূর্ণ, সেই সঙ্গে টিপ্পনী ও মন্তব্য, এবং আর্ত ভবিষ্যৎবাণী। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। বিদেশীয়ানা, ব্রাহ্মপদ্ধতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত রোষ, জনগণের প্রতি নিবিড় আশা ও ভাল-বাসা, গুরুর প্রতি দীপ্ত ভক্তি, চারিপাশের জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক সন্ধানী দৃষ্টি,—সর্বোপরি বাংলা ভাষার উপরে কিছু ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন, যার ফলে তাঁর লেখা বোঝা দুরূহ হয়ে উঠছে, যেমন ছিল কার্লাইলের প্রথম আবির্ভাবকালের রচনা, যা সৃষ্ট হয়েছিল দারুণ কোনো লক্ষ্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।"[১] ('নিবেদিতা লোকমাতা')

শুধু রচনার দায়িত্বই যদি স্বামীজীকে বহন করতে হত! সব কিছুর ঝক্কি বহনে ক্লান্ত বিবেকানন্দ ক্ষোভের সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে পত্রিকার ব্যাপারে তাঁর দায়দায়িত্বের কিছু কথা আছে :

---

১ নিবেদিতা-কথিত 'দীর্ঘ পত্র' হচ্ছে উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজীর 'বিলাতযাত্রীর পত্র', যা কিছুদিন পরে নাম বদলে হয় 'পরিব্রাজক।' 'ভাষার উপর ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন' আর কিছু নয়, নিতান্ত চলিত বাংলায় লেখা, যা নিবেদিতার পক্ষে বোঝা শক্ত হয়েছিল, কারণ তিনি অনেক চেষ্টার পরেও সাধু বাংলার বেশী শিখতে পারেননি।

উদ্বোধন প্রকাশিত হবার পরে 'শিষ্য' শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে স্বামীজীর সে বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। উদ্বোধনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের চমৎকার বিবরণ ওর মধ্য থেকে পাই।—

"স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত ক'রে পরিহাসচ্ছলে) "উদ্বন্ধন" দেখেছিস্?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজী। এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য। কিরূপ?

স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাংলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেমন ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verbএর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হয়।...

শিষ্য। মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করেছেন—তা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী। তুই বুঝি মনে কচ্ছিস্, ঠাকুরের এই সব সন্ন্যাসী সন্তান কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে ব'সে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক্ হবে। এদের কাছে কাজ কি ক'রে করতে হয়, তা শেখ্।...

শিষ্য। মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বের হবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজী। তা তো বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হ'লে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে, রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনা মূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

স্বামীজী। 'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas (সকল বিষয় গড়ে তোলবার আদর্শ) দিতে হবে। Negative thoughts (নেই-নেই-ভাব) মানুষকে weak (নির্জীব) ক'রে দেয়। Positive ideas (জীবন গড়ার ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হ'য়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প - সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ সব বিষয়ে কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই ব'লে দিতে হবে।... বেদ-বেদান্তের উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে।"

"সারদা বলে কাগজ চলে না।…আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব advertise করে ছাপাক দিকি —গড় গড় করে subscriber হবে। খালি ভটচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!

"যা হোক, কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। 'টাকা-কড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে? সাহেবরা[১০] কি করছেন? আমার হয়ে গেছে। তোমরা যা করবার কর। একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারুর নেই—এক লাইন লিখবার…ক্ষমতা কারুর নাই—সব থামকা মহাপুরুষ।" (১০ আগস্ট, ১৮৯৯; লণ্ডন থেকে লেখা)। (ক্রমশঃ)

"বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা, ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, জনসাধারণকে এবং দরিদ্রদিগকে সুখী করিতে হইবে।"

"যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ, তাদের সেবার জন্য যে তৈরী হবে—তাদের ভিতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

১০ "সম্ভবতঃ পাশ্চাত্ত্য-প্রত্যাগত গুরুভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলা হইয়াছে।"—'বাণী ও রচনায়' প্রদত্ত টীকা

চাঁদের দেশে

শিবদাস

১

নীল আকাশে যে সাদা মেঘের ভেলাগুলি ভেসে বেড়ায়, তাতে চড়ে কত মানুষ, কত কবি, কত জননী, কত শিশু যুগে যুগে পাড়ি দিয়েছে চাঁদের দেশে। চাঁদের দেশ থেকে কত আনন্দ এনেছেন তাঁরা। সে চাঁদ আমাদের কাছ থেকে বেদ্ বেশী নয়, এই মেঘের ওপারে, আর একটু দূরে। সে চাঁদকে আমাদের আঙিনায় নেমে এসে, খোকার কপালে টিপ দিয়ে যেতে ডাকাও হয়।

কত বিজ্ঞানীও গেছেন চাঁদের দেশে। তাঁরা তো আর মেঘের ভেলায় চড়বেন না, তাঁরা গেছেন হিসেব-নিকেশের ভেলায় চড়ে। তাঁরা হৃদয়সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁদের কারবার মগজের সঙ্গে। অনেক অঙ্ক-পাতি কষে তাঁরা আমাদের কাছে চাঁদের দেশের অনেক তথ্য এনে দিয়েছেন।

কিন্তু মানুষের এতদিনকার এসব যাওয়াই ছিল কল্পনায় যাওয়া। মানুষ আর চাঁদের মাঝখানের আড়াই লক্ষ মাইলের ব্যবধান তাতে একটুও কমেনি।

গত ২১শে জুলাই কিন্তু দু-জন মানুষ চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝখানের এই ব্যবধানটুকু একেবারে মুছে দিয়ে সত্যিকারের ভেলায় চড়ে নীল আকাশে পাড়ি দিয়ে একেবারে সশরীরে গিয়ে অবতরণ করল চাঁদের ওপরে; (গত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৮-তে মানুষ চাঁদ আর মানুষের মাঝের এই ব্যবধান কমিয়ে করেছিল ৭০ মাইল, আর গত ২১শে মে ১৯৬৯-তে মাত্র ৯ মাইল।) চাঁদের পিঠে নেমে ঘুরে বেড়িয়ে, চাঁদের মাটি, অনেক ছবি তুলে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন পৃথিবীতে। গত ২৪শে জুলাই রাত্রি ১০টা ১৯ মিনিটের সময়* তাঁরা তাঁদের ভেলাটিকে ভিড়িয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরে, হাওয়াই দ্বীপের কাছে। নীল আকাশে নয়, নিবিড়-কালো মহাকাশে পাড়ি দেবার এই ভেলাটির নাম 'অ্যাপোলো-১১'। (আগের দুটোর নাম অ্যাপেলো-৮ ও অ্যাপেলো-১০।) পৃথিবী থেকে অ্যাপোলো-১১ যাত্রা করেছিল গত ১৬ই জুলাই, রাত্রি ৭টা ২ মিনিটের সময়। যাত্রী ছিলেন তিন জন—নীল. এ. আর্মস্ট্রং, ই. এ্যালড্রিন ও মাইকেল কলিন্স।

২

কেপ কেনেডি হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়, পূর্ব উপকূলের দক্ষিণ প্রান্তে, আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে। সেখানকার উৎক্ষেপণ-মঞ্চে সেদিন যাত্রার পূর্বে ৩৬৪´ ফুট উঁচু অ্যাপোলো-১১ যানটি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশে খুব শক্ত করে তৈরী কংক্রিটের ভিত্তির ওপর নির্মিত একটি লোহার কাঠামো; কাঠামোটি কয়েক জোড়া বাহু মেলে যানটিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। কাঠামোটির ভিতরে লিফ্ট আছে। তাতে চড়ে মহাকাশচারী তিনজন সন্ধ্যা ছয়টার আগেই (১৬. ৭. ১৯৬৯) এসে উঠে বসেছিলেন মহাকাশযানটির একেবারে মাথার কাছে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ কম্যাণ্ড মডিউলে। তাঁরা ভেতরে ঢোকার পরই বাইরে থেকে দরজটা নিশ্ছিদ্র করে বন্ধ করে দিয়ে লোকজন সবাই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন

---

* সব সময়ই ভারতীয় সময় দেওয়া হল।

সাড়ে তিন মাইল দূরে উৎক্ষেপণ-পরিচালন-কেন্দ্রে। সেখান থেকেই চালু করা হবে

১ নং চিত্র
এ্যাপোলো মহাকাশযান

যানটিকে। শুধু উৎক্ষেপ করাই নয়, মহাকাশ-পথে যাওয়া-আসা নিয়ে পাঁচ লক্ষ মাইল পথ চলার সময় তাকে পরিচালনাও করা হবে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পৃথিবী থেকে বেতারযোগে। কত দূরে যান গেল, কোন্ দিকে এখন ঘুরতে হবে, কি করতে হবে ইত্যাদি সব খবরই এবং নির্দেশই মহাকাশযাত্রীরা পাবেন নীচ থেকে। এমন কি তাঁদের রক্তের চাপ মাপা, হৃদ্‌স্পন্দন গোনা, সময়মত তাঁদের ঘুম থেকে জাগানো, এসবও করা হবে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকেই, বেতার-যোগে। সেই পরিচালন-কেন্দ্রটি আছে টেক্সাসের হিউস্টনে।

রাত্রি ঠিক ৭টা ২ মিনিটের সময় সাড়ে তিন মাইল দূরের উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র থেকে মহাকাশচারীদের জানানো হল—'তোমাদের যানের রকেট চালু করা হল।' সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশযানের নীচে লাগানো রকেটটি পঞ্চমুখে বিপুল পরিমাণ অগ্নি ও ধূম উদ্গীরণ করতে লাগল আকাশফাটানো শব্দ করে। মহাকাশচারীদের মনে হল যেন প্রলয়-কালীন বজ্রনির্ঘোষ হচ্ছে। সেকেণ্ডে পনেরো টন করে জ্বালানি (১০'৬৭ টন তরল অক্সিজেন ও ৪'৩৩ টন কেরোসিন) পুড়তে শুরু করেছে তখন—সাড়ে এগারো কোটি পক্ষিরাজ ঘোড়া যেন চঞ্চল হয়েছে এই ৩,২০০ টন ওজনের যানটিকে আকাশে তুলে উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য। যানটিকে কিন্তু তখনই ছাড়া হল না, লোহার কাঠামোটি সজোরে আঁকড়ে ধরে রইল তাকে; বাহুমুক্ত করল ৯ সেকেণ্ড পরে। ছত্রিশতলা বাড়ীর সমান উঁচু বিপুলকায় যানটি তখন প্রথমে ধীরে ধীরে পৃথিবীপৃষ্ঠ ত্যাগ করে ওপরে উঠতে লাগল। তারপর ক্রমবর্ধমান গতিতে সোজা ওপরে উঠে মুখটা একটু পূর্ব-দিকে হেলিয়ে নিল। ৬৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই যানটির গতি শব্দের গতির চেয়েও বেশী হল। তারপর থেকে মহাকাশযাত্রীদের আর রকেটের

গর্জন শুনতে হয়নি, শব্দকে পিছনে ফেলে তাঁরা এগিয়ে চললেন।

আড়াই মিনিটের মধ্যেই যানটির গতিবেগ হল ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইল। সেটি তখন পৃথিবী থেকে ৩৮ মাইল ওপরে উঠে এসেছে। এখানে যানটিকে তুলে দিয়ে যানটির একেবারে নীচ থেকে স্যাটার্ন-৫ রকেটের তৃতীয় অংশটি আপনি খসে গেল। রকেটের ২য় অংশটি সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যানটি লম্বায় ছিল ৩৬৪', এখন তার রকেটের নীচের ১৩৮' ফুট লম্বা অংশটি খসে যাওয়ায় তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো ২২৬' ফুট। রকেট এই আড়াই মিনিটে ২,২৫০ টন জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলেছে, পাঁচটি এফ-১ ইঞ্জিন সহ তার নিজেরও ওজন ছিল ১৫০ টন; তাই রকেটের তৃতীয় অংশটি খসে যাওয়ায় যানটির ওজন ২,৪০০ টন কমে গিয়ে দাঁড়ালো মাত্র ৮০০ টন, পৃথিবী ছেড়ে উঠার সময় যা ওজন ছিল, তার চারভাগের একভাগ মাত্র।

রকেটের ৮২' ফুট লম্বা দ্বিতীয় অংশটি সক্রিয় হবার সঙ্গে সঙ্গে যানের গতি দ্রুততর হল। রকেটের এ অংশটিতে দুটি মাত্র জে-২ ইঞ্জিন। এ ইঞ্জিনগুলির শক্তিও অনেক কম। তবে যানটির ওজন এখন আগের ওজনের চারভাগের একভাগ মাত্র। তাই সাড়ে ছয় মিনিট পরে যানটির গতি বেড়ে গিয়ে হল ঘণ্টায় ১৪,০০০ মাইল। যানটি তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১১৮ মাইল ওপরে উঠে এসেছে, যে উচ্চতায় থেকে সে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, তার প্রায় কাছাকাছি।

এখানে তুলে দিয়ে রকেটের দ্বিতীয় অংশটি খসে পড়ল, তৃতীয় অংশ সক্রিয় হল। এখন যানের দৈর্ঘ্য আরো কমে গিয়ে হল ১৪৪' ফুট, আর ওজনও কমে গিয়ে হল মাত্র ৩০০ টন, যাত্রাকালীন ওজনের প্রায় এগারো ভাগের একভাগ। কারণ রকেটের দ্বিতীয় অংশের জ্বালানি (তরল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন) ৪৭০ টন আর তার নিজের ওজন ৩০ টন তখন কমে গেছে। স্যাটার্ন-৫ রকেটের ৬০' লম্বা তৃতীয় ও শেষ অংশটি ২ মিনিটের কিছু বেশী সক্রিয় থেকে যানটির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইলে। যানটি যখন পৃথিবী-পরিক্রমার কক্ষপথে উঠে এসেছে (পৃথিবীপৃষ্ঠ ছাড়ার ১১ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড পরে), তখন রকেটের তৃতীয় অংশটির ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হল; এ-অংশে একটি মাত্র জে-২ ইঞ্জিন ছিল। রকেটের তৃতীয় অংশের ইঞ্জিন বন্ধ করা হল বটে, কিন্তু সেটিকে তখন যান থেকে খসিয়ে দেওয়া হল না, তার জ্বালানিও (১১৫ টন তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেন) নিঃশেষ হয়নি। তার আরো কাজ আছে।

পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করার পরই যানটির একেবারে মাথায় কম্যাণ্ড মডিউলের ওপর মুকুটের মতো লাগানো লাঞ্চ-এসকেপ মডিউলটিকে যান থেকে খসিয়ে দেওয়া হল। এটির কাজ ছিল—কক্ষপথে ওঠার আগে রকেটে যদি কোন গণ্ডগোলের লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে সে কম্যাণ্ড মডিউলকে নীচের বাকী সব অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মহাকাশযাত্রিগণ সহ সেটিকে নিরাপদে পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে আসবে। সে প্রয়োজন হয়নি। এর পরে আর কোন প্রয়োজনও নেই তার।

৩

মহাকাশযানটি ইঞ্জিন বন্ধ থাকা অবস্থাতেই নিজের গতিবেগ ও পৃথিবীর আকর্ষণের যুক্ত ফলে পৃথিবী পরিক্রমা করতে করতে যখন প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল,
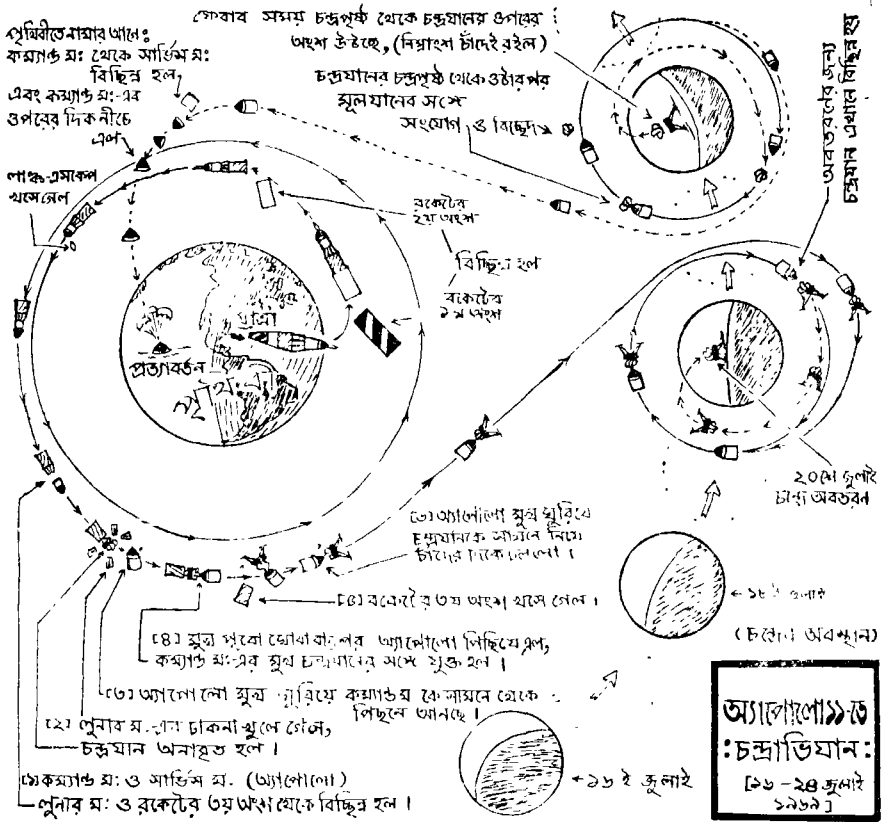
২নং চিত্র

তখন বিষুবরেখার কাছে আসতেই রকেটের তৃতীয় অংশটিকে আবার চালু করে যানের মুখ চাঁদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। এই সময় চাঁদের কক্ষপথ (চাঁদ যে পথ ধরে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে সেই পথ) যানটির ঠিক মাথার ওপর এসে গিয়েছিল। চাঁদের দিকে মুখ ঘোরানো হল মানে চাঁদ তখন সেখানে ছিল সেখানটা লক্ষ্য করে নয়, ২০শে জুলাই যানটি যখন চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছুবে তখন চাঁদ যাতে যানটির কাছ থেকে ৭০ মাইল মত দূরে থাকে এমন একটি স্থানকে লক্ষ্য করে। যানটি তখন চাঁদে যাওয়ার জন্য পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে ঘণ্টায় প্রায় ২৫,০০০ মাইল বেগে মহাকাশে পাড়ি লাগাল।

মহাকাশের পথে পাড়ি দেবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই কম্যাণ্ড মডিউল এবং সার্ভিস মডিউল যুক্ত থেকে, নীচের বাকি অংশ (লুনার মডিউল ও রকেটের তৃতীয় অংশ) হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ৫০' ফুট এগিয়ে গেল। এই সময় এই প্রক্রিয়ার ফলে ব্যবস্থামত লুনার মডিউলের বাইরের ঢাকনাগুলি খুলে খসে গেল, লুনার মডিউলের ভেতরে রক্ষিত চন্দ্রযান অনাবৃত হয়ে পড়ল; চন্দ্রযানের পায়াগুলি গোটানো অবস্থায় রকেটের তৃতীয় অংশের মধ্যে ঢোকানো ছিল। তারপর

এগিয়ে যাওয়া অংশটি একেবারে উল্টে গেল অর্থাৎ সামনের দিকের কম্যাণ্ড মডিউল পিছনে এল এবং সার্ভিস মডিউল সামনে গেল। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে সেটি গতিবেগ কমিয়ে দিতে থাকল, যার ফলে পিছনে বিচ্ছিন্ন করা রকেটের তৃতীয় অংশের সঙ্গে সংযুক্ত লুনার মডিউলের সঙ্গে তার ৫০' ফুটের ব্যবধান কমতে কমতে শূন্য হয়ে গেল—চন্দ্রযানের মাথার সঙ্গে কম্যাণ্ড মডিউলের মাথা ঠেকে গেল। দুটিকে বেশ ভাল-ভাবে যুক্ত করা হল তখন। উৎক্ষেপের সময় উৎক্ষেপণের সুবিধার জন্য যেভাবে যানটির বিভিন্ন অংশ সাজানো হয়েছিল, তাতে একেবারে মাথায় ছিল লাঞ্চএসকেপ মডিউল (১নং চিত্র—ক ; আগেই খসে গেছে), তার পরে কম্যাণ্ড মডিউল (খ), তার পরে সার্ভিস মডিউল (গ), তার পরে লুনার মডিউল (ঘ), তার পর সাটার্ণ-৫ রকেটের মস্তিষ্ক (ঙ), তার পর রকেটের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম অংশ (চ, ছ ও জ ; আগেই ছ ও জ খসে গেছে)। এখন সাজানোটা দাঁড়ালো এই রকম : সামনে সার্ভিস মডিউল (গ), তার পর কম্যাণ্ড মডিউল (খ), তার পর ঢাকনাহীন লুনার মডিউল অর্থাৎ চন্দ্রযান (ঘ), তারপর রকেটের তৃতীয় অংশ (ঙ-চ)। এর পর রকেটের তৃতীয় অংশটিকে যান থেকে খসিয়ে দেওয়া হল ; যানের তখন অবশিষ্ট রইল চন্দ্রযান, তার আগে কম্যাণ্ড মডিউল, তার আগে সার্ভিস মডিউল (ঘ—খ—গ→)। রকেটের তৃতীয় অংশ খসে যাবার পর যানটি আর একবার উল্টে গিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে এল, আর সেভাবেই ছুটে চলল চাঁদের দিকে ; এই সব প্রক্রিয়ার ফলে তফাত এটুকু হল, আগে চন্দ্রযান সার্ভিস মডিউলের পিছনে পা-মোড়া হয়ে ঢাকনায় ঢাকা ছিল, এখন খোলা অবস্থায় পা-ছড়িয়ে কম্যাণ্ড মডিউলের সামনে—যানের একেবারে সামনে এল (গ—খ—ঘ→)। রকেটের তৃতীয় অংশটি খসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রযানের গোটানো পায়াগুলি সোজা হয়ে গিয়েছিল (২নং চিত্র)।

চন্দ্রযানকে এভাবে কম্যাণ্ড মডিউলের সামনে আনার প্রয়োজন ছিল। দুজন মহাকাশচারীকে সার্ভিস মডিউল থেকে চন্দ্রযানে প্রবেশ করতে হবে চাঁদে নামার আগে, আবার ফেরার সময় চন্দ্রযান থেকে কম্যাণ্ড মডিউলের ভেতর ফিরে আসতে হবে। দুটো গায়ে গায়ে না থাকলে তা করা যায় না। অথচ উৎক্ষেপণের সময় পৃথিবী থেকে এইভাবে সাজিয়েও আনা যায় না ; কারণ তাতে যানটিকে ওপরের দিকে ক্রমশঃ সরু, শেষে একেবারে সূঁচল করা যাবে না। এদিকে পৃথিবীর চারদিক ঘেরা আবহমণ্ডলের প্রতিক্রিয়া ঠেলে তা ভেদ করে ওপরে তুলতে গেলে যানটিকে মাথার দিকে এভাবে ক্রমশঃ সরু করে আনতেই হবে। মহাকাশে এসে সে প্রয়োজন নেই, চাঁদের কাছে গিয়েও না, কারণ এসব জায়গায় আবহমণ্ডল নেই ; প্রায় কিছুই নেই যা যানটির ছুটে চলার সময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকে পিছনে ঠেলে দিতে চাইবে। অবশ্য যানটির গতি একটু একটু করে কমে আসছিল অন্য কারণে ; পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করছিল। এই আকর্ষণের ফলে যানটি যখন চাঁদের কাছাকাছি পৌছেছে, চাঁদ যখন মাত্র ৩০,০০০ মাইল দূরে, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল থেকে কমে গিয়ে দাঁড়ালো ঘণ্টায় মাত্র ২,২২৩ মাইল। এর পর যানটির ওপর পৃথিবীর টানের চেয়ে চাঁদের টানের জোর হল বেশী। তখন চাঁদের টানে যানটির গতি ক্রমশঃ বেড়ে চাঁদের ঠিক ওপাশে গিয়ে হল ঘণ্টায় ৫,৭০০ মাইল ; এই সময়, ১৯শে জুলাই রাত্রি পৌনে এগারটার সময়

মহাকাশযাত্রীরা সার্ভিস মডিউলের ইঞ্জিন চালিয়ে এই গতিবেগ কমিয়ে ঘণ্টায় ৩,৭০০ মাইল করলেন; তখন যানটি চাঁদের আকর্ষণ আর গতিবেগের মিলিত ফলে চাঁদের চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করল।

যানের গতিবেগ এভাবে না কমালে সেটি চাঁদের চারদিকে ঘুরতো না, সোজা ছুটে চলে যেত চাঁদ থেকে আরো দূরে। তখন অবশ্য চাঁদ ও পৃথিবী তাকে একই দিকে টানত, যাতে যানের গতি ক্রমশঃ কমে যেত এবং এক জায়গায় গিয়ে সে থেমে যেতই। তারপর আবার ফিরতে শুরু করত এবং ক্রমবর্ধমান গতিতে এগিয়ে এসে চাঁদকে ছাড়িয়ে ফিরে আসতো পৃথিবীতে। চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনাতে এই পরিস্থিতিকে যাত্রীদের একটি স্বাভাবিক নিরাপত্তার উপায় বলে ধরে রাখা হয়েছে।

অ্যাপোলো-১১ যানটি চাঁদকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্রায় ২ ঘণ্টা করে সময় নিচ্ছিল। এভাবে ১০ বারেরও বেশী চন্দ্র-প্রদক্ষিণের পর আর্মষ্ট্রং ও এ্যালড্রিন কম্যাণ্ড মডিউল থেকে চন্দ্রযানে প্রবেশ করলেন। কম্যাণ্ড মডিউলের মুখ ও চন্দ্রযানের মুখ যেখানে সংযুক্ত হয়েছে, সেখানে দুটিতেই ৩২" ইঞ্চি চওড়া এবং দুটি যানের সংযুক্ত অবস্থায় মোট ১৮" ইঞ্চি লম্বা একটি সুরঙ্গপথ; সে পথের কবাট খুলে প্রথমে এ্যালড্রিন ঐ সুরঙ্গপথ দিয়ে চন্দ্রযানে গেলেন; তার ২৫ মিনিট পর গেলেন আর্মষ্ট্রং। বেশ ভালভাবে তাঁরা চন্দ্রযানের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখলেন ঠিক আছে কিনা; কারণ চাঁদে নামা ও উঠার সময় চন্দ্রযানের যন্ত্রগুলিই একমাত্র অবলম্বন।

চাঁদকে ১২ বার প্রদক্ষিণের পর, ২০শে জুলাই রাত্রি ১১টা ১৮ মিনিটের সময় চন্দ্রযান ঈগলকে মূলযান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। এটা ঘটল যান যখন চাঁদের ওপাশে, যখন আমাদের ও চন্দ্রযানের মাঝখানে রয়েছে চাঁদ। বিচ্ছিন্ন হবার পর চন্দ্রযান যে-পথে চন্দ্রপ্রদক্ষিণ করছিল, রাত্রি ১২-৩৮ মিনিটের সময় নিজের ইঞ্জিন চালু করে তার চেয়ে আরো একটু নীচে নামল। এ'দিকে মূলযানে চড়ে কলিন্স একা আগের পথেই (চাঁদ থেকে ৭০ মাইল ওপরে) চন্দ্রপরিক্রমা করে চললেন, আর দেখতে লাগলেন চন্দ্রযানের অবতরণ; বেতারে বললেন, "এই চন্দ্রযান ঈগলটি একটি কুৎসিত পাখির মত দেখাচ্ছে, কিন্তু সে নামছে বেশ ভালভাবেই"। রাত্রি ১-৩৫ মিনিটের সময় চন্দ্রযান চন্দ্রপৃঠে অবতরণ শুরু করল; চন্দ্রযান আর চন্দ্রপৃষ্ঠের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। প্রক্রিয়ার সবটাই পরিচালিত হচ্ছিল যন্ত্রে, কিন্তু নামার ঠিক আগে যাত্রীরা দেখলেন, যেখানটায় নামার কথা, সে জায়গাটা মোটেই সমতল নয়, এলোমেলো বড় বড় পাথরের স্তূপ সর্বত্র। সেখানে যান নামলে বিপদ; যদি ভেঙ্গে না-ও যায়, নেমে বেশী কাত হয়ে বসলে, ১৫° ডিগ্রীর বেশী হেলে বসলে, চন্দ্রযানকে আর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ওপরে তোলাই যাবে না; তার মানে জলহীন বায়ুহীন খাদ্যহীন স্থানে নিশ্চিত মৃত্যু। যাত্রীরা তখন পরিচালনভার যন্ত্রের হাত থেকে নিজেদের হাতে নিলেন এবং যানটিকে চন্দ্রপৃষ্ঠের ৫০' ফুট ওপর দিয়ে সামনে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কিছুদূরে সমতলভূমির ওপর নামলেন।

চন্দ্রযান চাঁদের ওপর যেখানটায় নামল, সে অঞ্চলটির নাম 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র'। নাম সমুদ্র হলেও এটি সমুদ্র নয়, মরুভূমির মতো; চাঁদে জলই নেই, জলে তরঙ্গ তোলার জন্য হাওয়াও নেই। বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধের জন্য

চাঁদের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন নাম রেখেছেন, সে-সব নামই চলে আসছে। দূর থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ যেখানে-যেখানে সমতল বলে মনে হয়, সেসব জায়গার নাম 'সমুদ্র' রাখা হয়েছে। যেমন 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র', 'প্রশান্তি সমুদ্র', 'সঙ্কট সমুদ্র', 'অমৃত সমুদ্র' ইত্যাদি; একটি এলাকার নাম 'স্বপ্ন সরোবর'—ছোট বলে সমুদ্র বলা হয়নি। পৃথিবীতে স্থান-নির্দেশের জন্য আমরা যেমন তার ওপর বিষুব-রেখা, অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা রেখা প্রভৃতি কতকগুলি কাল্পনিক রেখা টেনে ভাগ করি, চাঁদকে বিজ্ঞানীরা সেভাবে কাল্পনিক রেখা টেনে ভাগ করেছেন। চন্দ্রযান যেখানে অবতরণ করল, সেখানটা

◉=চন্দ্রযানের অবতরন-স্থল [0·6914° lat., 23·614° long.]
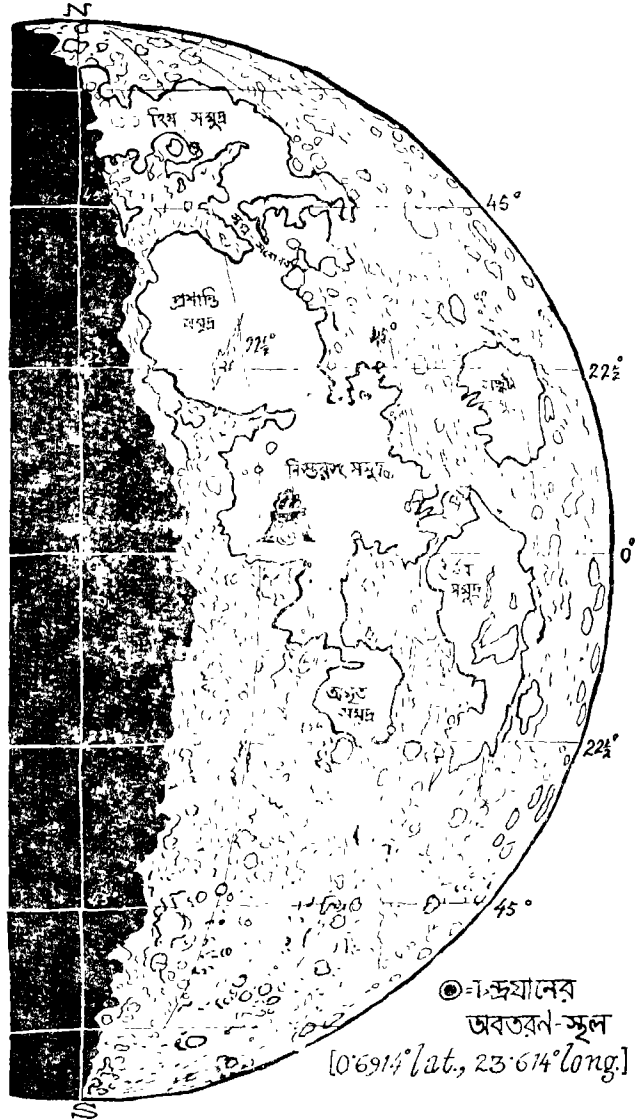
৩নং চিত্র

চাঁদের বিষুবরেখা থেকে প্রায় ০·৬৯১৪° উত্তরে, এবং চাঁদের যে দিকটা আমরা দেখতে পাই (চাঁদ ২৯½ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তার নিজের চারিদিকে একবার ঘোরেও ২৯½ দিনে, সেজন্য সব সময়ই চাঁদের একই পৃষ্ঠ পৃথিবী থেকে দেখা যায়), তাকে চাঁদের

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সংযোগ করে সমান দুভাগ করলে যে রেখায় দ্বিধাবিভক্ত হয়, সেই রেখা থেকে ২৩·৬১৪° ডিগ্রী পূবে। (৩নং চিত্র)।

চন্দ্রযান যখন চাঁদের ওপর নামল, তখন তার পায়াগুলি চাঁদের মাটিতে মাত্র ২" বসে গিয়েছিল। পায়াগুলির নীচে গোলাকার পা-দানি (কিনারা-উঁচু থালার মত আকারের) লাগানো ছিল, যাতে যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করলে তার নামার বেগজনিত চাপ অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে যায়। নামার সময় উপরের দিকে ইঞ্জিনের মুখ ছিল, চাঁদের আকর্ষণে কমিয়ে যানটিকে যথাসম্ভব ধীর গতিতে নামাবার জন্য; ইঞ্জিনের গ্যাসের বেগে, যান নামার ঠিক আগে চাঁদের ধুলো ওপরে উঠে যায়—ধুলোর ঝড়ের মত যানটিকে ঢেকে ফেলে। নামার সময় জানলায় ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তোলা হচ্ছিল; এই ধুলোর ঝড় জানলা ঢেকে দেওয়ায় ছবি ঝাপসা ওঠে কিছুক্ষণ! অবশ্য অতি অল্পক্ষণই তা ছিল।

যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে বসেছিল প্রায় খাড়া হয়ে—মাত্র ৪° হেলে।

খুব সুন্দরভাবে, নির্বিঘ্নে, ঠিক পরিকল্পনা-মতই পৃথিবী থেকে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে মানুষ যান নিয়ে গিয়ে নামাল চাঁদের ওপর, ১৯৬৯-র ২০শে জুলাই, রাত্রি ১·৪৭ মিনিটের সময়।

মানুষের কত দিনের স্বপ্ন সফল হল, মানুষের জ্ঞানের—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কত বড় সাফল্য এটি, মানুষের অধ্যবসায়, উদ্যম ও সাহসের কত বড় নিদর্শন! এই প্রথম মহাকাশের বুকে পাড়ি দিয়ে মানুষের তৈরী ভেলা মানুষ নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে অপর জ্যোতিষ্কে গিয়ে ভিড়ল। (ক্রমশঃ)

"মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহা বীর্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

কর্মিগণের গম্য চন্দ্রলোক

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

আধুনিক জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানের বলে মানব-সন্তান স্থূল শরীরেই চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবতই জিজ্ঞাসার উদয় হয়—হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত যে চন্দ্রলোক, যাহা পিতৃযাণমার্গের শেষ সীমা, আতিবাহিক দেবগণ কর্তৃক বাহিত না হইয়া যে-স্থলে গমনের অন্য উপায় নাই, ইষ্টাপূর্তাদি কর্মানুষ্ঠানকারিগণ বহু আয়াসের ফলে যেখানে গমনের অধিকার লাভ করেন, সেই চন্দ্রলোকে যখন মানব-সন্তান এইভাবেই গমন করিতে সমর্থ হইলেন, তখন তো বৈদিক বা স্মার্ত কর্মসকলের কোন উপযোগিতাই নাই! বেদাদি শাস্ত্রেরই বা সার্থকতা কোথায়? এই জাতীয় প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগা অস্বাভাবিক নহে বলিয়া এবিষয়ে কিছু শাস্ত্রীয় আলোচনা করা হইল।

হিন্দুশাস্ত্রমতে মনুষ্যগণের ভোগভূমিভূত লোক সাতটি, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য। এই সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক। বিষ্ণুপুরাণ, ২।৭ অধ্যায়ে ভূর্লোকাদির স্থান এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—সর্বোচ্চ পর্বতশিখর পর্যন্ত পাদগম্য স্থানই—**ভূর্লোক**। ভূমি ও সূর্যের মধ্যবর্তী সূর্যের নিম্নদেশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে বিরাজিত লোকসকলই **ভুবর্লোক**। পরিদৃশ্যমান উপগ্রহ চন্দ্রমা ইহারই মধ্যে অবস্থিত। এই ভুবর্লোকের অপর নাম—'অন্তরিক্ষলোক ও মরীচিলোক', ইহা "তে অন্তরিক্ষম্ আবিশতঃ, তে দিবম্ আবিশতঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৪।৫।৬-৭) ইত্যাদি শ্রুতি, এবং "দ্যুলোকাৎ অধস্তাৎ অন্তরিক্ষম্ যৎ তৎ মরীচয়ঃ" (ঐতঃ উপঃ ১।১।২ ভাষ্য) ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। সূর্যমণ্ডলের ঊর্ধ্ববর্তী জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুবনক্ষত্র পর্যন্ত স্থলে অবস্থিত লোকসকলকে বলে—**স্বর্লোক**। ইহার অপর নাম স্বর্গলোক. "তে দিবম্ আবিশতঃ" ইত্যাদি শতপথ শ্রুতি, এবং "দ্যুলোকং স্বর্গাখ্যম্" ইত্যাদি তত্রস্থ সায়ণভাষ্য হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। ধ্রুবের ঊর্ধ্বে **মহর্লোক** (বিষ্ণুপুঃ ২।৭।৪২, কূর্মপুঃ ৪৩।১)। তাহার ঊর্ধ্বে **জনলোক**, তদূর্ধ্বে **তপোলোক** এবং তদুপরি নানা স্তরে বিভক্ত **সত্যলোক**। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে এতদ্বিষয়ক বর্ণনাতে একটু তারতম্য আছে, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। তবে সেই মতে স্বর্গলোক ধ্রুবেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

এক্ষণে আমরা কর্মিগণের গম্য যে চন্দ্রলোক, তাহা এই লোকসপ্তকের মধ্যে কোথায় অবস্থিত এবং এই পরিদৃশ্যমান উপগ্রহভূত চন্দ্রমাই সেই চন্দ্রলোক কি না, তাহা নিরূপণের প্রয়াস করিতেছি।

(ক) দেবযানমার্গ-বর্ণনাতে শ্রুতি বলিতেছেন —"আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্" (ছাঃ ৫।১০।২), ইহা হইতে অবগত হওয়া যায়—কর্মিগণের গম্য চন্দ্রলোক সূর্যের ঊর্ধ্বদেশে, সুতরাং দ্যুলোকের অর্থাৎ স্বর্গলোকের মধ্যে অবস্থিত। "অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবম্" (ঐতঃ ১।১।২), এই শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন— "বিপ্রকৃষ্টা আপঃ চান্দ্রমস্য অন্তঃপদার্থঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।১।১৬)। সুতরাং ঐতরেয়ক শ্রুত্যুক্ত অম্ভঃশব্দে জলপূর্ণ চন্দ্রলোক গ্রহণীয়। "পরেণ

দিবম্" এই শ্রুত্যংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ তস্য অন্তসো লোকস্য" ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের আলোচ্য চন্দ্রলোক সূর্যের ঊর্ধ্বে দ্যুলোকের মধ্যে অবস্থিত, ইহাই নির্ণীত হয়। কূর্মপুরাণও তাহাই বলেন—"ভূমের্যোজনলক্ষে তু ভানোর্বৈ মণ্ডলং স্থিতম্। লক্ষ্যে দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্" ॥ (কূর্মপুঃ ৪০।৮) ইত্যাদি।

(খ) আবার "বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজা" (বৃঃ ২।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে "পাণ্ডরং শুক্লং বাসঃ···অপ্-শরীরত্বাৎ চন্দ্রাভিমানিনঃ" ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন হইতে, "ভানুমণ্ডলতো যস্মাৎ দ্বিগুণং চন্দ্রমণ্ডলম্",[১] (বৃঃ ভাষ্যবার্তিক ২।৪।৫৪-৫৫), ইত্যাদি বার্তিককারের বচন হইতে, "দ্বিগুণঃ সূর্যবিস্তারাৎ বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ" (কূর্মপুঃ ৪০।১৪) ইত্যাদি স্মৃতিবচন হইতে এবং উক্ত ঐতরেয়ক ১।১।২ শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়—এই কর্মিগম্য চন্দ্রমা জলপূর্ণ এবং সূর্যমণ্ডলাপেক্ষা বৃহৎ।

(গ) চন্দ্রলোকে গমনকরতঃ কর্মির জলময় শরীর লব্ধ হয়, ইহা "চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যম্ আরভন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৪ ভাষ্য), ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। তাহা সঙ্গতও বটে, কারণ ভূর্লোকে আমাদের ক্ষিতিপ্রধান শরীরের ন্যায় জলপ্রধান চন্দ্রলোকে জলপ্রধান শরীর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এইরূপে এতাবৎ পর্যন্ত শাস্ত্রবিচারে আমরা দেখিলাম—কর্মিগম্য শাস্ত্রীয় চন্দ্রলোক সূর্যের ঊর্ধ্বে দ্যুলোকে অবস্থিত, তাহা সূর্যাপেক্ষা বৃহৎ ও জলপূর্ণ। পাতঞ্জলের মতে তো তাহা ধ্রুবেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আর কর্মিগম্য এই চন্দ্রলোক দ্যুলোকের, অর্থাৎ স্বর্গলোকের অন্তর্গত হইলেই "স্বর্গকামো যজেত", "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি শ্রুতিরও সার্থকতা সিদ্ধ হয়। অতএব নির্ণীত হইতে—ভুবর্লোকের মধ্যে অবস্থিত পরিদৃশ্যমান এই উপগ্রহভূত চন্দ্রমা, কর্মিগণের গম্য চন্দ্রলোক নহে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তে একটি বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা এই—স্মৃতি বলেন, "দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র সূর্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাট্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥" (মহাভাঃ, উদ্‌যোগপর্ব ৩৩,৬৭)। সুতরাং কর্মিগম্য শাস্ত্রীয় চন্দ্রলোক যদি সূর্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ইষ্টাপূর্তকারী কেবল কর্মী সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া কিপ্রকারে সেখানে গমন করিবেন? উক্ত স্মৃতিবাক্যে তো যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং সম্মুখ সমরে নিহত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও সূর্যমণ্ডল ভেদের প্রতিষেধই প্রতিভাত হইতেছে। এই বিরোধের সমাধান কি? তাহা বলা হইতেছে—দেবযানমার্গে আতিবাহিক দেবগণকর্তৃক বাহিত হইয়া সূর্যমণ্ডলভেদ করতঃ যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা ঋজুমার্গাবলম্বনে ঝটিতি গমন করেন, ইহা "সঃ যাবৎ ক্ষিপেৎ মনঃ তাবৎ আদিত্যং গচ্ছতি" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ত্বরাবচনম্ গন্তব্যান্তরাপেক্ষয়া শৈঘ্র্যার্থত্বাৎ" (ব্র. সূঃ ৪.৩।১ সূ-ভাষ্য) ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন এবং "বক্রাধ্বনা গতিম্ অপেক্ষ্য অবক্রেণ গতিঃ ত্বরাবতী কল্প্যতে" (ন্যায়নির্ণয় ৪।৩.১) ইত্যাদি টীকাকারীয় বচন হইতে নির্ণীত হয়। ভাষ্যকারীয় বচনে "গন্তব্যান্তর' বলিতে অবশ্যই কর্মিগম্য চন্দ্রলোককে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ শ্রুতিতে পিতৃযাণমার্গে সর্বোচ্চ স্থলে অবস্থিত চন্দ্রলোক এবং দেবযানমার্গে সত্যলোক পর্যন্ত

১ "অন্তোঽতিপাণ্ডরং বাসঃ যস্মাচ্চন্দ্রাভিমানিনঃ"

দেবলোকসমূহ ব্যতিরেকে অন্য কোন গন্তব্য স্থান নাই। উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সত্যলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং 'গন্তব্যান্তর' বলিতে চন্দ্রলোককেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে ইহাই নির্ণীত হয় যে, পিতৃযাণমার্গবাহী আতিবাহিক দেবগণ কর্মীকে লইয়া বক্রমার্গাবলম্বনে সূর্যমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া তদূর্ধ্ববর্তী কর্মিগণের গম্য জলপূর্ণ চন্দ্রলোকে গমন করেন, এবং অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিমান দেবযানমার্গবাহী আতিবাহিক দেবগণ উপাসকাদি সূর্যমণ্ডলভেদের অধিকারিগণকে লইয়া ঋজুমার্গাবলম্বনে সূর্যমণ্ডলকে ভেদ করিয়াই গন্তব্য দেবলোক গমন করেন। এইরূপে উক্ত বিরোধ নিরাকৃত হইয়া পড়ে।

অতএব জ্যোতিষ্কবিজ্ঞানবলে মানবসন্তান যে চন্দ্রলোকে গমন করিতেছে, তাহা কেবল কর্মিগণের গম্য শাস্ত্রবর্ণিত চন্দ্রলোক না হওয়ায় হিন্দুগণের বেদাদিশাস্ত্রের কোনপ্রকার বিরোধ হয় না।

চলার পথে

শ্রীদীপেন্দ্র চক্রবর্তী

প্রতি পরমাণু মাঝে আত্মা মোর লীন
প্রভাসিত তত্ত্ব তার অনন্ত মাঝারে ;
তাইতো পারি না আমি স্বচ্ছদৃষ্টিহীন
পশিতে যে বিশ্বব্যাপী অরূপ আত্মারে।
রূপের সাগর মাঝে প্রাণপণ করিয়া প্রয়াস
বারে বারে আসে শ্রান্তি যখনি সন্তরি ;
হইবে কি ঐকান্তিক চেষ্টা মোর বৃথা
পাব না কি আমি হায় সিন্ধুতীরে তরী !

বিশ্বের দুয়ারপ্রান্তে দাঁড়ায়ে একাকী
গাহিতেছি নিজ মনে অসীমের গান ;
নিখিল আত্মার সাথে একদা মিলন
হইবে নিশ্চয় মোর, জানি ভগবান !

সমালোচনা

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তা: হরপ্রসাদ মিত্র। বেঙ্গল পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-১২; পৃঃ ১৯৮; মূল্য ছয় টাকা।

সাম্প্রতিক বিবেকানন্দচর্চার পটভূমিতে অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের আলোচ্য গ্রন্থটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আধুনিককালে ভারতীয় মনীষীদের সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার কিছু সার্থক প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিশেষভাবে শতবার্ষিকী-উদ্‌যাপনের আয়োজন থেকেই এ-জাতীয় প্রচেষ্টার সূত্রপাত হলেও এর দ্বারা সাধারণ পরিচয়ের অন্তরালে একই মহাপুরুষের অন্তর্লোকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনাপ্রসঙ্গে আমাদের তথ্য-সমৃদ্ধি ও উপলব্ধি-গভীরতা—দুইই ঘটে থাকে। স্বামীজীর মতো যুগমনীষাপ্রসঙ্গে এজাতীয় আলোচনা আরো বেশী প্রয়োজনীয়। কারণ, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর যথাযথ স্থান-নিরূপণের কাজ এদেশে এখনো বাকি। তাঁর অধ্যাত্ম-ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, চারুকলায়, কারিগরী বিদ্যায়, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারে, সর্বোপরি মহত্তম মননে ও দর্শনে যে হিমালয়োপম বিকাশ দেখা দিয়েছিল, দূর থেকে তার কয়েকটি গিরিশৃঙ্গের রূপরেখামাত্র এ যাবৎকাল আলোচিত। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রবেশের অন্তর্দৃষ্টি যে ঋষিকল্প মহাপুরুষদের থাকতে পারে, তাঁদের কথা বাদ দিলেও স্বামীজীর চিন্তাধারার নানামুখী বিশ্লেষণে সযত্ন প্রয়াস আমাদের বুধমণ্ডলীর কাছে একান্ত প্রত্যাশিত। সে প্রত্যাশা-পূরণের উদাহরণ অবশ্য বিরল। অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের 'বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তা' এদিক থেকে আগ্রহী পাঠকের অভিনন্দন লাভ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যসৃষ্টি ও সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে এর আগে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে গবেষণাধর্মী আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। অধ্যাপক মিত্র পূর্ব-আলোচনার সংকেত গ্রহণ করলেও নিজস্ব পঠন ও মননের বিপুল তথ্যসম্ভারের ভিত্তিতে স্বামীজীর সাহিত্য ও সমাজ-বিষয়ে মূল চিন্তাসূত্রগুলি বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর মানস-পরিমণ্ডলটি এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ-মানসের পরিধি- ও গভীরতা-নিরূপণে সহায়ক হয়েছে।

'ভারত-সাধকের বিশ্বভাবনা' প্রবন্ধ থেকেই বিবেকানন্দের বিশ্বতোমুখী মনীষার মূল-পরিচয়টি অধ্যাপক মিত্র নিপুণ তথ্যসমাবেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিবেকানন্দ-মানসের প্রস্তুতিপর্বের রূপরেখা হিসাবে 'অন্বয়দৃষ্টি ও আত্মসন্ধান', 'সমাজ-মনের অবসাদমুক্তি', 'একজন পূর্বগামীর চিন্তা'—অধ্যায় তিনটি প্রণিধানযোগ্য। শেষোক্ত প্রবন্ধে আচার্য ভূদেবের সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার ঐক্য সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তবে ভূদেবের আগে ও পরে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পূর্বগামীদের সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাসূত্রের ঐক্য ও অনৈক্য আজও বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বিবেকানন্দ-মানসের অন্তরেতিহাসে Imitation of Christ

(ঈশানুসরণ) গ্রন্থটির প্রস্তাব সম্বন্ধে 'বিবেকানন্দের একখানি প্রিয় গ্রন্থ' নিবন্ধটি সুন্দর আলোকপাত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের দু' বৎসর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'একটি পুরাতন কথা' নিবন্ধের বক্তব্যসূত্র অনুসরণ করে লেখক স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সৌসাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন। একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনাও 'ত্যাগে'র বিশেষ মূল্য স্বীকার করে নিয়েই তাঁর জীবনসাধনাকে পরিচালিত করেছে। কিন্তু সমগ্র ভারতের পুনরুজ্জীবনে ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতার যে একান্ত মূল্য স্বামীজী নির্ধারণ করেছেন, রবীন্দ্রমননে ত্যাগের সেই গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনুপস্থিত। একদিকে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির তুঙ্গতম শীর্ষ আর একদিকে জগৎকল্যাণে আপন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত নিঃশেষে বিলোপ—এ দু'দিক থেকেই বিবেকানন্দের মানসপ্রয়াণ রবীন্দ্রভাবলোক থেকে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাই মনে হয়, অধ্যাত্মচেতনার জগতে এবং সাহিত্যচিন্তার জগতেও রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন মানদণ্ডের প্রয়োজন।

উদাহরণস্বরূপ এ বইয়ের 'সাহিত্য ও সমাজকথায় বিবেকানন্দ' এবং 'বিবেকানন্দের সাহিত্য' প্রবন্ধ দুটি স্মরণীয়। প্রথম প্রবন্ধের প্রথম বাক্যেই লেখকের মন্তব্য—'বিবেকানন্দ সাহিত্যিক ছিলেন না।' এর ব্যাখ্যাস্বরূপ দ্বিতীয় বাক্য—'তাঁর বাংলা লেখাগুলিতে সাহিত্যগুণ আছে বটে, তবে প্রধানত সাহিত্যস্রষ্টা হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।' প্রধানতঃ সাহিত্যিক হওয়ার মানদণ্ড এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি নিশ্চয়। তাঁদের মতো ব্যাপক সৃষ্টির অবসর নিশ্চয় স্বামীজীর ছিল না; কিন্তু সাহিত্যের ভাষা, সৌন্দর্য, মনন-গভীরতা—এসব কিছু সম্বন্ধে তিনি রীতিমতো সজাগ লেখক। এমন কি তাঁর নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ও যথেষ্ট—১৮৯৯-এর ১০ই আগস্ট লণ্ডন থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখা চিঠিতে 'উদ্বোধন'-পত্রিকা-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়—'সারদা বলে, কাগজ চলে না।… আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব advertise ক'রে ছাপাক দিকি—গড় গড় ক'রে subscriber হবে।' তিনি অল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু যা লিখেছেন তা বিশেষ যত্ন করেই লিখেছেন। পরিমাণগত বিচারে নয়, গুণগত বিচারেই বিবেকানন্দ জাত-সাহিত্যিক। তাঁর 'পত্রাবলী'র অধিকাংশ পত্র, 'পরিব্রাজক' বা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' যেমন চলতি ভাষার শাণিত ইস্পাতের তরবারি, তেমনি সাধুভাষায় তাঁর স্থিতধী মনস্বিতার অতুলনীয় উদাহরণ 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা' (বর্তমান সমস্যা), 'জ্ঞানার্জন' বা 'বর্তমান ভারতে'র মতো নিবন্ধাবলী। অপরপক্ষে তাঁর ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতার মধ্যে এমন ভাব-ভাষা-ছন্দের মিলিত সৌন্দর্য রয়েছে, যা কবিরূপে তাঁর অন্তরতম পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছে।

সুতরাং 'বিবেকানন্দের সাহিত্য' (পৃঃ ১২৪) নিবন্ধের মন্তব্য—'…দেশের সমকালীন কাব্য-ভাষার গতি কোন্ দিকে, অথবা যে-ভাষা কবিতার উপযোগী, যাতে সাহিত্য-সচেতন সাহিত্য-রসিক মন অন্য কোনো আনুগত্য ব্যতিরেকেই সাড়া দিতে পারে, সে-ভাষা আয়ত্ত করবার মতন বিস্তৃত সময় বা তীক্ষ্ণ আগ্রহ ছিল না তাঁর।' একথা স্বীকৃতিযোগ্য নয়। গদ্যের মতো কবিতার ভাষাও স্বামীজীর একান্ত নিজস্ব। অন্য কোনো ভাষায় এই বক্তব্য আপন প্রাণসত্যে প্রতিষ্ঠা পেত না। সমকালীন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের থেকে বিবেকানন্দের কবি-ভাষা আলাদা এবং সেই স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা।

স্বামীজীর কবিতার ভাষায় যে রুদ্রমাধুর্যের প্রকাশ ও অতল উপলব্ধির আভাস, চিরকালের বাংলা সাহিত্যে তার শ্রেষ্ঠ আসন নির্ধারিত।

ঐ একই নিবন্ধের আর একটি অংশ—"লেখক-বিবেকানন্দের মধ্যে অনুভূতি বা বক্তব্যের চাপ এতোই প্রবল ও অকৃত্রিম ছিল যে, রচনার শিল্পরীতি সম্বন্ধে তাঁকে কখনোই খুঁৎ খুঁৎ করতে হয়নি।...তাঁর ভাষারীতি তাঁর লক্ষ্যবোধেরই নিখুঁৎ অভিব্যক্তি, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের চেয়ে তিনি নিজে ছিলেন অনেক বড়ো, আরো অনেক ব্যাপক; উদ্দেশ্য সব সময়ই তাঁর সম্পূর্ণ অধীনস্থ ছিল।" (পৃঃ ১৪১) এক্ষেত্রেও 'লেখক বিবেকানন্দে'র পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ফুটেছে বলে মনে হয় না। আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠি অনুসারে জগতের মহত্তম অনুভূতিরাশি প্রতিদিনের ঘরোয়া ভাষায় কবিত্বমণ্ডিতরূপে প্রকাশের চেষ্টায় যাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলীর সৃষ্টি, তিনি লেখার সময়ও আপন কুশলতা-সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। অভ্যস্ত সাহিত্যরুচি থেকে তাঁর সাহিত্যলোক ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেই-খানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর সত্যের সাধনারই আর একটি রূপ তাঁর সাহিত্য-সাধনায়। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রধান গুণ অধ্যাপক মিত্রের মতে 'মহাপ্রাণতা'। স্বামীজীর সবকয়টি মৌলিক বাংলা গ্রন্থেই তাঁর বেদান্ত-বিশ্বাসী, স্বদেশপ্রেমিক, আন্তর্জাতিক এবং ইতিহাস-সচেতন সত্তার যে পরিচয় অধ্যাপক মিত্র লক্ষ্য করেছেন, তার সঙ্গে একথাও যোগ করা চলে যে, স্বামীজী আপন রচনা সম্বন্ধে সচেতন শিল্পী। তাঁর ব্যক্তিত্বের বজ্রধাতু গলিয়েই তাঁর অমর ভাষাশৈলীর সৃষ্টি। অধ্যাপক মিত্রের ভাষায় 'তিনি আপন ব্যক্তিত্বগুণে এবং সহজ প্রেরণা-বশেই তাঁর নিজস্ব রীতির প্রবর্তক।' (পৃঃ ১৪০)

ভারতবর্ষের সমাজকেন্দ্রিক ইতিহাসচেতনা-প্রসঙ্গে ভূদেব, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামীজীর তুলনামূলক আলোচনা এ গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে, বিশেষভাবে 'বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা' প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত প্রবন্ধের মন্তব্য, "বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তা তাঁর সর্বদা সমাধিস্থ থাকবার মূল বাসনারই গুরু-প্রণোদিত রূপান্তর বললে অন্যায় হবে না।" ... "সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত, ঐক্য-প্রত্যয়ী, —এবং বিজ্ঞান-সচেতন এক সমাজ না গড়ে উঠলে যথার্থ আধুনিকতার সঙ্গে ভারতীয়তার অভিপ্রেত যোগটি সম্ভব হ'তে পারে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে যাঁদের অল্পবিস্তর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে, আত্মস্থতাকামী সেই গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয় দলই সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসে আশ্রয় পান।" এদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন মনীষীর সমাজচিন্তা সম্বন্ধে আরো নিশ্চিত সিদ্ধান্তমূলক আলোচনার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার-আন্দোলন, পাশ্চাত্য-প্রভাবে সমাজের রূপান্তর, ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ, ভারতীয় বর্ণাশ্রম-আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্লেষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের চিন্তা ও নির্দেশ আরো বিশদ-ভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। তবে, সমগ্র গ্রন্থটি পাঠান্তে বিবেকানন্দ-মানসের বিশাল ব্যাপ্তির যে পটভূমি পাঠক-মানসে রচিত হয়, তার ফলে কিছুক্ষণের মতো আমরা সবাই কবি মোহিতলালের ভাষায় 'চন্দ্রতারকার সভাতলে' আসন পাতি।

এমন একটি মনন-ঋদ্ধ, প্রসারিতদৃষ্টি, সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-নিপুণ আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশের জন্য এ গ্রন্থের প্রকাশকমণ্ডলী আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন। সুচারু প্রচ্ছদপটে ও শোভন মুদ্রণে

গ্রন্থটির আদ্যন্ত যথার্থ শ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

চেনা শোনার বাইরে: অমিতা রায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট: কলিকাতা-১৩। পৃ: ২০৮; মূল্য: পাঁচ টাকা।

চেনার বাইরে হলেও রুমানিয়া শোনার বাইরে নয়। কিন্তু চেনাশোনার দেশও সে নয়। তাই স্বল্প-পরিচিত এই পূর্ব-য়ুরোপীয় দেশটির বিবরণ আমাদের মতো গৃহগতপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই স্বপ্নচারণের উপযুক্ত উপকরণ। তার ওপর সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত এই দেশটির ১৯৬৭ অবধি বিবর্তনের একটু আভাসও এ গ্রন্থে মেলে। ১৯১৯-তে লেখিকা তাঁর স্বামীর সঙ্গে রুমানিয়ায় গিয়ে ছাত্রীরূপে সে দেশকে আপন করে নেবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সমস্ত বইটি জুড়ে প্রকৃতি ও মানুষের এক প্রীতিস্নিগ্ধ ছায়াছবি তাই সারাক্ষণ পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখে। রাজনীতির কূটতর্ক না তুলে সহজ মানবতার দৃষ্টিতে এই 'নতুন দেশ'কে দেখতে পেরেছেন বলেই লেখিকা রুমানিয়াবাসীদের সঙ্গে এই ভারতের, এই বাংলার মানুষেরও মর্মবন্ধন স্থাপন করতে পেরেছেন। ১৯৬৭-তে তিনি আবার লেখিকা-রূপে স্বল্পকালীন ভ্রমণের জন্য সেদেশে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। গ্রন্থশেষে সাম্প্রতিক রুমানিয়ার সমৃদ্ধিরও কিছুটা আভাস মেলে।

ভ্রমণসাহিত্যকে অযথা তথ্যভারাক্রান্ত বা উপন্যাসরসসিক্ত না করে দূরকে কাছে আনার এই অন্তরঙ্গ প্রচেষ্টায় লেখিকার সহজ সুমিত ভাষাভঙ্গী প্রধান সহায় হয়ে উঠেছে। যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা নিয়ে তিনি বিদেশকে স্বদেশ করে তুলেছিলেন, সর্বদেশের সর্বকালের সেরা ভ্রাম্যমাণদের তা-ই সবচেয়ে বড়ো সম্বল। এমন একটি আকর্ষণীয় ভ্রমণসাহিত্য-প্রকাশে সুধী প্রকাশক যথার্থ রুচির পরিচয় দিয়েছেন। —প্রণবরঞ্জন ঘোষ

সাংখ্যকারিকা (ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত)—স্বামী দিবাকরানন্দ কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশক: জগন্নাথ বর্মন, গ্রাম—মতিলাল, পো:—মন্দিরবাজার, জেলা—২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ১৭৫; মূল্য তিন টাকা।

মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শন ভারতীয় *মনীষার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।* ষড়্দর্শনের অন্যতম দর্শন সাংখ্যদর্শন। ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত সাংখ্যকারিকা সাংখ্যশাস্ত্রের একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই একখানি গ্রন্থ অধিগত করিতে পারিলে সাংখ্যদর্শনে ব্যুৎপত্তিলাভের পথ অনেকাংশে সুগম হয়।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে সাংখ্যকারিকার মূল ৭৩টি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যাইবে। প্রতিটি শ্লোকের নিম্নে পদপাঠ, তৎপরে অন্বয়, শব্দার্থ, পদব্যাবৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ সর্বত্রই সরল ও মূলানুগ হওয়ায় বিষয়বস্তু সহজবোধ্য হইয়াছে। পুস্তকের শেষাংশে মূল সংস্কৃতে 'মাঠরবৃত্তিঃ' সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মর্যাদা বাড়িয়াছে। সাংখ্যদর্শনের বিদ্যার্থিগণের নিকট এই 'সাংখ্যকারিকা'খানি সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্ত জনগণের সেবাকার্য

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, গত মে মাসে অন্ধ্র প্রদেশের তিনটি জেলা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল গুণ্টুর জেলা; এখানে ৯৯৮টি গ্রামের মধ্যে ৮৩২টি গ্রামই বিপর্যস্ত। এই গ্রামগুলির মধ্যে আবার সর্বাধিক বিপর্যস্ত ১৫০টি গ্রাম। এক গুণ্টুর জেলাতেই ২,০০০ ব্যক্তি এবং ১,৫০,০০০ গবাদি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ এবং গৃহহীনদের সাময়িক আশ্রয়োপযোগী কুটির নির্মাণের মাধ্যমে অন্ধ্র প্রদেশ সরকার কর্তৃক ত্বরিতগতিতে সেবাকার্য শুরু করা হইয়াছে।

এখন সেবাকার্যের প্রাথমিক পর্ব শেষ হইয়াছে এবং বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন গুণ্টুর জেলার মহকুমা-শহর চিরালার উপকণ্ঠে ১০০টি গৃহ নির্মাণের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই ১০০টি নূতন গৃহে কুরথালা গ্রামের ১০০টি বিপর্যস্ত পরিবার পুনর্বাসন লাভ করিবে। প্রতিটি গৃহে পাথরের দেওয়াল এবং মাঙ্গালোর টালির ছাদ হইবে। প্রাথমিক হিসাবে প্রত্যেকটি গৃহের জন্য আনুমানিক খরচ পড়িবে ২,০০০৲ টাকা। অতএব এই গৃহনির্মাণকার্যের জন্য এখনই ২,০০,০০০৲ টাকা প্রয়োজন। অর্থের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে সেবাকার্য যথাসময়ে আরও বাড়ানো যাইবে।

'অন্ধ্র পত্রিকা'-র কর্তৃপক্ষ সেবাকার্য আরম্ভ করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে ৫০,০০০৲ টাকা দিয়া মহানুভবতা দেখাইয়াছেন।

আমরা সহৃদয় জনসাধারণের নিকট এই সেবাকার্যে মুক্তহস্তে সত্বর অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি, যাহাতে রামকৃষ্ণ মিশন দুর্গতদের পুনর্বাসন-কার্য যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যেই করিয়া উঠিতে পারেন।

অনুগ্রহপূর্বক সবপ্রকার সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন এবং যে-সেবাকার্যের জন্য সাহায্য পাঠাইবেন, তাহাও সঙ্গে লিখিয়া পাঠাইবেন; 'রামকৃষ্ণ মিশন' (Ramakrishna Mission)—এই নামে চেক পাঠাইবেন:

১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২) অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালি রোড, কলিকাতা-১৪

৩) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯

৪) রামকৃষ্ণ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৫) রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই-৫২

৬) রামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৪

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ (হাওড়া),
৮ই আগস্ট, ১৯৬৯

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা : পাহাড়পুর, মণ্ডলঘাট এবং জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে অন্যান্য অঞ্চলে বন্যার্তদের জন্য কুটিরনির্মাণ ও কূপখনন কার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে। জলপাইগুড়ি শহরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলিতে বিতরণের জন্য শিক্ষা-সরঞ্জাম পাঠানো হইতেছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা : বন্যায় বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের সেবাকল্পে বসবাসের জন্য কুটির, কলোনীতে যাইবার রাস্তা ও সমাজ-মন্দিরগুলির নির্মাণকার্য এবং জল সর-বরাহের ব্যবস্থাদি সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে।

অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যাপীড়িতদের সেবা : সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহের অন্যতম গুন্টুর জেলায় প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় বিপর্যস্ত জন-গণের জন্য সেবাকার্য রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সম্প্রতি আরম্ভ করা হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতিভবন

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে গত ২১ জুলাই, ১৯৬৯ স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতিভবনের উদ্বোধন করেন সিঙ্গাপুরের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী এস. রাজরত্নম। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে ভাষণ দেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম (মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৪) ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইহা নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এই শিক্ষায়তনের প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ : (১) বিবেকানন্দ কলেজে অধ্যয়নরত বিদ্যার্থীদের জন্য একটি ছাত্রাবাস, (২) আবাসিক শিল্প-বিদ্যালয় (Technical Institute), (৩) আবাসিক উচ্চ-বিদ্যালয়।

প্রথমে মাত্র ৭টি ছাত্র লইয়া স্টুডেন্টস্ হোম আরম্ভ করা হয় ; বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৩২০। স্টুডেন্টস্ হোমের ৬৪তম বর্ষের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ৩১.৩.৬৯ তারিখে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ৩১৮ ; তন্মধ্যে হাই-স্কুলের ১৫৪, ওরিয়েন্টাল স্কুলের ১১, প্রি-ইউ-নিভার্সিটি ও ডিগ্রী কোর্সের ৪৪, পলিটেক-নিকের ১০৮, পোস্ট-ডিপ্লোমার ১ জন ছাত্র ছিল। মোট ছাত্রসংখ্যার ৯১ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের।

উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী—মোট ৪টি ক্লাস ; শিক্ষার মাধ্যম তামিল ভাষা। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন বিভাগ হইতে হাইস্কুলের ৫১ জন ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

কলেজ-বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে ২৯ জন বি. এস-সি ডিগ্রী কোর্সে এবং একজন এম্.এ কোর্সে পড়াশুনা করিয়াছে। এই বিভাগের ৪৪ জন ছাত্রের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে স্কলারশিপ পাইয়াছে। ছাত্রদের ডিগ্রী ও প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

আবাসিক টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটের ৩৭ জন ছাত্র লাইসেন্সিয়েট মেকানিক্যাল

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয় এবং ২৯ জন ফার্স্ট ক্লাস পায়। অন্যান্য বিভাগের ফলও সন্তোষজনক। পলিটেকনিকের ১০১ জন ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

স্টুডেন্টস্ হোমের অঙ্গীভূত না হইলেও স্টুডেন্টস্ হোম কমিটি কর্তৃক দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে একটি মায়লাপুরে অবস্থিত, নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ সেন্টিনারি এলিমেন্টারি স্কুল। এখানে প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আছে, ২৫৭ জন বালক ও ১৯৩ জন বালিকা মোট ৪৫০ জন পড়াশুনা করে। অন্যটি চিঙ্গেলপুট জেলায় মাল্লিয়াকারানাই গ্রামে অবস্থিত। এই উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ (ছাত্রী ২০ জন)।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শাখার ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মালদহে প্রথম মঠ শাখা স্থাপিত হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। জনহিতকর কার্যের প্রসার তার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মিশন শাখা খোলা হয়।

মঠ বিভাগে নিত্য পূজার্চনা ও ধর্মালোচনাদির ব্যবস্থা আছে। একাদশীতে রামনামকীর্তন হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও অন্যান্য পুণ্য জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ গ্রামে গ্রামে যাইয়া সভা ও উৎসবাদির মাধ্যমে ম্যাজিক ল্যানটার্ন সহযোগে ধর্ম- সমাজ- ও শিক্ষামূলক বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

মিশন শাখার দুইটি বিভাগ: শিক্ষা ও সেবা। উত্তরবঙ্গ শিক্ষায় অনগ্রসর বলিয়া মিশন বিভাগে শিক্ষাদানের কাজই প্রধান। আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা ৬৩৪), একটি নার্সারি স্কুল (ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০৬), একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় (ছাত্র-ছাত্রী ২৩৬) অবস্থিত এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয় সুপরিচালিত।

আশ্রমের বাহিরে এবং দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে একটি নিম্ন বুনিয়াদী, ৩টি প্রাথমিক ও ৪টি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। রামকৃষ্ণপল্লীতে সারদা শিল্পনিকেতনে মহিলাদিগকে সেলাই, রেশম কাটা, খেলনা তৈরি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রম-গ্রন্থাগারে ২,১৯১ খানি পুস্তক আছে। ২৫টি মাসিক ও ৩টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৩০।

আশ্রমের বিবেকানন্দ শিশুসঙ্ঘে ৩১০টি শিশু শরীর-মনের সুষম গঠনের সুযোগ পাইতেছে। গ্রামেও দুইটি শিশুসঙ্ঘ পরিচালিত হইতেছে।

আশ্রমে অবস্থিত ব্রহ্মানন্দ বিদ্যার্থী ভবনে ৩৩ জন ছাত্র আছে। এখানে মেধাবী দরিদ্র ও আদিবাসী ছাত্র বিনা-ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ পায়।

আশ্রমে ১৬টি এবং বাহিরে ১৫টি ছায়াচিত্রে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে।

সেবা-বিভাগ কর্তৃক স্থায়ী ও সাময়িক ভাবে ঔষধবিতরণ ও অন্যান্য সেবাকার্য করা হইয়া থাকে।

তিনটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধবিতরণ কেন্দ্রের মধ্যে একটি শহরে ও অন্য দুইটি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ঔষধবিতরণ কেন্দ্র তিনটিতে যথাক্রমে ৩০৮০৪, ২৭১৪ ও ৪৯৩২ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে খয়রাত্রাণ-কার্যে পুরাতন

মালদহ, গাজোল ও বামনগোলা থানায় ৪টি কেন্দ্র হইতে প্রায় ৭৫,০০০৲ টাকার যব, গম, ভুট্টা, ধুতি, শাড়ী, জামা ও গুঁড়া দুধ বিতরিত হয়।

শ্যামলাতাল (হিমালয়) বিবেকানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৭—মার্চ, ১৯৬৮) প্রকাশিত হইয়াছে। ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে হিমালয়ের শান্তিপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে এই আশ্রম ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমটি দীর্ঘকাল ধরিয়া জনসাধারণের সেবারত।

আলোচ্য বর্ষে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৭,৫০৮ (নূতন ৪,৮৮৮)। অন্তর্বিভাগে ১২টি শয্যা আছে; এই বিভাগে ১৪৫ জন রোগী চিকিৎসালাভ করিয়াছে।

একদিকে ১৯ মাইল এবং অপরদিকে ৩৫ মাইলের মধ্যে কোন উপযুক্ত হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় না থাকায় সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বত্যজনগণের একমাত্র চিকিৎসার স্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সেবাশ্রমে পশুচিকিৎসার একটি বিভাগ আছে। আলোচ্য বর্ষে পশুচিকিৎসালয়ে ১,৯৪টি পশু চিকিৎসিত হয়।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর বক্তৃতা সফর

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া গত ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সিঙ্গাপুর হইয়া হনলুলু যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে আমেরিকা ও ইউরোপ হইয়া অক্টোবর মাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন। এই সফরে সিঙ্গাপুরে ১টি, হনলুলুতে ১৪টি, পোর্টল্যাণ্ড ও ওয়াশিংটনে ২টি করিয়া, স্যানফ্রানসিস্‌কোতে ৪টি, হলিউড ও চিকাগোতে ১টি করিয়া, নিউইয়র্কে ৪টি এবং ফ্রান্সের গ্রেৎজে ১টি বক্তৃতায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্তানগণের জীবন ও বাণী এবং গীতা, অধ্যাত্মজীবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ইহা ছাড়া ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও নিকটস্থ অঞ্চলে ২০টি এবং আঁটপুর, গোমো, বারুণী, বর্ধমান, চন্দননগর, হাজারিবাগ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তিনি আরো ২০টি বক্তৃতা দিয়াছেন।

উৎসব সংবাদ

বালিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম জন্মোৎসব এবং মঠের ৪৬তম বার্ষিক উৎসব গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার হইতে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার পর্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চণ্ডী ও গীতা পাঠ, ভজন-সঙ্গীত এবং ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দ্বিপ্রহরে দরিদ্রনারায়ণসেবা হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জনাব মোতাহার আলী খান মজলিস্-এর সভাপতিত্বে ধর্মসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কতিপয় স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বিবিধ সংবাদ

'লুনা-১৫'র চন্দ্রে অবতরণ

গত ১৩ই জুলাই রাশিয়া হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাত্রিহীন মহাকাশযান 'লুনা-১৫' গত ২১শে জুলাই রাত্রি ৯-২০ মিনিটের সময় চাঁদের 'সঙ্কটসমুদ্র' অঞ্চলে অবতরণ করিয়াছে। আমেরিকার মহাকাশযান 'অ্যাপোলো-১১' দুইজন মহাকাশচারীকে লইয়া পূর্বরাত্রে যেখানে অবতরণ করিয়াছিল, লুনা-১৫-র অবতরণস্থল সেখান হইতে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি ও স্থানীয় শিক্ষাব্রতীদের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রব্রাজিকা শুদ্ধপ্রাণা ১৬ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিল সকালে কল্যাচক আর্যতনয়াশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ে ও ঠাকুর-নগর নন্দা মহিলা বিদ্যাপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবসন্তকুমার দাস। ২রা ও ৩রা মে সকালে ও সন্ধ্যায় সুভাষপল্লী বিবেকানন্দ শিশুনিকেতন, বড়বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয় ও কল্যাচক গ্রামে স্বামী আপ্তকামানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী পুণ্যাত্মানন্দজী, শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী ও শ্রীকমল প্রামাণিক স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ৩০শে মে কল্যাচক বিবেকানন্দ পাঠশালায় সকালে পূজাপাঠাদি হয়। বিকালে শিশু-সম্মেলন ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতি স্বামী আপ্তকামানন্দ ও প্রধান অতিথি অধ্যাপক সলিলকুমার দিন্দা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

এই সংখ্যার লেখকগণ

১। **স্বামী তেজসানন্দ :**
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড়

২। **ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার :**
অধ্যাপক, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিট্যুট, কলিকাতা

৩। **শ্রীগুরুদাস দাশ :**
অধ্যাপক, টেকস্‌টাইল টেকনলজি, শ্রীরামপুর

৪। **শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর :**
নবগ্রাম, হুগলী

৫। **শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :**
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৬। **স্বামী বিশ্বরূপানন্দ :**
রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী

৭। **শ্রীদীপেন্দ্র চক্রবর্তী :**
শ্রীহট্ট, পূর্বপাকিস্তান

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যার ৪৩১ পৃঃ [illegible] ২য় ও ১৬শ লাইনের 'তৃতীয় অংশের' স্থলে 'প্রথম অংশ' এবং ৪৩২ পৃঃ [illegible] লাইনের [illegible] স্থলে '১৪শে' পড়িবেন।

দেবী কন্যাকুমারী মূর্তি

জ্যোতির্ভাস্বরে মন্দিরে সাগরে সম্মুখবর্তিনীম্ ।
কুমারীং কন্যকাং দেবীং প্রণমামি তপস্বিনীম্ ।

হরিকুমারী আর্টিস্টদের সৌজন্যে

দিব্য বাণী

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ ॥

[শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম-চরিত্রের ধ্যান]

সোনার বরণা দুর্গা আসীনা বাহন সিংহ'পরে
কটাক্ষে তাঁর শত্রু সবার বুক কেঁপে ওঠে ডরে
(যত রিপুচয় পুড়ে ছাই হয়, যেন সে অগ্নিশিখা !)
ললাটে তাঁহার শোভার আধার বিমল চন্দ্রলিখা ;
ধরেছে কৃপাণ অতি খরশাণ, চক্র, ত্রিশূল আর
শঙ্খধারিণী শক্তিরূপিণী চতুর্হস্তে তাঁর ;
সিংহবাহনা দেবী ত্রিনয়না বিজয়দায়িনী বেশে
তেজের ছটায় ভুবন ভরায়—ত্রিজগৎ যায় ভেসে ;
করি বেষ্টন যত দেবগণ, সিদ্ধসঙ্ঘ পূজে—
ধ্যান কর তাঁর, জয়া-দুর্গার এ রূপ হৃদম্বুজে।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। ৫৭
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১ম অঃ

মুক্তির কারণরূপা পরাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা তিনি,
সংসারবন্ধন-রূপা অবিদ্যাও তিনি, সনাতনী,
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী, জননী।
প্রসন্না হইয়া তিনি বরদান করেন যখন
খুলে যায় মুক্তিদ্বার— টুটে যায় সকল বন্ধন !

কথাপ্রসঙ্গে

পুরাণ ও শ্রীশ্রীচণ্ডী

কোন তপোবনে উপবিষ্ট কোন ঋষিকে শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন, ঋষি উত্তর দিতেছেন, কখনো বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু বলিতেছেন। ঋষির কথাগুলি মেধাবী শিষ্য সব মনে করিয়া রাখিতেছেন এবং পরবর্তী কালে তিনি উহা বহুজনকে শুনাইতেছেন। তাঁহারা আবার উহা বলিতেছেন অপরের কাছে। এমনিভাবে ছড়াইয়া যাইতেছে কথাগুলি; ক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়া নাটক, কাব্য, কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের সর্বত্র সর্বসাধারণের মনে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে।

'মুনিশিষ্যোপশোভিত' তপোবনের এই চিত্রের সহিত ভারতীয় জাতির, ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ অতি নিবিড। ভারতের যাহা কিছু বরণীয়, যাহা কিছু মহনীয় তাহা সবই আমরা পাইয়াছি এইভাবে—তপোবনে, তপস্যা- ও ধ্যানপরায়ণ ঋষি-মুনিদের, সত্য-দ্রষ্টাদের নিকট হইতেই। সেই পুণ্য নৈমিষা-রণ্যের কথা মনে পড়ে; মনে পড়ে বাল্মীকির তপোবন; জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের প্রসারের কেন্দ্র এমনি আরও কত তপোবন, যেখানে কত ঋষি, কত শিষ্য আমাদের সভ্যতার ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে, ইতিহাস-আখ্যানাদি অবলম্বনে গল্পচ্ছলে সর্বসাধারণের বুঝিবার মতো করিয়া ভগবান সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে বেদান্তনিহিত উচ্চতম সত্যগুলিকে প্রকাশ করিয়াছেন সহজ সরল-ভাবে। সেগুলিই পুরাণ।

এই পুরাণই আমাদের ভগীরথ; সাধারণের দুরধিগম্য, চিন্তারও অতীত প্রদেশ হইতে বিগলিত ও নির্ঝরিত, চিন্তার উত্তুঙ্গ শিখর-সঞ্চারী বেদান্ত-সুরধুনীকে সে নামাইয়া আনিয়াছে নিম্নের সমতলভূমিতে। ধনী-দরিদ্র-জ্ঞানী-মূর্খ-নির্বিশেষে সকলের কাছে—সন্ন্যাসীর আশ্রমে, রাজার প্রাসাদে, দীনতমের কুটীরে, সর্বত্রই ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার এই পূত পাবনী ধারাকে প্রবাহিত করিয়াছে—সকলেই যাহাতে ইহার নাগাল পাইয়া ইহার স্নিগ্ধ, প্রাণপ্রদ ধারায় শোকতাপজর্জরিত জীবনকে শীতল করিতে পারে, অবশ প্রাণকে উজ্জীবিত করিতে পারে।

পুরাণ বলিতেছে, গল্প শুনিবে এস। তোমায় দর্শনশাস্ত্রের কথা বলিব না, এমন কিছু বলিব না, যাহাতে তোমার মাথা টনটন করে। গল্প শুনিতে তুমি ভালবাস নিশ্চয়ই? সেই গল্পই তোমাকে বলিব। ভালবাসার গল্প, যুদ্ধের গল্প, সমাজজীবনের জটিল সব পরিস্থিতির গল্প, মনস্তত্ত্বের গল্প, যাহা তুমি শুনিতে চাও, তাহাই বলিব। তবে আমার প্রাণের কথা, ভারতের প্রাণবাণী কি তোমায় কিছুই শুনাইব না?—তা নয়; আমার যাহা বলিবার আছে তাহা ঐ সব গল্পের ভিতর দিয়াই বলিব। ত্যাগী, হৃদয়বান, নিষ্কলঙ্কজীবন, উপলব্ধিমান মুনি-ঋষিদের দিয়াই তোমাদের গল্প শুনাইব। তাঁহারা চিন্তার উচ্চ স্তর হইতে তোমাদের চিন্তার স্তরে নামিয়া আসিয়া তোমাদের মত করিয়াই গল্প বলিবেন। তোমাদের কল্যাণের জন্য তাঁহারা সব করিতে পারেন। তুমি পঙ্কিল ভূমিতে থাকিলে তোমাকে তুলিয়া লইবার জন্য সেখানে তাঁহারা নামিয়া আসিবেন, সস্নেহে

তোমার হাত ধরিবেন—এ আর বড় কথা কি! এই গল্পের ভিতর দিয়াই তাঁহারা ধীরে ধীরে তোমার মনকে তুলিয়া লইয়া যাইবেন আনন্দধামের পথে। একটু একটু করিয়া চন্দনলেপন করিবেন তোমার অঙ্গে। ক্রমে তুমি নিজেই ব্যাকুল হইয়া উঠিবে নিজ অঙ্গকে পঙ্কের পূতিগন্ধমুক্ত করিয়া সুরভিত চন্দনচর্চিত করিতে।

এমনি একটি পুরাণের নাম মার্কণ্ডেয় পুরাণ। জিজ্ঞাসু শিষ্য ক্রৌষ্টুকির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রধান অংশ; পুরাণের প্রারম্ভে মূল প্রশ্নকারী অবশ্য মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য জৈমিনি। শ্রীশ্রীচণ্ডী এই মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই একটি অংশ; ইহার ১৩৭টি অধ্যায়ের মধ্যে ৮১তম হইতে ৯৩তম পর্যন্ত ১৩টি অধ্যায় 'দেবী মাহাত্ম্য' বা শ্রীশ্রীচণ্ডী।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রারম্ভে ক্রৌষ্টুকি মার্কণ্ডেয় ঋষির নিকট অষ্টম মনু সূর্যপুত্র সাবর্ণির জন্ম-বৃত্তান্ত জানিতে চাহিতেছেন। উত্তরে ঋষি বলিতেছেন যে, রাজাহারা রাজা সুরথ জগন্মাতা, জগদ্রূপা, জগন্নিয়ামিকা, চিন্ময়ী মহাশক্তিকে মৃণ্ময়ী মূর্তির মাধ্যমে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, এবং ইহজন্মে সুখে রাজ্যভোগ করিবার পর স্থূলদেহান্তে সূক্ষ্মদেহ লইয়া সাবর্ণি মনুরূপে জন্মলাভ করিয়া সুদীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করেন।

ইহারই বিস্তৃত বিবরণ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। কিন্তু জগন্মাতার দর্শনলাভ করিয়াও রাজা সুরথ তাঁহার নিকট ইহজন্মে ও পরজন্মে রাজ্যভোগই প্রার্থনা করিলেন। আমাদের মনের উপর ভোগেচ্ছা বা বাসনার প্রতাপ যে কত প্রবল, তাহারই নিদর্শন এটি। কিন্তু বাসনার দাসত্ব করিবার জন্যই কি মানুষের জন্ম? ইহলোক ও পরলোকের ভোগই কি জীবনের চরম লক্ষ্য? ধর্মাচরণ কি শুধু তাহারই জন্য? সকলেই কি 'কড়ায়ের ডালের খদ্দের', রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সকলেই কি তাঁহার কাছে 'লাউ-কুমড়ো' ফল চাহিয়া লয়, অমূল্য ধন ভগবান লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে কি কেহই চায় না? জীবনপথে ভোগের আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া এবং একের পর এক আঘাত খাইতে খাইতে চলিয়া কোন জন্মের কোন পরম শুভলগ্নে নচিকেতার মতো, মৈত্রেয়ীর মতো কাহারো মনে কি বৈরাগ্যের বিপুল শুভ্র আলোকে ভোগের অসারতা আত্মপ্রকাশ করে না? করে বৈ কি। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সেজন্য গল্পাংশেই রাজা সুরথের সহিত সমাধি নামক একজন হৃতসম্পদ বৈশ্যকেও পাশাপাশি রাখিয়াছেন। একই সঙ্গে একই রূপে একই পথে চলিয়া তাঁহারা একই সময়ে জগন্মাতার দর্শনলাভ করেন। সমাধি কিন্তু মায়ের কাছে মুক্তি ছাড়া আর কিছুই চাহেন নাই; যদিও যাহা চাহিতেন তাহাই পাইতেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরম্ভটি আমাদের অতি-পরিচিত একটি মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক এবং দর্শন-শাস্ত্রের একটি জটিল তত্ত্ব মায়ার সহজবোধ্য রূপের গল্প দিয়া; গল্পটি নিজেই একটি সত্যের উদ্ভাসক। মাঝখানে জগৎ ও জগন্নিয়ামিকা শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহাও দেবাসুর-যুদ্ধের কয়েকটি গল্পের মাধ্যমেই।

রাজা সুরথ বলবান শত্রু ও অসাধু অমাত্য-গণ কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বনে চলিয়া আসিয়াছেন, মেধামুনির তপোবনে আসিয়া উঠিয়াছেন। রাজ্য, রাজভৃত্য, ধনাগার, এসব কিছুই আর এখন তাঁহার নয়,—ইহাই বাস্তব।

কিন্তু এ বাস্তবকে তাঁহার মন স্বীকার করিতেছে না, সেগুলিকে তখনো 'আমার' বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিয়া চিন্তার জাল বুনিতেছে—'আমার' সেই রাজধানীর কাজ অমাত্যেরা ভালভাবে চালাইতেছে তো? 'আমার' কষ্ট-সঞ্চিত ধনভাণ্ডার তাহারা যথেচ্ছ ব্যয়ে নিঃশেষ করিতেছে না তো? 'আমার' প্রিয় হস্তীটির পরিচর্যা ঠিকমত হইতেছে কিনা কে জানে! হায়রে, 'আমার' বেতনভুক্ ভৃত্যেরা এখন আমার কথা ভুলিয়া অপর প্রভুর সেবা করিতেছে!

ঠিক সেই সময় সেখানে সমাধি নামে এক-জন বৈশ্য আসিলেন। তিনিও সমব্যথার ব্যথী—তাঁহার ধনলোভী অসাধু স্ত্রীপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণ তাঁহার বিপুল সম্পত্তি ও অর্থাদি কাড়িয়া লইয়া শেষে তাঁহাকেও বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন; মনের দুঃখে তিনি বনে আসিয়াছেন। কিন্তু বনে আসিয়াও সেই শ্রদ্ধাপ্রেমহীন, নির্দয়, অমানুষ স্ত্রীপুত্রাদির জন্যই তাঁহার মন ব্যাকুল রহিয়াছে—তাহাদের কোন সংবাদ জানেন না, তাহারা ভাল আছে তো?

এখানে সুরথ ও সমাধি সাধারণ মানুষের মতোই মমত্বাকৃষ্টচিত্ত হইলেও সাধারণ হইতে তাঁহাদের একটি বৈশিষ্ট্য ঋষি দেখাইয়াছেন। সাধারণ মানুষ এই হৃদয়-দৌর্বল্যকে, এই 'আমি-আমার' বোধকে স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লয়—অনেক সময় এই 'পশুপক্ষিসুলভ' মমতার উপর মহত্ত্বের একটি আবরণও চড়ায়; বিশেষ করিয়া সমাধি বৈশ্যের মনোভাবকে তো আমরা 'মহত্ত্ব' বলিতেই পারি, তিনি নিজেও তাহা ভাবিতে পারিতেন—'কি মহৎ আমি! যাহারা আমার সহিত এত অন্যায় অমানুষিক আচরণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতিও আমি প্রেমপ্রবণ-চিত্ত!' কিন্তু সমাধি সেরূপ ভাবেন নাই। সুরথ ও সমাধি দুজনেই বুঝিয়াছেন যে, এভাবে চিন্তা করিয়া অনর্থক কষ্টভোগের কোন মানেই হয় না। তাঁহারা এরূপ চিন্তা হইতে বিরত হইবার চেষ্টাও করিতেছেন, কিন্তু কেন বুঝিতেছেন না, মন কোন কথাই শুনিতেছে না। এই বোধ, এই বিবেকই সত্যলাভের পথে প্রথম পদক্ষেপ করায়। এই 'কেন'র উত্তরের জন্যই সুরথ ও সমাধি মেধা মুনির নিকট যাইয়া সব খুলিয়া বলিলেন।

মেধা মুনি বলিলেন, "বাবা, এ-রকমই হয়; এরই নাম মায়া—মহামায়ার মায়া।" "মহামায়া কে?" এই প্রশ্নের উত্তরেই মেধা-মুনি কয়েকটি দেবাসুর-সংগ্রামের পটভূমিকায় দেবীমাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। মুনি বলিলেন, মহামায়াই জগতের মূল, ব্রহ্ম-স্বরূপা। তাঁহার শক্তিপ্রভাবেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ ঘটিতেছে, তিনিই এই জগতের সব কিছু হইয়াছেন, শুভ অশুভ সবই। আমাদের শুভবুদ্ধিরূপেও তিনি, অশুভ বুদ্ধি-রূপেও তিনি। তিনি সংসারে বন্ধকারী অবিদ্যা, আবার মুক্তিদাত্রী ব্রহ্মবিদ্যাও। তাঁহাকে আরাধনায় প্রসন্না করিতে পারিলে তিনি যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দেন। ইহজগতে অভ্যুদয়, পরজন্মে স্বর্গসুখ, অথবা মুক্তি—তাঁহার কৃপায় সবই পাওয়া যায়।

দেবাসুর-যুদ্ধের বর্ণনার তিনটি ভাগ: প্রথম চরিত্রে মহাশক্তির প্রভাবে মধুকৈটভবধ, মধ্যম ও উত্তর চরিত্রে বিভিন্ন মূর্তিতে আবি-র্ভূতা মহাশক্তি কর্তৃক যথাক্রমে মহিষাসুর ও স-সেনানী শুম্ভ-নিশুম্ভবধ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মস্ত বড় একটি আশ্বাসের বাণী শুনি আমরা: বারে বারে জগতে অশুভ শক্তি শুভ শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হয়, অনেক সময় মনে হয় উহার

দমন অসাধ্য, কিন্তু এরূপ প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় অমোঘ ঈশ্বরীয় বিধানে উহা বিনষ্ট হয়ই —পরিণামে শুভশক্তিরই জয় হয়। আর একটি পরম আশ্বাসের বাণী মার্কণ্ডেয় ঋষি শুনাইয়াছেন: মেধা মুনি দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা শেষে সুরথ ও সমাধিকে বলিতেছেন, 'সেই মহামায়াই আমাদের মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু তিনিই আবার যেমন তোমাদের বিবেক দিয়াছেন, তেমনি একদিন না একদিন সকলকেই সে বিবেক দিবেন'।— ছেলেকে খেলা করিবার জন্য তিনিই ধূলায় নামাইয়া দিয়াছেন, তিনিই আবার খেলা শেষে তাহাকে ধূলা মুছাইয়া কোলে তুলিয়া লইবেন —তিনি যে 'মা'।

ঋষির উপদেশ মত সুরথ ও সমাধি শক্তি-আরাধনায় ব্রতী হইলেন, তিন বৎসর তাঁহারা পূজা, পাঠ, ধ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে তপস্যা করিলেন। পূজায় পুষ্প-ধূপ-দীপাদির সহিত স্বদেহ-রক্ত-সিঞ্চিত বলিও তাঁহারা মাকে নিবেদন করিতেন।

মা প্রসন্না হইয়া তাঁহাদের দেখা দিলে সুরথ ও সমাধি নিজ নিজ প্রার্থিত বর প্রাপ্ত হইলেন। সুরথকে মা বলিলেন, "তুমি তোমার হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইবে, আর কখনো তাহা হস্তচ্যুত হইবে না। দেহান্তে সাবর্ণি মনুরূপে সুদীর্ঘকাল পৃথিবীর পালক হইবে।" সমাধিকে বলিলেন, "তোমার মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান হইবে।"

মা শক্তিরূপিণী। শক্তির উদ্বোধনই তাঁহার পূজা। তপঃ শব্দের অর্থ তাপ, শক্তি। যাহা করিলে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বোধিত হয়, তাহাই তপস্যা। আমাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মহাভারতে আছে, ধর্মব্যাধ বলিতেছেন, সংযমই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। তপস্যাই মায়ের শ্রেষ্ঠ পূজা। আমরা ইহলোকে অভ্যুদয়, দেহান্তে সূক্ষ্মদেহে সুখভোগ বা এসব অনিত্য স্বল্প আনন্দের অতীতে পরমানন্দময়ী মায়ের কোল যাহাই চাই না কেন, তপস্যা ছাড়া কিছুই পাওয়া যাইবে না। আজ মহামায়ার পূজা-বসরে মহাশক্তির কাছে প্রার্থনা করি, সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি আমাদের সকলকেই তাঁহার পূজায় উদ্বুদ্ধ করুন, তপস্যায় ব্রতী করাইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করুন!

"যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে, সর্বশক্তির আকর অন্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহা হইতে শক্তি-অবতরণের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং পরে সম্যক শ্রদ্ধার সহিত আবাহন পূজা ও আত্মবলিদান করিয়া মহাশক্তির প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে। তবেই দেবী বরদা হইয়া সাধকের প্রাণমনে অভিনব অপূর্ব বলের সঞ্চার করিয়া ঈপ্সিত অর্থে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবেন এবং উহাতেই ফলসিদ্ধি করতলগত হইবে।"

—স্বামী সারদানন্দ ('ভারতে শক্তিপূজা')

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

ধর্মের প্রমাণ কি? প্রমাণ প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, সবই নিজে প্রত্যক্ষ করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'যত মত, তত পথ।' হিন্দুধর্মে একথা আমরা আগেও শুনেছি, তবে ঠাকুরের কথায় বিশেষত্ব আছে। কারণ সব ধর্মমতে সাধন করে, নিজে সব প্রত্যক্ষ করেই তিনি একথা বলেছেন। সেজন্য তাঁর ভেতর সব ধর্মের পূর্ণতা পাই। হিন্দুধর্মের সব সম্প্রদায়ের তো বটেই, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের মতেও তিনি সাধনা ও তাতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত ঠাকুরকে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করতে চান। একজন ভক্ত আমাকে লিখেছেন যে, একজন পণ্ডিত লিখেছেন, ঠাকুর তন্ত্রসাধনা করেছেন—সে সাধনা বৈদিক মতের বাইরে। এসব মনগড়া কথা, সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তন্ত্রমতেই নয়, বৈষ্ণবমতেও সাধনা করেছেন, বৈদিকমতেও সাধনা করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। সেজন্য তাঁকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করা যায় না। সব ধর্মেরই মূর্ত প্রতীক তিনি। তিনি এসেছিলেন সব ধর্মকেই পুনরুজ্জীবিত করতে। স্বামীজী তাই তাঁকে "স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে" বলে প্রণাম জানিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেলেন সব ধর্মই সত্য, সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ভগবানলাভ করা যায়। আমরা ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছি, তাঁর কথা আপ্তবাক্য বলেই মেনে নিয়েছি। বিচার করে দেখলেও একথা বোঝা যায়। যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মগুলিকে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাহলে সে-গুলির ভেতর কতকগুলি সাধারণ জিনিস দেখতে পাব—গণিতে যাকে বলা হয় 'গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক'। দেখতে পাব, সব ধর্মেই 'আমি-আমার' ভাবকে দুঃখকষ্টের কারণ বলেছে; সব ধর্মেই মহাপুরুষরা এসেছেন; সব ধর্মেই প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিরা মানুষের দুঃখে কাতর হয়েছেন ও তা দূর করার চেষ্টা করেছেন।

আমাদের অহংকার ও স্বার্থবুদ্ধিই যে সব নষ্টের গোড়া, এগুলিকে নাশ করতে পারলেই যে আমরা মুক্ত হয়ে যাব, একথা সব ধর্মেই স্বীকার করে। এই অহঙ্কারের গণ্ডী ছেড়ে বেরোবার উপায় কি?—'আমি-আমার' ভাব ছেড়ে দিয়ে 'তুমি-তোমার' ভাব আনতে হবে; সম্পূর্ণ নিষ্কাম- ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারলে আমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারি। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হওয়া আর অনন্তপ্রেমসম্পন্ন হওয়া একই কথা। অনন্ত প্রেমই ভগবান।

অহঙ্কারকে নাশ করতে হবে, একথা সব ধর্মই বলেছে; তবে তা করার জন্য বিভিন্ন ধর্মে অবশ্য বিভিন্ন পথ দেখানো হয়েছে। মোটামুটি সে পথগুলিকে চারটে ভাগে ভাগ করা যায়—ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ। এগুলির মধ্যে যে-কোন একটি পথ ধরে আমরা অহঙ্কারকে নাশ করতে পারি। কোন ধর্ম ভক্তিমার্গে, কোন ধর্ম জ্ঞানমার্গে, কোন ধর্ম ধ্যানমার্গে জোর দিয়েছে। বৈষ্ণব

* কুচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩০. ৩. ৬৯ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

ও খৃষ্টধর্ম বেশী জোর দিয়েছে ভক্তিমার্গের ওপর, বৌদ্ধধর্ম ধ্যান ও বিচারের ওপর, অদ্বৈতবাদ জ্ঞানবিচারের ওপর। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে এই সব পথ ধরে গিয়ে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে বলে গেছেন, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—যে-কোন একটা পথ ধরে গেলেই ভগবানলাভ হবে। এদিক থেকে সব ধর্মই এক। যে ধর্মমতেই, যে পথ ধরেই চল না কেন, অহঙ্কারকে বিনাশ করা নিয়েই কথা। স্বামীজী বলেছেন, "আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য- ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ; মতবাদ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এসব গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।" মানুষের এই ব্রহ্মভাবকেই ব্যক্ত করতে বলছে সব ধর্ম। পূজাদি অনুষ্ঠান-পদ্ধতির দিক থেকে বিভিন্ন ধর্মে কিছু তফাত থাকতে পারে, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্যের দিক থেকে সব ধর্মই এক।

প্রত্যেক ধর্মেই মহাপুরুষগণ আছেন। হিন্দুধর্মে যেমন মুনি-ঋষি, সেইরকম মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্মেও আছেন। সব ধর্ম যদি সত্য না হত, তাহলে বিভিন্ন ধর্মে এই সব মহাপুরুষগণ কখনো জন্মাতেন না।

সব ধর্মই বলে ভগবান অনন্ত। অনন্ত বা অসীমকে কখনো সীমার মধ্যে আনা যায় না, অসীম ভগবানকে সসীম ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, যা কখনো উচ্ছিষ্ট হয়নি। এর অর্থ, ব্রহ্ম মনবুদ্ধির অগোচর, আমাদের চিন্তা ও বাক্যের অতীত। শাস্ত্র বলছে, যাঁকে অবলম্বন করে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ হচ্ছে, তিনিই ব্রহ্ম: "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ ব্রহ্মেতি।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ৩।১)। এসব হল সত্তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত মাত্র, তটস্থ লক্ষণ। 'নেতি নেতি করে সব ত্যাগ করে গেলে যা থাকে, তাই ব্রহ্ম,' 'ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ', 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।১।৩)—এ সবই তাই। ভাষায় এর বেশী আর কিছু বলা চলে না। এক ব্যক্তি তাঁর দুই ছেলেকে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গুরুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ছেলে দুটি যখন পাঠ শেষ করে বাড়ী ফিরছে, তখন তিনি বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ব্রহ্মকে জেনেছ?" ছেলেটি তখন আধঘণ্টা ধরে বোঝাতে লাগল ব্রহ্ম কি বস্তু। ছোট ছেলেকেও তিনি এই প্রশ্ন করলেন। সে চুপ করে রইল। তখন তিনি বড় ছেলেকে বললেন, "ব্রহ্ম কি, তা তুমি কিছুই বোঝনি। ব্রহ্ম যে কি, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আমার ছোট ছেলেই ঠিক জেনেছে।" যে মনে করে আমি ব্রহ্মকে জেনে ফেলেছি, সে মোটেই জানে না; যে মনে করে জানতে পারিনি, সেই-ই ঠিক ঠিক জেনেছে: "যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।" (কেনোপনিষদ্ ২।৩)। কাজেই ব্রহ্মকে আমরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না, বলতে গেলেই নানারকম হয়ে যায়। ভাষার সসীমতার জন্যই এরকম হয়। জাগতিক কোন জিনিসের বর্ণনা দিতে গিয়েই আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম বলি, ঠিকমত বর্ণনা কেউ-ই দিতে পারি না; ব্রহ্ম তো আমাদের মনবুদ্ধির অতীত জিনিস। তাই

বিভিন্ন ধর্ম ভগবান সম্বন্ধে যা বলেছে, সেগুলিকে বিভিন্ন প্রকার এবং অনেক সময় আপাতবিরোধী বলেও মনে হয়; আসলে কিন্তু সবই এক—একই সত্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা। সকল ধর্মের মানুষই সেই একই ভগবানকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

সব ধর্মই সত্য; এ নিয়ে ঝগড়া করার কিছুই নাই। তবু আমরা যে মনে করি কেবল আমার ধর্মই সত্য, সে শুধু অহংকারের জন্য। এ থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। আজ আমাদের সব বিবাদ ভুলে যেতে হবে, সব ধর্মাবলম্বী লোকের মধ্যে পরস্পর প্রীতির ভাব আনতে হবে! এখন জগতে অধর্মের ভাব বেশী হয়েছে, অধর্মের প্রভাবে ধর্ম লুপ্ত হতে চলেছে; জড়বিজ্ঞানের প্রভাব মানুষের মনে ধর্মবিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। এই অবস্থায় আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান এখনো যদি পরস্পর বিবাদ করে শক্তি ক্ষয় করি, তবে অধর্মের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি থাকবে কি করে? এখন সব ধর্মসম্প্রদায়কে ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে, অধর্মের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সমস্ত শুভ-শক্তিকে একত্র করতে হবে সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য।

একত্র হতে হলে আমাদের সকলের অন্তরকে এক করে নিতে হবে। সে পথ তো শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েই গেছেন; বিশ্বভ্রাতৃত্ব-স্থাপনের ভিত্তিভূমিও তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সমাধিভূমিতে উঠে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমস্ত জীবের মধ্যে একই ব্রহ্ম বিরাজিত। যেমন হিন্দুস্থানীতে বলে, "যো রাম দশরথকা বেটা, ওহী রাম ঘট ঘট মে লেটা"—প্রত্যেক জীবের মধ্যে রামচন্দ্র রয়েছেন। ঠাকুর এটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে তাঁর কাছে মানুষে-মানুষে কোন ভেদ ছিল না, সবাই ছিল তাঁর আপন জন। মূর্খ হোক জ্ঞানী হোক, ধনী হোক দরিদ্র হোক, গায়ের রং শাদা হোক বা কালো হোক বা হলদে হোক,—সবাই তাঁর সমান প্রিয় ছিল। মানুষমাত্রই ছিল তাঁর আদরের জিনিস। আমরা যদি বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে চাই, তা হলে এরকম একটা সমত্ববোধের ভিত্তির ওপর না দাঁড়ালে তা সম্ভব নয়। নানা দেশে নানা ধরনের লোক, মানুষে মানুষে কত পার্থক্য! সকলের এক হবার জায়গাটা কোথায়? তা হচ্ছে এই আত্মায়—সর্ববিধ বাহ্য পার্থক্য সত্ত্বেও যেখানে সব মানুষ এক। এটা যদি উপলব্ধি করতে পারা যায়, তবেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষকে এক প্রেমের ডোরে বাঁধা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব-স্থাপন সম্ভব হতে পারে।

এই একত্ববোধের দিকে, সব মানুষকে এক বলে উপলব্ধি করার দিকে অগ্রসর হবার উপায় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ যে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র কথা বলে গেছেন, স্বামীজী যা সারা জগতে প্রচার করেছেন, তাই হল উপায়। মানুষকে ভগবান ভেবে, তার সেবায় ভগবানের পূজো হচ্ছে ভেবে কাজ করার চেষ্টার ফলে সব মানুষই এক—এ বোধ স্বতই আসবে, মানুষের ওপর ভালবাসা ক্রমে গভীর হবে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদেরও, ভগবান-লাভের জন্য যারা সংসার ছেড়ে এসেছে তাদেরও, এভাবে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজে ব্রতী করে গেছেন। বলে গেছেন, ঠিক ভাব নিয়ে করতে পারলে জপধ্যানের মতোই তা ভগবানলাভের সাধনা হবে; কারণ ভগবানের সেবা করছি এ ভাব নিয়ে

কাজ করলে তাতে মন সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তাতেই থাকবে। তিনি তাই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের নীতিবাক্য দিয়ে গেছেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" ভগবানলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য, তবে তার উপায়রূপে যে শিব-জ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্ম, তার দ্বারা সমাজও উপকৃত হবে। শুধু সন্ন্যাসীরাই নয়, সকলেই যদি "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" কাজ করে, পরিবারের মধ্যে আত্মীয়স্বজনের সেবা, সমাজের সেবা, রাষ্ট্রসেবা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেবা—সব কাজই যদি ভগবানের পূজো মনে ক'রে করে, তাহলে তার দ্বারা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ভগবানলাভ তো হবেই, সেই সঙ্গে রাষ্ট্র, সমাজ, সমগ্র মানবজাতিই উপকৃত হবে—অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ এসব আপনি কমে যাবে, বিশ্বভ্রাতৃত্বস্থাপনের পথ প্রশস্ত হবে।

তবে এভাবে কাজ করতে হলে আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য এবং কাজ তার সহায়কমাত্র। নিয়মিতভাবে জপধ্যান না করলে কাজের সময় ভাব রক্ষা করা যায় না; কাজকে পূজো ভাবা, মানুষকে ভগবান ভাবা যায় না; সব মানুষকে সমানভাবে ভালবাসা যায় না। সাধু-গৃহস্থ-নির্বিশেষে সকলেরই তাই নিয়মিত ভগবচ্চিন্তার প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। অনেকে বলে থাকে, এত কাজের মধ্যে ভগবানের নাম করার সময় পাওয়া যায় না। সংসারের কাজ কি কখনো বন্ধ হবে? তা নয়, ওরই ভেতর সময় করে নিতে হবে। সমুদ্রের তীরে বসে সমুদ্রের ঢেউ দেখে যদি কেউ ভাবে ঢেউ থামলে স্নান করবো, তাহলে তার স্নান করা আর হবে না কখনো। সে যদি দুটি ঢেউ-এর মাঝখানে ঝট করে একটা ডুব দিয়ে আসে, তবেই তার স্নান করা হয়।

কাজের সময় সংসারে সকলের মধ্যে ইষ্টকে চিন্তা করার ও কাজকে তাঁরই পূজা জ্ঞান করে চলার চেষ্টার মাধ্যমেই ক্রমে কাজই যথার্থ পূজায় রূপান্তরিত হবে। কাজকে তখন আর বন্ধন বলে মনে হবে না। তখন সংসার বলে আলাদা আর কিছু থাকবে না—তুমি থাকবে আর তোমার ইষ্টদেবতা থাকবেন; সকলের মধ্যেই তখন ইষ্টদেবতাকে দেখতে পাবে। তখন সংসার সোনার সংসার হয়ে যাবে, কাজে বিরক্তির ভাব চলে যাবে, জীবন আনন্দে ভরপূর হবে, মধুময় হবে।

উপনিষদে আছে, স্ত্রীর কাছে স্বামী যে প্রিয় হয়, সে স্বামীর জন্য নয়, স্বামীর ভেতর যে আত্মা আছেন তার জন্য; সেরূপ স্বামীর স্ত্রীর প্রতি যে ভালবাসা, মা-বাপের সন্তানের প্রতি যে ভালবাসা, তা স্ত্রী বা সন্তানের জন্য নয়, আত্মার জন্যই।

যাঁরা প্রকৃত ধার্মিক লোক তাঁরা লোকের দুঃখে বিচলিত হন। অবতারপুরুষ বা আচার্য-গণ আসেন মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করতে; তাঁরা মানুষের দুঃখকষ্টে উদাসীন থাকবেন, একি হয় কখনো? অনেকে বলে থাকেন, ধার্মিক লোকেরা লোকের দুঃখকষ্টের দিকে তাকান না; বর্তমান সময়ে ধর্মকে সাধারণতঃ যেভাবে আমরা আচরিত হতে দেখি, তাতে অবশ্য একথা মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ধর্মে কখনই এভাব থাকতে পারে না। অপরের দুঃখকষ্টে যে উদাসীন থাকে, সে যথার্থ ধার্মিক নয়।

প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম দেখেন, তাঁদের দুঃখকষ্ট নিজে অনুভব করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একদিন দক্ষিণেশ্বর কালী

বাড়ীর চাঁদনির ঘাটে দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছিলেন তিনি। এমন সময় গঙ্গার বুকে দুই নৌকার দুই মাঝিতে ঝগড়া বাধে, এবং একজন অপরের পিঠে খুব জোরে চাপড় মারে। সেই আঘাতের দাগ তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠেও ফুটে উঠল। এটা কি করে সম্ভব হয়? —তিনি সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন বলেই এরূপ হওয়া সম্ভব হয়েছিল। স্বামীজীর জীবনেও অনুরূপ একটি ঘটনার কথা বলছি। স্বামীজী তখন বেলুড় মঠে রয়েছেন; গঙ্গার ধারের বাড়ীটির দোতলার পূব দিকে যে বারান্দা, তার দক্ষিণ-প্রান্তে স্বামীজীর ঘর। বারান্দার পশ্চিমে একটি ছোট ও একটি বড় ঘর, এ ঘর দুটির মুখ গঙ্গার দিকে। স্বামীজী একদিন মাঝরাতে বারটার পর ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। বারান্দার পশ্চিমদিকের ঘর দুটির একটিতে তাঁর গুরুভাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দও ছিলেন। স্বামীজীকে বারন্দায় বেড়াতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি ঘুম হচ্ছে না?" স্বামীজী বললেন, "দেখ্ পেসন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুমের মধ্যে একটা শক্ পেয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তারপর থেকে অস্বস্তি বোধ করছি। দেখ্, দূরে কোথাও একটা ভীষণ দুর্ঘটনা হয়েছে ও বহু লোক বিপন্ন হয়েছে।" বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের বলেছিলেন, "কোথায় কোন্ দূরে হাজার হাজার লোক বিপন্ন হল, আর এখানে ঘুম হল না—এটা শুনে মনে হাসি পেল। কিন্তু স্বামীজীকে কিছু বললাম না। পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখলাম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফিজি অঞ্চলে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বহু লোক মারা গেছে।" এইজাতীয় ঘটনা ধরার জন্য যন্ত্র আছে; কিন্তু স্বামীজীর মনই সেই যন্ত্র হয়ে উঠেছিল—মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি তাঁর স্নায়ুতন্ত্র এত সংবেদনশীল ছিল যে, সে দুঃখকষ্টের সাড়া সেখানে জাগতই; তাই এত দূরের মানুষের বিপদ তাঁর মন ধরেছিল, তাদের জন্য সমবেদনাতুর হয়েছিল।

যথার্থ ধর্মই এই একাত্মবোধ এনে দেয়—সব মানুষের মধ্যেই নিজেকে বা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করায়। মানুষকে ভগবানজ্ঞানে সেবা করার সাধনা এ উপলব্ধি লাভের একটি রাজপথ। ঠাকুর-স্বামীজী এইটি শিখিয়ে গেছেন আমাদের। সারাজগতের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্যই তাঁরা এসেছিলেন। সাধুই হোক বা গৃহস্থই হোক, তাঁদের এ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলে তবেই ভারতের উন্নতি হবে; ভারতের কেন, সারা জগতেরই হবে। আমাদেরই সে আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করে জগৎকে দেখাতে হবে। স্বামীজী এ দায়িত্ব আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা যেন সে দায়িত্ব বহন করতে পারি। সব বিভেদ ভুলে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে একত্র হয়ে, সব শুভ শক্তিকে একত্র করে যেন জগতের সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি শুধু আদর্শের প্রতি ভালবাসা নিয়ে নয়, আদর্শকে জীবনে মূর্ত ক'রে। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাছে আজ এই প্রার্থনাই করি।

স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ : প্রাক্‌কথন*

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদ : স্বামী বীতশোকানন্দ]

ভারত-ভ্রমণে যেসব বিদেশীরা আসেন, অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা এখানকার সাধু ও ফকির, বা বৈরাগীদের সঙ্গে পরিচিত হন। এঁরা হচ্ছেন ভারতীয় জনতার চিত্রময় অংশ। এঁদের ভেতর কি হিন্দু কি মুসলমান, অধিকাংশই রমতা সাধু; আবার অনেকে অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত পরিব্রাজক-সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বতন্ত্রতার চিহ্নরূপে এঁদের সকলেরই পরিধানে গৈরিক বসন। তাছাড়া বিশেষ চিহ্নও আছে—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, করে দণ্ড বা ত্রিশূল, মাথায় উচ্চচূড় জটাভার, মুখে ও সর্বাঙ্গে ভস্ম-বা মৃত্তিকা-লেপ। যোগী, নাগা, উদাসী এবং আরো কত সব সম্প্রদায়ের বহু সাধু সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত; একথা শঙ্করাচার্য কর্তৃক খৃষ্টীয় ৮ম শতকে প্রবর্তিত পুরীসম্প্রদায় সম্বন্ধে সমধিক সত্য। শঙ্করাচার্য নিজে সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁর অধ্যাত্মভাবধারা এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দু-হাজার বছর ধরে গুরুপরম্পরা বহন করে আসছেন। আলোচ্য মূল ইংরেজী গ্রন্থখানির লেখক স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই পুরীসম্প্রদায়ভুক্ত।

বিবেকানন্দের জন্ম ও শিক্ষা বাংলাদেশে। যৌবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভারতে আধুনিক যুগে তিনিই প্রথম ধর্মাচার্য, যিনি হিন্দু-গোঁড়ামির গড়া নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে সাগর পেরিয়ে পাশ্চাত্ত্যে ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন। প্রথমবার গিয়েছিলেন চীন ও জাপান হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে, সেখানে ধর্মমহাসভায় হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে; এই ধর্মমহাসভাটি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত চিকাগো মেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ-রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যে-কাজ তিনি করতে যাচ্ছিলেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ পূর্ণ সজাগ ছিলেন। হিন্দুধর্ম তখন পর্যন্ত নিজেকে প্রচারশীল ধর্ম বলে ভাবতে শেখেনি। জনৈক বন্ধু বলেন, জন্মভূমি-পরিত্যাগের প্রাক্‌কালে বিবেকানন্দকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে যাচ্ছি, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান, আর সমস্ত আদর্শবাদ সহ খৃষ্টধর্ম যার একটা কষ্টকল্পিত অনুকরণ মাত্র।"

চিকাগোয় প্রচারকরূপে সাফল্য অর্জনের পরের কয়েকটি বছর তিনি আমেরিকায় কর্ম ও ভ্রমণে অতিবাহিত করেন; ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে দুবার ইউরোপ মহাদেশে আসেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি ভারতে ফিরলে স্বদেশবাসীরা তাঁকে যে বিপুল সংবর্ধনা জানান, তাকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যেখানে তিনি প্রথম অবতরণ করেন সেই কলম্বো থেকে শুরু করে যে-মাদ্রাজ থেকে তাঁকে প্রথম বিদেশে পাঠানো হয়েছিল সেই মাদ্রাজ পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণগুলি, এবং কলকাতায় তাঁর নিজের মঠে পৌঁছুবার পর যে-সমস্ত শহর, প্রদেশ ও করদরাজ্যগুলিতে আমন্ত্রিত

* হস্তলিখিত মূল ইংরেজী পাণ্ডুলিপিটি স্বামী সারদানন্দের পুরাতন পত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, ভগিনী নিবেদিতা আমেরিকা হইতে (কেম্‌ব্রিজ, মাস, ইউ. এস. এ ; ১৬. ১. ১৯১১) ডাকযোগে ইহা পাঠাইয়াছিলেন। ১২ই ফেব্রুআরি তারিখ উহা বাগবাজার পৌঁছায়। আমরা যতদূর জানি, রচনাটি পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। —সঃ

হয়ে তিনি গিয়েছিলেন, সেই ভ্রমণগুলি সবই ছিল সত্যিই বিজয়ীর জয়যাত্রার অগ্রগতি। আর মুসলমান সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে হিন্দুভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার মাত্রা যেখানে খুবই কম, সেই দক্ষিণভারতে ধর্মমত ও বিশ্বাস-সংক্রান্ত মতভেদ-গুলির উপর তাঁর নির্দেশনামা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে সেই সময় থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। ভারতের নাম নিয়ে চার বছর আগে যে গৈরিকভূষিত ভিক্ষুক সন্ন্যাসী ভারতের উপকূল ছেড়ে গিয়েছিলেন, ভারত এখন তাঁর জীবনোদ্দেশ্য ও বাণীকে প্রকাশ্য অভিনন্দন দ্বারা সমর্থন করল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এখনো কতটা সজীব সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা হয় যখন শুনি, মাদ্রাজে ১৪ দিন ধরে স্বামীজী প্রতিদিন মধ্যাহ্নে একটা করে বৈঠক বসাতেন আর সেখানে প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা দার্শনিক ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্ন করতেন, আর সে প্রশ্নগুলির উত্তর স্বামীজীকে প্রথমে সংস্কৃতে ও পরে ইংরেজীতে দিতে হত। সংস্কৃত ভাষা তাঁর নিজের দেশে কোনক্রমেই মৃত নয়। স্বামীজী দ্বিতীয় এবং শেষবার পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং দু-বছর পূর্ণ হবার আগেই ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই দেহত্যাগ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে তিন-চার বার গিয়ে সেখানে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-বার ভাষণও দিয়েছিলেন।

স্বদেশে তাঁর কর্মকাণ্ডে স্বামীজী কখনো ধর্মসংস্কারক বা সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। যে সম্মানের অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তার সুযোগ নিয়ে নিজের কোন প্রিয় সাম্প্রদায়িক মতবাদ অপরের ওপর চাপিয়ে দিতে চাননি। বর্তমান যুগ-পরিবর্তনের কালে উদ্ভূত বিভ্রান্তিগুলির প্রত্যুত্তররূপে তিনি অধ্যাত্ম হিন্দুধর্মের পতাকা তুলে ধরেছিলেন—যা আদর্শস্থানীয়, গতিশীল এবং জাতি-ও প্রথাগত সর্ববিধ বাহ্যানুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, এমনকি বেদ এবং উপনিষদ্‌ও কেবলমাত্র ধর্মের এই কেন্দ্রীয় এবং সর্বাধিক মর্মোদ্ঘাটক রূপটি ছাড়া অন্য আর কিছুই ঘোষণা করে নাই; লিখিতই হোক বা অলিখিতই হোক, অপেক্ষা-কৃত আধুনিক কালের সন্ত ও আচার্যগণের বাণীও ছিল তাই।

পাশ্চাত্যে ভারতীয় চিন্তার বার্তাবহ স্বামীজীর অবদান কিন্তু কিছু বেশী জটিল। সেখানে তাঁর বহুসংখ্যক রচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তিনি শুধু অদ্বৈততত্ত্ব বা একত্বের, সর্বব্যাপী ঈশ্বরতত্ত্বেরও সংজ্ঞানিরূপণে বা বিস্তারেই নিরত ছিলেন না, প্রাচীন জ্ঞানের একটি শাখার একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রামাণিক অধিকারিরূপেও কাজ করেছেন; আলোচ্য গ্রন্থটিতে তারই পরিচয় মেলে। জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটি (রাজযোগ) সম্বন্ধে ইউরোপের কোন পরিচয়ই নেই বললেই চলে, এমন কি এর নামটি পর্যন্ত সেখানে প্রায় অজ্ঞাত।

রাজযোগ বইটি স্পষ্টতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত—একটি অংশ মৌলিক গ্রন্থ, অপরটি ভাষ্যসমেত একটি প্রাচ্য গ্রন্থের অনুবাদ। এ ছাড়া বিষয়া-নুসারে গ্রন্থটিকে আরও একভাবে দু-ভাগ করা যায়; প্রথম ভাগে আমরা যেন একটি রাগিণী শুনছি, যার বিষয়বস্তুর সঙ্গে ধর্মের সারূপ্য আছে; দ্বিতীয় ভাগটি যেন মিশ্ররাগাত্মক, যেটিকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। একদিকে আমরা শুনি সেই উদাত্ত ধ্বনি: "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহ-মেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ

পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥" অপরদিকে আমরা যতই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, টীকার পর টীকা পড়তে থাকি, ততই, বিশ্বাসের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, অন্তত: মানসিকতার দিক থেকে একটি প্রাচীন ও অপরিচিত মনোবিজ্ঞানের সম্মুখীন হই যেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বকীয় পরিভাষা ও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এবং যা আমাদের অভ্যস্ত জ্ঞানের সঙ্গে আশ্চর্য রকমে সাদৃশ্যহীন।

দুটি দৃষ্টিকোণই ঠিক; প্রাচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে রাজযোগ হচ্ছে ধর্ম, আর পাশ্চাত্তোর দিক থেকে বিজ্ঞান। সাধু ও আচার্যদের দিব্যভাব ও ভবিষ্যদ্দর্শন সম্বন্ধে আমরা পাশ্চাত্ত্য-বাসীরা যে একেবারেই অনভিজ্ঞ, তা নয়; মাঝে মাঝে এর পরিচয় আমরা পেয়েছি, এবং সেগুলিকে মানসিক বিকার বলা কখনই ঠিক নয়। ফ্রান্সী, যোয়ান, টেরেসা ও ইগনেসাস লয়লা ব্যতীত আমাদের ইতিহাস বহুলাংশে রিক্ত থেকে যেত। কিন্তু আমরা এইসব অতীন্দ্রিয় ঘটনাবলীর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার কোন প্রয়োজনই বোধ করিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ভুল বোঝা সত্ত্বেও সেসব ঘটেছে, আমাদের সহানুভূতির জন্য নয়। প্রাচ্যে কিন্তু কোন ধর্মীয় ভাবকে লোকে সরলতা ও ঋজুতার সঙ্গেই সত্যের মর্যাদা দেয়, যেমন পাশ্চাত্ত্যে দেয় কোন একটি যন্ত্রের আবিষ্কারকে বা কোন যন্ত্রশিল্পের প্রক্রিয়াকে। এতেই বোঝা যায়, যে মানসিক অবস্থা ধর্ম-সমূহের উদ্ভবস্থল, স্বামী বিবেকানন্দ যাকে অতিচেতন বলে অভিহিত করেছেন, তার স্বীকৃতি প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানের একটা পূর্ণ অঙ্গ হওয়া চাই-ই। পতঞ্জলির প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম সূত্র "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি"-র মতো আর কোন সূত্র আছে কি, যা বৈজ্ঞানিক আদর্শের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে অধিকতর বেপরোয়া ও নির্ভীকভাবে হাসতে পারে? এই সূত্রের লেখকের মনে বিন্দুমাত্রও বিভ্রান্তি ছিল কি? মনের কোন বাতায়নকে রুদ্ধ করে অন্ধকার করে রাখবার প্রশ্ন ওঠে কি? ঐ শব্দগুলিই অপরোক্ষভাবে সূত্রটির প্রামাণ্যের দাবির ভিত্তি রচনা করেছে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষানুভূতির ওপর। কারো কথাকে মেনে নেবার জন্য আবেদন করা হচ্ছে না। শিষ্যকে শিক্ষাদানে "আগম-প্রমাণ" বা "আপ্তবাক্য-প্রমাণ" কথাটির বিশেষণটির পশ্চাতে যে আত্মগৌরব রয়েছে, তা লক্ষ্য করুন; "অনুমান" হচ্ছে সম্ভাব্য তত্ত্ব নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য পন্থাগুলির অন্যতম; কিন্তু দুটিই প্রত্যক্ষানুভূতির উপর সমভাবে নির্ভরশীল। কাজেই প্রত্যক্ষই হচ্ছে সমস্ত পরীক্ষার চরম মানদণ্ড, কষ্টিপাথর। গ্রন্থাদির প্রমাণ অস্বীকার করে ধর্মের সমস্ত উপাদানগুলিকে অনুভূতির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার এই আগ্রহ পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা অনুযায়ী ধর্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানেরই বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক—একথা সত্য নয় কি?

এই প্রাচ্য বিজ্ঞানটি, এর বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে নিয়ে, আর একটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনার দাবি রাখে; সেটি হচ্ছে পদ্ধতির প্রশ্ন। এই অনুসন্ধান-প্রক্রিয়াটির প্রকৃতিই এমনি যে, মানবদেহই হল তার পরীক্ষাগার, এবং (পরীক্ষার জন্য) সে-দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি ছাড়া আর সবই অগ্রাহ্য। তাই বলে একথা সত্য নয় যে, সেখানে কোন পরীক্ষা করা হয় না; সমগ্র গবেষণাটিই পরীক্ষা-ভিত্তিক। আর, যখন আমরা পাঠ করি, হৃৎ-পিণ্ডকে এতখানি স্বাধিকারে আনা যায় যে, রক্তসঞ্চালনক্রিয়া ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত বা বন্ধ করা যায়, তখন রাজযোগের পথিকৃৎদের কী

সাহস ও জ্ঞাননিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তার কিছুটা আভাস পাই। কোন সিদ্ধান্তের বহুবিধ অঙ্গের প্রামাণিক প্রতিষ্ঠার জন্য যে জীবনোৎসর্গের প্রয়োজন হয়—যেমন আধুনিক রসায়ন বা ভেষজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—রাজ-যোগের ক্ষেত্রে যে তা কম প্রয়োজন হয়েছিল, একথা বিশ্বাস করার কোন অবকাশ নেই। একথা তো স্পষ্ট যে, নিয়মনিষ্ঠার কঠোরতা-বরণে আধুনিক বিজ্ঞানীদেব জীবনরীতিতে পূর্বসূরীদের প্রাধান্য দিতেই হবে।

আর একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা বাকী থাকছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি এই যোগসূত্রগুলি লিখেছিলেন; বিংশ শতাব্দীতে 'গ্রন্থকার' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থে তাঁকে গ্রন্থকাররূপে দেখা চলে না। বলা যায়, তাঁর সমকালীন তপস্যা ও মননের সঙ্গমোদ্ভূত সিদ্ধান্তগুলির লিপিকার ছিলেন তিনি। আজও তিনি যোগের আদিগুরু বলে পরিচিত। কোন বিজ্ঞানপরিষদ্ কর্তৃক কোন খৃষ্টাব্দের আবিষ্কারগুলি ঐ পরিষদের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত হলে ঐ আবিষ্কারের কৃতিত্ব যেমন ব্যক্তিগতভাবে ঐ পরিষদের সভাপতিকেই দেওয়া হয়,—এ বোধ হয় ঠিক সেইরকমই।

যোগসূত্রগুলি সংস্কৃতির একটা যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষার অবদান। প্রকাশিত হবার বহু পূর্ব থেকেই সেগুলি ছিল; প্রকাশ-কালেই সেগুলি কয়েক শতাব্দীর পুরাতন।

উপসংহারে বলা যায় যে, এই অদ্ভুত প্রাচীন রাজযোগ আজও পর্যন্ত ভারতে প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। এতে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন এমন শিক্ষার্থী কয়েক হাজার রয়েছেন। আবার এমন লোকও আছেন, হয়তো অল্প-সংখ্যক, যাঁরা এতে অতি-উন্নত। সে যাই হোক, আমরা, এই গ্রন্থের লেখক স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ শিষ্যেরাই, স্বামী বিবেকানন্দকে পূর্বোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত বলেই সসম্ভ্রমে দেখি। তিনি সেই মহাত্মাগণের অন্যতম, যাঁদের কাছে সমাধি বা অতিচেতন অবস্থার কিছুই রহস্যাবৃত ছিল না, যাঁদের কথাগুলি "আপ্তবাক্য"।

—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

"জাতীয় মনের হর্ম্যনির্মাণে তাঁর (স্বামীজীর) বিশ্বাস রূপ নেবে। সর্ব মত ও জাতির ত্রিশকোটি নরনারীর জীবনের ওপরই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। সেই সঙ্গে হয়ত, পৃথিবীর বিশ্বাসের জগতে নূতন যুগের অভ্যুদয়।···

"সেই মন্দিরভবনের নির্মাণে আমি যেন একটি ইটও বহনের যোগ্য হই।"

"তাঁর (স্বামীজীর) প্রাণ-মন-আত্মা এক জলন্ত মহাকাব্য, যা 'ভারত' এই নামোচ্চারণে মহারহস্যব্যাকুল।"

—ভগিনী নিবেদিতা

গীতায় সমন্বয়

স্বামী আদিনাথানন্দ

ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার ইতিহাসে ভগবদ্-গীতায় বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে একটি সমন্বয়মূলক দৃষ্টিকোণ হইতেই যে বিচার করা হইয়াছে, একথা অবিসংবাদিত সত্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে তত্ত্বসম্বন্ধে দার্শনিক মতগুলির সমন্বয়সাধনে তত বেশী তৎপর হন নাই, যতটা হইয়াছেন আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির সম-উপযোগিতা দেখাইয়া দিতে। ইহা করিতে যাইয়া তিনি গীতায় একটি মৌলিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবানলাভের জন্য প্রচলিত কোন পথকেই অপরগুলি অপেক্ষা ছোট বা বড় না বলিয়া বলিয়াছেন যে, চরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়করূপে সব পথগুলিই স্ব-প্রধান; স্বামীজীর ভাষায়, জীবভাবের অবসান ঘটাইয়া মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশের সহায়করূপে প্রত্যেকটি সাধনমার্গই সহাবস্থানের অধিকার লাভ করিয়াছে।

ইহা সম্ভব হয় কেমন করিয়া? আমরা জানি জ্ঞানযোগ বা বুদ্ধিযোগ বা সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ—এই চারিটি প্রধান সাধনপথের তত্ত্বসম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীতে ও সাধনপদ্ধতিতে পার্থক্য প্রচুর। আত্মা বা পুরুষ সত্য, প্রকৃতির অন্তর্গত সকল বস্তু ও ধারণা তাঁহাতে আরোপিত—পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সত্য মানিয়া লইয়া সাংখ্যযোগী বা জ্ঞানযোগী অগ্রসর হন। বৈদান্তিক জ্ঞানযোগীর মতে একমাত্র আত্মা ভিন্ন আর সবই মিথ্যা; যাহা কিছু দৃশ্যস্থানীয় তাহাই মিথ্যা বা মায়া—এমনকি ঈশ্বরও জড়জগতের এবং মানসজগতের বস্তুচয়ের মতোই সমভাবে মিথ্যা, মায়িক।

কোন ভক্তিপথাবলম্বীর নিকট আবার জ্ঞানযোগীর এই ধারণা বিকট বলিয়া মনে হইবে; তিনি কখনই ইহাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাঁহার নিকট ঈশ্বরই চরম সত্য, ঈশ্বরের স্বরূপপ্রকাশক প্রতিটি উপলব্ধিই সত্য। ভক্তের নিকট ঈশ্বরেব ধারণার স্থান আত্মার ধারণার উর্ধ্বে।

কর্মযোগী ও রাজযোগীর আবার কোন দার্শনিক ঈশ্বরীয় তত্ত্বের প্রয়োজনই নাই। তাঁহারা বাহিরের সাহায্য অস্বীকার করিয়াই আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ করেন; অজ্ঞানের পঙ্কিল আবর্ত হইতে উদ্ধারলাভের জন্য তাঁহারা একমাত্র মন ও বুদ্ধির শক্তির উপর নির্ভরশীল।

গীতার মতে, এই বিভিন্ন পথগুলির বিস্তারিত অংশে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সবগুলিরই উদ্দেশ্য এক, এবং সব পথগুলিই সমভাবে সীমিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, 'সবাই বলে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে, কিন্তু কারো ঘড়িই ঠিক চলে না।'

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বিষয়টি সম্যক-ভাবে বোঝা যায়। সব পথেরই লক্ষ্য মুক্তি, বন্ধন হইতে আমাদের মুক্ত করিয়া দেওয়া। মানুষ বাস্তবিকই স্বরূপতঃ পূর্ণ ও মুক্ত। নিজের এই মুক্ত স্বরূপ আবিষ্কার করার নামই মুক্তিলাভ—নূতন করিয়া কিছু পাওয়া নহে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ যেমন বলিয়াছেন, "আত্মজ্ঞান নূতন কিছু সৃষ্টি নয়, আবিষ্কার মাত্র।" শঙ্কর-বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ইহাই। যে-সম্পদ হারাইয়া

গিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি, আসলে তাহা যে হারায় নাই, আমার কাছেই রহিয়াছে, ইহা জানার (যেন আবার তাহা ফিরিয়া পাওয়ার) নামই আত্মজ্ঞানলাভ। আমরা পূর্ণ ও মুক্ত-স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞানবশতঃ আমাদের মিথ্যা ধারণা জন্মিয়াছে যে আমরা অপূর্ণ, বদ্ধ ; কাজেই সত্যলাভে আগ্রহশীল সব সাধকেরই একমাত্র কাজ হইল এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। অজ্ঞানের এই আবরণ উন্মোচন করিতে হইলে সাধককে ধাপে ধাপে সাজানো কয়েকটি অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। প্রথম ধাপে ওঠা, প্রথম কাজ হইল, যে চারিটি পথের কথা বলা হইয়াছে, তাহার যে-কোন একটি অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে চলিতে শুরু করা। ক্রমে সাধক উচ্চতর ধাপগুলিতে উঠিতে থাকেন। যে-কোন পথ ধরিয়াই হউক কিছুকাল শান্তচিত্তে আন্তরিকতার সহিত সাধনা করিবার ফলে সাধকের মনের নিম্নস্তরের উত্তেজনা ও আবেগগুলি সংশোধিত হইয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় ; সাধকের মধ্যে তখন সাত্ত্বিক ভাবের প্রাধান্য ঘটে, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি দমিত হয়, চেতনার উচ্চতর অবস্থায় অনন্যমনা হইয়া অবস্থান করিবার মতো কিছুটা মানসিক স্থৈর্য ও শক্তি তাহার আসে। সাধনার অগ্রগতির ফলে এই মানসিক স্থৈর্য ও শক্তি ক্রমবর্ধিত হইয়া এক অবস্থায় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থালাভ সাধকের আধ্যাত্মিকতালাভের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ক্ষণ ; সাধকের মন যখন এতখানি শুদ্ধ হয়, তখন নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তিনি আধ্যাত্মিকতার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। জগৎ ও জীবনের পিছনে যে চিন্ময় শক্তি ক্রিয়াশীল, এই অবস্থায় স্বজ্ঞাসহায়ে সাধক তাঁহার আভাস পান, ভগবদানন্দের পূর্বাস্বাদ পান। ঐ আনন্দসাগরে সর্বক্ষণ মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাঁহার চিত্ত তখন স্বতই ধ্যানে ডুবিয়া যাইতে চায়। এ অবস্থায় আসিলে সাধক বলিতে পারেন, "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া !" তাঁহার অগ্রগতি তখন স্বাভাবিক ও অব্যাহত। অজ্ঞানের অবশিষ্ট ক্ষীণ আবরণটুকু উন্মোচিত হইয়া অনির্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে একীভূত হওয়া তখন যে-কোন মুহূর্তে ঘটিতে পারে, তখন প্রশ্ন শুধু সময়ের।

পূর্বে যে চারি প্রকার যোগ বা সাধনপথের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি সবই সাধককে একই ভাবে, ঠিক একই পর্যায়ক্রমেই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর করায় ; কাজেই সেগুলি সবই সমধর্মী। তাছাড়া, গীতা যখন ঘোষণা করে যে, সমস্ত বেদই হইল ত্রিগুণের রাজ্যের অন্তর্গত এবং বেদকেও অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত হওয়াই হইল আদর্শ, তখন সেই ঘোষণাই সব সাধনপথকেই আদর্শ হইতে নিম্নতর স্তরে, ত্রিগুণের রাজ্যে একই আসনে বসায় ; কোন পথই যখন আমাদের অমৃতধাম পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে না, সবগুলিই যখন সমভাবে সীমিত, তখন কোন পথের অপরগুলি হইতে প্রাধান্যের বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবির প্রশ্নই উঠে না। অমৃতধামে আমাদের প্রবেশলাভ ঘটে এক অনির্বচনীয় উপায়ে, যাহাকে কখনো বলা হয় 'ভগবৎ-কৃপা', কখনো বা 'ভগবানের স্বেচ্ছানির্বাচন'—কঠোপনিষদের ভাষায় "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" (১৷২৷২৩)।

'একৈবাহং জগত্যত্র'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া অর্জুনের মনে বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিলেন শ্রীভগবানই সর্বময়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে যাহা কিছু অভিব্যক্তি তাহা তাঁহারই বিভূতি; জন্ম ও মৃত্যু, জয় এবং পরাজয়, সুখ এবং দুঃখ, করুণ এবং কঠোর, সব তাঁহারই শক্তি, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। চণ্ডীতে বর্ণিত হিমালয়ের এক যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী অম্বিকা তাঁহার সহিত সংগ্রামে রত দৈত্যরাজ শুম্ভকে ঐ একই আধ্যাত্মিক চরম সত্য শুনাইয়া দিলেন—একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। "অখিল জগৎসংসারে আমিই একা রহিয়াছি। আমা ছাড়া অন্য আর কে আছে?" (চণ্ডী ১০।৫)। শুম্ভ দেখিতেছিলেন তাঁহার প্রতিপক্ষ সিংহবাহিনী উদ্ধতা যোদ্ধ্রী একের পর এক বিচিত্র ভূষণ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা বিচিত্র-মূর্তি নানা রণ-সঙ্গিনীদের আমদানী করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধে আগাইয়া দিতেছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই আশ্চর্যবলবীর্যশালিনী এবং নূতন নূতন যুদ্ধকৌশলে সুদক্ষা। ইঁহাদের পরাক্রমে শুম্ভের বিপুল দৈত্যবাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, এমনকি তাঁহার অপরাজেয় মহাবীর ভ্রাতা নিশুম্ভও মৃত্যুমুখে পতিত। এমন অঘটন যে ঘটিতে পারে তাহা ত্রৈলোক্যজয়ী শুম্ভ স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার পৌরুষের এত বড় লাঞ্ছনা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। বুঝিতেছিলেন, নারীর হাতে তাঁহাকেও মরিতে হইবে। পরিত্রাণ নাই। ভাবিতেছিলেন, কি কুক্ষণেই দূতের কথা শুনিয়া এই ছলনাময়ীকে রাণী করিতে চাহিয়াছিলাম! এত দুঃখেও তাঁহার হাসি পাইতেছিল! ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণকে পদানত করিয়া অবশেষে অবলার হাতে প্রাণবিয়োগ! এ কি বাস্তব, না স্বপ্ন?

যাহা হউক দানবের ঔদ্ধত্য মরিয়াও মরে না। শুম্ভ ভাবিলেন, সৈন্যসমারোহ দ্বারা যাঁহাকে জব্দ করা গেল না, নানা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যাঁহাকে আহত করা সম্ভব হইল না, তাঁহাকে একবার বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া দেখি। বলিলেন,

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী।

"বলগর্বে গর্বিতা হে উদ্ধতা নারী, দূতের মুখে তুমি সংবাদ পাঠাইয়াছিলে যে, একাই তুমি আমার সমরশক্তির সঙ্গে লড়াই করিবে। তোমার সেই আস্ফালন তো দেখিতেছি বাগাড়ম্বর মাত্র। তলে তলে যুক্তি করিয়া এই সব ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, নারসিংহী, বারাহী, কালী, কৌমারী প্রভৃতি জালাময়ীদের কোথা হইতে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদেরই শক্তিতে আমার সৈন্যদের ছারখার করিলে। ইহাতে তোমার আর কি বাহাদুরী? মিথ্যাবাদিনী যাদুকরীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হাত আর কলঙ্কিত করিতে চাই না।"

দৈত্যরাজের কটুবাক্য শুনিয়া দৈত্য-মর্দিনীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—সেই হাসি যাহা "নগেশ্বর হিমালয়ের" সানুদেশে দেবতাদের স্তব শুনিয়া "জাহ্নবীতোয়ে" স্নানের জন্য

আগতা রঙ্গময়ী পার্বতীর মুখে প্রতিফলিত হইয়াছিল—বড় স্বচ্ছ, নির্মল, সর্বসঙ্কোচবিমুক্ত, জ্ঞানদীপ্ত হাসি—মহামায়ার স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। কাম ও দম্ভ যে বাক্যের প্রযোজক, দেবী তাহাকে খণ্ডন করিলেন কল্যাণকরী শ্রৌতী বাণী দিয়া।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥

"রে দুর্ভাগা, মোহ তোর সকল চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; তাই তুই আমার কার্যকলাপ বিচার করিতে বসিয়াছিস। কি করিয়া তোকে বুঝাইব আমি কে? রূপের পশ্চাতে অরূপ, বহুর পশ্চাতে এককে ধরিবার ক্ষমতা তো তোর মলিন বুদ্ধিতে আসিবে না। তাই তোর চোখ গেছে ঝলসাইয়া। গর্বিতা আমি নই, কেননা অপ্রাপ্যকে পাইলে তবে তো গর্ব। কিন্তু আমার তো কিছু অপ্রাপ্য নাই। বিশ্বসংসারের সকল কিছু অনাদিকাল হইতে আমার কুক্ষিগত। সর্বময়ী আমার পক্ষে গর্বের কথা উঠে না। গর্ব তোরই মূঢ় মনের মিথ্যা ভূষণ। তাই কামদৃষ্টিতে তুই আমাকে দেখিয়াছিস। আসুর দম্ভে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে নামিয়াছিস। যে-সব শক্তিময়ীদের অস্ত্র হানিতে দেখিতেছিস তাহারা কেহ আমা হইতে আলাদা নয়। এখন দেখ্, তোর চোখের সামনে প্রমাণ করিয়া দি একই আমার শাশ্বত সত্য। বহু একেরই বি-ভূতি—বিশেষ প্রকাশভঙ্গী মাত্র। দেখ্, এক মুহূর্তে কি করিয়া ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী প্রমুখ রণময়ীরা আমারই দেহে বিলীন হইয়া যায়।"

অর্জুনের চোখে একটু জ্ঞানাঞ্জন লেপিয়া দিয়া বেদার্থপ্রকাশক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, পশ্য—দেখ। "সচরাচর সমস্ত জগৎ আমারই দেহে দেখ।" (গীতা—১১।৭), তেমনি শুম্ভাসুরের মনে ঝাঁকানি দিয়া বেদময়ী জগজ্জননীও বলিলেন, পশ্য—দেখ্। "নানা শক্তির আমাতেই অন্তঃপ্রবেশ দেখ্।" শুম্ভাসুরের ভাগ্য কম নয়। অর্জুনের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মোপলব্ধির আভাস।

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা॥

"অনন্তর ব্রহ্মাণীপ্রমুখ নানামূর্তিধারিণী সেই সেই দেবশক্তিগণ পরমেশ্বরী মহাদেবীর তনুতে প্রবেশ করিলেন! তখন অম্বিকা একাকিনীই তথায় বিদ্যমান রহিলেন।" (চণ্ডী—১০।৬)

বহুরূপিণীকে একাকিনী দেখা অথবা একক হইতে বহুরূপের সম্প্রসারণ দেখা—দুই-ই তত্ত্বদৃষ্টির এপিঠ ওপিঠ। অর্জুন দেখিয়াছিলেন দ্বিতীয়টি, শুম্ভাসুরকে মা দেখাইলেন প্রথমটি। অর্জুন দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে মর মর হইয়াছিলেন; কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, প্রভু, এই "সর্বতোদীপ্তিমন্ত" "দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষপরিব্যাপ্ত" অদ্ভুত বিশ্বরূপ আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমার স্বাভাবিক শান্ত ছোট মানুষ-মূর্তিটিই আমার পক্ষে ভাল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া পুনরায় স্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিয়া অর্জুনকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। সহ্য করিতে না পারিলেও বিশ্বরূপদর্শনের ফলে অর্জুনের জ্ঞান-ভক্তি যে দৃঢ় হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

দৈত্যরাজ শুম্ভ শক্তির নানা প্রকাশকে মহাশক্তিময়ীর সত্তায় বিলীন হইতে দেখিয়া কতটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা মার্কণ্ডেয় মুনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিমতো মিশ্রীর রুটি সিধা করিয়া বা উলটা করিয়া যেমন করিয়া হউক খাইলে যদি সমান মিষ্ট লাগে, তাহা হইলে মন যেমনই হউক স্বয়ং আদিশক্তির মুখে তাঁহার

তত্ত্বের উপন্যাস শুনিয়া এবং তাঁহার মধ্যে বহুত্ব ও একত্বের সামঞ্জস্য নিজের চোখে দেখিয়া শুম্ভের যে কোনও আধ্যাত্মিক লাভ হয় নাই তাহা বলা চলে না। বরং বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় শুম্ভ শত্রুবেশে দেবীরই পরম ভক্ত। চণ্ডীর ভাষায়—সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়াস্ত (চণ্ডী ৪।১৮)—মায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া মায়ের শূলের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গতিলাভ। শুম্ভাসুরও নিশ্চিতই উর্ধ্বগতিলাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে পুরাণের এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়া একজন দেবীভক্ত একটি স্তবের মধ্যে লিখিয়াছেন—

শঙ্করী হইয়া মাগো গগনে উড়িবে
মীন হয়ে রব জলে মা নখে তুলে লবে॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণী
কৃপা করে দিও মাগো রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

*　*　*

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য তুমি গো পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই স্তবটি যে শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে তাহা দেখিতে পাই। যে ভক্ত বুঝিতে পারে জগন্মাতাই স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, জগন্মাতা হইতেই সকল বিনাশ, সে আর মৃত্যুতে ভয় পায় না। সে তখন এই কল্পনায় আনন্দ পায়—সে যেন একটি ক্ষুদ্র মাছ হইয়া জলে ভাসিতেছে আর মৃত্যুরূপা মহামায়া শঙ্খচিল-মূর্তি ধারণ করিয়া একটি আঘাতে তাহাকে তুলিয়া লইতেছেন, তাহার দেহটি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে পঞ্চভূতের কারাগার হইতে মুক্তি দিতেছেন।

একৈবাহং জগত্যত্র—দেবীর মুখে চণ্ডী মহাগ্রন্থের এই উক্তি বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত বাণীসমূহেরই প্রতিধ্বনি। উপনিষদের ঘোষণা—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—(এই যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা ব্রহ্মই), ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ (এই বিশ্বসংসার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়।), নেহ নানাস্তি কিঞ্চন (এখানে নানা বস্তু কিছু নাই, এক পরমাত্মাই আছেন।), একমেবাদ্বিতীয়ম্ (এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ) ইত্যাদি ইত্যাদি। বেদান্তের সাধক ভক্তিপথ দিয়া হউক অথবা যোগপথ বা বিচারপথ দিয়া হউক এই চরম সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান। যেমন করিয়া হউক একে পৌছিতে হইবে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন, দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি। যতক্ষণ দ্বিতীয় দেখিতেছ ততক্ষণ ভয় থাকিবে। দ্বিতীয়কে একের মধ্যে উপলব্ধি কর। চোখের দোষে একেকে দ্বিতীয় বলিয়া দেখিতেছ। বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্তির অঞ্জন লাগাইয়া ঐ চোখের দোষ দূর কর। তখন দেখিবে দ্বিতীয় কিছু নাই, তৃতীয় কিছু নাই, চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম কিছু নাই। একৈবাহং জগত্যত্র। সেই সত্যস্বরূপিণী চিন্ময়ী আনন্দময়ী বিশ্বমাতা সর্বকালে, আবার কালেরও অতীতে একাকিনী দাঁড়াইয়া আছেন।

মা

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[গান : কাফি—যৎ]

সুখের আশা ছেড়ে দিয়ে এসেছি মা তোমার কোলে।
ইহকালে পরকালে চাইব না সুখ কোনো কালে ॥
সুখের নেশায় ঘুরে ঘুরে পড়িনু দুখের পাথারে
সুখের সাথে দুঃখ ফিরে— বিবেকরূপে দিলে বলে ॥
সদানন্দময়ী তুমি তোমারি তো ছেলে আমি
সদাই আমায় রাখ কোলে, আর যাব না তোমায় ফেলে ॥

আবাহনী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

[গান : রামপ্রসাদী—লঘুগুরু ছন্দে]

এস জননি, প্রাণে।
জীবন সঁপি চরণে তব বন্দন জয়গানে ॥
মন্থর যত ক্লান্তি ছায় ধূসর অভিযানে,
বিদলি' এস স্বর্ণকান্তি করুণার বিধানে।
আলো তব জ্বালো মা, ম্লান এ-বিতানে,
বন্ধন যত খণ্ডন কর'—প্রার্থি নিরভিমানে।
যুগযুগান্ত সুমধুর তব মূর্ছন শুনি কানে,
রেশ তার নির্ঝরি' কর' সার্থক সন্তানে।
পুণ্য তব প্রসাদে শিবদৃষ্টিদীপদানে
মায়া যত অন্তর ছল মায়া বলি' জানে।
আশা পথহারা যত বিষণ্ণতা আনে
যাচে তব শান্তি-অক্ষ সুধার সন্ধানে।
বিশ্বভুবন সাধন তব বরিয়া নভপানে
ধায় জননি মনমোহিনি, শরণাগতি-তানে।

বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

একটি বহুবিতর্কিত প্রশ্ন—বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? এই ত্রয়ীর মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করা আজকের দিনে অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, যেহেতু বিজ্ঞানের সঙ্গে অপর দুটির অহি-নকুল-সম্বন্ধের কথা সুপ্রচলিত। প্রকৃত সম্পর্ক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় অতীতকাল থেকেই মনীষীরা বিশেষ যত্নবান। তথাপি একথা অনস্বীকার্য, বর্তমান কালেও অনেক দার্শনিক বা ধর্মপ্রবক্তা আছেন যাঁরা বিজ্ঞান থেকে সহস্র যোজন দূরে থাকতে অভিলাষী এবং বিজ্ঞানকে দানব ছাড়া তাঁরা ভাবতে কুণ্ঠিত। তেমনি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁদের কাছে ধর্ম বা দর্শন অবাস্তব বিধায় পরিত্যাজ্য। অথচ এক সময়ে এমন অবস্থা ছিল যখন ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু এই প্রীতির সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। অনুদারতার মলিন পরিবেশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তিনটি শাখা। একথা নিঃসন্দেহ যে, তিনটিই এক নয়, যেহেতু তিনেরই স্বতন্ত্র বক্তব্য থাকা যুক্তিসঙ্গত এবং তা আছে। কিন্তু যে-বিদ্বেষের অশুভ প্রচ্ছায়াতে এ বিরোধ স্নিগ্ধতার সীমা অতিক্রম ক'রে কলরব তুলেছে, তার মূলে আমাদের অনুভূতির সীমায়িত রেশ, আমাদের জ্ঞানের সীমিত বিস্তৃতি ও সত্যবোধ-সম্পর্কিত ন্যূনতম শিথিল ধারণা। তথাপি কি প্রাচ্যের, কি পাশ্চাত্যের বহু স্থিতপ্রজ্ঞ মনীষী এই বিরোধকে মনে করেছেন 'আপাত'। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন এই তিনের মধ্যেকার সন্দেহের ঊর্ণনাভ অজ্ঞানতাপ্রসূত।

বিজ্ঞানের চরম কর্তব্য সত্যের অনুসন্ধান। দর্শনের সার কথাও তাই। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে প্রভেদের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক টেলর[১] তাঁর এক গ্রন্থে বলেছেন, যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞান আর অনুসন্ধান চালাতে অপারগ তখনই মন ও দর্শন কাজ আরম্ভ করে। দর্শনের 'ডেটা' কতগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা নয়, যা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সংগ্রহ করা যায়।

দর্শন কি করে? বিজ্ঞান যেসব প্রকল্পকে ব্যবহার করে, দর্শন সেই-সব প্রকল্পকে পরীক্ষা করে, কিন্তু এই প্রকল্পসমূহ থেকে নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনের আশায় নয় বা সুপ্রাচীন কোন ধারণাকে আধুনিকীকরণের জন্য নয়। তার কাজ হলো সেই-সব প্রকল্পের চরম বাস্তব অস্তিত্বের মূল্যায়ন করা। বিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে 'বুদ্ধিমান অনুসন্ধিৎসা'। তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে—তা হলো ঘটনাসমূহের মধ্যে ঐক্যের ছন্দ আবিষ্কার করা। কিন্তু তার সীমা নির্দিষ্ট। ঘটনাসমূহের ফলাফলের বৃহত্তর ইঙ্গিত সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসা পূর্বে বিজ্ঞানের ছিল না।

যাঁরা জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করেন, তাঁরা তাঁদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সহজবোধ্য ঘটনা-সমূহকে আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান এই জগতের উপাদানসমূহের কথা জেনেছে এবং জানিয়েছে মানুষকে। বিজ্ঞান বলেছে, এই বিশাল পৃথিবী গঠিত হয়েছে পদার্থের সাহায্যে। অণু দিয়ে তৈরী হয়েছে পদার্থ। আবার

---

১ Prof A. E. Taylor : Elements of Metaphysics

পরমাণুর সমষ্টিতে জন্ম নিয়েছে অণু। এই পরমাণু আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন, মেসন ইত্যাদি অধিকতর ক্ষুদ্রাকৃতি কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। বিজ্ঞান এসবের হদিস পেয়েছে। সে বলে, সমগ্র পৃথিবীতে এক শক্তির অধিষ্ঠান। বিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম 'এনার্জি'। এর পরিমাপক হচ্ছে 'বল' (force)। বিজ্ঞান বলে পদার্থ ও শক্তির সহযোগিতায় বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব।

দার্শনিকরা চান সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীর প্যাটার্ন আবিষ্কৃত হোক, আর বিজ্ঞানীরা চান অচেতন প্রকৃতির ঘটনাবলীর রহস্য উন্মোচিত হোক। হেগেল্ বলেন, চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে ঘটনার অনুসন্ধান করা দর্শনের কাজ। এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য উচ্চার্য, বিজ্ঞান অধুনা কেবলমাত্র অচেতন পৃথিবীর প্রকৃতির রহস্য জানতেই প্রয়াসী নয়, তার দৃষ্টি সুদূর-প্রসারিত। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধানে সে ব্রতী।

যদিও দর্শন কার্য ও কারণের মধ্যে সেতু রচনা করে, তথাপি তা বিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র পর্যায়ের। পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বিজ্ঞান নির্ণয় করে কার্য ও কারণের সম্বন্ধ। ক্রাউথার[২] বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলেছেন, প্রতিবেশের উপরে আধিপত্য স্থাপনের জন্যেই বিজ্ঞানের উদ্ভব, তথাপি সমাজ ও বিজ্ঞানের বিবর্তনে পরস্পরের অনিবার্য প্রভাব অনস্বীকার্য। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিজ্ঞান এবং এই প্রয়োজন মেটাতে পারলেই তার সার্থকতা। সমাজের প্রয়োজনেই বিজ্ঞান—একথা এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী স্বীকার করেন না। এডিংটন, হোয়াইটহেড্, বিশপ অব্ বার্মিংহাম প্রভৃতি মনীষীরা মনে করেন, বিজ্ঞান বিশুদ্ধ মনন-শীলতার প্রকাশমাত্র। অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল তাঁর এক গ্রন্থে বলেছেন, ব্রহ্মাণ্ড, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-রহস্য প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণা যদি বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য না হতো, তাহলে আজ যাকে বিজ্ঞান বলি তার অস্তিত্ব থাকত না। তা হয়তো কোনদিনই উদ্ভূত হতো না। কেবল-মাত্র মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের প্রেরণাতেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ হয়েছে একথা সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া চলে না।

তাই আমরা বুঝতে পারছি যে, মানুষের অন্তরাত্মার দুটি স্বাভাবিক প্রেরণার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান। একারণেই বিজ্ঞানের ধারা দুটি—ব্যবহারিক ও দার্শনিক। প্রথমটির লক্ষ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুখ, সুবিধা, সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ ক'রে তোলা। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য এই বিশাল জগতের বৈচিত্র্য ও নানা জটিলতার মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সরল নিয়মের আবিষ্কার করা এবং তার ফলে সৃষ্টি-রহস্যের সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়া। এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী বলেন এইটিই হলো বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হচ্ছে, তার ব্যবহারিক ধারাও তত প্রসারিত হচ্ছে। যেহেতু মানুষের যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় নিহিত রয়েছে সত্যের পথে ও প্রতিষ্ঠায়।

বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম সকলেই সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত। সত্যের সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিতর্ক চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও এতে যোগ দিয়েছেন। 'সৎ' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে 'সত্য'। সৎ+য. অর্থাৎ সৎ-এর প্রকাশ হলো সত্য। দার্শনিকরা বলেন শুধু যা আছে, তা-ই কেবলমাত্র সৎ এবং সত্য

---

২ J. G, Crowther: The Social Relation of Science

একথা বলা অনুচিত। এখন যা আছে, তা পরে থাকবে কিনা এবং অতীতে ছিল কিনা, তার - নির্ভুল উত্তরের উপর নির্ভর করে সত্যাসত্যের নির্ধারণ। দার্শনিকেরা সত্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—পারমার্থিক, ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক।

এর থেকে স্বতই প্রশ্ন উঠবে, এমন কি কোন সত্য বস্তু থাকতে পারে যা শাশ্বত, যা সনাতন, যা সার্বভৌম। বিজ্ঞানের সত্য তা হতে পারে না। বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রত্যক্ষ বা যন্ত্রযোগে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর। এবং একথা অনস্বীকার্য যে, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দেশ ও কালের সীমানায় নির্দিষ্ট। যুগে যুগে বিজ্ঞানের সত্যের রূপ পরিবর্তিত হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নতুন পরীক্ষার ফলে পরিত্যক্ত হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে এমন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। একারণেই বিজ্ঞানের জগতে 'চরম বা পরম সত্য' বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য আপেক্ষিক। আজ বিজ্ঞানীরা সামগ্রিক বা সনাতন চরম সত্যকে সন্ধান করতে তৎপর হচ্ছেন সত্য, তথাপি তাঁরা একথা স্বীকারে অকুণ্ঠিত যে, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির সাহায্যে বা বিচার-প্রণালীতে পারমার্থিক সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সত্য পরিবর্তন-শীল। তাই বিনা প্রমাণে কেন, কোন কারণেই বিজ্ঞান কোন সত্যকে ধ্রুব সত্য বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানে 'পরম-সত্যের' স্থান নেই।

এই যুগে সব কিছুই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তির সাহায্যে বিচার করে যখন কোন বিষয় আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি তখন তাকে 'সত্য' বলেই ভাবি। আধুনিককালে বিজ্ঞান আমাদের যাবতীয় চিন্তা, যুক্তির উপরে খবরদারি করছে। তার ফলে আমাদের মধ্যে এক বিশেষ প্রবণতা জেগেছে যে, কোন প্রাকৃতিক বা মানসিক ঘটনাবলীকে বিজ্ঞানের প্রচলিত সূত্র বা তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা। এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহকেও বিজ্ঞানের সত্য দিয়ে বিচার করতে চেষ্টা করি। এর ফলে এমনটি হয়েছে যা বিজ্ঞান অনুমোদন করে না, আমরা সেগুলি হয়তো বিনা দ্বিধায় বর্জন করতে পারি। প্রতিদিনই বিজ্ঞান আমাদের পুরোনো চিন্তাধারার পরিবর্তন এনে নতুন অভ্যাসে রত হতে নির্দেশনামা জারি করছে। বিজ্ঞান আজ তার নিজের গৌরবে মহিমান্বিত, বিজয়ী, যেহেতু তার অবস্থিতি সত্যের সুদৃঢ় পর্বতের উপর। তার অঙ্গে সত্যের নানা বর্ণালোকে রঞ্জিত পরিচ্ছদ। তার আহার্য হলো সত্য, 'সত্য' তার ধ্রুব লক্ষ্য,—তার জীবন, তার আত্মা। যেখানেই সে থাক্ না কেন তার সঙ্গে থাকবে সত্যের আলোক যা দূর করে যুগযুগান্তের তমিস্রা। প্রকৃতির প্রায় প্রতিটি বিভাগে অভিযান চালিয়ে এখন সে ধর্মের বিশাল ও রহস্যময় প্রদেশের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে।

যাঁরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সমন্বয় দেখতে পান না, তাঁরা ধর্মকে উপেক্ষা করেন, যেহেতু তাঁদের মতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত 'সত্যের' মতো কোন 'সত্য' ধর্মের অনুশাসনে নেই। তাঁরা বলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য হলো সত্য অন্বেষণ করা এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা। কিন্তু ধর্ম তা পারে না, কারণ—ধর্মপ্রবক্তাদের অনেকে বলেন . এই বিশ্বকে এক বিশাল পুরুষ শূন্য থেকে সৃষ্টি

করেছেন। কাজেই ধর্মের সাহায্যে আমাদের লাভ কি হতে পারে? বিজ্ঞান দাবী করে, বাস্তব সত্তা একটিই এবং তা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, বৈচিত্র্যের মধ্যেই একত্ব বিরাজিত এবং এইটেই প্রাকৃতিক নিয়ম। ক্রমবিবর্তনের তত্ত্ব, প্রাকৃতিক শক্তির (natural force) অস্তিত্ব এবং বিভিন্ন 'শক্তি'র মধ্যে সম্বন্ধ পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিসমূহ এক চিরন্তন শক্তিপ্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বিজ্ঞান আমাদের বলে, একই প্রাণ থেকে সৃষ্ট হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, 'বস্তু, গতি ও শক্তি বাস্তব নয়, তারা বাস্তবের সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র।' যদি কোন ধর্ম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান দিতে পারে তাহলে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে ঐক্য আসতে পারে, নচেৎ হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, বেদান্ত তা পারে। তিনি বলেন বেদান্তের কোন বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই, যেহেতু বিজ্ঞান বেদান্তের পরিপন্থী নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বেদান্তের সঙ্গে মেলে এবং যা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হতে পারে তাও না মেলার কারণ নেই।

সার জন আর্থার টমসন[৩] বলেন, বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের মধ্যে প্রকৃত কোন বৈপরীত্য নেই। বিজ্ঞান হলো বর্ণনামূলক এবং কোন শেষ সিদ্ধান্তের কথা শোনায় না। ধর্ম রহস্যময় এবং ব্যাখ্যা করবার অপেক্ষা রাখে। তিনি বলেন বিজ্ঞান ধর্মের সিদ্ধান্তসমূহকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু স্বামীজী বলেন বেদান্ত হলো এমন এক ধর্মমত যার প্রতিটি কথা বিজ্ঞান-সম্মত। স্বামী বিবেকানন্দ জোর গলায় বলেন, বিংশশতকে এমন ধর্ম চাই যা বিজ্ঞানের সকল 'সত্যের' সঙ্গে সম্পূর্ণ মিতালিবদ্ধ। এমন ধর্ম চাই যা দর্শনের সঙ্গে একত্রীভূত, যা সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের পরীক্ষিত বা আবিষ্কৃত সত্যের পরিপন্থী কোন কিছু থাকবে না তাতে। বেদান্তের ধর্ম তাই।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে শক্তিমান মানুষ নিজেকে মনে করেছে দুর্জয়। লোভ, মোহ, দ্বন্দ্ব, হানাহানিতে পৃথিবীর বাতাস কলুষিত। তাই বিজ্ঞান মানুষকে জ্ঞানের সার বস্তুটি দিচ্ছে কোথায়? সর্বত্র সমান দেখা, সকল বস্তুকে সমজ্ঞান করা, সকল ভূতে নিজেকে দেখতে পেলে মানুষ হিংসা ভুলে যায়। যেহেতু নিজের মতন সে আর কাউকে ভালবাসে না। গীতার এক বাণীতে আছে—

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি
পরাং গতিম্॥

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শান্তি ও মুক্তি-লাভের পথের নির্ভুল নির্দেশ পাই বেদান্ত ও গীতার বাণীতে। এই বাণী সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য ও অহিংসার সুমহান বাণী। তাহলে আমাদের করণীয় কি? বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে অধ্যাত্মবিদ্যার উপলব্ধিকে। তাহলেই আজ পৃথিবীতে যেসব গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাদের সমাধান সহজ হবে। মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অভিশাপ দেবে না বিজ্ঞানকে। বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মকে আমরা সুন্দরতর ও সর্বজনগ্রাহ্য রূপেই দেখতে পাব।

---

৩ John Arthur Thomson : Introduction to Science

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্রিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামীজীর জোয়াল একজন সত্যিই ঘাড়ে নিয়েছিলেন, উদ্বোধনের ক্ষেত্রে, তাঁর নামোল্লেখ আগেই করেছি, স্বামীজীর পত্রেও এ ব্যাপারে বারবার তাঁর উল্লেখ আছে—তিনি প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত। তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়ে এই দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করব। এক্ষেত্রে আমরা কিছু স্মৃতিকথা সরাসরি উদ্ধৃত করতে চাই। প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার মধ্যে এমন হৃদয়স্পর্শ থাকে যা সার-সংক্ষেপ করলে বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। স্মৃতি-কথাগুলি থেকে বিবেকানন্দ ও ত্রিগুণাতীত, নেতা ও বিশ্বস্ত কর্মী উভয়েরই ছবি পাই। নেতার প্রেরণা, ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা, প্রতিহত ইচ্ছার ক্ষুব্ধ গর্জন, তারপরেই অনন্ত ভাল-বাসার প্লাবন; অপরদিকে নেতার প্রতি কর্মীর (যে-কর্মী কিন্তু গুরুভাই, তার কম নন) আনু-গত্য ও অব্যাহত অনুরাগ এবং শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও সংগ্রাম। সারদাপ্রসন্ন কী ভালবাসাই না বাসতেন নরেন্দ্রনাথকে![১১] অভিজাত ঘরের ছেলে, পড়াশোনায় ভাল, কিন্তু খেয়ালী, মুষড়ে পড়েন সহজে, ঝাঁপিয়েও পড়েন তেমনি স্বচ্ছন্দে, ছেলেধরা মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ছেলেধরার কাছে—সারদা তার ফলে রামকৃষ্ণ-শিষ্য হয়েছিলেন। ঘুরে বেড়ানো বাতিক ছিল, সন্ন্যাসী হয়ে আরও বাধাবন্ধহারা, দুরধিগম্য তিব্বত, মানস-সরোবর পর্যন্ত পরিব্রজ্যা থেকে বাদ পড়েনি, (তাঁর ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন ইংরেজীতে ইণ্ডিয়ান মিরারে), বেপরোয়া, খাওয়ার ব্যাপারেও, প্রচুর খেতে পারতেন, প্রায় না খেয়েও থাকতে পারতেন, বিচিত্র সব শখ ছিল, 'কাকচরিত-শিক্ষা' পর্যন্ত, ব্যস্ত থাকতেন সব সময়ে, হয় কাজে, না হয় পড়াশোনায়, না হয় ধ্যানে জপে। তিনি বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন, ঘোর বৈরাগ্যের জন্য পরীক্ষা দিয়ে ওঠা হয়নি, নরেন্দ্রনাথ অন্যদিকে বি. এ. পাসের বেশী করেননি, তাহলেও নরেন্দ্রের কাছ থেকেই সব সময়ে শিখতেন—নরেন্দ্রনাথ সারদাপ্রসন্নকে

---

১১ এই ভালবাসার এক স্নিগ্ধ সহাস ছবি এঁকেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত:

"নরেন্দ্রনাথের পিতা একখানি মলিদা চাদর ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথও পরে সেই মলিদা চাদরখানি ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথ গুজরাটে অবস্থানকালে নিজের চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ চাদরখানি সারদা মহারাজকে পরাইয়া দিলেন। তিনি সেই জীর্ণ চাদরখানি অমূল্য মনে করিয়া আলমবাজারে লইয়া আসিলেন।...নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ মলিদাখানি কখনো মাথায় দিয়া, কখন-বা বগলে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। একদিন আলমবাজার মঠের ভিতর দিককার পূর্বদিকের খোলা ছাতে ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। শশী মহারাজ কৌতুক করিয়া বলিলেন, 'অরে সারদা, নরেন তোকে দেয় নাই; আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে তাই তোকে দিয়ে আমাকে দিয়েছে।' নিরঞ্জন মহারাজ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, 'দুঃ শালা, তোকে দেবে কেন রে? তুই শালা বেঁটে, তিন তাল মোহনভোগ খাস এ কি তোর উপযুক্ত? এ তোকে দেয়নি, শশীকেও দেয়নি, নরেন আমাকে কত ভালবাসে, সেইজন্য তোর হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।' এইরূপে সকলে বালকের মত নৃত্য ও আনন্দ করিতে লাগিলেন।"

('ঘটনাবলী', ২য়)

কিভাবে পড়াতেন, তার একটি ছবি দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত :

"নরেন্দ্রনাথের যখন পাথুরীর অসুখ হয় তখন ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে সারদা মহারাজ শুশ্রূষার জন্য আসিয়া থাকিতেন। তিনি 'ক্যাসেলে'র মুদ্রিত ছবিওয়ালা শেক্স-পীয়ারের গ্রন্থগুলি পড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থবোধ করিলে সারদা মহারাজকে শেক্সপীয়ারের নানা গ্রন্থ ও কাব্যের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। বালক সারদা মহারাজ সম্মুখে বইখানি খুলিয়া রাখিয়া একমনে নরেন্দ্রনাথের নিকট শেক্স-পীয়ারের কাব্যের সহিত সংস্কৃত কাব্যের কোথায় মিল ও বৈষম্য আছে সেই সমস্ত স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে সারদা মহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া উঠিত। তখন তিনি আর পড়িতে পারিতেন না, বইখানি বন্ধ করিয়া স্থির মনে জপ করিতেন। তিনি যখন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তখনও ঠিক এই রকম একমন-প্রাণ হইয়া পড়িতেন। বৈকাল হইল, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সারদা মহারাজের কোনো হুঁস থাকিত না। অন্ধকার হইয়া আসিলে আলো জ্বালিয়া আবার পড়িতে বসিতেন, এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষরূপে শিখিয়াছিলেন।" ('ঘটনাবলী', ২য়)

পরবর্তী কয়েক বৎসর ছেড়ে একেবারে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের কথা। উদ্বোধন প্রেস কেনা হয়েছে। সারদা মহারাজ 'ওয়ার্ক' করতে বড় ব্যস্ত, প্রেস কেনার পরে ওয়ার্কের উপাদান পেয়েছেন, ফল কি হয়েছে, সাক্ষাৎদর্শী শচীন্দ্রনাথ বসু সন্ত পত্রযোগে তা জানিয়েছিলেন। একেবারে জলজ্বলে জীবন্ত ছবিখানি, প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করছি :

"গত সোমবার (৬ নভেম্বর, ১৮৯৮)··· স্বামীজী ও আমি (বেলুড় মঠ থেকে) বাগবাজারে আসিলাম।···হলঘরে (বলরাম বাবুর বাড়ির) বসিলেন, আমরাও বসিলাম—কেবল আমি ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরৎ চক্রবর্তী আসিল। নানাবিধ কথা হইতেছে, এমন সময় সারদা মহারাজ টলিতে টলিতে আসিয়া হাজির—জ্বর হইয়াছে।

"স্বামীজী যখন আলমোড়াতে তখন হইতে ত্রিগুণাতীত মহারাজ তাঁহাকে বারবার চিঠি লেখেন—ভাই, আমি work করিব—তুমি আমাকে ২,০০০৲ টাকা দাও, আমি প্রেস করিব, কাজ চালাইব। স্বামীজী তাঁহাকে ১,০০০৲ টাকা দিয়াছেন, বাকি ১,০০০৲ টাকা ধার করিয়াছেন। মাসে ১০৲ টাকা সুদ লাগে। ১,৫০০ টাকায় দুটি বেশ ভাল প্রেস কিনিয়াছেন, কিন্তু কিনিলে কি হইবে, কোন কাজ নাই, ঠায় বসিয়া আছেন; বড়বাজারের এক গুদামে ৮৲ টাকা ভাড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। সুধীরের 'রাজযোগ' বইখানি (স্বামীজীর বইয়ের অনুবাদ) ছাপাইবার সঙ্কল্প হইয়াছে, কিন্তু পয়সা নাই, কাগজ আসিবে কোথা হইতে?···আমি একবার ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ, ও কাজ (প্রেসের কাজ) বড় nefarious (হীন), আপনার কর্ম নয়। অপর লোকের করা উচিত।' তখন ভারী spirit; বলিলেন, 'না, any work is sacred. আমি কাজ পেলে খুশী; কাজ করতে আমি নারাজ নই।' আমি চুপ করিয়া গেলাম। এখন রোজ ৬টার সময়ে প্রেসে যান, সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া হয়, আর আসেন রাত ৫টার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জ্বর হয়।

"স্বামীজী ও রাখাল মহারাজ একসঙ্গে ত্রিগুণাতীতজীকে অভ্যর্থনা করিলেন,—'কি বাবাজি, এসো, আজকের খবর কি? প্রেসের কতদূর? বল বল! বস, বস!'

"ত্রিগুণাতীত (নাকি সুরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে)—'আঁর ভাই, আঁর পাঁরিনি—ওসব কাঁজ কি আঁমাদের পোঁষায় ভাই?... সারাদিন তীর্থির কাকের মতন বসে থাকতে হয়; না আছে একটা কাজ, না আছে কিছু। একটা job work পাওয়া গেছে, তাতে কি হবে? ৷৷০ আনা বড় জোর পাওয়া যাবে। আমি প্রেস বিক্রী করে ফেলার চেষ্টা করছি।'

"স্বামীজী—'বলিস কি রে? এরই মধ্যে তোর সব শখ মিটে গেল? আর দিন কতক দেখ্, তবে ছাড়বি। এই দিকে প্রেসটা নিয়ে আয় না, কুমারটুলীর কাছে! আমরা সকলে দেখতে পেতুম।'

"ত্রিগুণাতীত—'না ভাই, সেইখানেই থাক। দিনেক দুদিন দেখা যাক। ১৫৲।২০৲ টাকা লোকসান করে বেচে দেব।'

"স্বামীজী—'ও রাখাল, বলে কি? ওর যে খুব ট্রায়াল হল দেখছি। তোর এরই মধ্যে সব গুঁড়িয়ে গেল! patience রইল না!'

"এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর চক্ষু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন ও গর্জিয়া বলিলেন—'বলিস কি রে? দে, প্রেস বিক্রী করে দে। আমার টাকার ঢের দরকার আছে। এই বেলা বিক্রী কর—১০০৲।১৫০৲ টাকা লোকসান করেও বেচে ফেল্।...কাজের নামটি হলেই এদের সব বৈরাগ্যি উপস্থিত হয়—'অাঁর ভাঁই পাঁরি নি—ওঁসব কাঁজ কি অাঁমাদের?' কেবল খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি উপুড় করে শুয়ে থাকতে পারে। যাদের কোন কাজে patience নেই তারা কি মানুষ?...তুই তিন দিন এখনো প্রেস করিসনি। যাঃ যাঃ তোকে ঢের experiment হয়েছে—তোর বড আস্পর্ধা হয়েছিল। কে তোকে প্রেস করতে সেধেছিল? তুই-ই তো আমাকে লিখে লিখে টাকা আনালি। নিয়ে আয় না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার তোর মানে কি? আর এই তোর জ্বর জ্বর হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখছিস্ না?'

"ত্রিগুণাতীত—'৮৲ টাকা ভাড়া দিতে হবে, এক মাসের এগ্রিমেন্ট হয়েছে।'

"স্বামীজী—'দূর দূর, ছি ছি! এ বলে কি? এসব লোক কি কোন কাজ করতে পারে? ৮৲ টাকার জন্য পড়ে আছিস? তোদের এ ছোটলোকপনা কিছুতেই যাবে না। তুই আর হরমোহনটা সমান। তোদের কখনো কোনো business হবে না। সেও এক পয়সার আলু কিনতে পঞ্চাশ দোকান ঘুরবে আর ঠকে মরবে।...দে প্রেস আমাদের মঠে পৌঁছে—আমাদেরও তো একটা প্রেস চাই। দেখ্, কত লেকচার দিয়েছি, কত লিখেছি, তার অর্ধেকও ছাপা হল না। তুই আমাকে work দেখাস্? রাখাল, মনে কর, সে আজ কত দিনের কথা—আজ সে ১২।১৩ বৎসরের কথা—সেই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কয়জনে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁদছি। আমি বললাম, 'তাঁর অস্থি গঙ্গার ধারে রাখা উচিত, গঙ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত, কারণ তিনি গঙ্গার ধার ভালবাসতেন।...আমার কথা শুনল না। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁকুড়গাছির বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজেছিল। রাখাল, মনে কর, আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ ১২ বছর bull-dog-এর মতন সেই idea নিয়ে তামাম

দুনিয়া ঘুরেছি, একদিনও ঘুমোইনি। আজ দেখ, তা সফল করলাম। সেই idea আমাকে একদিনও ছাড়েনি।…এ জাতের কি আর উন্নতি আছে ?'

"ত্রিগুণাতীত—'ভাই, তোমার brainটি কেমন! তোমার brainটি আমায় দিতে পারো ?'

"এই কথায় খুব হাসি পড়িয়া গেল, কারণ বলিবার তারিফ ছিল। পরে ত্রিগুণাতীত বলিলেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটু সাবু খাইয়াছিলেন ; এ বেলা এক সের রাবড়ি, আধ সের কচুরী ও তদুপযুক্ত তরকারী আহার করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামীজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—'শালা! তোর stomachটা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দি। লাহোরে সূরজলাল বলেছিল, 'স্বামীজী, তোমায় নানকের brain আর গুরুগোবিন্দের heart এসে গিয়েছে—কেবল জগমোহনের (খেতড়ির দেওয়ান) মত পেটটি চাই।' "[১২] (উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৯)।

নেতার কাছে বন্ধু ও অনুগত সহকর্মীর চেহারা ঐরকম। বিবেকানন্দের কাছে সকলে উপনীত অগ্নি আহরণের জন্য। তারপরে তাঁরা কী করতেন—তাঁদের একজন ত্রিগুণাতীত কী করেছেন—তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন কুমুদবন্ধু সেন তাঁর স্মৃতিকথায়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে (উদ্বোধন) প্রেসের প্রতিষ্ঠা, উদ্বোধন-পত্রিকা বেরুল ১৮৯৯-এর জানুয়ারী মাসে। সেই দিনটি এবং পরবর্তী দিনগুলির কথা কুমুদবন্ধু লিখেছেন :

"উদ্বোধন প্রকাশের দিন এখনো স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজী-লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়ন সম্মুখে বংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা, সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস, ও ছোট ছাপাখানা—তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।…আজ মনে পড়ে উদ্বোধনের সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরু দায়িত্বভার একাকী বহন করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যাপূত জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি কার্যক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি—শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কতদিন তিনি কখনো অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখা-শুনা নহে, আজ কম্পোজিটর অনুপস্থিত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান

১২ ত্রিগুণাতীতের অধিক আহার রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে সবিস্ময় কৌতুকের বিষয় ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত একটি মজার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একদিন বাবুরাম মহারাজের বাড়িতে সারদা মহারাজ ও আরও দুজনের নিমন্ত্রণ। কার্যগতিকে সারদা মহারাজ ছাড়া কেউ হাজির হতে পারেননি। তিন জনের রান্না হয়েছিল। পাছে রুটি তরকারি নষ্ট হয়, সারদা মহারাজ একাই তিনজনের খাবার শেষ করলেন। বাবুরাম মহারাজের মা কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বৃদ্ধার সারারাত্রি উদ্বেগে গেল। না জানি কি অসুখ বাধে। পরদিন সকালে সারদা মহারাজকে সুস্থ দেখে স্বস্তির-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "সারদা কি খায়রে! ও অনেক পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়িয়েছে ও অনেক 'মোন্তর' শিখেছে, তাই উড়ো মোন্তরে উড়িয়ে দেয়; তা না হলে মানুষে কি অত খেতে পারে!"

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র ও সমালোচন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, ডাক মাশুল সমেত। কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, উদ্বোধন-প্রেস হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "উদ্বোধনের" প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। * *। এই প্রেসে পুস্তক, চেক, বিল প্রভৃতি নানাপ্রকার ছাপা কার্য্য সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সু-সম্পন্ন করা হয়। * *।

১ম বর্ষ। ২য় সংখ্যা। ১৫ই মাঘ। ১৩০৫ সাল।

বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র।

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত—সম্পাদক।

উত্তমপ্রেস, কলিকাতা।

স্চী।

—০—

'উদ্বোধন' পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রচ্ছদপট

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যার প্রচ্ছদপট

করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল প্রেসম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে নানা স্থানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্ উপকরণ পাওয়া যায়, সেই তথ্য লইবার জন্য কখনও ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনও কখনও প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সময়ে পত্রিকা-প্রকাশ না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যায়রাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইত। নানাদিকে এই সব কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত—ক্লান্তির কোনো কালিমা দেখা যাইত না। বেশীর ভাগ কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান বস্তীতে বাস করিত। তিনি বিনা সংকোচে বস্তীর মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ করিতেন। কত দিন দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অপরাহ্নকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলপান করিতেছেন এবং তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি তাঁহার তখনও স্নানাহার হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ্ণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাঁহার দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাঁহাদের 'প্রভাকর প্রেস' নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি যাইতেন। এদিকে পত্রিকায় কোন-প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল-ত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এক-দিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ তখন উদ্বোধনে সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরাম-কৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই উদ্বোধনে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, 'কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তা তো বুঝতে চাও না!' স্বামীজী বলিলেন, 'ও সব কথা রেখে দে। তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের উপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটররাও বিদ্বান নয়। যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল, তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক-ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়! তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি, তবে উন্নতিটা কি হল বল্?' স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস ও পত্রিকা, দুটির জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে, বিশেষ, কম্পোজিটর প্রভৃতির সন্ধানে তাঁহাকে বস্তীতে বস্তীতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ্ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

তখন পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনও কখনও তিনি উদ্বোধনের জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।" ('উদ্বোধনের জয়যাত্রা'—উদ্বোধন সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৪)।

সামনে যাঁর লাঞ্ছনা করছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করছেন একই সঙ্গে, অন্তরালে প্রশংসা ঢেলে দিচ্ছেন—স্বামীজী এমনই করতেন। তিনি জানতেন, ত্রিগুণাতীত কী করছেন! মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন—ঠাকুরের সন্তানের পক্ষেই এ জিনিস করা সম্ভব। জগদ্ধিতায় এঁদের দেহ-ধারণ।[১৩]

'উদ্বোধন' কী, সেই কথাটাই সবশেষে স্মরণ করতে চাই। উদ্বোধন কি পত্রিকা মাত্র? কদাপি নয়। উদ্বোধন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী-শরীর। তাই হোক—স্বামীজী অন্তত: তাই চেয়েছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ সাফল্য নিশ্চয় হয়নি। কিন্তু স্বামীজীর ইচ্ছা অমোঘ, এই বিশ্বাস আমরা রাখতে চাই। স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধনের পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১ মাঘ, ১৩০৯) উদ্বোধনের স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্য বা ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরম কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেইজন্য আপাত শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী, এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর।"

অবিশ্বাস্য বৃহৎ আশা। কিন্তু সে আশা অন্য কারো নয়, স্বামী সারদানন্দের তপস্যা-সংস্কৃত চিত্তের। স্বামী বিবেকানন্দের আশা আরও বৃহৎ,—অন্ততঃ অতুলনীয় বৃহৎ ও গম্ভীর ভাষায় তাঁর আশা প্রকাশিত হয়েছিল—উদ্বোধনের প্রস্তাবনায় যা পেয়েছি। "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"—সঘন কণ্ঠে স্বামীজী বলেছিলেন। সে ভারতবর্ষ শুধুই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হবে না, নূতনের উদ্বোধন-ভূমিও হবে। তার জন্য—"চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি; আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।" আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রজোগুণ চান—কি বিচিত্র বিপরীত আকাঙ্ক্ষা! বিবেকানন্দ হাহাকার করে উঠলেন, সত্ত্বগুণ—সত্ত্বগুণ কোথায়?—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল! যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজ অকর্মণ্যতার উপর

---

[১৩] জগতের হিতকর্মে স্বামী ত্রিগুণাতীতের ক্লান্তি ছিল না। পত্রিকার দ্বারা ভাবপ্রচারের ভাবটি তাঁর মাথায় গেঁথে ছিল। আমেরিকায় প্রচারকার্যে গিয়ে তিনি কেবল সানফ্রানসিসকোয় হিন্দুমন্দিরই স্থাপন করেননি, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে *Voice of Freedom* নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বের করেছিলেন। *The Disciples of Ramakrishna* গ্রন্থে পত্রিকাটির বিষয়ে পাই:

"The magazine ever and always held constant to the high ideals of truths of the Vedanta philosophy and the varieties of materials published soon attracted a wide circle of readers. Soon the *Voice of Freedom* was an established success with a growing list of interested friends and subscribers. The magazine continued for seven years, after which period it was stopped to the disappointment of many Vedanta friends."

নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তোলে; যেথায় নিজ সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে, এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"

"অতএব, সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর";—স্বামীজী বললেন,—তমোগুণকে বিতাড়িত করতে প্রয়োজন রজোগুণের, ভারতে যার একান্ত অভাব। পাশ্চাত্যে অপরপক্ষে রজোগুণের পূর্ণ প্রকোপ। ভারত যদি রজোগুণের দ্বারা উদ্দীপিত করতে পারে নিজেকে, তাহলে তমোগুণ পরিষ্কৃত হয়ে সত্ত্বগুণ নির্মল আলোকে পুনঃপ্রকাশিত হবে। সেই সত্ত্বকে রজোগুণী পাশ্চাত্যের বড় প্রয়োজন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গুণের বিনিময় না হলে পৃথিবীর কল্যাণ নেই। "এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।"

ভারতের জন্য উদ্বোধন বিশেষভাবে কি করবে? স্বামীজী বললেন, ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখবে, যাতে সকলে পিতৃধন দেখতে ও জানতে পারে। তারপর? বিবেকানন্দ তারপর যা লিখেছিলেন, সে রচনা একমাত্র তাঁরই, যাকে প্রাণবাণী না করলে কোনো 'উদ্বোধন'ই সম্ভব নয়:

"নির্ভীক হইয়া সর্ব দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্যকিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল, তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"

(ক্রমশঃ)

'মাকে ভালবাসতে হলে'

সেখ সদরউদ্দীন

মাকে ভালো বাসতে হলে
ভাইকে ভালো বাসরে ভাই,
ভাইকে ভালো বাসলে তবে
মায়ের কোলে পাবি ঠাঁই।
ভাইকে যদি করিস ঘৃণা
বসাস ছুরি বক্ষে তার,
ভাবিস কি তুই তাতে ওরে
তুষ্ট হবে মনটি মার?
ভায়ের বুকের আঘাতখানি
মায়ের বুকে দ্বিগুণ বাজে,
মায়ের চরণ শরণ করে
মাগবি কৃপা কোন্ সে লাজে?

মায়ের পূজা করার আগে
ভাইকে রে তুই বক্ষে টান,
দ্বন্দ্ব-ভেদের বিন্ধ্যাচলে
ভাঙ্গতে রে তুই আঘাত হান!
ভায়ের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে
মৈত্রী প্রেমের গানটি ধর—
দেখবি তবে মা-জননী
আলো করে আছেন ঘর!

উপনিষদে 'শক্তিবাদ'

ডক্টর রমা চৌধুরী

"শক্তিবাদ" ভারতীয় দর্শনের একটী মূলীভূত তত্ত্ব। ভারতীয় দর্শনের কেন্দ্রীভূত সত্য হলেন পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, অথবা পরমদেবতা। তাঁকে চারটী বিভিন্ন দিক্ থেকে দেখা যায়—সাংসারিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক। এরূপে, সাংসারিক দিক্ থেকে, তিনি হলেন এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা। উচ্চতর নৈতিক দিক্ থেকে, তিনি কেবল এই দৃশ্যমান জড়জগতের কারণ নন, সেই সঙ্গে ন্যায়-নীতি-স্থাপক, এবং উচ্চতর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীনেচ্ছা-শক্তিমান জীবগণের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক। পুনরায়, আরো উচ্চতর আধ্যাত্মিক দিক্ থেকে তিনি কেবল কঠোর ন্যায়পরায়ণ বিচারকমাত্রই নন, সেই সঙ্গে সকলের পরমপ্রিয়, চিরোপাস্য দেবতা। পরিশেষে, উচ্চতম দার্শনিক দিক্ থেকে তিনি সকলের আত্মা, স্বরূপ। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই পরমেশ্বর ও জীবজগতের মধ্যে ভেদ আছে। যেমন, প্রথম ক্ষেত্রে, স্রষ্টা কারণ ও সৃষ্ট কার্য সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন হতে পারে না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ক্ষেত্রেও, যথাক্রমে শাসক ও শাসিত, উপাস্য ও উপাসক নিশ্চয় পরস্পর ভিন্ন। কেবল চতুর্থ ক্ষেত্রে,—ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণরূপেই এক ও অভিন্ন, আত্মার দিক্ থেকে।

এরূপে, প্রথম তিনটী মতবাদ হল ভারতের সুবিখ্যাত "একেশ্বরবাদ ও ত্রিতত্ত্ববাদ", যে মতানুসারে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিশ্চয়ই একজনই কেবল, কিন্তু তত্ত্ব একটীমাত্র নয়, তিনটী—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, জীব ও জগৎ। শেষ মতবাদটী ভারতের সুপ্রসিদ্ধ একাত্মবাদ বা একতত্ত্ববাদ, যে মতানুসারে, ব্রহ্ম কেবল এক ব্রহ্ম নন, এক তত্ত্বও সমভাবে।

একতত্ত্ববাদ ও ত্রিতত্ত্ববাদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ হল শক্তিবাদ-সম্বন্ধীয়। একতত্ত্ববাদ মতে, এক তত্ত্ব ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়—তাঁর কেবলমাত্র স্বরূপই আছে, গুণ ও শক্তি কিছুই নেই। ত্রিতত্ত্ববাদ মতে, ত্রিতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সগুণ ও সক্রিয়, এবং সেজন্য অনন্ত অচিন্ত্য গুণশক্তি-বিমণ্ডিত।

উপনিষদেও এইভাবে দুটী স্বতন্ত্র দার্শনিক ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত—একতত্ত্ববাদ ও একেশ্বরবাদ বা ত্রিতত্ত্ববাদ। এবং একেশ্বরবাদ বা ত্রিতত্ত্ববাদের দিক্ থেকেই শক্তিবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে। ব্রাহ্মণসমূহে "শক্তিকে" গ্রহণ করা হয়েছে প্রধানতঃ আচারানুষ্ঠানিক ও জৈবিক দিক্ থেকে—যেমন "বাক্"কে গ্রহণ করা হয়েছে স্রষ্টা প্রজাপতির পত্নীরূপে, যাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি দেবদেবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। এরূপ, স্থূলতর অর্থে সৃষ্টির কথা অবশ্য উপনিষদেও কয়েকটী স্থানে আছে, যদিও ব্রাহ্মণসমূহের ন্যায় সেরূপ উগ্রভাবে নয়। যথা—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুর্বীয়েত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চনাতো ভূয়ো বিন্দেৎ" ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১।৪।১৭)

"অগ্রে এই জগৎ এক আত্মারূপেই বর্তমান ছিল। তিনি কামনা করলেন—'আমার জায়া হোক্, তদনন্তর আমি সন্তান উৎপাদন

করি; এবং আমার বিত্ত হোক্, তদনন্তর আমি যজ্ঞাদি কর্ম করি।' এই পর্যন্ত সমুদায় কামনা। এর চেয়ে অধিক ইচ্ছা করলেও কেহ প্রাপ্ত হয় না। সেজন্য এখনও যে ব্যক্তি একাকী থাকে, সে কামনা করে: আমার জায়া হোক্, তদনন্তর আমি সন্তান উৎপন্ন করি; এবং আমার বিত্ত হোক্, তদনন্তর আমি যজ্ঞাদি কর্ম করি। যে পর্যন্ত মানুষ এই সমুদায়ের একটীও না প্রাপ্ত হয়, সে পর্যন্ত সে আপনাকে অপূর্ণই মনে করে। এরূপে তার পূর্ণতা হয়—'মনই' তার আত্মা বা পতি, 'বাক্' তার জায়া, 'প্রাণ' তার সন্তান।"

"ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণম্।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৫।৩)

"তিনি নিজের জন্য মন, বাক্ ও প্রাণ সৃষ্টি করেছিলেন—এঁরাই হলেন পিতা, মাতা ও সন্তান।"

"নৈবেহ কিংচনাগ্র" (বৃহদারণ্যক ১।২।১)

"সোঽকাময়ত দ্বিতীয়া মে আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।২।৪)

"তিনি কামনা করলেন—'আমার দ্বিতীয় দেহ উৎপন্ন হোক্। তিনি তখন মনদ্বারা বাক্যের সঙ্গে মিলিত হলেন।"

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।—স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।...স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ত্তত: পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।১,৩)

"পূর্বে এই আত্মা পুরুষরূপ ছিলেন। কিন্তু তিনি একাকী আনন্দলাভ করলেন না। সেজন্য কেহ একাকী আনন্দলাভ করেন না। তিনি দ্বিতীয় একজনকে ইচ্ছা করলেন। তিনি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন, এবং এরূপে পতি ও পত্নীর উদ্ভব হল।"

এরপরে সাধারণ সৃষ্টির দিক্ থেকেই যেন বলা হয়েছে, একজন হলেন বৃষ, অন্যজন হলেন গো, এবং তাদের মিলন থেকে গো-জাতির উদ্ভব হল। একই ভাবে, একজন হলেন অশ্ব, অন্যজন অশ্বী; একজন গর্দভ, অন্যজন গর্দভী; একজন অজ, অন্যজন অজা; একজন মেষ, অন্যজন মেষী; এই ভাবে, পিপীলিকা পর্যন্ত প্রাণী জগতে সৃষ্ট হল।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।৪)

ব্রাহ্মণ-সমূহের ন্যায় এরূপ জৈবিক-সৃষ্টিতত্ত্ব কিন্তু উপনিষদে অন্যান্য বহু স্থলে উচ্চতর, আধ্যাত্মিক সৃষ্টিতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে অতি সুন্দর ভাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তৃতীয় অধ্যায়ের "অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ" নামে খ্যাত সপ্তম ব্রাহ্মণটীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এস্থলে, বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গে এবং স্পষ্টতম ভাবে বলা হয়েছে যে, সেই পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরস্থ আত্মা; এবং এই ভাবেই তাঁর সৃষ্টি।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩।৭।৩)

"যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত অথচ পৃথিবী থেকে পৃথক্; পৃথিবী যাঁকে জানে না, অথচ পৃথিবী যাঁর শরীর এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করছেন—ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।"

একই ভাবে বলা হয়েছে—জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান ও জীববীজের বিষয়ে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শরীরা

বা আত্মারূপে সেই বস্তুটির ভেতরে প্রবেশ করেছেন স্বয়ং অমৃতস্বরূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বর।

এই তো হল পরিপূর্ণ "পরিণামবাদ"—যে কোনো রকমেই হোক্, এই মতানুসারে, স্বয়ং ব্রহ্ম, বা ঈশ্বরও এইভাবে সৃষ্টি করে চলেছেন, কেবল স্বীয় শক্তি দিয়ে নয়, স্বীয় অনন্ত-অখণ্ড স্বরূপই প্রকটিত করে সানন্দে। ভারতীয় শক্তিবাদ, তথা পরিণামবাদ, এই মধুরমোহন, সরস-সুশোভন, ললিতলোভন সত্যেরই প্রতীক—"শক্তিবাদ" এস্থলে আছে, সত্য; কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী আছে "স্বরূপবাদ"। কারণ, স্বীয় প্রতিটি শক্তিতেই তিনি তাঁর অখণ্ড স্বরূপসহই রয়েছেন বিদ্যমান, সেজন্য "স্বরূপ" ও "শক্তিতে" কোনোরূপ ভেদ নেই। বিশেষ করে, উপনিষদের "শক্তিবাদ" ওতপ্রোতভাবে "আত্মবাদ", যেহেতু উপনিষদ্ আত্মবাদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

অবশ্য, সেস্থলে স্বাভাবিক প্রশ্ন হতে পারে এই যে, তাহলে "স্বরূপ" ও "শক্তির" মধ্যে এরূপ প্রভেদ করা কেন হয়েছে? তার উত্তর হল এই যে, সূর্য ও কিরণ, সমুদ্র ও তরঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে যে ভেদ, "স্বরূপ" ও "গুণ-শক্তির" মধ্যে ঠিক সেই একই ভেদ। একই সূর্যকে নানাদিকে, নানাভাবে প্রকাশিত করে নানা কিরণ; একই সমুদ্রকে নানাদিকে নানাভাবে উচ্ছলিত করে তরঙ্গ। একই ভাবে, একই "স্বরূপকে" নানাদিকে নানাভাবে প্রকাশিত, উচ্ছলিত করে "গুণ-শক্তি"। অবশ্য, অদ্বৈতবাদিগণের মতে, এরূপ "গুণ-শক্তি" আপাতদৃষ্টিতে সেই এক ও অখণ্ড স্বরূপের মধ্যে "স্বগত-ভেদের" সৃষ্টি করে বলে; পরিশেষে তারা "ঔপাধিক" ও "মিথ্যা" পারমার্থিক দিক্ থেকে, ব্যবহারিক দিক্ থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা যতই থাকুক না কেন। কিন্তু ভেদাভেদবাদিগণের মতে, "স্বরূপের" এই যে "গুণ-শক্তিজ" ভেদ, তা সত্য ও শাশ্বত, যেহেতু "গুণ-শক্তি" "স্বরূপের" প্রকাশ এবং সেই দিক্ থেকে "স্বরূপ" থেকে অভিন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক "গুণ-শক্তিরই" স্বীয়, অতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাকে "স্বরূপ" থেকে ভিন্ন করেই রাখে।

এই নিয়ে ভারতের বৈদান্তিকগণের মধ্যে বহু মতভেদ ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেসব বাদ দিলেও, ভারতীয় দর্শনের এই "শক্তিবাদের" অন্তর্নিহিত মহিমা, গরিমা ও মধুরিমা আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। তা হল, সেই কূটস্থ নিত্যের, সেই একের বহুরূপে প্রকাশ। সত্যই, "এক" "বহু" হতে পারেন কি না, "ব্রহ্ম" "ব্রহ্মাণ্ডে" পরিণত হতে পারেন কি না, "শিব" "জীব"-রূপ ধারণ করতে পারেন কি না, দর্শনশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রের যুক্তি-বিচারের দিক্ থেকে সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা-প্রপঞ্চনার উদ্ভব হতে পারে, নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা' সত্ত্বেও "এক" যে "বহু" হচ্ছেন, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।৩)—"তিনি সংকল্প করলেন—আমি বহু হই, আমি জন্মগ্রহণ করি"—এই অপূর্ব মন্ত্রানুসারে, তাঁর নিঃসঙ্গ একাকিত্ব, "এক-মেবাদ্বিতীয়ত্ব" ত্যাগ করে, প্রকাশিত হচ্ছেন এই জীবজগতে, বিকশিত করছেন তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য, তাঁর অসীম আলোক-আনন্দ-অমৃত ধরণীর প্রতি ধূলি-কণায়, তাই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আশা ও আনন্দের সংবাদ নয়? পণ্ডিতেরা তর্ক করুন এই প্রকাশের প্রকৃত স্বরূপ ও তথ্য সম্বন্ধে। কিন্তু আমরা সাধারণ জনেরা এই আশ্বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব যে, তিনি সত্যই আছেন আমাদের সকলের মধ্যেই, আমাদের অতি নিকট জন,

নিজ জন, প্রিয়জনরূপেই।—কারণ, স্বয়ং উপনিষদেই কি তিনি নিজেই বলেননি—

"সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি ততঃ সৃষ্টিরভবৎ।"
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।৫)

"'আমিই এই সৃষ্টি, কারণ আমিই এই সমুদায় সৃষ্টি করেছি।' সুতরাং তিনিই স্বয়ং সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়েছেন।"

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।২-৪)

"তিনিই অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই নক্ষত্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই জল, তিনিই প্রজাপতি।

"তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই দণ্ডধারী জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, তুমিই বিশ্বব্যাপী।

"তুমিই নীল পতঙ্গ, তুমিই লোহিতচক্ষু শুক, তুমিই মেঘ-ঋতু-সাগরসমূহ। অনাদি-স্বরূপ তুমি ব্যাপকরূপে বিদ্যমান—যাঁর থেকে সমুদায় বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে॥"

নিবেদিতা

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কতবার মনে ভাবি একটু তোমার কথা বলি।
কোনরূপে দেখিয়া তোমায়, এনে দেবো আমার অঞ্জলি!
কখনো তো দেখিনি তোমারে।
দেখিনি তো কাহারেই যুগান্তের পার হতে যারা উঁকি মারে।
দেখিনি তো সীতা সতী শকুন্তলা মদালসা সাবিত্রী কাহারে!
তবু মনে মনে এঁকে নিয়েছি তো তাঁহাদের রূপচিত্রগুলি!
অকস্মাৎ মনে আসে তোমাকেও এঁকে নেবো দিয়ে সেই তুলি—
না না, কোন নারী নয়, মানবী মুরতি নয়—রূপবতী রাজকন্যা নয়!
শ্বেতপদ্ম একখানি শত বা সহস্রদল হোক সে যা হয়।
যে পদ্ম প্রেমের মতো, যে পদ্ম ত্যাগের মতো, যে পদ্মটি পবিত্র, নির্মল!
কি আর তুলনা তব, পদ্ম ছাড়া, অমলিন ত্যাগে অবিচল!
চারিদিকে মানুষের মলিন পরশ ঢালা, পদ্মনীচে যেন পঙ্কভূমি,
মাঝে তার টল টল শ্বেতপদ্ম সম মহা মহিমায় দাঁড়ায়েছ তুমি।
সৃজিলে নতুন রূপে নারীর নতুন জাতি, ত্যাগ আর প্রেমের ভুবন,
আপন অঙ্গন-সীমা অতিক্রমি মেলে যদি নারী তার তৃতীয় নয়ন!
পরিজন পতিপুত্র স্থানকাল অতিক্রমি ক্ষুদ্র স্বার্থসীমা
জাগালে সম্মুখে তার প্রেম ত্যাগ আদর্শের কি মহান বিদেহ মহিমা!
আপন আদর্শ দিয়ে রচিয়াছ তেজ-ত্যাগ-আদর্শের নব নারী-গীতা
গুরু ও পরমগুরু পদে নিবেদিত শ্বেত পদ্ম তুমি ওগো নিবেদিতা!

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম

মৌলভী রেজাউল করীম

পৃথিবীর ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন সব মহামানবের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নানাভাবে দেশ ও সমাজকে প্রভাবিত করেন। তাঁরা দেশের মানুষকে তার করণীয় কর্তব্যের নির্দেশ দেন। তাঁরা বিবিধ আদর্শ প্রচার করে গোটা দেশের রূপান্তর ঘটিয়ে দেন। তাঁরা হলেন যুগ-প্রবর্তক মহামানব। এইসব মহামানব সম্বন্ধে কারলাইল বলেছেন, "Our comfort is that Great Men, take up in any way, are profitable company. We cannot look, however imperfectly, upon a great man, without gaining something by him." অর্থাৎ আমাদের এই একটি সান্ত্বনা যে, যেভাবেই দেখিনা কেন, মহাপুরুষদের সান্নিধ্যলাভ ফলপ্রদ। মহাপুরুষের সংস্পর্শে এলে কিছু না কিছু উপকার পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কারলাইল আরও বলেছেন যে, মহামানবগণ আলোর উৎস। তাঁরা সেই আলো যা জগতের অন্ধকারকে দূর করে। এ আলো কেব জ্বালিয়ে দেওয়া প্রদীপ নয়। বরং এক স্বাভাবিক দীপ্তি যা ঈশ্বরের দানস্বরূপ, স সময় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এ আলো চিরপ্রবহমান উৎস। রামকৃষ্ণ পরমহংস সেইরূপ একটি আলোর উৎস, যা উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে সে যুগের জড়বাদী জীবন-দর্শনের সামনে একটা আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার আদর্শ স্থাপন করলেন। তিনি তাঁর অপার প্রতিভার প্রভাবে পশ্চিমী জড়বাদী ভাবধারার দুর্বার স্রোতকে রুদ্ধ করতে সক্ষম হলেন। সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নিরীশ্বরতার স্থানে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিশ্বাস, স্থিরতা ও ঈশ্বরপ্রীতি। তাঁর কণ্ঠ থেকে হতাশ মানুষ শুনলো আশার বাণী। ভেদাভেদ দ্বারা ছিন্নভিন্ন মানুষ শুনলো সর্বধর্মসমন্বয়ের মহাবাণী। সেই মহাপুরুষের স্পর্শলাভ করে ঘোর সন্দেহবাদী নরেন্দ্রনাথ দত্তের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। পরমহংস-দেবের কৃপায় তিনি হলেন জগৎবরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুরের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিবার ভার নিয়ে তিনি অদম্য তেজে ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত হলেন। আজকার এই প্রবন্ধে সেই স্বামীজীর দেশপ্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলব।

প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা দেশপ্রেম বলি, স্বামীজীর আদর্শ তার চেয়ে আরও মহান ও উচ্চভাবোদ্দীপক। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "Patriotism is not enough."—অর্থাৎ দেশপ্রেম যথেষ্ট নয়। একটা গোটা মানুষ তৈরি করতে গেলে দেশপ্রেম ব্যতীত আরও অনেক গুণের দরকার। দেশপ্রেম সেইসব মহৎ গুণের অন্যতম। কোনমতেই তা একমাত্র গুণ নয়। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, তার দেশপ্রেম থাকলেই যথেষ্ট হ'ল, তার অন্য কোন গুণের চর্চার ততটা দরকার নাই, তবে বলব যে, পূর্ণ জীবনের ধারণা সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় আমরা জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের আদর্শের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতাম। সেই সঙ্গে অন্যান্য গুণেরও যে দরকার সে কথার উপর বিশেষ

গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না। আজ তার কুফল আমরা প্রতিপদেই উপলব্ধি করছি। আজ দেশে বিভিন্ন পার্টি বা দলের উদ্ভব হয়েছে। এইসব দলের সমর্থকগণ দলের আদর্শকে এত বড় করে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে যে, তারা সত্যিকারের দেশপ্রেমের আদর্শেরই ক্ষতিসাধন করছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী মহামতি বার্কের সম্বন্ধে একজন লেখক যা বলেছেন এদেশের দলপতিদের সম্বন্ধেও সেই কথাটা বলা চলে, "He gave to the party what was meant for humanity." অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিকে দেবার মত অনেক গুণ তাঁর ছিল কিন্তু তিনি তাঁর পার্টিকেই সব দিয়ে দিলেন। প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের মনে রাখা দরকার যে, সে যেমন একটা দেশের নাগরিক, সেইরূপ সেই একই ব্যক্তি একই সঙ্গে বিশ্ব-নাগরিকও বটে। সত্যিকার দেশপ্রেমের সহিত বিশ্বপ্রেমের বিশেষ একটা বিরোধ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্ভুতভাবে এই দুই আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। সেইজন্য বলব যে, তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচলিত আদর্শ থেকে বহু উচ্চস্তরের বস্তু। তিনি কেবল স্বদেশপ্রেমের কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। স্বদেশপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমের প্রান্ত-সীমায় নিয়ে যেতে হবে। তাঁর মতে প্রীতি-ভালবাসা ও জনকল্যাণের সীমাকে স্বদেশের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। এ-সবকে সঞ্চারিত করতে হবে সারা বিশ্বে। বিশ্বের সব মানুষকে ভালবাসতে হবে। তাদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তিনি আমেরিকার চিকাগো ধর্মসভায় শাশ্বত হিন্দু-ধর্মের যে আদর্শ তুলে ধরেন তা ছিল সেই হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা যা সর্বব্যাপী উদারতা ও মানবতায় বিশ্বাসী। সে ধর্মে সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান নাই। সে ধর্ম সারা বিশ্বকে আপনজন বলে আলিঙ্গন করতে সঙ্কুচিত হয় না। বস্তুতঃ স্বামীজীর জাতীয়তা ও দেশপ্রেম কোন গণ্ডিবদ্ধ দেশের মধ্যে সীমিত নয়।

আজ থেকে কিঞ্চিদধিক একশ বছর পূর্বে স্বামীজী আমাদের এই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই একশ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে তাঁর অপার প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে। আজ দেশে যে অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ দেখতে পাচ্ছি তাতে তাঁর দান অপরিসীম। দেশের তরুণদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। দেশের তরুণগণ যদি তাঁর আদর্শ অনুসারে চলত, যদি তারা ধর্মের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকত, যদি বিদেশের দোষগুলি বর্জন করে গুণগুলি গ্রহণ করত, যদি ভারতের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলত, তবে সেইসব তরুণদের দ্বারা কি বিরাট ও মহৎ কাজই না সম্পন্ন হ'ত! পাছে ভারতবাসী সত্যপথ বর্জন করে বিপথে যায়, সেইজন্য স্বামীজী আমাদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, বহু সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে, ঠিক পথ ধরে না চললে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে। আজ তাঁর সেইসব অমূল্য উপদেশগুলির যথার্থ তাৎপর্য আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তাঁর শিক্ষাগুলিকে নূতন যুগের পটভূমিতে নূতন করে স্মরণ ও অনুধাবন করা দরকার।

স্বামীজী মূলতঃ ছিলেন সংসারত্যাগী ব্রহ্ম-চারী সন্ন্যাসী। কিন্তু অপরাপর সন্ন্যাসীর মত তিনি কেবল পরমার্থবিষয় নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন একদিকে সন্ন্যাসী ও অপরদিকে কঠোর কর্মযোগী। পরমার্থ-বিষয়ের সহিতই জাতির ঐহিক, বৈষয়িক ও সাংসারিক কল্যাণের কথাও তিনি চিন্তা

করতেন। কর্মের আদর্শ, গার্হস্থ্যজীবনের দায়দায়িত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, শিক্ষানীতি, এসব বিষয়ও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উত্থান-পতনের ইতিহাস তিনি গভীর-ভাবে পাঠ করেছেন। কিসে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে, এই অধঃপতিত জাতি কেমন করে আবার জেগে উঠবে, কেমন করে সামগ্রিক-ভাবে দেশবাসীর চরিত্র সংগঠিত হবে যাতে তারা জগৎ-সভায় সম্মানের সহিত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে—এসব বিষয়ও তিনি গভীর-ভাবে আলোচনা করেছেন। বহু পড়াশুনা, বহু জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁরই প্রভাবে সে যুগের বহু তরুণ যুবকের প্রাণে স্বদেশ-প্রেমের উৎসাহ জাগ্রত হয়েছিল। তাঁর প্রভাবে ও অনুপ্রেরণায় এইসব তরুণ সম্প্রদায় নূতন আগ্রহে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বামীজীর আদর্শকে অবলম্বন করেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবন আরম্ভ হয়েছিল। জনসেবা, জনকল্যাণমূলক কাজ, দৈহিক শক্তিচর্চা, সর্বোপরি ধর্মভাব—এইসব আদর্শ দ্বারা দেশের হাজার হাজার তরুণ যুবক অনু-প্রাণিত হয়ে উঠলো। স্বামীজীর অনুপ্রেরণা না পেলে সে যুগের তরুণ সম্প্রদায় এভাবে জেগে উঠত না। তিনি সক্রিয়ভাবে কোন রাজনীতি করেননি। কিন্তু এদেশের রাজ-নীতির গোড়াতে যে গঠনমূলক কাজ, যে সেবার আদর্শ, যে ত্যাগের স্পিরিট—তা তিনি তরুণদের মধ্যে উদ্দীপিত করেছিলেন। আজন্ম বিপ্লবী স্বামীজীর আবির্ভাব সে যুগের একটা ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জাতি তখন আপনাকে ভুলতে বসেছিল, তার অতীতের মহান ঐতিহ্য, গৌরবময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাহিনী সম্বন্ধে তার মনে কোন রেখাপাত হয়নি। সে যুগে যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁরাও দেশের আসল সমস্যার কথা ঠিক ধরতে পারেননি। তাঁরা হয়তো মনে করতেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবেই বুঝি দেশের এপ্রকার দুর্গতি। তাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতা আদায়ের দিকে। এই সময় স্বামীজী তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁর সাধনা, ত্যাগ, তপস্যা ও বৈপ্লবিক চিন্তা নিয়ে জাতির সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি আমেরিকাতে ভারতের বাণী প্রচার করে বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি ভারতে পদার্পণ করেই স্বদেশবাসীকে আকুল কণ্ঠে আহ্বান করলেন, "ওঠ, জাগ্রত হও!" দেশবাসী উপলব্ধি করল তাঁর এই আহ্বান কোন রাজনৈতিক নেতার শূন্যগর্ভ আহ্বান নয়। এ আহ্বান এমন একজন সর্বত্যাগী মহাযোগীর উদাত্ত আহ্বান যা অন্তরে শিহরণ জাগিয়ে দেয়। তাঁর এ আহ্বান জাতির হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত দিল। তরুণদের প্রতি ধমনীতে স্পন্দন সৃষ্টি করল। তিনি কোন কিছুর জন্য সরকারের নিকট আবেদন করলেন না। তিনি সোজাসুজি জাতির হৃদয়ের নিকট আবেদন করলেন। তিনি জাতিকে বুঝালেন: "দোষত্রুটি তোমার নিজের মধ্যে আছে। সেটাকে দূর করে ফেল, সব ঠিক হয়ে যাবে।" তিনি বললেন, "দুর্বলতা ত্যাগ কর, কারণ বলহীন ব্যক্তি কিছুই করতে পারে না। সবল হও, পেশীর চর্চা কর। বলহীন জাতি অপরের দয়ার দানের উপর নির্ভর করে দাঁড়াতে পারে না।" এইভাবে স্বামীজী আত্মবিস্মৃত জাতির মনে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেন। তিনি তাদের বুঝালেন যে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে নতুবা জাতীয় জাগরণ

হবে না। সে যুগের বহু রাজনৈতিক নেতা লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু জাতির ঘুমন্ত প্রাণকে এমনভাবে জাগাতে পারেননি। তাঁরা দেশের নাড়ীর খবর রাখতেন না। স্বামীজী তাঁদের পথে গেলেন না। স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা দেখবার জন্য সারা ভারত ভ্রমণ করে বেড়ালেন। তিনি যেমন গেলেন রাজার প্রাসাদে, তেমনি স্বচক্ষে দেখলেন দীনের পর্ণকুটির।—গেলেন সন্ন্যাসীর আশ্রমে, মঠে মন্দিরে পথে প্রান্তরে হাটে বাজারে দোকানে সরাইখানাতে—সবস্থান ঘুরে ঘুরে নিজের দুটি চোখ দিয়ে দেখলেন দেশের অবস্থা। কি চাই দেশের লোকের, কি তাদের অভাব, কেন তাদের এই দারিদ্র্য ও দুর্গতি, কিভাবে দূর হবে তাদের এই দুর্দশা, কি তাদের প্রয়োজন—এই সব কথা তিনি চিন্তা করলেন। এই ভারত-পরিক্রমার সময় দেশের যুগযুগসঞ্চিত দারিদ্র্য তাঁর নিকট অত্যন্ত কঠিনভাবে প্রকট হয়ে উঠলো। তিনি বুঝলেন দেশে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার নাই, শিক্ষাটা কেবল মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের মধ্যে আবদ্ধ, অশিক্ষা জড়তা ও কুসংস্কারে দেশ ছেয়ে গেছে। কেবল বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাব পাশ করলেই এদেশের কোন উন্নতি হবে না, অভাবও দূর হবে না। এদের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগাতে হবে। সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা এদের দৈন্য দুর্দশা দূর করতে হবে। দারিদ্র্য, অভাব, অনটন—এসব যতদিন থাকবে ততদিন কিছুই হবে না। ভিখারীর জাতির কোন ভবিষ্যৎ নাই। তাই তিনি জোর দিলেন দৈহিক, ঐহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের উপর। এ সব করতে হবে, তবেই দেশের উন্নতি হবে—এ সবের একটাকেও বাদ দিলে চলবে না। "ভীরুতা বর্জন কর, পরিশ্রম কর, সর্ব বিষয়ে আন্তরিক হও"—এই হ'ল তাঁর অন্যতম বাণী।

এ কথা সত্য যে, স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতিতে যোগদান করেননি। কিন্তু রাজনীতির মূলতত্ত্ব তাঁর সবিশেষ জানা ছিল। দেশের সত্যিকারের প্রয়োজন কি, কি কি বস্তুর আশু প্রয়োজন—এ বিষয়ে তাঁর সম্যক্ ধারণা ছিল। তিনি গভীরভাবে ভারতের অতীত ইতিহাস পড়েছিলেন, তার থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের পরাধীনতার ও অধঃপতনের মূল কারণ কি, মূল রোগ কোথায় আছে। বস্তুতঃ তিনি সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করেছিলেন। তিনি বললেন, "ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ জনসাধারণকে অবহেলা করা। এই অবহেলা হচ্ছে একটা জাতীয় মহাপাপ—a great national sin." সে যুগের স্বদেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতাদের বুঝালেন যে, যতদিন দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হবে, যতদিন তারা ভালভাবে খেতে পরতে না পাবে, যতদিন তাদের যত্ন না লওয়া হবে, ততদিন রাজনীতি করে কোন ফল হবে না। সকলের আগে চাই এইসব, অন্য সব পরে। কিন্তু কেবল চাই বললেই হবে না। সেজন্য অক্লান্তভাবে সাধনা করে যেতে হবে। স্বভাতল কাঁপানো বক্তৃতা দিয়ে এসব কাজ হবে না। স্বামীজী দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা। শিক্ষা চাই, নতুবা সব ব্যর্থ। তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে, দেশের গোটা শিক্ষাটা মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের হাতে ন্যস্ত। জনশিক্ষা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নাই

এবং ইচ্ছাও নাই। অধিকাংশ স্কুল বিদ্যালয় সরকারী-সাহায্যপুষ্ট ও সরকারী নির্দেশে সেগুলি পরিচালিত হয়। কারিকুলাম বা পাঠ্যব্যবস্থাও সরকারই ঠিক করে দেন। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা দেশের সামগ্রিক উপকার বা লাভ হবে না। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, যদি আমাদের আবার উঠতে হয়, তবে প্রথম কাজ হবে শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক করে দেওয়া; আর, তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নূতনভাবে শিক্ষার কারিকুলাম রচনা করতে হবে। এই কারিকুলামে যেমন থাকবে ভারতের ঐতিহ্যের কথা, ধর্মবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস, তেমনি থাকবে চরিত্রগঠন ও শরীরগঠনের ব্যবস্থা। কারণ জনসাধারণই সমস্ত শক্তির উৎস, তাদের ন্যায়-সঙ্গত দাবী থেকে তাদের বঞ্চিত করলে পরে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ অর্থশালী কোটিপতির উপর স্বামীজীর কোনই আস্থা ছিল না, তিনি সে যুগেও বুঝেছিলেন যে, ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের উন্নয়নের উপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। সর্বপ্রযত্নে তাদের অবস্থা ভাল করতে হবে। তাই তিনি দেশের শিক্ষিত লোকদের বারবার অনুরোধ করেছেন: ভারতের এই দুঃখ-দুর্দশার পাহাড়ের উপর আগুন লাগাও। যুগ যুগ ধরে যেসব জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে আছে তার সেই স্তূপের উপর আগুন লাগিয়ে সবকে পুড়িয়ে দাও। গায়ের জোরে নয়। এসব করতে হবে ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা। শিক্ষাই জীবনদায়িনী শক্তি, মানুষ তৈরির যন্ত্র। আজ স্বামীজীর এইসব বক্তৃতা ও রচনাবলী পাঠ করলে মনে হবে যেন কোন আধুনিক বৈপ্লবিক জননেতার কণ্ঠধ্বনি শুনছি। স্বামীজীর হৃদয়ে ছিল অসীম দেশপ্রেম। তাঁর সেই দেশপ্রেম ছিল সামগ্রিকভাবে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি ভালবাসা থেকে উৎসারিত।

স্বামীজী কেবলমাত্র কতকগুলি উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। তাঁর বিপ্লবী মন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তিনি চেয়েছিলেন, দেশের উপর যুগ যুগ ধরে যে অভাব দুঃখকষ্ট স্থায়ী হয়ে চেপে বসে আছে তাকে সমূলে উৎপাটন করতে। ভারতের সমাজের মধ্যে জগদ্দল পাথরের মত যে রক্ষণ-শীলতা বিরাজমান আছে তাকে তিনি দূর করতে চাইলেন। সমস্ত বিষয়কে পুনর্বিবেচনা করে আমূল পরিবর্তন করতে চাইলেন। ধনিক সম্প্রদায় যে কেবলমাত্র দরিদ্র জনসাধারণের ঘাড়ের উপর বসে থাকবে তা হ'তে দেওয়া চলে না। তিনি জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চাইলেন। এই দিক দিয়ে বলতে পারি যে, স্বামীজী ছিলেন একজন প্রথমশ্রেণীর সোস্যালিস্ট। এই যে দরিদ্র জনসাধারণকে বিশেষ করে নীচজাতিদের দূরে রাখা হয়েছে, অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে, তাকে তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন। বলতে পারি যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীর পূর্বগামী। গান্ধীজীর বহু পূর্বেই তিনি অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের সূত্র-পাত করেন। জাতীয়তাবাদী বলতে যদি দেশের কল্যাণকামী হওয়া বুঝায় তাহলে স্বামীজী ছিলেন প্রথমশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদ কোনওরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁর মনে বিশ্ব-প্রেম তথা মানবপ্রেমের স্পিরিট সদাজাগ্রত ছিল। তাঁর মতে সত্যিকারের জাতীয়তাবাদের সহিত বিশ্বমানবতার কোন বিরোধ ছিল না। তবে যে-দেশ অনুন্নত, পরাধীন, দরিদ্র ও অশিক্ষার পঙ্কে নিমজ্জিত, সে দেশের কথা একটু

বেশী করে চিন্তা করতে হবে বইকি। তাই তিনি তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যের উন্নততর দেশের মত উন্নত করতে চেয়েছিলেন। তিনি অপরাপর জাতীয়তাবাদীদের মত হইচই করেননি। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, সব বিষয়ের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে শক্তি অর্জন করতে হবে। দেশকে নিজেদের আদর্শ অনুসারে গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিমদেশের সহিত শক্রতা চাই না, বরং তাদের সহযোগিতা চাই। তাদের নিকট থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। তবে সেই সঙ্গে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে, পশ্চিমদেশকে সকল বিষয়ে অনুকরণ করা চলবে না। সেখান থেকে শিক্ষার উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু তা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বর্জন করে নয়, বিস্মৃত হয়েও নয়। আমরা যা কিছু করব, ভারতের ঐতিহ্য ধর্ম ও জীবনের মূল থেকে তা রস সংগ্রহ করবে। সামাজিক সংস্কার চাই, শক্তিচর্চা চাই, শিক্ষাসংস্কার চাই, নানা দিক দিয়ে বৈপ্লবিক মন নিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু ভারতের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যকে ভুলে গেলে চলবে না। স্বামীজী নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পশ্চিম দেশের রাজনীতি এদেশে আমদানী করলে বা তাদের অনুকরণ করলে দেশে দলাদলি ভেদাভেদ বেড়ে যাবে। তাতে যত হইচই হবে, প্রকৃত কাজ তত হবে না। তিনি পুনঃ পুনঃ দেশবাসীকে এসব বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন—কিছুতেই পাশ্চাত্যের অনুকরণ করো না। ভারতবাসী যেন সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে পরস্পরের সহিত ঝগড়া-বিবাদ না করে, এ সম্পর্কে তিনি বহুভাবে সমাধান করে দিয়েছিলেন। সত্ত্বগুণ, উচ্চাশা, শুদ্ধমন, শুভ্র চরিত্র, আত্মপ্রত্যয়—এই সব ব্যতীত কোন দেশ বড় হতে পারে না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতের সংহতি রক্ষা করতে হ'লে সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, গণ্ডিবদ্ধতা, ভেদাভেদ-জ্ঞান—এসব চিরতরে বর্জন করতে হবে। এইসব পাপের প্রভাবে সমগ্র দেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যে ছিল উদার ভারতপ্রেম। ভেদাভেদ দলাদলি ইত্যাদি হচ্ছে ভারতের সংহতির প্রধান শত্রু। ভারতীয় জীবন থেকে এই সব পাপ দূর না হ'লে ভারতের কোন ভবিষ্যৎ নাই।

একদিকে স্বামীজী ছিলেন বীর সন্ন্যাসী, সিংহের মত ছিল তাঁর শক্তি ও তেজ। আবার অপর দিকে তিনি ছিলেন মমতা, প্রীতি, প্রেম ও স্নেহের অমৃতময় উৎস। দেশের অগণিত জনসাধারণের প্রতি কী গভীর ভালবাসাই না ছিল তাঁর বিশাল হৃদয়ে! এ সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: "I do not believe in a god or religion, which cannot wipe out the widow's tears or bring a piece of bread to the orphan's mouth." অর্থাৎ সে ঈশ্বর বা ধর্মে আমার বিশ্বাস নাই, যা বিধবার অশ্রু মুছাতে পারে না অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথ-আতুরের মুখে একটুকরা রুটি দিতে পারে না। একথার অর্থ কি তিনি নাস্তিক? না, তা মোটেই নয়। এর আসল অর্থ এই—দুঃখীর দুঃখ দূর করতে হবে, অভাবীর অভাব মোচন করতে হবে। এসব দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেউ যদি আচার-অনুষ্ঠানকেই ধর্ম বলে মনে করে তবে তা নিতান্ত ভুল ধারণা। ঐ উক্তির মধ্যে আমরা শুনছি বিপ্লবী

স্বদেশপ্রেমিক তথা মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর ঘোষণা। জনকল্যাণ ব্যতীত দেশ-সেবার কোন অর্থ হয় না। স্বামীজী বলতেন, যদি জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূর করতে না পারি তবে ধ্বংস অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করতে বলি, "হে ভারত, ভুলিও না," ইত্যাদি। সীমাহীন দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি দেশবাসীর নিকট এই প্রকার সম্মোহনী বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, স্বামীজী ছিলেন আদর্শ দেশপ্রেমিক। তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমের আদর্শের উৎস। যারা দেশপ্রেমিক হ'তে চায় তাদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা কি তোমাদের অস্থির ও নিদ্রাহীন করে তুলছে? তা যদি না করে থাকে তবে কেবল বক্তৃতা দিয়ে কোন্ ধরনের দেশপ্রেমের পরিচয় দাও? জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য বাস্তব সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে হবে। এ পথে আছে বহু অসুবিধা। সমস্ত অসুবিধা দূর করবার জন্য অদম্য ইচ্ছাশক্তি চাই। যদি সমগ্র জগৎ তলোয়ার নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবুও যা তোমরা ঠিক মনে কর তা করবার জন্য প্রস্তুত হও। ইহাই আসল দেশপ্রেম। দেশসেবা বলতে তিনি জনসাধারণের সর্ববিধ স্বাধীনতার কথা বুঝতেন—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক। স্বামীজী বারবার বলতেন যে, ভারতের সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে জনগণের সেবা, দারিদ্র্যক্লিষ্ট অশিক্ষিত লোকের সেবা। কারণ তাঁর মতে তারাই তো ভারতবর্ষ। তাদের নিয়েই সমাজ। আমি তুমি যারা বড়লোক, যারা সুখী, তারা নয়। এই মহান স্বামীজী একটি সু-উজ্জ্বল গৌরবান্বিত ভারতের আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে যখন মহাবাণী নির্গত হল: ওঠ, জাগো, দেখ তোমার ভারত উন্নত সিংহাসনে উপবিষ্ট অধিক-তর ভাবে পুনর্জাগরিত গৌরবান্বিত—ইহাই তোমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। তাঁর এইসব অগ্নিগর্ভ বাণী ভারতের যুবকগণকে উৎসাহিত করেছে। তাদের প্রাণে এনেছে নবযৌবন। তাদের জীবনকে দেশ ও জাতির সেবায় করেছে নিয়োজিত। আজকের এই নবজাগ্রত ভারতে স্বামীজীর দানের কথা জাতি কখনও ভুলতে পারবে না। জয়তু স্বামীজী!

তুমি

শ্রীশান্তশীল দাশ

তুমিই আঁধার দাও, তুমি দাও আলো,
তুমি দূরে ফেলে দাও, তুমি বাস ভালো,
হাসাও তুমিই সেই, তুমিই কাঁদাও,
গড়ো তুমি আবার সে-গড়া ভেঙে দাও;

খেয়ালী, তোমার খেলা কিছু সে বুঝি না,
শুধু দেখি সেই খেলা, অর্থ খুঁজি না;
হাসাও যখন, হাসি, কাঁদি কাঁদালেই;
চলি থামি বারবার আলো আঁধারেই!

একদিন এই খেলা শেষ হবে জানি,
সেদিন তুমি কি মোরে কাছে নেবে টানি?

ডাক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ধরণীর মাঝে কিমাশ্চর্য আছে বা অতঃপর—
গিরিদরী থেকে বাহিরায় ধ্বনি 'আক্‌বর' 'আক্‌বর'।
দুরধিগম্য মরুপর্বত একান্ত জনহীন—
রাখাল বালক সেই শব্দেতে চমকিত কতদিন।
রটিল বারতা, যত নরনারী দূর গ্রাম নগরীর
জমায় নিত্য গুহার মুখেতে একটা মেলার ভিড়।
বুঝিতে পারে না কিন্তু কিছুই, পায়নাকো সন্ধান—
পাথরের মুখে হেন বাণী দিল কোন্ সে শক্তিমান?

২

পল্লী হইতে সংবাদ গেল দিল্লীর দরবারে—
হোমরা চোম্‌রা, আমীর ওম্‌রা হাসিয়া উড়ালো তারে।
বাদশাহ এই জবর খবর শুনিয়া কহেন হাসি,'
বান্দার ডাক কেন যে পড়িল চলো গিয়ে দেখে আসি।
সুন্দরের সে অদ্ভুত ডাক, পশিতেছে যেন কানে,
রওনা হলেন বাদশাহ যেই কৌতুকা আহ্বানে।
দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রেতে আবু পাহাড়ের গায়ে—
শ্রান্ত, ক্লান্ত, দাঁড়ালেন এক 'ফণিমনসার' ছায়ে।

৩

উঠিতেছে ধ্বনি কর্কশ ক্ষীণ শ্রুতিকটু অতিশয়
একি প্রহেলিকা, নরের কণ্ঠ শুনি যেন মনে হয়।
পাথরে আঘাত করিয়া বাদশা দাঁড়ান গুহার আগে—
বলেন হুজুর কি লাগি তলব নফর আদেশ মাগে।
পশ্চাৎ হতে সন্ন্যাসী আসি চাহিছেন মুখপানে—
কহেন ডাকের মূল্য বুঝেছ, বুঝিতে পেরেছ মানে।
'ডাকে ভগবান আসে বলেছিনু' করনিকো বিশ্বাস—
মনে পড়ে তব অহমিকাভরা সে কুটিল পরিহাস।

৪

উপেক্ষার এই ডাকে যদি আসে নিজে দিল্লীশ্বর—
কাতর ব্যাকুল ডাকে আসিবে না কেন জগদীশ্বর ?
জেনো মানুষের জ্ঞানের বাহিরে এমন জিনিস আছে,
যাহার প্রবল আকর্ষণেতে ভগবান আসে কাছে।
প্রবল-প্রতাপ বাদশাহ তুমি, কতই অহঙ্কার,—
তবু এই ডাকে এখানে আসিয়া ঠেলিছ পাষাণদ্বার।
আসে ভগবান, নিশ্চয় আসে, নিশ্চয় আসে ডাকে,
যে বলে এ কথা, সত্যই বলে, বিশ্বাস করো তাকে।

দারিদ্র্য

শ্রীকালিদাস রায়

তোমারে চিনিল শুক, সনক, অক্রূর,
সর্বস্বে কিনিল বলি, জিনিল জনক।
সেবিয়া হইল ধন্য নারদ বিদুর,
ভক্ত তব রঘুনাথ, কবীর নানক।
দাও তব নৈমিষের হরীতকী দু'টি
তোমার 'কাম্যক'-ব্যথা চিরকাম্য-প্রিয়,
তব বদরিকাছায়ে চিরদিন লুটি'
তোমার 'দণ্ডক'-দণ্ড চিরদিন দিও।
তোমার সন্তোষ-ক্ষেত্র ভারতের বুকে,
তোমার বৈশালী-মন্ত্র নিশিদিন স্মরি,
তব বোধিদ্রুমতলে যেন রহি সুখে
তব বৃন্দাবনে যেন করি মাধুকরী।
যদি দিগম্বরে পাই জীবন-সন্ধ্যায়,
চিরদিন র'ব তব মণি-কর্ণিকায়।

দিনের শেষে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

এই তো এসেছি জীবনের আজ শেষ কিনারায় ;
কেমনে এলাম ভাবিতে অবাক লাগে !
বেঁধেছিনু আমি এ মাটির বুকে কুঞ্জছায়ায়
ছোট্ট বাসাটি, সে কথা স্মরণে জাগে :
আজিকে পিছনে যতদূর পারি চেয়ে দেখি ফিরে
অসীম ভুবন ! যেন এর শেষ নাই !
গীতগুঞ্জন নীরব হ'য়েছে ঝংকারি ধীরে
সুরের পরশ বুকে আর নাহি পাই !

কোথায় হারালো হৃদয়দোলানো ভোলানো সে গান ?
দেহতটে আর নাচে না কামনাঢেউ ;
সহসা কেন যে প্রশান্ত আজ অশান্ত প্রাণ !
কোথায় সে মন ? চুরি কি ক'রেছে কেউ ?
লুকালো কোথায় উচ্ছল ধারা চঞ্চলতার—
সমুখে নেমেছে কেন এ কৃষ্ণ ছায়া ?
পারেনি তবু সে রুধিতে আমার কল্পনাদ্বার,
সেখানে এখনো খেলিছে স্বপনমায়া !

ওগো কালো ছায়া ! আবরিলে কেন স্বচ্ছ আকাশ ?
ঢাকিলে আলোর দীপ্ত মুকুরখানি।
তুমি কি মৃত্যু ? বিশ্ববাসীর একান্ত ত্রাস
শিয়রে দাঁড়ালে রাজার আদেশ আনি ?
এসো মহাকাল ! স্বাগত তোমার এই আগমন,
তোমার হিসাব চুকায়ে রেখেছি আমি ;
যা কিছু কুকাজ সকলি হে আমি রেখেছি স্মরণ,
ত্রুটি বিচ্যুতি জাগে মনে দিবা যামি !

করো নির্দেশ—কোন দেশ স্থির—ফিরিয়া যাবার ?
যেতে চাই সেথা ধুয়ে সব অপরাধ।
এই মাটিতেই নূতন জনম যাচি হে আবার—
পূর্ণ করিতে অপূর্ণ যত সাধ।
ক্ষমাহীন কোনো গুরু অপরাধ যদি করে থাকি,
দণ্ড লইবো নতশিরে প্রভু আজ,
শুনিয়াছি যার অনুশোচনায় ঝরে দুটি আঁখি,
তারে তুমি নাও কোলে তুলে মহারাজ!

অধরা

বনফুল

তোমারে যায় না ধরা, হে সুদূরচারিণী অধরা,
তবু তব বন্দনায় এ ধরণী চির-কলস্বরা,
নিত্য নব নব রূপে কবিত্বের কল্পনা-অপ্সরা
তব লাগি অর্ঘ্য রচে সাজাইয়া সৌন্দর্য-পসরা,
কিন্তু তুমি তবুও অধরা।

মনের নিভৃত দেশে মাঝে মাঝে অনুভব করি
অনাদি-অনন্ত-পারে আপনারে প্রসারিয়া, মরি,
অতীন্দ্রিয় স্বপ্নলোকে মুক্ত তুমি, ওগো নিরম্বরী;
তাহাই কি ব্রহ্মলোক? ব্রহ্মর্ষিরা যেথায় উত্তরি,
বিরাজেন জ্যোতির্মূর্তি ধরি?

আলো যেথা নিঃশেষ নিঃশব্দ ঘন অন্ধকারে
ভাষা যেথা নির্বাক হে অধরা, তারও পরপারে
আছ তুমি, হে অসীমা রূপাতীত যে মহা-আধারে
সে আধারও সীমাহীন, সে আধারও লুপ্ত নিরাধারে,
তোমারে ধরিতে কেবা পারে?

প্রথম দেখা হিমালয়

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মায়াবতী এসেছি কয়েকদিন হ'ল। যে ঘরটিতে আছি, তার বারান্দায় এসে দাঁড়ালে 'উত্তরস্যাং দিশি' হিমালয়-দর্শনের কথা। সমতল বাংলার মানুষ। পাহাড় দেখলেই অবশ্য অবাক হই না। তবু হিমালয় সম্বন্ধে কতো দিনের কতো স্বপ্ন, ধ্যান, স্মৃতি, দেখবো বলে কতো দিনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তুতি। লক্ষ্ণৌ থেকে পিলিভিত হয়ে আসতে আসতে কতবার ভেবেছি পথের মোড়ে যে-কোনো বাঁকেই খুলে যাবে সেই অফুরন্ত বিস্ময়ের স্তরে স্তরে আকাশস্পর্শী অভিযান। অরণ্য, পর্বত, নদী, গ্রামের পর আবার গ্রাম, শেষটায় এলো লোহাঘাট। আজকের দিনে মিলিটারীর কল্যাণে প্রায়-শহর এই লোহাঘাটের বাজারে আধুনিকতম কেনা-কাটারও অসুবিধে নেই। তবু লোহাঘাটের পথের দুধারে পাইন আর দেবদারুর সারি, মাথার উপরে ঘন হয়ে আসা মেঘ, দূর আকাশের কোণে একটি আধটি পাহাড়চূড়োর আভাস, শেষ বৈশাখের বাতাসেও শীতল বরফ-ছোঁওয়া —মুহূর্তে মনকে তৈরী করছিল এর পরবর্তী অভিযানের জন্য।

টাট্টু ঘোড়া নিয়ে দু'জন পাহাড়ী তৈয়ার, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠতে যাবে, এমন সময় সবার পরিচিত ধনসিং এগিয়ে এসে নমস্কার জানালেন। একদা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের ছোট্ট পোস্ট অফিসটির রানার, এখন আপন উদ্যোগে এ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। আশ্রমের তীর্থযাত্রীদের কাছে ইনি একান্ত আপনজন। ধনসিংহের ভ্যান গাড়ীটি খালি আছে—আমরা আশ্রমযাত্রীরা অনায়াসে যেতে পারি।

প্রথম দফা চড়াই-উৎরাই অক্লেশে উত্তীর্ণ হয়ে আশ্রমে এসে পৌঁছলাম আধ ঘণ্টার মধ্যে। পাহাড়ী পথ মসৃণ হয়েছে যুক্তপ্রদেশের সরকারী বদান্যতায়। কিন্তু পথের সঙ্গে সঙ্গে জনতার হানা সম্ভব হয়নি। আশ্রমটি যে পাহাড়ের উপর, তার চারদিকের সীমানায় জনবসতি নিষিদ্ধ। আর এই নীরব নিষেধের পরপারে মায়াবতীর নগ্ন তপস্যার নির্জনতা।

যে ঘরটিতে রয়েছি, তার পাশ দিয়ে পাহাড়ী পথ উঠে গেছে উঁচু-নিচু অরণ্য-অন্ধকারে। সামনের একফালি জমিতে ন্যাসপাতিগাছে উঠছে নামছে কাঠবিড়ালি। আর অগণিত তরুশাখার ফাঁকে দূরে বিস্তারিত অধিত্যকা উপত্যকা পেরিয়ে চোখে পড়ে দিগন্তের সঞ্চিত মেঘমালা। আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামীজী বললেন, 'এখন দেখতে পাচ্ছেন না, যে-কোন মুহূর্তে ওই মেঘ সরে যাবে, আর হিমালয় দেখা দেবেন সমস্ত উত্তর দিকটা জুড়ে। একেই বলে মায়া। মায়া সরে গেলেই তাঁর দর্শন।'

প্রতিদিনের উদয়াস্ত-প্রত্যাশা বিমুখ মেঘের আড়ালে রেখে প্রথম পাঁচটি দিন কেটে গেছে। কাল ষষ্ঠ দিনের প্রভাত। এই মুহূর্তে অন্ধকার মায়াবতীর পাথুরে মাটিতে ধ্বনিত বৃষ্টির শব্দ, আর জানালার কাঁচের ওপরে একটি দুটি পতঙ্গের ঘোরাঘুরি ঘরের আলো লক্ষ্য ক'রে। আশ্রমের রান্নাঘর থেকে একটু আলোর রেখা ছাড়া বাইরের অন্ধকারে সূচী বিঁধবারও

জায়গা নেই। মাঝে মাঝে একটি দুটি বৃষ্টি-ধারায় আলোর চমক, আর তার পরেই বেহালার ছড়টানা মল্লারের মতো বৃষ্টির একতান। শুনতে শুনতে একসময় মনে হলো, কী জানি এই মেঘ যদি আ'র সরে না যায়। হিমালয়ের বুকে এসেও হয়তো হিমালয়ের চূড়া এমনি মেঘের আড়ালেই থেকে যেতে পারে। শুধু মেঘ, বৃষ্টি, রৌদ্র, ছায়া, অরণ্য, অন্ধকার, পতঙ্গ-ধ্বনিত নৈঃশব্দ্য—হয়তো এ যাত্রায় আমার এটুকুই লাভ!

তাই হোক, তবে তাই হোক।

কিন্তু—না—না—তাও কি হয়? আমি তো শুধু শখের ভ্রমণকারী হিসাবে এক চক্কর ঘুরে গিয়ে দেখা এবং না-দেখা হিমালয়ের কল্পিত উপন্যাস বানাতে আসিনি। ভারতের প্রাণের সত্য, ধ্যানের সত্য, উপলব্ধির সত্য এই হিমালয়। সেই তিন সত্যকে বুকের মধ্যে এক অখণ্ডরূপে গ্রহণ করবো বলেই হিমালয়ে আসা। নইলে এত কাছের দার্জিলিং-কালিম্পঙ ছেড়ে মায়াবতী আসা কেন?

অনেকদিন আগে কালিম্পঙে যাওয়ার ইচ্ছে জেগেছিল এক তরুণ বন্ধুর আহ্বানে। মনের কথা যাই থাক, বাদ সাধল অসুস্থ দেহ। তারপর প্রায় কুড়িটি বছর কেটে গেছে। কর্ম-চক্রের আবর্তনে হিমালয়ের ভৌগোলিক মাতামহী চেরাপুঞ্জী অবধি যাওয়া হয়েছে, তবু হিমালয়ের তুষারমৌলি স্বরূপ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু জোর করে তো পাওয়ার জিনিস এ নয়। আমি তো কেবল বহিরঙ্গ শোভাটুকু চাইনি, আমার হিমালয় ধ্যানের সত্তা নিয়ে অন্তরের মধ্যে জেগে উঠবে—এই চেয়েছিলুম।

বাইরের বৃষ্টির কান্নায় কান পেতে মনে হচ্ছিল, হয়তো এখনও সময় হয়নি। হয়তো তপস্যার বাকি অনেক। যাকে চোখে দেখতে চাই, তাকে খালি সময় আর সুযোগের মিলনেই ধরা যায়। যাকে ধ্যানে ধরতে চাই, সে নিজে ধরা না দিলে তো পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যদি হিমালয়ে বেড়াতে আসতুম কেবল—তাহলে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেওয়া যেতো। আমি যা দেখতে চাই, তা তো ভাগ্যের খেলা নয়, মানবজন্মের তা সহজাত অধিকার। হিমালয়-দর্শন তো আমার মতো ভারতবাসীর কাছে আত্মদর্শনেরই প্রতীক। সে আত্মিক সত্যের শিখরচূড়ার মেঘ হয়তো মিথ্যা নয়, তেমনি সত্যও নয়। সত্য সেই হিমালয়!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'সমুদ্র আর হিমালয় না দেখলে অনন্তের ধারণা হয় না।' হয়তো সে-কথা ভেবেই একদা মনে জেগেছিল—

সমুদ্র দেখেছি আমি,
হিমালয় দেখিনি কখনো।
জানি এই তরঙ্গিত জীবন-জিজ্ঞাসা,
আনন্দের ফেনরাশি,
সংশয়ের নিত্য-আন্দোলন!
বহুদূর চক্রবালে
বহু দিন চেয়ে চেয়ে
অবিশ্রাম তটরেখা খুঁজেছি অন্তরে।
প্রীতির প্রবাল দিয়ে
তিলে তিলে গড়ে-ওঠা
কত প্রাণদ্বীপ
আশ্রয়-আশ্বাস দিয়ে ভরেছে হৃদয়!
নোঙর ফেলেছি যেই
দেখেছি অমনি,
সেই সব দ্বীপ ঘিরে তরঙ্গ ফেনিল
ক্রন্দন-কল্লোল-গীতে
ঘুরে ফিরে মরে।
তীরপ্রান্ত হ'তে চাই
দিক্‌প্রান্ত পানে;
হে অসীম

মেলেনি উত্তর !
তাই আজ চাই হিমালয় !
চাই আজ প্রত্যহের সমতল হ'তে
বিপুল বিস্ময় ভরা
মহা-আবির্ভাব,
অনন্ত প্রশ্নের লাগি
উত্তুঙ্গ উত্তর !
হে হিমাদ্রি,
মন্ত্র দাও, মৌন তব সংগোপন বাণী,
এ জীবন ধ্যান হোক,
হোক ওঁকার।

কখন ঘন-অন্ধকারে ঘরের আলো লুপ্ত হয়ে দু'চোখ ভরে ঘুম নেমে এসেছে। আমি সেই ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে শুধু হিমালয়ের কথাই ভেবেছি।

* *

ভোরের অন্ধকার তখনো পর্দার আড়ালে থমকে আছে। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সকালবেলায় মাঙ্গলিক ধ্বনিত হ'লো পাখির গলায়। কান পেতে শুনলুম বৃষ্টি নেই। যখন ঘর ছেড়ে বাইরে এলুম চারদিকে ঝিলমিল রোদ। কেবল অভ্যাসবশে ন্যাসপাতি গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চাইলুম। একরাশ শাদা মেঘের স্তূপ স্তরে স্তরে চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে। মেঘ ? না—না— আর কিছু ;—আর কিছু নয়, এই তো হিমালয় ! একসঙ্গে একমুহূর্তে কতো না তুষারচূড়া নির্মল রৌদ্রের শুভ্রতায় অবিচল আনন্দঘন রূপে আকাশ জুড়ে দেখা দিয়েছে ! দ্রুতপদে এসে দাঁড়ালুম সেই ওকগাছটির তলায়--যেখানে পূজ্যপাদ হরিমহারাজের পুণ্যস্মৃতি আজও জড়ানো। না, কোনো ভুল নেই, এই তো হিমালয় !

আমার ঘরের বারান্দার দিকে কে ছুটে চলেছেন ? চেয়ে দেখি আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ। আমায় না দেখতে পেয়ে এদিকেই মুখ ফেরালেন, দূর থেকে হাত তুলে বললেন, 'আজ দেখতে পেয়েছেন।' আমার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ তাঁর দীপ্ত চোখেমুখে। সেই মুহূর্তে 'মধু বাতা ঋতায়তে। মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।'

আজ আমার প্রথম দেখা হিমালয়। আর প্রথম দিনটিতেই এমন দিগন্তজোড়া আবির্ভাব ! শুধু কেদার-বদরীর দিকে একটু মেঘের ছায়া। আর সমস্ত উপত্যকা জুড়ে এক মেঘের সমুদ্র, যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে হিমালয়ের পাদমূল ঢেকে দিতে চাইছে। সেই মেঘসমুদ্র পার হয়ে ধবল তুষারশ্রেণী আত্মস্থ আনন্দে শুভ্র-জ্যোতি-বিকীর্ণ-মহিমায় মুহূর্তে যুগ-যুগান্তরের ধ্যান অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিল।

আশ্রম-অধ্যক্ষ মহারাজ দূরবীণটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'আপি নাম্পা' শিখর থেকে 'পঞ্চচুল্লি' পার হয়ে 'নন্দাদেবী'র দ্বৈতশিখরে চোখ রাখলুম। নন্দাদেবীর হিমশুভ্র বিস্তারের একপাশে একটু ছায়া হয়তো কাছাকাছি কোনো পাহাড়ের আংশিক বাধায় সূর্যালোক সেখানে পড়েনি। কেন জানি না, ওই ছায়াটুকুর জন্যই চারপাশের শুভ্রতা আরো মায়াময় হয়ে উঠেছে।

নন্দাঘুন্টি. ত্রিশূল, তারপর আবছা আভাসে কেদার-বদরী একটু উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত অবধি এত অবাধ দর্শন শুনেছি অন্যত্র একেবারেই দুর্লভ। আমেরিকান পরিভাষায় যা 'million dollar sight' (দশ লাখ টাকার দৃশ্য), আমাদের পরিভাষায় তা 'যোগমূর্তি গিরিশ'। অথবা এই শুভ্র তুষারপুঞ্জে স্তব্ধীকৃত ত্র্যম্বকের অট্টহাস !

আর এক দৃষ্টিতে, সমুদ্রমন্থনজাত অমৃতফেনার তরঙ্গায়িত প্রকাশ!

দূর থেকে যাকে মনোহর মনে হয়, কাছে এলে তাকে যদি আত্মার আত্মীয়রূপে চেনা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বা সার্থকতার আর কিছু আছে কি? দূরবীণের যোগে হিমালয়ের সঙ্গে এই মুহূর্তে যে সখ্যবন্ধন স্থাপিত হ'লো, তার অনাদি অনন্ত বিস্তার যেন আজকের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

আমার মাথার উপর ওকগাছের একটি দুটি পাতা ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে। দূরবীণের সামনে ছোট্ট প্রজাপতি মত্ত হয়ে উড়ে গেল। দূরে দূরে পাইন আর দেবদারুর চূড়া মাথা নেড়ে আমন্ত্রণ জানালো। আমি আর তো দূরের অতিথি নই, ওদেরই অন্তরের একজন! আমি যে হিমালয়ের বরাভয় পেয়েছি!

* *

অধ্যক্ষ মহারাজ বললেন, ধরমগড় ঘুরে আসুন। সেখান থেকে আরো ভালো দর্শন হবে। দু'জন তরুণ ব্রহ্মচারী বন্ধুর সঙ্গে ধরমগড় চললুম পাহাড়ী পথের মধ্য দিয়ে। গমের ক্ষেত পার হয়ে পথ চলে গেছে অরণ্যের অন্তরালে। তারপর বেশ কিছুটা সমতল ফাঁকা। স্বামীজী নাকি এইখানে একটি সাধন-ভজনের কুঠিয়া বানাতে চেয়েছিলেন—উপযুক্ত স্থানই বটে! একটু এগিয়ে এক সীমান্তে বেঞ্চ পাতা আছে। এখানে উৎসুক দর্শকেরা আসেন যেদিন হিমালয়ের মেঘাবরণ সরে যায়। আজও তেমনি দিন। কিন্তু এইটুকু পথ আসতে আসতেই মেঘেরা আবার আচ্ছন্ন করেছে উত্তরের আকাশ। আভাসে দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের রূপরেখা। দূরবীণে ধরা পড়ছে নন্দাদেবীর দ্বৈতশিখর। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রথম দর্শনের নাট্যাঙ্কে যবনিকা নামতে শুরু করেছে।

ধরমগড়ের উপর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে—বহুদূর পরিব্যাপ্ত যাতায়াতের পথ। অনেক দূরে মাঝে মাঝে লোকালয়ের আভাস। গল্প শুনলাম সেইসব অজানা পথিকদের, যাঁরা হিমালয়ের আকর্ষণে পথ হারিয়ে সারারাত উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে ঘুরে ফিরেছেন, অথবা গাছের উপরে সশঙ্ক চিত্তে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন! চারদিকে তরঙ্গিত পর্বতমালার মাঝখানে এই কুমায়ুন, আর এইখানে জীবনের প্রথম হিমালয়-দর্শন!

* *

আশ্রমে যখন ফিরে এলাম, তখন সম্পূর্ণ মেঘে ঢেকে গেছে দিগন্তের হিমালয়। কিন্তু আমি তো আজ জেনেছি, ওই মেঘ সরে যায়। হিমালয় চিরন্তন।

নিবেদিতার চোখে ভারতবর্ষ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের আগুনের পরশ-মণির ছোঁয়ায় বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হোলেন। মার্গারেট নোবল্ বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে রূপান্তরিত হোলেন নিবেদিতায়। সাধু ফ্রান্সিসের যেমন সেন্ট্ ক্লারা, বিবেকানন্দের তেমনি ভগিনী নিবেদিতা। অদ্ভুত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন এই ইংরেজ-দুহিতা মার্গারেট্ নোব্ল্। তাঁর সমস্ত লেখায় ও বক্তৃতায় বুদ্ধির কী উজ্জ্বল ছাপ! হৃদয়ের কোমলতায় নারীর স্বাতন্ত্র্য সহজেই প্রকাশ পায়। নিবেদিতার চরিত্রে এই কোমলতার কোন অভাব ছিলো না। কিন্তু নিবেদিতার জীবনে ও বাণীতে যেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় সেটা হোলো তাঁর লেখায় ও বলায় যুক্তির অদ্ভুত বাঁধুনি। শাণিত তরবারির মতো ঝক্‌ঝক্ করছে তাঁর প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্য। পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয় এথেন্সের সক্রেটিসের কথা। চিন্তার মধ্যে ধোঁয়াটে কিছু নেই। নিবেদিতা যা-কিছু লিখেছেন, যা-কিছু বলেছেন তার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ মনের পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই!

ইংরেজের (আইরিশ) ঘরে জন্মালেন, ইংরেজ মেয়ে যে শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে, নিবেদিতাও সেই শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ হ'য়ে উঠলেন। জীবনের আঠারোটি বৎসর এই ভাবে কেটে গেল। আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লেন। এখন থেকে নিবেদিতার ধর্ম-জীবনে শুরু হোলো একটি নূতন অধ্যায়। সংশয়ের ঝড় এসে তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসে হানলো প্রচণ্ড আঘাত। খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণের মতবাদ কি সত্যে প্রতিষ্ঠিত? বিচারের কষ্টিপাথরে বিচার ক'রে নিবেদিতা দেখতে পাচ্ছেন, বাইবেলে লিখিত অনেক কথাই যুক্তিসহ নয়। How and why I adopted the Hindu Religion ভাষণটীতে খ্রীষ্টীয় মতবাদগুলি সম্পর্কে তাঁর চিত্তে সন্দেহের যে-তরঙ্গ উঠেছিল তার কথা নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

> "Many of them began to seem to me false and incompatible with truth. These doubts grew stronger and stronger and at the same time my Christianity tottered more and more."

> "আমার মনে হোলো তাদের অনেক-গুলিই মিথ্যে এবং সত্যের সঙ্গে তাদের কোনো সঙ্গতি নেই। এই সংশয়গুলি ক্রমে জোরালো হতে আরও জোরালো হতে লাগলো এবং একই সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মে আমার বিশ্বাস উত্তরোত্তর নড়্‌বড়ে হ'য়ে উঠলো।"

নিবেদিতার মনে একটুও শান্তি নেই। কিন্তু সত্যকে জানবার জন্য তাঁর মনে কি অদম্য পিপাসা। গীর্জায় যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। কিন্তু সংশয়াকুল চিত্ত দিগন্তে একটা আশ্রয় চায়! মনের শান্তি খুঁজতে নিবেদিতা তাই মাঝে মাঝে ছুটে যান গীর্জায়, ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করেন। "But alas! no rest was there for my troubled soul all eager to know the truth." কিন্তু হায়!

নিবেদিতার অশান্ত আত্মা সত্যকে জানবার জন্য মরিয়া। সত্যকে জানার মধ্যেই তো আত্মার মুক্তি আর মুক্তির মধ্যেই তো আমাদের সব দুঃখের অবসান। সেই মুক্তি কতদূর? কতদূর?

সত্যের সন্ধানে ব্রতী হয়ে নিবেদিতা বিজ্ঞানের বই পড়তে শুরু করলেন। বিজ্ঞান প'ড়ে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে তা নিবেদিতার কাছে আরও প্রকট হ'য়ে উঠলো। সত্যানুসন্ধিৎসার দুর্বার প্রেরণায় নিবেদিতা বুদ্ধের জীবন-কাহিনী পড়তে শুরু করলেন। পড়ে মনে হোলো, খ্রীষ্টজন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে বুদ্ধের জন্ম, কিন্তু ত্যাগের দিক থেকে বুদ্ধের ত্যাগ কি খ্রীষ্টের ত্যাগের চেয়ে অণুমাত্র কম? গৌতম বুদ্ধের অদ্ভুত জীবন-কাহিনীর ও বাণীর মধ্যে নিবেদিতা ডুবে রইলেন তিন বৎসর কাল। বুদ্ধ তাঁর দিনের চিন্তায় এবং রাত্রির ধ্যানে! এই সময়ের কথা লিখতে গিয়ে নিবেদিতার লেখনী থেকে বেরিয়েছে: "এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হ'য়ে উঠলো, বুদ্ধ যে-মুক্তির কথা বলেছেন তা খ্রীষ্টধর্মের মুক্তির তুলনায় নিঃসংশয়ে গভীরতর সত্যে প্রতিষ্ঠিত।"

সাত বৎসর ধরে নিবেদিতার. এই আধ্যাত্মিক অভিযান চললো সত্যের সন্ধানে। সত্যের উপলব্ধিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেননি এখনও। দ্বন্দ্বের এখনও শেষ হয়নি। কবে নিবেদিতা সমস্ত সংশয়ের পারে গিয়ে অবিচলিত কণ্ঠে বলতে পারবেন:

"পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু।"

সত্যকে জানবার জন্য নিবেদিতার মনে যখন এই ব্যাকুলতা—দেখা দিলেন এক গৈরিক-পরিহিত সন্ন্যাসী সেই ইংরেজ-দুহিতার অদ্ভুত জীবনের দিক্‌চক্রবালে। ভারতের বড়লাট লর্ড রিপনের এক আত্মীয় নিবেদিতাকে নিমন্ত্রণ করলেন চায়ের আসরে। সেখানে নিবেদিতাকে তিনি পরিচিত করে দেবেন ভারতবর্ষীয় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। এই সন্ন্যাসী তাঁর সংশয়ের অন্ধকারের উপরে হয়তো সত্যের আলোকপাত করতে পারেন। অবশেষে এলো সেই ঐতিহাসিক মহালগ্ন যখন লণ্ডনের এক চায়ের আসরে নিবেদিতা প্রথম আসলেন স্বামীজীর সান্নিধ্যে। স্বামীজীর উপদেশাবলীর অরুণ-কিরণপাতে নিবেদিতার মনে যে-সকল সংশয়ের কুয়াসা ছিলো তা অপসারিত হোলো। কিন্তু নিবেদিতার সংশয়জাল ছিন্ন হতে সময় লেগেছিলো। নিবেদিতার মন সক্রেটিসের ধাঁচে গড়া। অকাট্য যুক্তির হাত ধরে চলতে সেই মন অভ্যস্ত। নিবেদিতার নিজের উক্তিতে আছে: "স্বামীজীর সান্নিধ্যে একবার বা দু'বার এসে আমার সংশয়গুলি দূর হয়নি। না, না, তাঁর সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হ'য়েছে। সেই আলোচনাগুলির মধ্যে উত্তাপ যে না থাকতো, এমন নয়। তাঁর উপদেশগুলি নিয়ে আমি মনের মধ্যে বিস্তর নাড়াচাড়া করেছি। ভাবতে ভাবতে বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু কোথায় যেন সন্দেহের একটা ভগ্নাবশেষ থেকে যায়। তখন স্বামীজী আমাকে বললেন ভারতবর্ষে গিয়ে যোগীদের দর্শন করতে, হিন্দু-ধর্মের যেখানে জন্ম সেখানে গিয়ে হিন্দুশাস্ত্র পড়তে। অবশেষে আমি এমন এক বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যার উপরে ভর দিয়ে মুক্তির আনন্দলোকে আত্মা উত্তীর্ণ হতে পারে।" এই প্রসঙ্গে স্বতই মনে জাগে স্বামীজীর কথা; গুরুর কাছে নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণ করতে তাঁর ছয় বছর লেগেছিল।

মার্গারেট নোবল্ কেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কেনই বা তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দু হয়েছিলেন, তার কাহিনী পড়তে পড়তে আমার মনে বার বার উদয় হয়েছে টলস্টয়ের কথা। টলস্টয়ের My Confession পড়লে জানা যায় তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের অভিযানও নিবেদিতার অভিযানের মতোই ছিলো সংশয়ের তুষার-ঝঞ্ঝায় বিঘ্নিত। আধ্যাত্মিক জগতে মানুষের জন্মান্তর সংশয়ের দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে কি সম্ভব?

'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা আরও পরিষ্কার করে লিখেছেন, কেন তিনি হিন্দুধর্মকে মনে করতেন "the highest and best of all religions." নিবেদিতার সত্যানুসন্ধিৎসু চিত্ত হিন্দুধর্মের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলো সত্যে অবিচলিত নিষ্ঠা। হিন্দুধর্মই জোরের সঙ্গে পৃথিবীতে ঘোষণা করেছে, ধর্ম হচ্ছে একটা জীবন্ত অভিজ্ঞতার ব্যাপার। ঈশ্বরের বাণী ব'লে শাস্ত্রে যা লিপিবদ্ধ আছে তাকে নির্বিচারে revealed truth হিসাবে গ্রহণ করা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে না। দর্শনশাস্ত্রে যে-দিব্যানুভূতির কথা আছে তা ঋষিদের অভিজ্ঞতা থেকেই উচ্চারিত হয়েছে—এই বিশ্বাসের এবং শ্রদ্ধার মূল্য আছে নিশ্চয়ই। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্—ঋষির এই ঈশ্বরীয় উপলব্ধির কথাকে আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যুক্তির মুখোসপরা গোঁড়ামি ছাড়া আর কি? ঐ উপলব্ধিতে সকলেরই অধিকার আছে। কিন্তু ধর্মকে ঠিক ধর্মের পর্যায়ভুক্ত হ'তে হ'লে ঈশ্বরীয় উপলব্ধির মধ্যে যে-সত্য রয়েছে তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত হওয়া চাই। হিন্দুধর্মের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিমার মধ্যে নিবেদিতার যুক্তিবাদী সত্যান্বেষী মন তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিলো।

বিদেশিনী হলেও নিবেদিতা প্রজ্ঞার শুভ্র আলোয় ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ রূপটি অবলোকন করেছিলেন আর ভারতবর্ষের প্রাণ-পুরুষকে তিনি এমন ক'রেই চিনেছিলেন যে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমস্ত চিত্ত দিয়ে এ দেশকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। ভারত তার গীতা এবং উপনিষদ্, রামায়ণ এবং মহাভারত, বুদ্ধ এবং রামকৃষ্ণ, হিমালয় এবং গঙ্গা, দোল এবং দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ এবং বিবাহ, আচার-অনুষ্ঠানের সমস্ত খুঁটিনাটি, সর্বোপরি তার শান্ত-নম্র সেবাপরায়ণা নারীজাতির চারিত্রিক মহিমা—সমস্ত কিছু নিয়ে নিবেদিতার চোখে অনুপম হয়ে দেখা দিয়েছিলো।

নিবেদিতা তাঁর গুরুদেবের মতোই বিশ্বাস করতেন, ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যা ভারতের একেবারে নিজস্ব। এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে তার ধর্মে, তার নৈতিক আদর্শগুলির মহিমায়। ভারতের দুই মহাকাব্যে এই মহিমময় নৈতিক আদর্শগুলিরই জয়গান। ভারতবর্ষ যদি তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিশ্বাস হারিয়ে পশ্চিমের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনুকরণ করে তবে সেই আত্মঘাতী পরানুকরণ তার শিরে সর্বনাশ ডেকে আনবে,—এই সত্যে নিবেদিতার বিশ্বাস ছিলো অটুট। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি তাঁর বহু লেখায়, বহু ভাষণে ভারতীয় সাহিত্যে যে একটি মহিমময় আদর্শবাদ আছে তার বিপুল মূল্য সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন আমাদের। আমাদের গৃহজীবনের মধ্যে যে একটি সারল্য এবং শান্তি আছে, আমাদের সমস্ত পূজা-পার্বণ-আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বভূতে প্রেমের এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের যে একটি ছন্দোময় অভিব্যক্তি রয়েছে—তা আমাদের দৃষ্টির সামনে নব গৌরবে প্রতিভাত হয়েছে নিবেদিতার লেখনী-

প্রসূত প্রবন্ধগুলির এবং কণ্ঠনিঃসৃত ভাষণগুলির কল্যাণে। তিনি সত্যই লোকমাতা ছিলেন। মা যেমন ছেলের চোখের পিচুটি ধুইয়ে দেন, নিবেদিতাও তেমনি তাঁর মাতৃহস্তে আত্মবিস্মৃত এই দুর্ভাগা জাতির চোখের পিচুটি যেন ধুয়ে দিয়েছেন। আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের আচার-অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা। নিজেদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপে অশ্রদ্ধা, স্বদেশের অতীত ইতিহাসের উপরে কটাক্ষপাত, স্বজাতির আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে বর্বরতার নিদর্শন মনে করা—আমাদের আত্মার পক্ষে এর চেয়ে তামসী রাত্রি আর কি হ'তে পারে?

তাই নিবেদিতা বিবেকানন্দের উপরে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: "এদেশে অর্থ-নৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা—অনেক সমস্যা আছে। এদের গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সব-চেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ যে-সমস্যা তা হচ্ছে 'How India should remain India'।" ভারতবর্ষ কেমন ক'রে ভারতবর্ষ থাকবে—এইটাই হোলো বড়ো সমস্যা। ভারতবর্ষ যাতে আপনার জাতিগত সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে ইতিহাসের নাট্যলীলায় আপন ভূমিকাটি সগৌরবে অভিনয় ক'রে যেতে পারে তার জন্য নিবেদিতা এদেশের মাতৃজাতিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "এই সুন্দরী ভারতভূমির কন্যা তোমরা প্রত্যেকে। তোমাদের সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা গভীর। প্রাচ্যের মহৎ সাহিত্যগুলি তোমরা পাঠ করো, তোমাদের কাছে এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। পাশ্চাত্যের সাহিত্যগুলি এখন নাই বা পড়লে। তোমাদের সাহিত্য তোমাদের উন্নত করবে। এই সাহিত্যকে তোমরা আঁকড়ে থাকো। তোমাদের গৃহজীবনের সরলতা ও সংযমকে আঁকড়ে থাকো তোমরা। অতীতে তোমাদের গার্হস্থ্যজীবনে যে একটি শুচিতা ছিলো তা এখনো রয়েছে তোমাদের গৃহজীবনের একটি সারল্যের মধ্যে। এই শুচিতাকে তোমরা অক্ষুণ্ণ রাখো।"

ভারতীয় জীবন-নাট্যের অনুপম সুষমার কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় নিবেদিতা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী পরিবেষণ করেছেন। কলিকাতার একটি দরিদ্র পল্লীতে নিবেদিতা তখন বাস করেন। পয়সা বাঁচানোর জন্য চলা-ফেরা করেন ট্রামে, নয় ঘোড়ার গাড়ীতে। এই সময়ে রাত্রিকালেও অনেক সময়ে নিবেদিতাকে গলির রাস্তায় যাতায়াত করতে হোতো একাকিনী। সাহেব-পাড়ায় মাতাল ইংরেজ তাঁর মনে উদ্বেগের সঞ্চার করতো। ইংরেজসন্তান রাস্তায় মাতলামি করছে—এ দৃশ্যে নিবেদিতা খুবই ব্যথা পেতেন। খ্রীষ্টানপল্লী থেকে হিন্দুপল্লীতে এসে নিবেদিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। আটমাস নিবেদিতা লেনে কলিকাতার একটি হিন্দুপল্লীতে শিক্ষয়িত্রীর জীবন কাটাবার পরও সেই আট মাসের মধ্যে মাতলামির একটি দৃশ্যও নিবেদিতার চক্ষুকে পীড়িত এবং চিত্তকে উদ্বিগ্ন করেনি। "In eight months of living in the poorest quarter of Hindu Calcutta, such a sight had been impossible." হিন্দুপল্লীর এই স্বাতন্ত্র্য নিবেদিতার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো। নিবেদিতা আরও বলেছেন: "কোন হিন্দু—তিনি সমাজের যে শ্রেণীর অথবা সম্প্রদায়ের অথবা দলের হোন না—আমার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেননি। আমার কোন অসুবিধার কথা তাঁদের কানে এলেই

নারী পুরুষ সবাই সেই অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট হ'তেন। গলির সব বাড়ীরই আমি যেন অতিথি ছিলাম। তাঁদের কাছ থেকে আহার্য রোজই আসতো। তাঁদের বাড়ীর ফলমূলের ভাগ আমি নিত্যই পেতাম। আমার বাড়ীতে অতিথি এলে তাঁরাই করতেন অতিথি-পরিচর্যার ব্যবস্থা। প্রেমের বশে এই যে আহার্য তাঁরা পাঠাতেন এর জন্য আমার মনে গর্ব্ববোধ আছে, কৃতজ্ঞতার অনুভূতিও আছে। এই যে প্রেমের দান—এ যে কী মিষ্টি!"

এই যে আতিথেয়তা—এর মধ্যে নিবেদিতা দেখেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ। নিবেদিতা দেখেছিলেন ভারতবর্ষের জীবন-ধারার অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত হ'য়ে আছে এমন এক সংস্কৃতি যা অতি প্রাচীন। ভারত-বাসীদের নৈতিক চরিত্রের এই বিকাশসাধনে, তাদের মধ্যে রুচিবোধের এই উন্মেষ ও বিস্তারে সকলের চেয়ে সাহায্য করেছে কিসের প্রভাব?" অকুণ্ঠ ভাষায় নিবেদিতা এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, "জাতীয় মহা-কাব্য দুখানির অধ্যয়ন।" নিবেদিতা বলেছেন: "এই দুইখানি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। আমাদের কাছে যেমন সেকস্‌পীয়ার, হিন্দু-দের কাছে তেমনি রামায়ণ-মহাভারত। সেকস্‌পীয়ারের সঙ্গে প্রত্যেক ইংরেজের পরিচয় না-ও থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুই রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী জানে। রামায়ণ-মহাভারত একাধারে সেকস্‌পীয়ারের কাব্যরসে ভরা এবং বাইবেলের ধর্মভাবের পবিত্রতায় পরিপূর্ণ।"

ভারত আমাদের জন্মভূমি হ'লেও এদেশের অন্তরাত্মার সঙ্গে আমাদের কয়জনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে? উপনিষদ্ আমরা কয়জন পাঠ করেছি? আমরা কবির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি বটে "মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।" কিন্তু কেন ভারতবর্ষ মহিমার জন্মভূমি, তা জানবার জন্য প্রজ্ঞার যে আলো দরকার সে আলো কোথায়? নিবেদিতা প্রজ্ঞার মহাসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী ছিলেন। বিদেশিনী হয়েও ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থরাজির এবং ভাষণগুলির মুকুরে, সর্বোপরি তাঁর মহাজীবনের নির্মল দর্পণে আমরা ভারতবর্ষের যে-রূপটাকে প্রতিফলিত দেখেছি, অনির্বচনীয় তার মহিমা। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন জন্মভূমিকে ভালোবাসতে।

বর্তমান গণশিক্ষায় প্রাচীন শৈলী

অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

শিক্ষার ওপরই নির্ভর করে সভ্যতার অগ্রগতি। উন্নতিকামী দেশগুলিতে সর্বাংগীণ সমুন্নতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ-প্রাচুর্যের উৎপাদন এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থাপনা কল্যাণ-রাষ্ট্রের আজকাল সর্বজনস্বীকৃত কর্তব্য। বিশেষতঃ, যে গণতান্ত্রিক ভারতের সরকার মনীষী লিঙ্কনের ভাষায়—"Government of the people, by the people, for the people", সে দেশে গণশিক্ষার সার্থক রূপ একান্ত অপেক্ষিত।

ভারতীয় সভ্যতায় জ্ঞানসাধনার নিত্য প্রয়োজনীয়তা সনাতন কাল থেকেই স্বীকৃত। প্রতিটি গৃহীর দৈনন্দিন অবশ্যকরণীয় পঞ্চ-মহাযজ্ঞের মধ্যে একটি হ'ল ব্রহ্মযজ্ঞ তথা বেদপাঠ তথা নিত্য শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে জ্ঞানের কিছুটা অনুশীলন। জ্ঞানদীপ্ত এবং সমুন্নত-চরিত্র নাগরিকই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। শিক্ষা ব'লতে ভারতবর্ষ কোনো গ্রন্থপাঠের দ্বারা অর্থোপার্জনের বিশেষ কৌশলকে আয়ত্ত করা কখনো বোঝায়নি। বর্তমানে শিক্ষা হচ্ছে "জীবিকা-কেন্দ্রিক", "জীবন-কেন্দ্রিক" নয়। এখন শিক্ষাগ্রহণ ভালো ক'রে পাশ করার জন্য। ভালো ক'রে পাশ করা ভালো চাকরী পাবার জন্য। ভালো চাকরী ক'রে প্রভূত অর্থ উপার্জন ক'রে জীবন-ধারণের মান উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য। ভালো খাওয়া, ভালো পরা এবং ভালো ঘরে থাকাই আমাদের উন্নত জীবনের লক্ষণ। মোটামুটি, উদর এবং চর্মকে পরিতৃপ্ত করাই হ'ল আমাদের আধুনিক শিক্ষা-সাধনার লক্ষ্য। উন্নত মনুষ্যত্ব অর্জন নয়, উন্নত জীবন-মান তথা high standard of lifeই হচ্ছে আমাদের বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য। গীতার কথায় বলা চলে—

"আশাপাশ-শতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥"

এই তো আমরা ক'রে চলেছি। দেশে আজ চতুর্দিকে অসংখ্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্র লক্ষ লক্ষ অর্থের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। প্রতি বৎসর জ্যামিতিক গতিতে পাশ করা লোকের হার বেড়ে চলেছে। অথচ, দেশে মনুষ্যত্বের এমন সার্বিক অভাবে আমরা আবার দুশ্চিন্তিত কেন, ভাববার বিষয়।

তা'হলে দেখছি, প্রচলিত শিক্ষা আমাদের অভাব মেটাতে পারেনি। **প্রথমতঃ**, এই শিক্ষা বৃত্তিমুখীন, মনুষ্যত্বমুখীন নয়। **দ্বিতীয়তঃ**, এই শিক্ষা বৈতনিক এবং আড়ম্বর- ও জটিলতা-পূর্ণ ব'লে দেশের আপামর জনসাধারণ এই শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেন না। বেতন দিয়ে পড়ার সামর্থ্য এই দেশে অধিকাংশ লোকের নেই। তদুপরি, বিদ্যালয়গুলি বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ সময়ে চালু থাকায় উদয়াস্ত কর্মরত সাধারণ জনগণ তার সুযোগ নিতে পারেন না। আজকাল কোথাও জনগণকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন একটি নিজস্ব জমি, তার ওপর একটি বাড়ি, তাতে অনেকগুলি কক্ষ, কিছু

চেয়ার-টেবিল বেঞ্চি প্রভৃতি আসবাব, কয়েকজন শিক্ষক, অন্য কয়েকজন সহায়ক কর্মী, তাঁদের নিয়মিত দক্ষিণার ব্যবস্থা, আবার একটি সংরক্ষিত ধনভাণ্ডার (reserve fund)। এই সবের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই, ছাত্রদের কাছ হ'তে বেতন এবং সরকারী অনুদানের ওপর নির্ভর ক'রে এই সব কেন্দ্রগুলি চলে। অভিভাবক এবং সরকারেরও আর্থিক দুর্গতির জন্য বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ানুকুল আয় হয় না। ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কী দুরবস্থা তা শিক্ষক এবং পরিচালকবর্গ মর্মান্তিকভাবেই জানেন। ছাত্রেরা বেতন দিতে গিয়ে অভাবে পড়ে, তাই তারা ক্ষুব্ধ। শিক্ষকগণ নিয়মিতভাবে বাঞ্ছিত দক্ষিণা যথাযথ পান না। তাই, তাঁরা অসন্তুষ্ট। একে তো অর্থের এবং সময়ের অভাবে জনগণের বৃহত্তম অংশ বিদ্যালয়ের সুযোগ নিতে পারেন না। আর, যে সৌভাগ্যবান ক্ষুদ্রতম অংশটি পারেন, তাঁরাও পূর্ণ প্রাপ্য পেয়ে ওঠেন না। আবার, যেটুকু পান, তাতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় না, হয় বিত্তোপার্জনের নৈপুণ্যশিক্ষামাত্র। এই সমস্যাগুলির সমাধানে প্রাচীন ভারতের শিক্ষণশৈলী কতটা সমর্থ, আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

আমাদের দেশে চিরকালই শিক্ষা ছিল জীবন-মুখী, জীবিকা-মুখী নয়। আমাদের কথা—"**সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে**"—যা মানুষের মনের মুক্তি ঘটাতে পারবে, সকল সংকীর্ণতা এবং মোহ থেকে মুক্ত ক'রে মনুষ্যত্বের মহত্ত্বে ভাস্বর ক'রে তুলবে, সেইটিই তো বিদ্যা। এই মহতী বাণীটি যদিও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের seal-এর ভিতর অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত র'য়েছে, তার যাথার্থ্য শিক্ষাসংস্কারকালে কতটুকু রক্ষিত হয়, ভাববার বিষয়। প্রসঙ্গতঃ, উপনিষদের সেই অনবদ্য সমাবর্তন-ভাষণটি বিশেষ ক'রে স্মরণীয়। নবভারতের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ তাই শিক্ষা সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে ব'লেছিলেন—"Education is the manifestation of the perfection already in man." - মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রসুপ্ত হ'য়ে আছে, তাকে জাগ্রত করাই হ'চ্ছে শিক্ষা। আগে মানুষ হোক, তারপর সে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী যাই হ'তে চায়, তাই হবে। কিন্তু, এখন আমরা প্রায় গোড়া থেকেই বিশেষীকরণ বা স্পেশালাইজেশন্ ঠিক ক'রে নিয়ে যে বৃত্তিতে সে যাবে, তাই তাকে করবার ব্যবস্থা করি। মানুষ করার কথা ভাবি না। তাই, ভালো ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ চিকিৎসক, পণ্ডিত অধ্যাপক প্রভৃতি যথেষ্ট আজকাল সমাজে মেলে। মেলে না শুধু ভালো মানুষ। আমাদের শিক্ষা একসঙ্গেই ছিল formative ও informative। এখন তো শুধু informative। অত্যধিক ভোগাসক্তিতে শিক্ষার ঐ গোড়ার কথাটি ভুলে যাবার জন্যে আজ সারা সমাজে মনুষ্যত্বের এমন অত্যন্তাভাব উৎকটভাবে প্রকটিত হ'য়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়তঃ, সর্বজনীনভাবে গণশিক্ষার যে একটি অপূর্ব ব্যবস্থা ভারতে ছিল, জগতে কোথাও এমনটি দেখা যায়নি। এখন আমরা বাড়ী ক'রতে plan তথা পরিকল্পনা করি, দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য পরিকল্পনা করি, পথঘাটের জন্য পরিকল্পনা করি। আধুনিক যুগে দ্রুত সুফল পাবার জন্য planned wa তে অর্থাৎ পরিকল্পিত ভাবেই অগ্রসর হওয়া রীতি। তাইতো এতো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঘটা। প্রতীচ্য থেকে এই পরিকল্পনার রীতি আমরা শিখেছি,

স্বাধীনোত্তর ভারতে progress তথা প্রাগ্রসরতার জন্য প্রয়োগ ক'রছি। আমাদের ঋষিপিতামহেরা কিন্তু এই পরিকল্পনা শুরু ক'রতেন একেবারে জীবনকে নিয়েই। পরিকল্পিত সমাজের জন্য **চাতুর্বর্ণ্য** এবং পরিকল্পিত জীবনের জন্য তাঁরা গ্রহণ ক'রেছিলেন **চতুরাশ্রম**। বর্তমানে সমাজ এবং ব্যক্তিজীবনের কোন পরিকল্পনা নেই, পরিকল্পনা আছে তার ভোগের উপকরণের। কিন্তু, সনাতন ভারতের প্ল্যানিং আরম্ভ হ'য়েছিল সমাজ এবং ব্যক্তিকে নিয়েই। তার ফলে বহু আঘাতেও এতকাল ধ'রে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা এবং ব্যক্তিজীবন এখনো পুরো ভেঙে পড়েনি। এই যে চতুরাশ্রম, তার প্রথমটি হ'চ্ছে ব্রহ্মচর্য। জীবনের এই প্রথম দিকটায় সবাইকে গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বাস ক'রতে হ'ত। ফলে সুগঠিত দেহ, জ্ঞানোন্নত মন এবং পরিশীলিত চরিত্রের অধিকারী হ'য়ে সবাই সংসারে কর্মজীবনে প্রবেশ ক'রত। আজো শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হ'চ্ছে অবৈতনিক এবং আবাসিক। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি-শাসিত সমাজে সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সবাই এই অবৈতনিক এবং আবাসিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ ক'রতে পারতো। সংস্কৃত টোল-চতুষ্পাঠীতে সেই পদ্ধতিটিই এখনো অনুসৃত হ'য়ে চ'লেছে। অনাড়ম্বর এবং অবৈতনিক হওয়ার জন্যে টোলে পড়বার সুযোগ সবাই গ্রহণ ক'রতে পারে। আর, টোলের প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল অর্থেরও কোন প্রয়োজন নেই। যদিও এই চতুষ্পাঠীলব্ধ শিক্ষার দ্বারা বর্তমানে অর্থোপার্জনের বিশেষ কোন কৌশল আয়ত্ত করা যায় না, তবুও দুর্লভ মনুষ্যত্ব সহজেই লাভ করা যায়। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই নিয়ে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঘটনা বিবৃতি করা হ'চ্ছে।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের অনিবার্য পরিণতিতে রংপুরের একজন টোলের পণ্ডিত সনকেশ্বর স্মৃতিতীর্থ কোচবিহারের নাদিরহাটে গিয়ে বাড়ী করেন। প্রতিবেশী সব স্থানীয় কোচ্ উপজাতির লোক। তাঁরা কৃষিজীবী। স্কুল-কলেজের পাট ওখানে নেই। শিক্ষার আলো থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। নৈতিক মানও খুব উন্নত নয়। নতুন ক'রে স্কুলে গিয়ে পড়বার মতো অর্থ, সময় এবং ইচ্ছা কোনটাই তাঁদের নেই। টোলের পণ্ডিত মশাই এই পরিবেশে মনকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। অথচ অন্যত্র গিয়ে বাড়ী করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও তাঁর নেই। তাই ভাবলেন, এই অঞ্চলোকগুলোকেই শিক্ষিত ক'রে তোলা যায় কিনা চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্। তিনি স্থানীয় কোচ্ অধিবাসিগণকে বোঝালেন যে, তাঁরা আসলে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়েরা সদাচারসম্পন্ন ও সুশিক্ষিতই ছিলেন পূর্বে। বর্তমানে নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে অশিক্ষার অন্ধকারে থেকে সদাচার বর্জন ক'রে শোচনীয় জীবন যাপন ক'রছেন। তাঁদের আত্মচেতনা জাগ্রত ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন তিনি। সাড়াও পেলেন কিছুটা। জাগলো তাঁদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞানের জিজ্ঞাসা। কিন্তু পড়ার স্কুল নেই; স্কুল ক'রে দিলেও বেতন দেবার সামর্থ্য নেই এবং সময়ও নেই। মাঠে চাষ ক'রবেন, না ১১টা হ'তে ৪টা পর্যন্ত স্কুলে কাটাবেন। এই রীতিতে অনভ্যাসে ইচ্ছাও তাই নেই।

এই অবস্থায় পণ্ডিত মশাই টোলের শৈলী নিয়ে নিরীক্ষায় নামলেন। টোলে মাইনে দিতে হয় না। সময়েরও বাঁধাবাঁধি নেই।

মাঠের মাঝখানে নগ্নগাত্র নগ্নপদ পণ্ডিত মশায় হাতে সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে ব'সে থাকতেন। চার পাশের মাঠে চাষে-রত চাষীরা একবার ক'রে তাঁর কাছে এসে একটি ক'রে সূত্র শুনে নিয়ে আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে হাল-গোরু নিয়ে একবার মাঠ ঘুরে আসছেন। আবার, আর একটি সূত্র আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে আবার একবার মাঠ ঘুরে আসছেন। এমনি ক'রে চ'ললো তাঁদের অধ্যয়ন। এইভাবে অনাড়ম্বর ভাবে পণ্ডিত মশায়ের অনলস পরিশ্রমে এবং নীরব সাধনায় সেখানে **ক্ষাত্রচতুষ্পাঠীর** নামে বহু কৃষিজীবী কোচ্ টোলের বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ ক'রেছেন; কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, স্মৃতির রাজ্যে তাঁরা প্রবেশ ক'রেছেন। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে মনে তাঁদের জেগেছে ধর্মজিজ্ঞাসা। একশটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে একশ হরিসভা। সপ্তাহান্তে তাঁরা সেখানে মিলিত হ'য়ে নিজেদের ধর্ম, আচার, ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করেন। হরিসভাগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন "ধর্মপ্রচারিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে তপ্সীতলায়। চার দিন ধ'রে অনুষ্ঠিত হয় তার বার্ষিক বিরাট উৎসব। বহু সহস্র নরনারী দুদিনের পথ পর্যন্ত হেঁটে এসে সেখানে যোগদান করেন। চালের মুষ্টিভিক্ষায় নির্বাহিত হয় সব ব্যয়। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক, বরেণ্য মনীষী ডঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তের আনুকূল্যে বর্তমান লেখকের সৌভাগ্য হ'য়েছিল গত ফাল্গুন মাসে সেখানে আহূত হ'য়ে সংস্কৃতে ও বাংলায় ভাষণ দেবার। ভারতের জাতীয় সংহতি, সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা, ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য, হিন্দুধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল ভাষণের বিষয়। বিকেল চারটা হ'তে রাত দশটা পর্যন্ত সভাস্থলে প্রশান্তভাবে উপস্থিত কয়েক সহস্র শ্রদ্ধালু নরনারীকে উপস্থিত থাকতে দেখতাম। কেবল বৃদ্ধ নয়, তরুণ, প্রৌঢ় এবং নারীরাও আছেন যথেষ্ট সংখ্যায়। ছয় ঘণ্টা ধ'রে চ'লেছে এমন সভায় একটু গুঞ্জন কখনো শুনিনি। নারীরা সেখানে পর্দানশীন নন। তাঁরা সেখানে স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করেন। তিন দিন সেখানে বাস ক'রেছি। কিন্তু কোনো নারীকণ্ঠস্বর শুনেছি ব'লে মনে হয় না। তরুণদেরো কোনো উচ্চ কণ্ঠ এবং অপশব্দ শুনিনি, দেখিনি কোনো অশালীন ব্যবহার। এমন পরিশীলিত জীবনের চিত্র জীবনে বড় আর দেখিনি। শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতার তো কথাই নেই। চুরি, ডাকাতি, মারামারি সেখানে নেই। কোচ্ চাষীরা তাঁদের এক এক জনের বাড়ী নিয়ে যেতেন এবং আপনা-থেকেই বলতেন যে সংস্কৃত-নির্ভর, পরিশীলিত, ধর্মনিষ্ঠ জীবন-যাপনের ফলে তাঁদের জাগতিক অভ্যুদয়ও বেশ হ'য়েছে। যাঁদের ছিল আগে খড়ের চাল, এখন ক্রমশঃ তাঁদের টিনের চাল হ'য়েছে। ছাব্বিশ বছর বয়স্ক অন্ধ যুবক সম্পূর্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মুখস্থ ব'লছে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" দেখলাম মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। সংস্কৃতজ্ঞান মূলে থাকায় বাংলা ভাষায় এই কৃষিজীবী কোচ্দের যে অধিকার দেখেছি, আমাদের বাংলায় এম্-এ পাশ করা অনেকেরই তা নেই। আর, সদাচার ও নীতিজ্ঞানের দুর্লভ অস্তিত্ব তাঁদের ক'রেছে মহনীয়। Dictum of the 7th Earl of Shaftluryর কথায়—

> "Education without instruction in religion and morals would merely create a race of clever devils."—
> **ধর্ম- এবং নীতিবর্জিত শিক্ষা কেবল কতগুলি চতুর দুর্বৃত্তকেই সৃষ্টি করে।**

স্বাধীনতার পর দেশের মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য কত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-সমাজশিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই দরিদ্র-দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা তাতে ব্যয় করা হচ্ছে। ধর্ম এবং নীতিকে সযত্নে পরিহার ক'রে আর সর্ববিধ বিষয়ে সাড়ম্বরে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হ'চ্ছে। অথচ, সেখানে যাঁরা শিক্ষিত হ'য়ে এসেছেন এবং যাঁরা হ'চ্ছেন, তাঁদের একটা বিরাট অংশের কর্মের দ্বারা সমাজের শান্তি আজ ব্যাহত। সরস্বতীর কমল বন আজ কিছু কিছু রাজনৈতিক মত্ত হস্তীর শুণ্ডোৎক্ষেপে বিপর্যস্ত। ছুতোনাতায় বিক্ষোভ এবং ধর্মঘট করাই অনেক ছাত্রগোষ্ঠীর আজ মর্যাদালাভের একমাত্র উপায়ে পর্যবসিত হ'য়েছে। প্রতিটি বিক্ষোভের (যার অনেকগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যাকেন্দ্রের দূরতম সম্পর্কও নেই) সময় দেশের এই শিক্ষিতগোষ্ঠী যেভাবে দরজা-জানালা এবং আসবাবপত্র ভাঙেন, ল্যাবরেটারীর ক্ষতিসাধন করেন এবং সেখানকার প্রধানের ওপর মানসিক এবং কোথাও কোথাও দীর্ঘ সময় ধ'রে ঘেরাও ক'রে রেখে দৈহিক উৎপীড়ন এবং বাচিক নির্যাতন করেন, তা বাইরের অন্য কেউ যদি করতো সে দুর্বৃত্ত ব'লে পরিগণিত হ'ত এবং আইন অনুসারে দণ্ডিত হ'ত। অশালীন বিক্ষোভের অশোভন প্রকাশে অনেক বিদ্যাকেন্দ্র আজ শান্তিকামী সজ্জনের দুষ্প্রবেশ্য হ'য়ে প'ড়েছে। এই ছিন্নমস্তার ভূমিকার অভিনয়ে কোন্ ইষ্ট তাঁরা লাভ ক'রবেন, সেটা তাঁরা তখন ভেবে দেখেন না। দলবৃদ্ধির উন্মাদনায় উল্লসিত কোন কোন ব্যক্তি এই মতিচ্ছন্নতাকে নেতৃত্ব দিয়ে এবং কেউ কেউ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় নিষ্ক্রিয়ভাবে অভিনয় ক'রে তরুণ সম্প্রদায়ের এবং দেশের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন ক'রে চলেছেন। তারুণ্যের এই অপচয়ে দেশের মহতী বিনষ্টি। এই দরিদ্র দেশের বহু অর্থ ব্যয় হয় এই সুশিক্ষিত দেশদরদীদের কৃতকর্মের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যা-কেন্দ্রগুলির ভগ্নকক্ষ, আসবাবপত্র এবং যন্ত্র-রাজির পুনর্নির্মাণে, যার ভগ্নাংশ দিয়ে বহু দরিদ্র ছাত্রের নিঃশুল্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হালের এক একটি ছাত্র-আন্দোলনের ফলে ছাত্রদের নিজেদের এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি কত হয়, তার পরিসংখ্যান প্রকাশিত হ'লে শিউরে উঠতে হবে। যাহোক্, এইভাবে ধর্ম- এবং নীতিবর্জিত শিক্ষার সুফল (?) আমরা নিত্যই ভোগ ক'রছি। স্বাধীনতার পর বাইশ বছর ধ'রে বহু অর্থের বিনিময়ে এই বৈতনিক, জাঁকজমকপূর্ণ, সযত্নে ধর্ম- এবং নীতিবর্জিত অথচ অন্য সর্ববিধ বিষয়যুক্ত শিক্ষার ফলে যাঁরা পূর্বে সৎ ছিলেন, তাঁরাও আজ পরিবর্তিত হ'তে চ'লেছেন।

আর বিপরীত চিত্র দেখে এলাম কোচ-বিহারের পল্লীতে। বাইশ বছর পূর্বে যারা ছিল অসৎ, ধর্ম- ও নীতিনির্ভর, শুধুমাত্র অনাড়ম্বর টোলের সংস্কৃত শিক্ষার দ্বারা তারা আজ মনুষ্যত্বের দুর্লভ মহিমায় ভাস্বর। "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন"—এ তো আমার চোখে দেখা বর্তমানের ঘটনা। গীতোক্ত শ্রদ্ধা, তৎ-পরতা ও ইন্দ্রিয়সংযমের সহায়ে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা তাঁরা অর্জন করেছেন সত্যিকারের জ্ঞান। টোলের সংস্কৃতশিক্ষা-শৈলী সত্যিকারের গণশিক্ষার ক্ষেত্রে আজও কত ফলপ্রসূ, এ তো তারি নিদর্শন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ক্রান্তদর্শী শিক্ষানেতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি অনুধাবনীয়।—

"ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার

আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব। তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার মনে দৃঢ় ছিল।...সংস্কৃত ভাষায় একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্ব-প্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।"

(আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)

"শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" প্রবন্ধে টোলের অনাড়ম্বর শিক্ষাশৈলীর প্রশংসায় তিনি বলছেন—

"আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো, বাহ্য-রূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না-হলেও চলে। অন্ততঃ এতকাল সেই রকমই আমাদের মনের ভাব ছিল।...অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মস্ত ক'রে চোখে পড়ে না। এদেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই।...সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ সর্ব-প্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা ক'রে এসেছে, কেননা সত্যই তার পরিচয়।"

যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার ক্ষেত্রে বারবার সংস্কৃত এবং তদাশ্রিত আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনের কথা ঘোষণা ক'রে গেছেন।—

"সংস্কৃত শিক্ষায় সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ-মাত্রেই জাতির মধ্যে একটি গৌরব, একটি শক্তির ভাব জাগিবে।...আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি।"

(শিক্ষাপ্রসঙ্গ)

তাই, এই প্রগতিবাদী সন্ন্যাসী শিক্ষানেতাদের জানিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান—

"Before flooding India with socialistic and political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our scriptures, in our Puranas, must be brought out."

সংস্কৃতকে অবজ্ঞা ক'রে ধর্ম- ও নীতিহীন শিক্ষা প্রবর্তিত ক'রে আমরা প্রগতির পথে কতটুকু অগ্রসর হ'য়েছি তা আজীবন শিক্ষাব্রতী, বাংলার নব জাগৃতির অন্যতম নায়ক, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের অন্যতম মুখ্য পুরুষ, ব্রাহ্ম মনীষী রাজনারায়ণ বসুর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যপ্রকাশক কথাগুলি আজ কি আরো বেশী ক'রে মনে পড়ে না।—

"যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য হারাই-তেছি, **যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হ্রাস পাইতেছে,** যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ, যখন দেশের শিক্ষাপ্রণালী এত অপকৃষ্ট যে, তদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইতেছে; **যখন বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না, যখন চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখ-প্রিয়তা প্রবল,** যখন আমাদের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়, বিশেষতঃ **যখন ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন, তখন গড়ে আমাদের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।"**

(আত্মপরিচয়—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ-১৩২)

কেবল বিত্তার্জনের যে শিক্ষা আমরা প্রবর্তিত ক'রেছি, তাতে "বিত্তের" ভাণ্ডার পূর্ণ হ'লেও রিক্ত থেকে যাচ্ছে "চিত্তের" ভাণ্ডার। উপ-নিষদের বাণী "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ,"—আজ ঠেকে হ'লেও আমাদের শেখা প্রয়োজন। মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আজ আমাদের আবার বলার দিন এসেছে—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রায় ৩০ বৎসর আগে একটি সভায় যোগ দেবার জন্য আহূত হয়ে আমি সস্ত্রীক এলাহাবাদ গিয়েছিলাম। ওখানকার ভাইস চ্যান্সেলার (Vice-Chancellor) শ্রীঅমিয়চন্দ্র ব্যানার্জীর বাড়ীতে ছিলাম। তাঁর বৃদ্ধ পিতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী—অবসরপ্রাপ্ত সেসন্স-জজ—ঐ বাড়ীতেই থাকতেন। আমি সারা দুপুরই প্রায় বাইরে থাকতাম।

একদিন বিকালে বাড়ী ফিরে দেখি, আমার স্ত্রী খুব বিষণ্ণভাবে বসে আছেন। তাঁর মুখে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে আমিও খুব আশ্চর্য বোধ করলাম। ব্যাপারটা যা ঘটেছিল সংক্ষেপে বলছি।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী প্রভৃতি কয়েকখানি বই ছিল। দুপুরে ঐ বইগুলি বারান্দায় একটি টেবিলের উপর রেখে তিনি একখানা বই পড়ছিলেন। হঠাৎ বৃদ্ধ জ্ঞানবাবু এসে দুই-একখানা বই উল্টে দেখে বললেন, 'আপনি এই সব বই পড়েন? এর মধ্যে তো অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে।' আমার স্ত্রী বেলুড়ে দীক্ষা নিয়েছিলেন; সুতরাং তিনি খুব দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আপনি ঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে এই রকম কথা বললেন!' জ্ঞানবাবু বললেন, 'স্বামীজী তো বিলেতে ম্যাক্সমূলারের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের সম্বন্ধ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন যা ঠিক নয়। তাছাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঠাকুর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার অধিকাংশই কাল্পনিক। আমি বই লিখে এসব প্রমাণ করেছি,' ইত্যাদি।

ব্যাপারটি শুনে আমি জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে বললাম, 'দেখুন, আপনার কথায় আমার স্ত্রীর মনে খুব আঘাত লেগেছে, কারণ তিনি ঠাকুর ও স্বামীজীর ভক্ত। আপনি আর এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা করবেন না—এটি আমার বিশেষ অনুরোধ।' জ্ঞানেন্দ্র বাবু বললেন, 'আপনি ঐতিহাসিক, সুতরাং যা সত্য তা যতই বেদনাদায়ক হোক তা অবশ্য স্বীকার করবেন।' আমি বললাম যে, আমি ইতিহাসের চর্চা করি, কিন্তু আমার স্ত্রী ঐতিহাসিক নন, তিনি ভক্ত, সুতরাং তাঁকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে থাকতে দিন—এ সকল অপ্রিয় আলোচনা হলে তাঁর পক্ষে এ বাড়ীতে থাকার অসুবিধা হবে।

পরদিন সকালে জ্ঞানেন্দ্র বাবু কয়েকখানা বই এনে আমার হাতে দিলেন। এর মধ্যে একখানা বই তাঁরই লেখা—Keshab Chandra and Ramkrishna। আমাকে ঐ বইটি বিশেষ করে পড়তে বললেন। চারি শত পৃষ্ঠার এই বইখানির প্রতিপাদ্য বিষয়: (১) কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা কোনরকমে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন—এই প্রচলিত ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, (২) স্বামী বিবেকানন্দ ইচ্ছে করেই ম্যাক্সমূলারকে এমন সংবাদ দিয়েছিলেন যাতে ঠাকুরের ও তাঁর সম্প্রদায়ের মহিমা বৃদ্ধি পায়, (৩) শ্রীরামকৃষ্ণকে কেউ চিনত না—কেশবচন্দ্রই তাঁকে প্রথমে জনসমাজে পরিচিত করেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। অত বড় বই আমার পক্ষে পড়া তখন সম্ভব ছিল না—বিশেষত: উল্টে পাল্টে যেটুকু দেখলাম তাতে তাঁর মন্তব্যগুলি

ও তাঁর ভাষা দেখে আমার খুবই খারাপ লাগল এবং পড়বার বিশেষ ইচ্ছাও রইল না।

সন্ধ্যাবেলায় জ্ঞানবাবু তাঁর বই সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম যে, অত বড় বই আমার পক্ষে পড়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, ও বইখানি আপনি নিয়ে যান—ভাল করে পড়ে আপনার মতামত লিখবেন।'

আমি বললাম, 'তাই করব। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। আমার বাবা যৌবনে কেশবচন্দ্র সেনের ভক্ত ছিলেন। আমার বাল্যকালে তাঁর কাছে শুনেছি যে, যখন কেশব সেন শেষ বয়সে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে কালীপূজা করতে আরম্ভ করলেন, তখন তিনি এবং আরও অনেকে বিরক্ত হয়ে তাঁর দল ছেড়ে দিলেন।'

এইটুকু বলে আমি বললাম যে, যদিও তখন আমার বয়স খুবই কম তবু বাবার সে কথাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। অবশ্য বাবার ধারণা ঠিক ছিল কিনা এবং কেশবচন্দ্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু ছেলেবেলায় শোনা আমার বাবার কথা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, কেশবচন্দ্র সেন জীবিত থাকতেই অনেকের একটা ধারণা জন্মেছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে কেশবচন্দ্রের ধর্মমতের বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল। এবং মনে রাখতে হবে, বাবা যে সময়কার কথা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তার অনেক বছর পরে ম্যাক্সমূলারের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিবরণ দিয়েছিলেন।

জ্ঞানবাবু আমার কথায় খুব খুশী হলেন না, তবে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি আমার বইখানি ভাল করে পড়ে দেখবেন। আশা করি আপনার মত বদলাবে।' আমি তাঁর বইখানি গ্রহণ করলাম এবং কথা দিলাম যে অবসরমত ভাল করে পড়ে দেখব।

তারপর অনেক বছর চলে গেছে। কারো কারো খুব ইচ্ছা ছিল আমি এ বিষয়ে কিছু লিখি। কিন্তু এ সম্বন্ধে নানা বই পড়ে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বই বা তাঁর মতামত সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছিল তা লিখলে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পক্ষে প্রীতিকর হ'ত না—বিশেষতঃ তাঁর পুত্র আমার বন্ধু অমিয়বাবুও হয়তো মনে কষ্ট পাবেন, এই ভেবে কিছু লিখিনি। যাঁদের নিয়ে সেদিন এই ঘটনার আবর্ত, তাঁরা সবাই আজ পরলোকে, তাই কর্তব্যবোধে সংক্ষেপে কিছু লিখছি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁর বইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু ব্রাহ্ম ও কেশবচন্দ্রের ভক্তের লেখা থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁরা প্রায় সকলেই ঠাকুরের প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম ও ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র ঠাকুরকে যে কী গভীরভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁদের লেখার মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁর মতের সমর্থক হিসাবে তাঁর বইতে তাঁদের যে-সমুদয় উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তার থেকে কিছু কিছু অনুবাদ করছি :

রেভারেণ্ড ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন : "ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা ও মা বলে সম্বোধন করা—এই অভিনব ভক্তির ভাব আমাদের আচার্য বিশেষ করে পরমহংসদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।...কেশবচন্দ্র অনুগত শিষ্য ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে বসে তাঁর কথাগুলি নম্রভাবে, বিনয় ও

শ্রদ্ধার সহিত শুনতেন এবং কখনও তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করতেন না (২১৩—২১৬ পৃষ্ঠা)।"

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল লিখেছেন :

"কেশবচন্দ্রের শেষ বয়সে ভগবানের মাতৃ-রূপে আরাধনা এবং খুব সহজ ও অল্প চলতি ভাষায় ভগবানের স্বরূপ-বর্ণনা—কেবল এইটুকুই শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষের সংসর্গের ফল বলা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তো অনেকেই শুনেছেন—তার মধ্যে কয়জন কেশব-চন্দ্রের ন্যায় তা উপলব্ধি করেছেন? অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ শুনে অল্প-বিস্তর উন্নতি করেছেন, কিন্তু কেশবের মত এত উন্নতি আর কারুরই হয়নি (২২৩ পৃষ্ঠা)।"

বিখ্যাত সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্টীম বোটে কেশবচন্দ্র ও ঠাকুরের একসঙ্গে যাত্রার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও ঠাকুরের প্রতি কেশবচন্দ্রের অদ্ভুত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ কোন ধর্ম-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁর মত একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মূল্য খুবই বেশী। এটি Modern Review-তে ছাপা হয়েছিল,[১] সুতরাং এর কোন অংশ উদ্ধৃত করলাম না। (জ্ঞানেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ, ২৭১-২৭৬ পৃঃ)।

কেশবচন্দ্র সেনের একজন প্রধান শিষ্য ও সহযোগী ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ইনিও স্বামী বিবেকানন্দের মতো শিকাগো ধর্মসভায় যোগদান করেছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ খুব প্রীতির ছিল না। প্রতাপচন্দ্র কেশব-চন্দ্র-প্রবর্তিত নববিধান ধর্মসম্প্রদায়ের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন এবং এর প্রতিনিধি হয়েই শিকাগো ধর্মসভায় যোগদান করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের অনেকের মতে শিকাগো ধর্ম-সভায় যোগদানকারী ভারতীয়দের মধ্যে প্রতাপচন্দ্রই সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুও তাঁর বইতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নাম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর আলোচ্য গ্রন্থখানি ১৯৩১ সালে ছাপা হয়। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen' তার বহু পূর্বে ১৮৮৭ সনে অর্থাৎ কেশবচন্দ্র ও ঠাকুরের দেহাবসানের অল্পকাল পরেই প্রকাশিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এই বইয়ের উল্লেখ ও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, কিন্তু কেশব ও ঠাকুরের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রতাপচন্দ্রের মতামত উল্লেখ করেননি। অথচ এই গ্রন্থে প্রকাশিত এঁর মতামত যে খুবই মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, মাতৃরূপে ভগবানের সাধনা এবং সর্বধর্মের সমন্বয়—নববিধানের যে দুইটি বৈশিষ্ট্য কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনে প্রকটিত হয়েছিল, সে দুইটিই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত সংস্পর্শের ফলে কেশবচন্দ্রের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিষয়টির গুরুত্ব বিধায় আমি মূল গ্রন্থের ইংরেজী থেকে কয়েকটি লাইন পাদটীকায় উদ্ধৃত করছি।[২] আমার ছেলে-

---

(১) Modern Review, 1927, Vol. I, pp. 537-9; 1928, Vol I, pp. 527, 651

(২) P. C. Mazoomdar, *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen.*

Third Edition 1931 (Originally published in 1887). Attention may be drawn to the following passages in this work.

Pp. 228-9.

"Keshub's own trials and sorrows about the time of Cooch Behar marriage had spontaneously suggested to him the necessity of regarding God as Mother. And now the sympathy, friendship, and example of the *Paramhansa* converted the Motherhood of

বেলায় বাবার কাছে যা শুনেছিলাম প্রতাপ-চন্দ্রের উক্তি তা সমর্থন করে এবং জ্ঞানেন্দ্র বাবু সাধারণের যে ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করার জন্য ৪০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন, সেই ধারণার সপক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আমি কল্পনা করতে পারি না।

God into a subject of special culture with him. The greater part of the year 1879 witnessed this development. It became altogether a new feature of the *Revival,* which Keshub was specially bringing about. However much European taste might dislike such a development, Keshub's religion perceptibly gained in popularity with Hindu Society by this means."

(A few lines above the passage quoted the author referred to the Mother as the 'goddess Kali' and refers to the traditional devotion of the Hindu saints to this deity.)

Pp. 241-2

"We have already said how the association of *Paramhansa* Ram Krishna developed the conception of the Motherhood of God which had often enough occurred in Keshub's mind before......He (Ram Krishna) worshipped *Shiva,* worshipped *Kali, Rama, Krishna,* he was a confirmed advocate of *Vedantic doctrines.* He was a believer in idolatry, and yet a faithful and most devoted meditator of the Great Formless One Whom he called অখণ্ড সচ্চিদানন্দ (the undivided truth, wisdom, and joy). This strange eclecticism suggested to Keshub's appreciative mind the thought of broadening the spiritual structure of his own movement."

(অধোরেখাগুলি মূলে নাই—উহা আমি যোগ করিয়াছি)

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যে অসংখ্য মন্তব্য আছে, তার আলোচনা করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। শ্রীরামকৃষ্ণের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে যেসব কথা আছে, তা আমার নিকট অত্যুক্তি বলেই মনে হয়, কিন্তু তার আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

"কর্ম করতে গেলে কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা। উপবাসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে, ভালমন্দ মিশ্রিত কর্ম করা ভাল নয়! গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবুও তারা গরু থাকে আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মনের অসুখ ও চিকিৎসা

ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস

স্বাস্থ্য বলতে সাধারণত দৈহিক স্বাস্থ্য মনে আসে। কিন্তু মনেরও স্বাস্থ্য রয়েছে। এমন কি জীবনকে উপভোগ করতে হলেও মন সুস্থ না থাকলে ষোল আনা ভোগ করা যায় না। দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষারও প্রয়োজন। কায়িক শক্তিতে শক্তিমান যেমন অনেক বস্তুভার বহন করতে পারে, মানসিক শক্তিতে তেজস্বী তেমনি মানসজগতের অনেক ভার সইতে পারে। মানসিক শক্তি দেহেও শক্তির যোগান দেয়। সুতরাং দেহের খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে মনের খোরাকেরও প্রয়োজন। নইলে মন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে অসুস্থ হয়।

অসুখের উৎপত্তিস্থল দুটি। একটি দেহ, আরেকটি মন। যে-সব অসুখ দেহের কোনো অরগানের বিকৃতি হতে হয়, তা অরগানিক। যেমন টি. বি.। ডাক্তার ক্লিনিক্যাল বা ল্যাবরেটরি-টেস্ট্ করে অরগানিক অসুখ ধরে ফেলে। অরগানিক অসুখের প্রারম্ভিক কারণ দেহ হলেও মনও অসুস্থ হয়,—বলার দরকার করে না। যে-সব অসুখ মানসিক কারণ থেকে হয়, সে-সব মানসিক। যেমন বেশ সুস্থ লোক, শরীরে কোথাও কিছু নাই, অথচ রক্ত দেখলেই মূর্চ্ছা যায়। মানসিক অসুখে অনেক সময় ডাক্তার রোগীর দেহ পরীক্ষা করে হিমসিম খেয়ে যায়, অথচ দেহের মধ্যে কোনো অরগানের বৈকল্য খুঁজে পায় না। মন প্রারম্ভিক কারণ হলেও এসব অনেক ক্ষেত্রে পরিণামে দেহের কোনো অরগানের বিকৃতি হতে পারে।

অরগানিক অসুখ বিভিন্ন কারণে হয়। যেমন বসন্ত হাম মাম্‌স ইনফ্লুএনজা প্রভৃতি ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়। অনেক হয় আবার ব্যাকটিরিআ থেকে, যেমন টি. বি. টাইফএড ডিসেনট্রি কলেরা ম্যানেনজাইটিস। হারনিআ গলস্টোন ইত্যাদি অসুখও অরগানিক। আঘাত লেগেও অরগানের অসুখ হতে পারে। উপযুক্ত খাবারের অভাবেও হতে পারে। অনেক অরগানিক ব্যাধি আবার বংশগত বা জন্মগত।

মানসিক অসুখ মনের চাপ থেকে হয়। দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ফিজিও-লজি ও এক্‌স্‌পেরিমেনট্যাল সাইকোলজিতে গবেষণার ফলে মনের সহিত দেহের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। মন স্থুল দেহের নার্‌ভ ও হর্‌মোনের মাধ্যমে কাজ করে। নার্‌ভাস সিসটেম চোখ কান নাক জিব ত্বক—ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ করায়। যা শুনছি, দেখছি, অনুভব করছি, কি যে-গন্ধ পাচ্ছি বা যে-স্বাদ পাচ্ছি তা এক রকম ইমপাল্‌স্ হয়ে সেন-সরি নারভ নামে নারভের মাধ্যমে ব্রেনে সেরি-ব্রেল করটেক্‌স্-এ যায় ও অনুভূতির সৃষ্টি করে। তখন মনের আদেশ মোটর নারভের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংগে বাহিত হয় ও আদেশ-মতো কাজ হয়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কারণে মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। যোগ্যতার চেয়ে বেশী আশা, ও আশা না-মেটায় গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়। সংসারে, চাকরিস্থলে, ব্যবসাক্ষেত্রে ও সমাজের মানুষের সঙ্গে মতের

মিল হয় না। নিত্য ঝগড়া ও মনকষাকষি হয়। ফলে প্রায়ই মন বিগড়ে থাকে। ছেলে-মেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব মনকে ঘিরে থাকে। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে আঘাত লাগে—তা বেশী হয় যখন সে মৃত্যুতে ভবিষ্যতের চিন্তা এসে জুটে। কারো কিছু দেখে—না ভেবে চিন্তে বা নিজের দরকার না থাকলেও বা নিজের শক্তিতে না কুলালেও—তা পাবার চেষ্টা করে। বিফল হলে ভীষণ নৈরাশ্য আসে। সমাজে নামধাম ও প্রতিপত্তির চেষ্টা করে। সফল না হলে মনের অবস্থা শোচনীয় হয়। তাছাড়া আরো কত রকমের চিন্তা ভয় হিংসা ক্রোধের ইমপাল্‌স্ নারভের মাধ্যমে ব্রেনে জমা হয়। খুব বাস্তব কথা যে, প্রায় প্রতি মানুষের কোনো-না-কোনো রকমের উদ্বেগ রয়েছে। মনের এ-ভার দূর করার জন্য নারভ নানা রকম উপায় অবলম্বন করে। যদি না-করতো, তবে সাংঘাতিক অবস্থা হতো। কেউ রেগে গেলে অনেক সময় তার মুখ দিয়ে আপনি অকথা বেকথা বের হয়ে যায়। তবেই যেন গায়ের ঝাল মেটে। নারভ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শোকে অনেকের আপনি চোখ দিয়ে জল আসে। বা খানিকটা জোরগলায় কান্না-কাটি করলে মন শান্ত হয়। লেখক বা কবির কোনো আবেগে নারভ উত্তেজিত হয়। মনের ভাব কিছু-একটায় লিখে ফেললেই নারভ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শিশুকে আদর করতে করতে উপরে ছুঁড়ে দিলে সে ভয়ে চোখ মুজে ফেলে ও আঙুল মুঠো করে। অর্থাৎ মনের ভয় হতে রিলিফ পাবার জন্য বিশেষ অংগভংগি করে। ভয় ক্রোধ ইত্যাদি চেপে রাখা ও সংযম করা এক কথা নয়। বিক্ষোভ চেপে রাখলে কাজকর্মে বা কথা-বার্তায় তা প্রকাশ পায় না বটে ; কিন্তু ব্রেনের মধ্যে তার ইমপালস্ কোনো প্রকারে কোড হয়ে দেহের মধ্যেই থেকে যায়। সংযমে কোন বিক্ষোভ বাইরেও প্রকাশ পায় না, আর দেহের মধ্যে ব্রেনেও গুপ্ত থাকে না। মনের বিক্ষোভ চেপে রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। এতে মনের উদ্বেগ কমে না ; বরং বেড়ে যায়। অহরহ মন দগ্ধ হয়। যখন দারুণ বিক্ষোভ মনে চাপা থাকে অর্থাৎ যখন সে উদ্বেগকে কোনোভাবে বাইরে প্রকাশ ক'রে বা জীবন-দর্শন দিয়ে সরিয়ে দিয়ে মনের ভার লাঘব করা হয় না, তখন দেহমনের এমনি মেকানিসম্ যে, মনের চাপের জন্য দেহে নানারকম ব্যাধির সৃষ্টি হয়। মনের কষ্ট দেহের কষ্টে বদল হয়। এ রূপান্তর হয় দুভাবে। একটির নাম নিউরোসিস, অন্যটির নাম সাইকোসিস।

নিউরোসিস হলো এমন এক অবস্থা যখন মনের উদ্বেগ রূপান্তরিত হয় অংগের কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণে ও আচরণের কোনো অসামঞ্জস্যে। এ-বদল বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে হয়। এতে প্রথম প্রথম কোনো দেহযন্ত্রের বিকার হয় না। যেমন কোনো ছাত্রকে ক্লাসে দশ পনেরো মিনিট বক্তৃতা করতে বললে সে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁপে। তার মুখ ও গলা শুকিয়ে যায়, ও পেটের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। অথচ সে দৈহিক কোনো আঘাত পায়নি। যন্ত্রণা কিন্তু বাস্তব। সে-যন্ত্রণা কয়েক ঘণ্টাও থাকতে পারে। এ হলো নিউরোটিক ব্যবহার। নিউরোটিক ব্যবহার পরিণামে দৈহিক অসুখেও দাঁড়াতে পারে। এরূপে সাইকোসোমাটিক অসুখ—পেপটিক আলসার হয়। হাইপোথেলামাস ও সেরিব্রেল করটেক্‌স্ ভীষণ ভয় ও ক্রোধ দ্বারা আলোড়িত হলে স্টোমাকের মাস্‌ল্ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তখন অ্যাসিড (ডাইজেসটিভ জুস)

স্টোমাকের উপর ক্রিয়া করে। মনের মধ্যে ভয় ও ক্রোধ একবার হলে দেহে পরপর এরকম কতকগুলি ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস ঘটে। ভয় ও ক্রোধ প্রায়ই হতে থাকলে পরিণামে স্টোমাক-আলসারে দাঁড়ায়। যে-ব্যক্তি সদাসর্বদা অসন্তোষ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটায় তার প্রায় স্টোমাকের যন্ত্রণা হয়। অনেক ছাত্র দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার পূর্বে ডাইরিয়াতে ভোগে। মিউকস কোলাইটিস-ও মানসিক চাঞ্চল্য থেকে হয়। অনেক হার্টের অসুখে ঠিক এরকম ব্যাপার ঘটে। ধীর স্থির অবস্থায় একজন মানুষের হার্ট আর্টারি দিয়ে প্রতি মিনিটে সাড়ে তিন কোআর্ট রক্ত পাম্প করে। যখন সে ভয়- বা ক্রোধরূপ ভীষণ মানসিক উত্তেজনায় পড়ে তখন এ সংকট অবস্থা হতে রেহাই পাবার জন্য হার্ট পাঁচ থেকে ছয় কোআর্ট রক্ত পাম্প করে আর্টারিতে দেয়। যে-কারণে ভয় ও ক্রোধ হয় তা যদি জীবনে লেগেই থাকে, তবে মনের প্রবল উত্তেজনাও লেগে থাকবে এবং হার্টকেও এতো পাম্প করতে হবে। শেষে দাঁড়াবে হার্টের অসুখ। আবার কারো দৈহিক অসুখ থাকলে মনের বিক্ষোভে তা বেড়ে যায়। অর্থাৎ কোনো অরগানের একটু প্যাথোলজিক্যাল অবস্থা হলে মনের উদ্বেগ কমাবার জন্য সে-অরগানের উপরই চাপ পড়ে। যেমন কারো চোখের ডিফেক্‌ট থাকলে তার মন উদ্বেগ হতে রিলিফ পাবার হদিস পায় এ চোখের অসুখকেই বাড়িয়ে। তখন চোখের অবস্থা খুব খারাপ হয়। কারো একটু হার্টের অসুখ থাকলে হয়তো তার সে অংগই জখম হয় বেশি করে। এরকম অনেক সময় কোনো দেহযন্ত্রের বিকার ও মনের পীড়ন একযোগে কাজ করে। মনের যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যায়রাম জোটে। হাই ব্লাডপ্রেসারও এভাবে হয়। অনেকের ঠোঁট বা হাত কাঁপে। কারো সব অংগই কাঁপে। কখনো-বা নিজেরই অজান্তে হাত পা প্যারালাইস্‌ড হয়ে যাওয়ার ভাণ করে। এ কিছু ইচ্ছাকৃত নয়। দেহ ও মনের এমনি মেকানিজম। এ অবস্থা বহুদিন বোপে থাকলে এ অংগের টিসু নষ্ট হয়ে যায়। পরিণামে অংগ একবারে পংগু হয়।

তোতলামিও কোনোরকম উৎকণ্ঠা থেকে রিলিফ পাবার কৌশল। পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা ইত্যাদিও অনেক সময় মানসিক কারণে হয়। হিসটিরিয়া, ফোবিয়া-ও তাই। এমন কি অনেকের খাদ্যেও ভয় হয় বা খেলে দেহে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—যাকে অ্যালার্জি বলে। অনেকে বিনা প্রয়োজনে বহুবার হাত পা ধোয় বা বাথরুমে ঢুকলে যেন আর বের হতে চায় না; এ সবই নিউরোসিস, কোনো-না-কোনা মানসিক উদ্বেগ চেপে রাখার অন্যরূপ প্রকাশ। গায়ের চামড়া মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম মাপকাঠি। বেশী বয়স না হলেও মুখ ফ্যাকাসে হওয়া মানসিক দুঃস্থতার লক্ষণ। ত্বকের অনেক রকম ব্যায়রাম দেহমনের অস্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন। জীবন-ধারার পরিবর্তনে অনেক মহিলা মানসিক চাপে কষ্ট পেয়ে এক ধরনের বাতে ভুগে। এ-বাত দেহমনের সমষ্টিগত যাতনা।

মনের বিক্ষোভ সাংঘাতিক অবস্থায় পৌঁছলে সাইকোসিস অর্থাৎ মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে দাঁড়ায়। সাইকোটিকদের কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার স্বাভাবিক হতে একবারে ভিন্ন ও অসংগত। মস্তিষ্ক-বিকৃতির বিভিন্ন ভাগ রয়েছে, যেমন সিজোফ্রেনিআ, প্যারানোআ, ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস, ইনভোলিউশন্যাল ম্যালানকোলিআ। আবার একই ধরনের

মস্তিষ্ক-বিকৃতি হতে পারে নারভাস সিসটেম ও ব্রেনের অরগানিক ডিফেক্‌ট্ থেকে। এ-ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক কারণ দেহযন্ত্র, মন নয়।

অরগানিক অসুখ ডাক্তারী চিকিৎসায় যত সহজে ও তাড়াতাড়ি সারানো সম্ভব, মানসিক অসুখ সারানো তত সহজ নয়। নিউরোসিস ও সাইকোসিস দ্বারা যে-অরগান বিকল হয় তার চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে মনের চিকিৎসা করাও প্রয়োজন। মনের চিকিৎসা অতো সহজ নয়। আজকাল 'সাইকোথেরাপি' দ্বারা মনের অসুখ সারানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর মধ্যে হিপনোসিস ও সাইকোঅ্যানালিসিস উল্লেখযোগ্য। তবে জীবনদর্শনের যে মতবাদের উপর হিপনোসিস ও সাইকোঅ্যানালিসিসের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে সে-সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উঠেছে। তা ভারতীয় জীবন-দর্শন হতে সম্পূর্ণ পৃথক। যাই হোক, হিপনোসিস ও সাইকোঅ্যানালিসিস দ্বারা কিছু রোগী উপকার পাচ্ছে। সাইকোলজিস্‌ট্ নানা কৌশলে বহুদিন ধরে রোগীর সঙ্গে কথা বলে বলে তার মনের কোণে কি ক্ষত চাপা রয়েছে, কোন্ কারণে হয়েছে তা তলিয়ে দেখে ও সে-কারণকে মন থেকে মুছে দিয়ে মনকে অন্য প্যাটার্নে ঢেলে সাজিয়ে দিতে চেষ্টা করে। এ হলো সাইকোথেরাপি। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, পূজা-অর্চনা ও মানসিক করে যে অনেক অসুখ সেরে যায়—এও এক ধরনের সাইকোথেরাপি; প্রার্থনা ও মানত দ্বারা গভীর বিশ্বাসে মনের ভার দেবতার কাছে লাঘব করে দেওয়া—অতি সাধারণ ব্যক্তিও মানসিক শক্তিতে তেজস্বী না-হয়ে নিমেষে মনটা হালকা করে দেয় যেন কারও ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে—মনটা এ-হালকা করার সঙ্গে সঙ্গে নারভের মাধ্যমে দেহের সহিত মনের হরিহর সম্পর্ক থাকায় দেহ হালকা হয়ে যায়, রোগ সেরে যায়। যাদের বিশ্বাস কম, প্রার্থনাদি করে, তবু যেন একটু সন্দেহ থেকে যায় এবং নিজের মনে একটু দায়িত্ব নেয় কি জানি কি হয় ভেবে, বিশেষ করে যারা টেবলেট, ক্যাপসুল, নানারকম ইনজেকশন, এক্সরে, রেডিঅম্ প্রভৃতির গুণ জানে—তারা মনে মনে একটু দায়িত্ব নেওয়ায় আপসে নারভের স্ট্রেন হয় ও দেহ দায়ী হয়। অসুখ যেন সেরেও সারে না। এ হলো মনের নিষ্ঠাব অভাব। আলসার ও হাঁপানি মানত ও প্রার্থনা করে সেরে গেছে—এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। বিশ্বাস মনকে দায়মুক্ত করার মস্ত বড়ো উপায়। মরফিআ, অ্যালকোহল, আফিঙ প্রভৃতি সিডেটিভ খুব তাড়াতাড়ি নারভের স্ট্রেনকে হালকা করে দেয় ও মনকে কিছু সময়ের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখে অস্বাভাবিক অবস্থায়। কিন্তু ঘোর কাটলেই আবার সে-অশান্তি ফিরে আসে। মাদক দ্রব্য মন হতে অশান্তিকে একবারে মুছে দিতে পারে না।

চিকিৎসা দুরকম—কিউরেটিভ ও প্রিভেনটিভ। অসুখ হলে যে চিকিৎসা তা কিউরেটিভ, আর যাতে না হয় তার ব্যবস্থা প্রিভেনটিভ। মানসিক কারণ হতে জাত অসুখ শুধু ডাক্তারী চিকিৎসায় সারে না। সারলেও তা স্থায়ী হয় না। হয়তো খুব সংকট অবস্থায় ওষুধ দ্বারা কিছু উপশম করানো যায়, যেমন হাই ব্লাডপ্রেসারে কি অনেক হার্টের অসুখে। মস্তিষ্কবিকৃত রোগী ইনজেকশন, ইলেকট্রিক শক ইত্যাদি দ্বারা ভালো হয়। কিন্তু অনেক সময় কয়েক বছর পর পুনরায় সে-লক্ষণ দেখা দেয়। যে-কারণে এসব অসুখ হয় তা খুঁজে বের করতে হয়। সে কোনো রকম মানসিক অশান্তি। অনেক

সময় মানসিক কারণ খুঁজে বের করলেও মন থেকে সে কারণ দূর করা খুব মুশকিল। মন একটা প্যাটার্নে গড়া হয়ে স্থায়ী হয়ে গেলে তাকে অন্য ছাঁচে ঢেলে সাজাতে বহু সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন। সেজন্য কিউরেটিভ ব্যবস্থার চাইতে প্রিভেনটিভ ব্যবস্থা প্রয়োজন। যেমন কায়িক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটু সর্দি-কাসি কাটা-ছড়া প্রভৃতিতে সবসময় ওষুধ ব্যবহার করা হয় তাড়াতাড়ি সেরে যাওয়ার জন্য বা বাড়াবাড়ি কিছু না-হওয়ার জন্য, সে-রকম মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মন ক্ষত হলেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনদর্শন দিয়ে সারিয়ে ফেলা দরকার, ক্ষত পুষে রাখা উচিত নয়। যার দেহের যে-রকম ধাত সে-বুঝে সে সাবধানে থাকে অসুখ না-হওয়ার জন্য। এরকম যার জীবনে যে-রকম সমস্যা তা বুঝে চলতে হয় অশান্তি না-হওয়ার জন্য। তবে জীবনের বাস্তব সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া নয়, সমাধান করা—মানসিক শক্তিকে আশ্রয় করে। প্রিভেনটিভ হিসেবে যেমন পুষ্টিকর খাদ্য খায় ও ঠিক সময়ে কলেরা বসন্ত ইত্যাদি দৈহিক অসুখের ওষুধ ব্যবহার করে প্রিভেনটিভ হিসাবে, তেমনি মনকেও জীবন-দর্শন দিয়ে শক্তি দিতে হয় মানস জগতের বীজাণু নষ্ট করার জন্য। দৈহিক ব্যায়াম যেমন প্রয়োজন, মানসিক ব্যায়ামও তেমন প্রয়োজন। মানসিক ব্যায়াম হলো জীবনদর্শন-প্রতিপালন। জীবনকে পূর্ণ করতে হলে দেহ ও মন দুই-ই পুষ্ট করতে হবে।

আশ্বিন সপ্তমী

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

'আবার এলো তো উমা'—গান গায় একটি বৈরাগী
বাজায়ে খঞ্জনী হাতে, সুমধুর কণ্ঠের রাগিণী
বাংলার বুকের থেকে যেন এলো পোহালে যামিনী,
মনে হয়, এ-শরতে সুর হ'লো আলো-অনুরাগী।
উমার মায়েকে বলে পুরবাসী এসে সবে ডাকি'
'হারা তারা এলো তোর, এলো তোর নয়নের মণি';
কই উমা উমা ব'লে ছুটে এলো মেনকা জননী,
স্নেহের জ্যোৎস্নাপক্ষ বুকে তাঁর উঠেছে তো জাগি'।

উমা তো বাংলার মেয়ে,—বাৎসল্যের রূপ-কল্পনাতে
জননীর দেবীরূপ দেখা দিল, স্নেহের সরণী
সৃষ্টি হ'লো, সময়ের বসুধারা বেয়ে প্রার্থনাতে;
রাত্রির শরীর থেকে দেখা দিল প্রভাতের প্রশান্তির মণি।
বৈরাগীর গানে, বুঝি আলোকের পদ্ম নিয়ে হাতে,
বাঙলার দুয়ারে এলো আজ এই আশ্বিন সপ্তমী।

মহামায়ার মাহাত্ম্য

স্বামী জীবানন্দ

মহামায়ার মাহাত্ম্য যত স্মরণ করা যায় ততই আনন্দ। জীবনে একটানা সুখ খুবই কম। সুখের পশ্চাতে দুঃখ, দুঃখের পিছনে সুখ যেন আলো-আঁধারের খেলা! একথা সব সময় মনে থাকে না। সুখ এলে মন উল্লসিত হয়, দুঃখ এলে মুষড়ে পড়ে। কি সাধারণ মানুষ, কি অসাধারণ মানুষ—ধনী মানী গুণী ব্যক্তি—সকলেরই জীবনে যখন দুঃখ আসে তখন তাঁরা সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণলাভের উপায় খোঁজেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখি রাজচক্রবর্তী নৃপতি সুরথ দৈববশে অশেষ দুঃখ পাচ্ছেন। তিনি প্রজারঞ্জক, শক্তিশালী এবং বহুবিধগুণসম্পন্ন। তিনিও শত্রুদের দ্বারা পরাজিত, আত্মীয় ও অমাত্যদের দ্বারা লাঞ্ছিত! এই অবস্থায় তিনি একা ঘোড়ায় চ'ড়ে গহন বনে প্রবেশ করলেন। 'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্।' সেই নিবিড় অরণ্যে তিনি দেখতে পেলেন একটি আশ্রম—যেন শান্তির নিলয়! সেখানে মহাতাপস মেধা মুনি সশিষ্য অবস্থান করেন। আশ্রমের পরিবেশ কী সুন্দর! হিংস্র পশুরাও সেখানে শান্ত হয়ে থাকে! আশ্রমে এদিক ওদিক বেড়াতে বেড়াতে একজনের সঙ্গে রাজার দেখা হ'ল। তিনি হলেন সমাধি বৈশ্য। তাঁরও অবস্থা মহারাজ সুরথেরই অনুরূপ। তিনি স্বজনদের দ্বারা অপমানিত ও বিতাড়িত। যারা কষ্ট দিয়েছে, অপমানের চূড়ান্ত ক'রে ছেড়েছে তাদের জন্যই যে এখনও চিন্তা! বনে এসেও ঘরের চিন্তা! দুষ্ট স্বজনদের প্রতিই চিত্ত স্নেহাসক্ত! উভয়ের একই অবস্থা।

মহারাজ সুরথ ও সমাধি বৈশ্য এর রহস্য জানার জন্য মেধা মুনির কাছে গেলেন। শরণাগত অতিথিদের জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত হয়ে মুনিবর বললেন, মহামায়ারই প্রভাবে জগতের সকল জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥'

দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তকেও বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবৃত করেন। সেই মহামায়া এই সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন। তিনি প্রসন্না হ'লে মানুষকে মুক্তি-লাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন। তাঁর হাতেই মুক্তির চাবি, তিনি মুক্তির দরজা খুলে দেবেন।

'তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥'

তিনি সংসারমুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ও সনাতনী। তিনিই সংসার-বন্ধনের কারণ এবং সকল নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রী।

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥'

মহারাজ সুরথ বললেন, 'ভগবন্! যাঁকে আপনি মহামায়া বলছেন, সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হন? তাঁর কার্যই বা কি? হে ব্রহ্মবিদ্বর! সেই মহামায়ার যেরূপ স্বভাব, যা তাঁর স্বরূপ, যেজন্য তিনি আবির্ভূত হন—সব আপনার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছা করি।'

মেধা মুনি বললেন :

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥'

সেই মহামায়া নিত্যা, জন্মমৃত্যুরহিতা। আবার এই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপী এবং সনাতনী হলেও তাঁর বহুপ্রকার আবির্ভাবের কথা আমার কাছে শ্রবণ কর।

'দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥'

যখন দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়, স্বরূপতঃ নিত্যা হলেও তখন তিনি জগতে আবির্ভূতা ব'লে অভিহিতা হয়ে থাকেন।

এরপর মুনিপ্রবর মেধা মহারাজ সুরথ ও সমাধি-বৈশ্যকে মহামায়ার তিনটি চরিত্র বর্ণন ক'রে শোনান। এই তিনটি চরিত্রে যথাক্রমে 'মহাকালী', 'মহালক্ষ্মী' ও 'মহাসরস্বতী'র আবির্ভাব ঘটেছে এবং 'মধুকৈটভবধ', মহিষাসুরবধ' ও 'শুম্ভনিশুম্ভবধ' কীর্তিত হয়েছে।

মহামায়া জগজ্জননীর অতুল মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে মেধা ঋষি বললেন :

'এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবংপ্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥'

হে নৃপ সুরথ! তোমাকে এই সর্বার্থসাধক দেবীমাহাত্ম্য বললাম। সেই দেবী এইরূপ মহিমান্বিতা। তিনি নিখিল বিশ্বকে ধারণ করেন।

'বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ॥
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে।
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্॥
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥'

সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই আবার তত্ত্বজ্ঞান দেন। তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অপর বিবেকাভিমানীদিগকে পূর্বে মোহাচ্ছন্ন করেছেন, অন্য অবিবেকীদের এখন মোহগ্রস্ত করছেন এবং এর পরেও অনেকে তাঁর প্রভাবে মোহগ্রস্ত হবে। হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীরই শরণাগত হও। ঐকান্তিকতা সহকারে তাঁর আরাধনা কর। তাঁকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করলে তিনি ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদান করবেন।

মহামায়ার মাহাত্ম্য শ্রবণের পর রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য কঠোরব্রতনিষ্ঠ মহাপ্রাণ ঋষিকে প্রণাম ক'রে দেবীর আরাধনার জন্য নদীতটে গমন করলেন। জগন্মাতাকে দর্শনের জন্য তাঁদের চিত্ত ব্যাকুল হ'ল। মন বৈরাগ্যের রঙে রঞ্জিত হল। মা! মা!! মা!!! অনুক্ষণ মাতৃচিন্তা, দেবীসুক্তপাঠ ও তার ভাবার্থ-অনুধ্যান। তাঁরা দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ ক'রে অত্যন্ত ভক্তিভরে পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করলেন; কখনো নিরাহার, কখনো স্বল্পাহারী হয়ে জননীর অর্চনারত হলেন। সমাহিত হয়ে তদ্গতচিত্তে স্ব-দেহ-রক্তসিক্ত বলি মাতৃচরণে নিবেদন করলেন।

তিন বৎসর এইভাবে অত্যন্ত সংযতচিত্তে দেবীর আরাধনার ফলে জগদম্বা শ্রীশ্রীচণ্ডিকা তাঁদের প্রতি প্রসন্না হলেন এবং তাঁদের সামনে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা হয়ে বললেন :

'যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ॥'

হে রাজন্! হে বৈশ্যকুলনন্দন! তোমরা দুজনে আমার কাছে যা যা প্রার্থনা করছ, সবই পাবে। আমি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের বর দেব।

অনন্তর মহারাজ সুরথ জন্মান্তরে সাবর্ণি মনুরূপে বিচ্যুতিহীন স্থায়ী সাম্রাজ্য এবং এ জন্মে

নিষ্কণ্টক হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধিমান্ ও বৈরাগ্যবান্ সমাধি-বৈশ্য প্রার্থনা করলেন সংসারাসক্তিনাশক শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান, যার মধ্যে অহংতা ও মমতার লেশ নেই।

অন্তর্যামিনী মহাদেবী বললেন, "হে নৃপ! অতি অল্পদিনেই তুমি শত্রুদের বিনাশ ক'রে নিজের রাজ্য পুনরায় লাভ করবে। তোমার সেই রাজ্যের আর বিচ্যুতি ঘটবে না। মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ ক'রে পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হবে।"

জগজ্জননী সমাধি-বৈশ্যকে বললেন, "হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার কাছে যে বর চেয়েছ, তা তোমাকে দিলাম। তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে।"

জগন্মাতা উভয়কে বরদান ক'রে এবং তাঁদের দ্বারা ভক্তিপূর্বক বন্দিতা হয়ে অন্তর্হিতা হলেন।

মহারাজ সুরথ ও সমাধি-বৈশ্য যথাভিলষিত বর লাভ ক'রে কৃতকৃত্য হলেন।

এখনও মাতৃচরণে শরণাগত সন্তানগণ মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তিভরে মাতৃপূজা ক'রে সুখ-দুঃখের পারে যান এবং পরমানন্দ-লাভে সমর্থ হন।

'ওঁ শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥'

তুলনাতীত

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অতঃপর সে রূপের তুলনা মেলে না। অবিচল
চেয়ে থাকি। যত ভালো—তারো বেশি ভালো মনে হয়।
যখন সামনে আর পিছনে ও চারিধারে জল।
তীরভূমি বড় থেকে ক্রমে যেন সুদূর স্বপনে
তিল হয়। চোখের চেতনা দিয়ে যায় নাক' গোনা:
কত পণ্য পড়ে ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বন্দরে;
শূন্যপাত্র পূর্ণ হয় সোমনাথ সাগর-চত্বরে!
ক্ষুদ্রতার হয় শেষ।—
　　　বিবেক-সমুদ্রে জ্বলে সোনা।

দশকুমারচরিতে সমাজচিত্র

ডক্টর অনিলচন্দ্র বসু

আচার্য দণ্ডী-বিরচিত দশমকুমারচরিতে তৎকালীন সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্র ভাল কি মন্দ, রুচিসম্মত কি রুচিবিগর্হিত—এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কেননা, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতির আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটছে। এ যুগের নীতির মানদণ্ডে যা গর্হিত, নিন্দনীয় ও রুচিবর্জিত বলে বিবেচিত, তা' হয়তো সে যুগে ছিল অন্যরূপ। সুতরাং এ যুগের নীতি ও রুচির মাপকাঠিতে প্রায় ১৩শ' বছর পূর্বের সমাজ-জীবনের মূল্যায়ন করতে যাওয়া অযৌক্তিক। তাছাড়া, কবি লিখেছেন কাব্য। কাব্যহিসেবে 'দশকুমারচরিত' রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সেটাই সহৃদয় পাঠকের বিচার্য। কবি কাব্যের মাধ্যমে কতটুকু নীতি-শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছেন, কি না হয়েছেন, সেটা পাঠকের বিচার করার কথা নয়। কবির রচিত কাব্যে কাব্যরস আস্বাদন করেও যদি আমরা তার মধ্যে কবির সমসাময়িক সমাজের কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়ে থাকি, সেটা আমাদের উপরি পাওনা।

কবি সামাজিক মানুষ। কবি সমাজের বুকে বসে কাব্য লিখবেন অথচ এতে সমাজের কোন প্রতিবিম্ব থাকবে না, তা কি করে সম্ভব? কবির জ্ঞাতসারেই হোক্ বা অজ্ঞাতসারেই হোক্, সমসায়িক সমাজের ছায়াপাত তাঁর কাব্যে থাকবে, এটা তো অনস্বীকার্য। আচার্য দণ্ডী-রচিত দশকুমারচরিতেও এর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। মহাকবি দণ্ডী রাজবাহন প্রভৃতি দশজন কুমারের জীবন এবং বিজয়-অভিযান বর্ণনা করতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে কাহিনীর সার্থক রূপায়ণের জন্য যেসব ঘটনা ও বৃত্তান্তের বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে অনেক সামাজিক তথ্য। এসব তথ্যের সঙ্কলন করে তৎকালীন সমাজের একটি সুস্পষ্ট ধারণা করার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা। দশকুমারচরিতে বর্ণিত সমাজ ছিল জীবনরসে উচ্ছল; উৎসাহ, উদ্দীপনা, কূটবুদ্ধি, সাহস, হটকারিতা ও পুরুষকারের বিজয়গৌরবে ভাস্বর। তৎকালীন সমাজে জাতিভেদপ্রথার প্রচলন ছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চে; তাঁরা ছিলেন সমধিক শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁরা "ভূসুর" "ধরণীসুর" ইত্যাদি বিশেষ সম্মানসূচক বিশেষণে ভূষিত হতেন। ঐ শ্রদ্ধার লোভে জাতিতে ব্রাহ্মণ না হয়েও অনেকে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিত। আবার ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ না করলে তাঁরা "ব্রাহ্মণব্রুব" বলে পরিচিত হতেন। ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণের গৃহে আহার করতে দ্বিধা করতেন না। রাজবাহন ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হয়েও বণিক পুষ্পোদ্ভবের গৃহে বাস ও আহার করেছিলেন।

সমাজে 'অনুলোম' ও 'প্রতিলোম' বিবাহের প্রচলন ছিল। বিবাহ-ব্যাপারে উচ্চ-নীচ জাতির পরস্পরের সংমিশ্রণে কোন বাধা ছিল না। রত্নোদ্ভব ও অপহারবর্মা যথাক্রমে বণিককন্যা ও গণিকার পাণিগ্রহণ করেছিলেন আর সত্য-বর্মা পাণিপীড়ন করেছিলেন দু'জন ব্রাহ্মণতনয়ার। বহু-বিবাহেরও প্রচলন ছিল। বিভববহুল ব্যক্তি একাধিক পত্নী গ্রহণ করতেন। সপত্নীবিদ্বেষও যে ছিল না তা নয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। 'গোমিনী'

সপত্নীবিদ্বেষ পোষণ করতেন না। কিন্তু সত্যবর্মার পুত্র সোমদত্ত বিমাতা কর্তৃক ঈর্ষাবশতঃ নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বাল্য-বিবাহ বা অপরিণত বয়সে বিবাহের বড় একটা প্রচলন ছিল না। যুবক-যুবতীরা নিজ নিজ পতিপত্নী-মনোনয়নের সুযোগ পেত, এমন কি গুরুজনদের মনোনীত পাত্র-পাত্রী প্রত্যাখ্যানও করতে পারত। শক্তিকুমার গুরুজনদের মনোনীত পাত্রী পছন্দ হবে না আশঙ্কা করে স্বয়ং যোগ্য পাত্রীর সন্ধানে বের হয়েছিল। কুবের দত্তের কন্যা কুলপালিকা ধনমিত্রের বাগ্‌দত্তা ছিল। কিন্তু ধনমিত্র তাঁর অপরিমিত দানশীলতার জন্য নিঃস্ব হয়ে পড়লে, কুবের দত্ত অর্থপতি নামে অপর বিত্তশালী ব্যক্তিকে কন্যাদানে সম্মত হলেন। কিন্তু কুলপালিকা তাঁকে প্রত্যাখান করে গোপনে অপহারবর্মার সহায়তায় ধনমিত্রকে পতিত্বে বরণ করল।

রাজপুত্র, অমাত্যপুত্র ইত্যাদির শিক্ষাব্যবস্থা ছিল নিপুণ। ষড়ঙ্গবেদ, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, মণিমন্ত্র, ওষধিবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, প্রভৃতিতে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে হত। নারীরাও শিক্ষিতা ছিলেন এবং সমাজে শ্রদ্ধার পাত্রী বলে বিবেচিত হতেন। সংগীত, নৃত্য এবং চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিবিধ সুকুমার কলার ব্যাপক অনুশীলন হত। নারীরা এসব কলাবিদ্যার নিয়ত অনুশীলনের দ্বারা পারদর্শিতাও লাভ করেছিলেন। নিম্ববতীর কন্দুকনৃত্যের বর্ণনাবসরে 'চূর্ণপাদ', 'গীতমার্গ', 'পঞ্চবিন্দুপ্রসৃত', 'গোমূত্রিকাপ্রচার' ইত্যাদি নৃত্যের বিবিধ মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। চিত্র-বিদ্যার উল্লেখও রয়েছে নিম্ববতীর আখ্যানে।

দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মঠ-মন্দির নির্মাণ করা হত। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মই ছিল প্রধান, যদিও বৌদ্ধ- ও জৈন-ধর্মাবলম্বী লোকও বিরল ছিল না। বৌদ্ধ-বিহারও ছিল। বসুপালিত বৌদ্ধসন্ন্যাসী হয়েছিলেন। দূরদেশে ধর্মস্থানে তীর্থযাত্রার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। সত্যবর্মা সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃ প্রবাসে তীর্থযাত্রা করেছিলেন। কাপালিকও ছিলেন, তাঁরা শ্মশানে বাস করতেন। স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, ভূতপ্রেতের আক্রমণ ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতে লোকের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে দুষ্ট-ব্যক্তিরা লোককে প্রবঞ্চনা করত। পুষ্পোদ্ভব ঐন্দ্রজালিকের রূপ নিয়ে রাজবাহন ও অবন্তীসুন্দরীর মধ্যে কৌশলে পরিণয় সংঘটন করিয়েছিল।

একনায়কতন্ত্র ছিল তৎকালীন প্রশাসনের রূপ। রাজা বড় একটা স্বেচ্ছাচারী হতেন না, বরং তিনি পরোপকারী এবং দানশীল হতেন। রাজকার্যের সৌকর্যার্থে সচিব-নিয়োগ করা হত কুলক্রমাগত প্রথায়। প্রত্যেক বিভাগে বিভাগীয় প্রধান ও কর্মচারী নিয়োগ করা হত। রাজার চতুরঙ্গ সেনা-বাহিনী থাকত, আর থাকত আরক্ষবাহিনী ও গুপ্তচর। আরক্ষবাহিনী ও গ্রাম-প্রধান নগর ও গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা- ও নিরাপত্তা বিধানের ভার নিতেন। নগররক্ষীরা রাত্রিতে অসি ও লগুড়হস্তে নগরের রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দিত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে বৃহৎ বৃহৎ নগরের চারদিকে পরিখা ও প্রাচীরের সুব্যবস্থা করা হত। প্রতিবেশী নৃপতিগণ পরস্পরের মধ্যে শত্রুতায় লিপ্ত থাকতেন।

তৎকালে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি

হয়েছিল। স্থলপথে ও জলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। স্থলপথে উটের সাহায্যে ও জলপথে নৌযানের সাহায্যে পণ্য-দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী করা হত। রত্নোদ্ভব বাণিজ্যোপলক্ষে নিয়তই সমুদ্রযাত্রা করতেন এবং তিনি নৌব্যসনে প্রাণ হারিয়েছিলেন। জলদস্যুর ইঙ্গিতও এ গ্রন্থে রয়েছে।

ব্যসন বলে গণ্য হলেও দ্যূতক্রীড়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরাই এতে অংশগ্রহণ করত। ব্যাপক প্রচলন ও অনুশীলন থেকে দ্যূতক্রীড়া একটি বিশেষ কলাবিদ্যা হিসাবে সমাজে গণ্য হতে লাগল। এর জন্য বিধিনিষেধ, আইনকানুন প্রভৃতির সৃষ্টি হল। দ্যূতক্রীড়ার জন্য রাজার নিকট থেকে 'সনদ'-গ্রহণের নিয়ম ছিল। দ্যূতসভা ছিল এবং দ্যূতসভার অধ্যক্ষও ছিলেন! 'পঞ্চবিংশতি' দ্যূতক্রীড়ার কৌশল ও পাশকনিক্ষেপের হস্ত-কৌশলের উল্লেখ রয়েছে এ গ্রন্থে। অনেক সময় দ্যূতক্রীড়াতে কপট আচরণ করা হত। একে অন্যের প্রতিনিধি হয়ে এতে অংশ গ্রহণ করতে পারত। কেবল উপকার করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই অপহারবর্মা বিমর্দকের প্রতিনিধি হয়ে দ্যূতক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল।

দস্যুতস্করের উপদ্রব মোটেই কম ছিল না। এমনকি দ্যূতক্রীড়ার ন্যায় 'চৌর্য'ও একটি বিশেষ কলাবিদ্যা হিসেবে গণ্য হত। "কর্ণী-সুত" প্রবর্তিত চৌর্যের বিবিধ নিয়মকানুন ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হত। চোরেরা বিশ্বস্ত চরের মাধ্যমে নগরে কার কত ধনরত্ন আছে, কার স্বভাব কিরূপ, কে কি কাজ করে প্রভৃতি আগে জেনে নিয়ে চুরি করত। অনেক সময় ধনের অস্থিরত্ব দেখিয়ে নগরবাসী লোককে প্রকৃতিস্থ করে চুরির আশ্রয় নিত। সব সময় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে চুরি করা হত না। অনেক সময় পরোপকারের জন্য চুরি করা হত। অপহারবর্মা অপরিমিত দানশীলতার জন্য নির্ধন ধনমিত্রকে সাহায্য করার জন্যে কুবেরদত্তের গৃহে চুরি করেছিল। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও নিজেকে 'চোর' বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করত না। দস্যুবৃত্তিরও প্রচলন ছিল। ধনীর ধন লুণ্ঠন করে দরিদ্রের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করতে লোকে দ্বিধা করত না। প্রবঞ্চনারও কোন সীমা ছিল না। অপহারবর্মা "চর্মময়পাত্র" দিয়ে একাধিক লোককে বঞ্চিত করে তাদের অর্থ হস্তগত করে সে অর্থ প্রাপককে দিয়েছিল।

আবার চুরির অপরাধে প্রাণদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল এবং বিবিধ বিচিত্র উপায়ে সে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হত। কখনো শূলে বিদ্ধ করে, কখন হস্তীর পদতলে পিষ্ট করে অপরাধীকে মারা হত। প্রবঞ্চনার জন্যও শাস্তির বিধান ছিল। প্রবঞ্চনা করে ধরা পড়লে তাকে তার সর্বস্ব হরণ করে রাজ্য থেকে নির্বাসন দেওয়া হত। রাজসিংহাসনলাভের জন্য রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে কূটচক্রান্তের অবধি ছিল না, সিংহাসন-লিপ্সু রাজপুরুষেরা পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ, গুপ্তহত্যা ইত্যাদিতে লিপ্ত হতেন।

সবকিছু মিলে তৎকালীন সমাজ ছিল অদ্ভুত ও বিচিত্র।

চাঁদের দেশে

[পূর্বানুবৃত্তি]

শিবদাস

৪

২১শে জুলাই রাত্রি ১-৪৭ মিনিট সময়ে চন্দ্রযান ঈগল মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিনকে নিয়ে চাঁদের ওপর নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে (০'৭° উঃ, ২৩'৬° পূঃ) অবতরণ করেছিল (৪নং চিত্র)। নেমেছিল ৭৮' ফুট ব্যাসের একটা গভীর গর্তের কিনারায়। মানুষ নিয়ে পৃথিবীর যান এই প্রথম চাঁদে নামলেও এর আগে যাত্রীহীন ২৩টি যান যন্ত্রপাতিসহ চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে। সে-গুলির ভেতর কিছু ভেঙ্গে গেছে, কিছু নিরাপদে নেমেছে। যেখানে অ্যাপোলো ১১ নামল, তার কাছাকাছিই এরূপ দুটি যান নেমেছিল। সেগুলি চাঁদের খুব কাছ থেকে ছবি তুলে পাঠিয়েছিল। যেগুলি ভেঙ্গেছে, সেগুলিও ভাঙ্গার ২।৩ সেকেণ্ড আগে পর্যন্ত ছবি তুলেছে। এ-অভিযানে নামাব স্থান নির্বাচন ইত্যাদিতে খুবই কাজে লেগেছে সেসব ছবিগুলি। চাঁদের ভূ-পিঠেরই মানচিত্র তৈরী হয়েছে তা দিয়ে।

চাঁদের মাটিতে যান নামার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু যাত্রী দুজন নীচে নেমে পড়লেন না। আগের ব্যবস্থামত ভেতরে থেকেই পর্যবেক্ষণ করে ও ছবি তুলে লম্বা ঘুম লাগালেন। বাকী রাতটুকু এবং সকালেও অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে তারা শান্ত দেহমন নিয়ে জাগলেন। ২১শে জুলাই সকাল সওয়া-আটটার পর আর্মস্টং বিশেষ পোশাক পরে তৈরী হলেন। যানের দরজা খুলে চন্দ্রযানের পায়ার সঙ্গে লাগানো মই বেয়ে নামতে লাগলেন। মই-এর শেষ ধাপে এক পা এবং যানের পায়ার নীচে লাগানো গোল চাকতিতে আর এক পা রেখে যানের একটা ঢাকনা খুলে একটা চলচ্চিত্র তোলার ক্যামেরার মুখ অনাবৃত করলেন। ক্যামেরাটি তখনি ছবি তোলা শুরু করল, বেতারে পৃথিবীতে তা পাঠাতেও লাগল আর একটি যন্ত্র। তখন, ঠিক সকাল ৮টা ২৬ মিনিটের সময় (২১শে জুলাই) আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করলেন। এই ব্যবস্থায় সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণ টেলিভিসনে দেখতে পেল।

আর্মস্ট্রং নেমেই সর্বাগ্রে কাছ থেকে খানিকটা চাঁদের মাটি তুলে থলিতে পুরে যানের ভেতর রাখলেন। বলা তো যায় না, অজানা পরিবেশে কোন অজানা কারণে যদি তখনি বা একটু পরে যানে ফিরতে বাধ্য হতে হয়, তা হলেও চাঁদের খানিকটা মাটি অন্ততঃ সঙ্গে ফিরবে। অ্যালড্রিন যান থেকে নামলেন এর ২০ মিনিট পর।

দুজনেই চাঁদের মাটিতে বেড়িয়ে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। চাঁদের অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখলেন, বললেন, "খুবই মনোরম।" তবে কেবল মনোরমই নয়, পরিবেশ ভীষণও—"এ দৃশ্য জীবনে আর দেখিনি—আলো-অন্ধকারময় এমন নিষ্ঠুর অপরিচিত প্রকৃতির সম্মুখীন আর কখনো হইনি।"

চাঁদের টান (অভিকর্ষ) পৃথিবীর টানের ছ'ভাগের একভাগ মাত্র। কাজেই সে অনভ্যস্ত পরিবেশে চলাফেরা করা, কাজ করা খুবই

চন্দ্রপৃষ্ঠে যাত্রীহীন যান

স্পর্শ-স্থান :	যান :
(দৃশ্যমান পৃষ্ঠে—বামে)	
[৩০° উ, ১° পূ]	লুনা-২
১	লুনা-১৩
২	" -৮
৩	" -৯
৪	" -৭
৫	অর্বিটার-৫
৬	সার্ভেয়ার-১
৭	লুনা-৫
৮	সার্ভেয়ার-৩
৯	রেঞ্জার-৭
১০	সার্ভেয়ার-২
১১	" -৬
১২	" -৪
১৩	রেঞ্জার-৯
১৪	" -৬
১৫	" -৮
১৬	সার্ভেয়ার-৫
১৮	" -৭
১৯	লুনা-১৫
(অদৃষ্ট পৃষ্ঠে—ডাইনে)	
১৯	অর্বিটার-২
২০	" -৩
[৩° উ, ১৬০° পূ]	" -১
[১৪° দ, ১৩০° প]	রেঞ্জার-৪

৪নং চিত্র
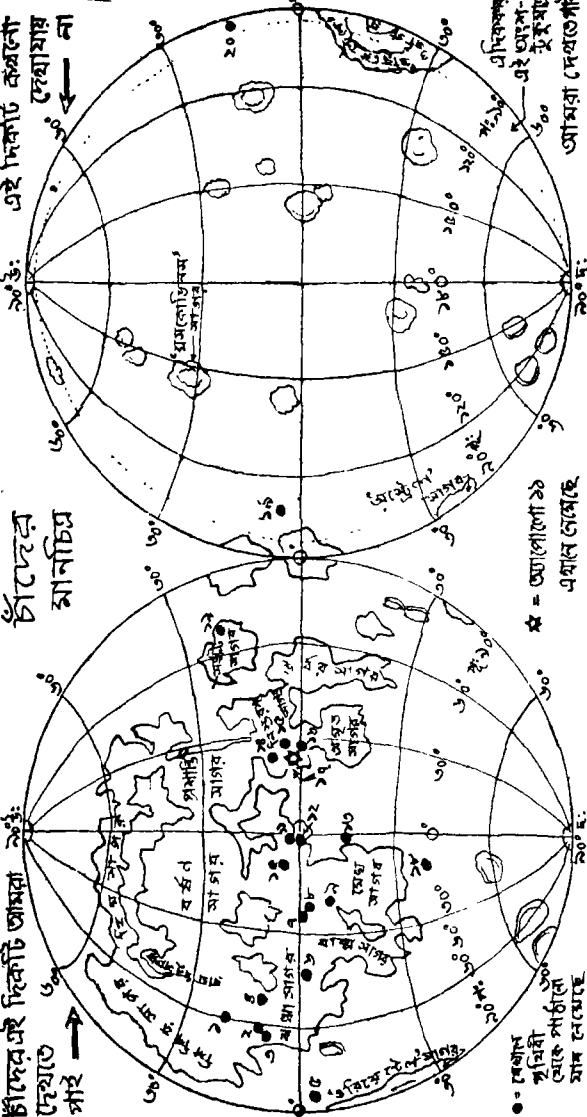
আজ পর্যন্ত মোট ২৫টি যান চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করেছে, (৭টি রাশিয়ার ও ১৮টি আমেরিকার), ২৪টি যাত্রীহীন, ১টি যাত্রীসহ (অ্যাপোলো-১১); এগুলির মধ্যে কিছু আছড়ে পড়ে ভেঙে গেছে, কিছু নিরাপদে নেমেছে। রাশিয়ার লুনা-২ প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ ক'রে ভেঙে যায় (১৩. ৯. ১৯৫৯)। চাঁদে প্রথম নিরাপদে নামে রাশিয়ার লুনা-৯ (৩. ২. ৬৬); আমেরিকার সার্ভেয়ার-১ (২ ৬. ৬৬)। চাঁদের অদৃশ্য দিকের ছবি প্রথম তুলে পাঠায় রাশিয়ার লুনা-৩ (৭. ১০. ৫৯)। পরে আমেরিকার ৫টি অর্বিটার চাঁদের শতকরা ৯৯ই ভাগেরই ছবি তুলে পাঠিয়েছে। চাঁদে নামা ২৫টি যানের ২১টির অবতরণ-স্থল উপরের মানচিত্রে দেখানো আছে, ৩টির স্থান-নির্দেশ দেওয়া হল, একটির (অর্বিটার-৪) অবতরণ-স্থল জানা নেই।

অসুবিধে। যতটা ভাবা গিয়েছিল ততটা অসুবিধে কিন্তু হয়নি; আর্মস্ট্রং বলেছেন, "বহু বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অনেক অসুবিধে ও বাধাবিঘ্ন আসবে, কিন্তু তা হয়নি; চাঁদে নামার পর চাঁদের অভিকর্ষের আওতায় এসে আমরা বেশ আরাম বোধ করেছিলাম। ভারশূন্য অবস্থায় বা পৃথিবীর অভিকর্ষের মধ্যে থাকার তুলনায় সে অবস্থা আমাদের কাছে অধিকতর আনন্দপ্রদ মনে হয়েছিল।" তবে অসুবিধের অন্য কারণ ছিল—তাঁদের পোশাক। মহাজাগতিক রশ্মি, চাঁদের অত্যধিক গরম ও ঠাণ্ডা প্রভৃতি অনেক কিছু থেকে যাত্রীদের রক্ষা করার জন্য পোশাকটি বহুস্তরযুক্ত ও বেশ ভারী করে করতে হয়েছিল; আবার খুব শক্ত করেও, কারণ চলতে গিয়ে অনভ্যাসে যদি যাত্রীরা টলে পড়ে যান, চাঁদের সূঁচল পাথরে লেগে ফুটো যেন না হয় কোথাও। তাছাড়া চাঁদে হাওয়া নেই বলে নিঃশ্বাস নেবার অক্সিজেনের থলেও পোশাকের সঙ্গে পিঠে বইতে হচ্ছে, বেতার প্রেরক- ও গ্রাহক-যন্ত্র প্রভৃতিও। অক্সিজেন থলি থেকে বেরিয়ে পোশাক ও যাত্রীদের গায়ের মাঝখানের সব জায়গা দিয়েই বইছিল, কেবল নাকের কাছে নয়। এইসব মিলিয়ে পোশাকের ওজন তিন মণ। তবে চাঁদে তার ওজন মাত্র আধ মণ, এই যা রক্ষে।

চাঁদে নেমে খুবই আনন্দ হচ্ছিল যাত্রীদের, আবার অনেক কাজও করতে হবে অল্প সময়ে—আর্মস্ট্রং তাই বলেছেন, "তখন আমাদের অবস্থা মিষ্টির দোকানের সামনে পাঁচ বছরের শিশুর মতো:—কোন্‌টা আগে খাব?" সব নিয়ে ঘণ্টা তিনেকের বেশী নীচে থাকা নিষেধ ছিল, কারণ মাত্র চার ঘণ্টার মত অক্সিজেন আছে। যান থেকে বেশী দূরে যেতেও নিষেধ করা ছিল, হঠাৎ বিপদ এলে তাড়াতাড়ি যাতে যানে ফিরে আসা যায়। চাঁদে নেমে অনেক কাজ করেছিলেন তাঁরা। প্রথমে চন্দ্রযানের পায়ায় মইয়ের সঙ্গে যে ফলকটি লাগানো ছিল, সেটি অনাবৃত করেন; তাতে লেখা ছিল, "পৃথিবী গ্রহ থেকে মানুষ ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম চাঁদের এই স্থানটিতে পদার্পণ করেছিল। আমরা সমগ্র মানবজাতির শান্তির জন্য এখানে এসেছিলাম।" স্বাক্ষর ছিল আর্মস্ট্রং, অ্যালড্রিন, কলিন্স ও প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের। এটি চাঁদেই থেকে যাবে, কারণ চন্দ্রযানের নীচের অংশের সবটাই চাঁদে থাকবে। তারপর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা চলচ্চিত্র-তোলা ক্যামেরা যানের দিকে মুখ করে বসালেন; এটিও ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা চাঁদের মাটিতে পুঁতলেন। তারপর চাঁদের ধূলো ও পাথর তুলে থলি ভর্তি করা চললো। ৪৫ পাউণ্ড চাঁদেব মাটি তাঁরা সঙ্গে নিয়ে ফিরেছেন। তাঁরা দেখলেন চন্দ্রপৃষ্ঠ কঠিন, ওপরে একটা মিহি ধূলোর স্তর, পিচ্ছিল, রং ঘন পাংশুটে; তাঁদের জুতোর দাগ ⅛ ইঞ্চির বেশী গভীর হচ্ছিল না। চাঁদের ওপর তিনটে যন্ত্র বসালেন তাঁরা। একটা প্রতিফলক—যা পৃথিবী থেকে পাঠানো 'লেসার' রশ্মিকে প্রতিফলিত করে ফেরত পাঠাবে। আর একটি ভূমিকম্প মাপার ও তার খবর পৃথিবীতে পাঠাবার যন্ত্র। আর একটা যন্ত্র যা সূর্য থেকে চাঁদে কী কী কণা আসে, কী হারে আসে, এই সব জেনে নেবে। এ যন্ত্রটি সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা দিয়েছিলেন; যাত্রীরা চাঁদ থেকে ফেরার সময় এটিও ফিরিয়ে এনেছেন; যাঁরা দিয়েছিলেন যন্ত্রটি তাঁদের কাছে ফলাফল পরীক্ষার জন্য ফেরতও দেওয়া হয়েছে। আগের

যন্ত্র দুটি চাঁদে রয়ে গেছে সক্রিয় অবস্থাতেই।

কাজ সেরে আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিন কিছু আগে-পরে যানে ফিরে এলেন ১১টা ২১ মিনিটের মধ্যেই, নামার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে ছিলেন ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট, অ্যালড্রিন ২ ঘণ্টা ২৩ মিনিট। তারপর খেয়ে দেয়ে আবার ঘুম, রাত্রি ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত। ঘুম থেকে উঠে ফেরার তোড়জোড় করতে লাগলেন। যে যানটি চাঁদে নেমেছে, ফেরার সময় তার সবটা ওপরে উঠবে না, নীচের অংশটি চাঁদেই থেকে যাবে, উৎক্ষেপণ-মঞ্চের কাজ করবে সেটি। রাত্রি ১১টা ১৪ মিনিটের সময় (২১শে) নীচের অংশ আর ওপরের অংশের জোড় খুলে দেওয়া হল; যানটির ইঞ্জিন চালু করা হল তার দশ মিনিট পরে। চার মিনিটের মধ্যেই যানটি ৩২,০০০' ওপরে উঠে গেল, ৭ মিনিটে ৫০,০০০' ফুট।

কলিন্স কম্যাণ্ড-মডিউলে বসে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল ওপর দিয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেই চলেছিলেন, বন্ধুদের ফেরার পথ চেয়ে। আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিন রাত্রি ৩টা ১ মিনিটের সময় (২২শে জুলাই) তাঁর কাছে পৌঁছে চন্দ্রযানকে কম্যাণ্ড মডিউলের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। দুটি যানের সংযোগস্থলের দরজা খুলে ১৮" ইঞ্চি লম্বা, ৩২" ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত যে সুরঙ্গপথ দিয়ে তাঁরা চন্দ্রযানে এসেছিলেন, সেই পথ দিয়েই চন্দ্রযান থেকে কম্যাণ্ড মডিউলে ঢুকলেন। তারপর পথটি বন্ধ করে দিয়ে কিছুক্ষণ পর চন্দ্রযানটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল; চন্দ্রযানটি ছুটে গেল সূর্যের দিকে।

তারপর ঘরে ফেরার পালা। ২২শে জুলাই রাত্রি ১০টা ১৭ মিনিটের সময় কলিন্স অ্যাপোলোর গতিবেগ বাড়িয়ে চাঁদের অভিকর্ষ কাটিয়ে পৃথিবীর দিকে সোজা ছুটে চললেন। ১৯শে জুলাই চন্দ্রপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করার পর পৃথিবীর দিকে যাত্রা করার সময় পর্যন্ত কলিন্স ৫৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে চাঁদকে ৩০ বার প্রদক্ষিণ করেছেন।

পৃথিবী থেকে পাঠানো ৩৬৪' ফুট উঁচু যানটির মাত্র ৪৪' তখন ফিরছিল (কম্যাণ্ড মডিউল ১১', সার্ভিস মডিউল ২৩' ফুট); পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশের আগে সার্ভিস মডিউলটিকেও খসিয়ে দিয়ে কেবল ১৩' ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, ১১' ফুট উঁচু কম্যাণ্ড মডিউলটি হাউই দ্বীপ থেকে ৯৫০ মাইল দূরে (১০° উঃ, ১৭০° পঃ) প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পথের বহু বাধা-বিপদ কাটিয়ে চাঁদের দেশে গিয়ে আবার নির্বিঘ্নে ফিরে এলেন তিনজন বিজয়ী চন্দ্রাভিযাত্রী।

৫

চাঁদ সম্বন্ধে বহু তথ্য মানুষ জেনেছে আগেই, বহু বিজ্ঞানীর বহু শতাব্দীর সাধনায়। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে যেসব তথ্য এসেছে, তা থেকে বিজ্ঞানীরা নতুন তথ্যও কিছু পেয়েছেন। সেগুলি 'মৃদু বিস্ময়কর'; আবার 'সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত'ও কিছু আছে। চাঁদ সম্বন্ধে পুরনো ও নতুন তথ্য কিছু দেওয়া হল:

১। চাঁদ নিজের চারদিকে এবং পৃথিবীর চারদিকেও ঘোরে মাসে একবার করে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর সঙ্গে সে সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করছে বছরে একবার। সূর্য যে ছায়াপথের দশহাজারকোটি তারকার মধ্যে মাঝারি আকারের একটি তারকা মাত্র, তার সঙ্গে তার কেন্দ্রের চারপাশে সূর্য আবার নিজ গ্রহ-উপগ্রহের পরিবার নিয়ে ঘুরছে সাড়ে বাইশ কোটি বছরে একবার করে।

পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরতে চাঁদের লাগে ২৭⅓ দিন; কিন্তু পৃথিবী চাঁদকে নিয়ে

সূর্যের চারদিকে ঘোরে ব'লে এই সময়ের মধ্যেই তার অবস্থান ৩০° ঘুরে যায়। তাই চাঁদ বৃত্ত পূর্ণ করার পর আরো ৩০° বেশী ঘুরে এলে (মোট ৩৯০°) আমাদের চোখে তার একপাক ঘোরা পূর্ণ হয়। এই জন্য আরো দুদিন পরে, ২৯½ দিনে, এক চান্দ্র মাসে এই আপেক্ষিক পরিবেশে তার পৃথিবী-প্রদক্ষিণ পূর্ণ হয় (৫নং চিত্র)।

পৃথিবী থেকে আমরা দেখি চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীকে বৃত্তাকার পথে নিত্য প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু সৌর জগতের বাইরে দাঁড়িয়ে যদি দেখতে পারি, তাহলে আমরা দেখবো পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একটানা রেখায় ঘুরছে, আর চাঁদ যেন লাফিয়ে লাফিয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে; সূর্যের চারদিকে সে যেন বছরে একটি করে দ্বাদশদল পদ্ম এঁকে চলেছে (৫নং চিত্র); দেখবো, চান্দ্র মাসের ১ম ও ৪র্থ সপ্তাহে, অমবস্যার ঠিক আগের ও পরের সপ্তাহে চাঁদের এই চলার বেগ কম, ৩য় ও ৪র্থ সপ্তাহে বেশী।

২। চাঁদের যে দিকটা আমরা দেখতে পাই, তার চেয়ে যে দিকটা দেখতে পাই না সেদিকে গর্ত অনেক বেশী।

৩। চাঁদের জন্ম নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক অনুমান করেছেন। অতি হালকাভাবে ছড়ানো কণার এক বিপুল-বিস্তৃত মেঘ ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ জমে সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছে, মনে করা হয়; সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সবই সেই মেঘেরই এক একটা অংশ। এ পর্যন্ত সকলেই একমত। কিন্তু কেউ বলেন, সম্পর্কে (ক) চাঁদ পৃথিবীর বোন—আদি মেঘের একটা টুকরো পৃথিবী, আর একটা পৃথক টুকরো চাঁদ; সেই অবস্থা থেকেই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর মতোই ক্রমে ক্রমে জমে কঠিন হয়েছে। কেউ বলেন, (খ) চাঁদ পৃথিবীর কন্যা—পৃথিবী বায়বীয় অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে ঘন হতে হতে এক সময় এত জোরে ঘুরেছিল যে তার একদিক ফেঁপে উঠে শেষে আলাদা হয়ে গিয়েছিল; সেইটাই চাঁদ। আবার কেউ বলেন, (গ) চাঁদ

৫নং চিত্র

পৃথিবীর সাথী—পৃথিবীর মতোই চাঁদ পৃথক একটি গ্রহ, একা একাই সূর্য প্রদক্ষিণ করতো, একদা পৃথিবীর কাছ দিয়ে যাবার সময় তার

টানে আটকে গেছে; তখন থেকে একসঙ্গে চলা শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন, চাঁদের মাটি পরীক্ষা করে এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যাবে; তা যায়নি। তবে নিশ্চিতভাবে না হলেও শেষ অনুমানটিই, (গ), বেশী সমর্থিত হয়েছে। অ্যাপোলো ১১ অভিযানে যে চাঁদের পাথর এসেছে, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে তার বয়স ধরেছেন ৪৫০ কোটি বছর; এখন পর্যন্ত পাওয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম পাথরের বয়স ৩৩০ কোটি বছর; কাজেই চাঁদ পৃথিবীর আগে জন্মেছে, সে একটি পৃথক গ্রহ—এখন পর্যন্ত এই-ই বলতে হয়।

৪। অ্যাপোলো ১১ অভিযানের ফলে নিশ্চিত জানা গেল চাঁদ জীবতত্ত্বের দিক থেকে মৃত—চাঁদে কোন জীবাণু নেই, কোন জীবের থাকার মতো পরিবেশ নেই। ভূতত্ত্বের দিক থেকেও চাঁদ পৃথিবীর মতো নয়; বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, তার সবটাই কঠিন এবং ভেতরটা ফাটল ধরা; অগ্ন্যুৎপাতে উৎক্ষিপ্ত তরল পদার্থ জমে চাঁদের 'সাগর'গুলি সৃষ্টি হয়েছে বহু আগে। চাঁদে রেখে আসা যন্ত্র থেকে পাঠানো ভূকম্পনের তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিকগণ এই অনুমান করছেন।

৫। চাঁদে রেখে আসা প্রতিফলককে গত ১লা আগস্ট লেসার রশ্মি পাঠিয়ে ও ফেরত পেয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ঐ দিন চাঁদের দূরত্ব জানিয়েছেন ২,২৬,৯৭০.৯ মাইল। এতে ভুল যদি থাকে, ১৫০´ ফুটের বেশী নয়; আগে যেভাবে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব মাপা হত, তাতে ১ মাইল পর্যন্ত ভুল থাকার সম্ভাবনা ছিল।

৬। চাঁদ থেকে আনা ধুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে তার অর্ধেকই হল হীরকের মত উজ্জ্বল লম্বা বা গোলাকার কণা, কাঁচ। এই কণাগুলির জন্যই চাঁদের জমি পিচ্ছিল মনে হয়েছিল।

৭। রাসায়নিক বিশ্লেষণে চাঁদের মাটিতে 'হিলিয়াম' পাওয়া গেছে, যা পৃথিবীতে আছে; 'আরগণ' 'ইরিয়ণ' প্রভৃতি গ্যাসও পাওয়া গেছে।

৮। চাঁদের মাটি বা ধূলি জীবনের পক্ষে হানিকর নয়।

৯। চাঁদ তাঁর নিজের চারদিকে ঘুরতে যে সময় নেয় পৃথিবীর চারদিকেও ঘোরে ঠিক সেই সময়ে, ২৯½ দিনে। সেজন্য সব সময় চাঁদের একটা দিকই আমরা দেখতে পাই; তবে তার অপর দিকের সামান্য একটু অংশও আমাদের কাছে অনাবৃত হয় (৪নং চিত্র)।

চাঁদ সম্বন্ধে পরে আরো কত কি জানবো আমরা। সে সব তথ্য থেকে শুধু চাঁদেরই নয়, সৌরজগতেরও বহু অজানা রহস্য উদ্ঘাটিত হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। সে রহস্যোদ্ঘাটনের এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে মানুষ অ্যাপোলো ১১-তে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়ে চাঁদের দেশে গিয়ে এবং নির্বিঘ্নে ফিরে এসে।

আবেদন

উত্তরবঙ্গ ও আসামে রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যাত্রাণকার্য

উত্তরবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং আসামের কাছাড় জেলায় ইদানীং বন্যার যে তাণ্ডবলীলা হয়ে গিয়েছে তাতে লক্ষ লক্ষ বিঘে চাষের জমি প্লাবিত হয়েছে, সহস্র সহস্র লোক হয়েছেন গৃহহীন ও নিরাশ্রয় ; এইসব দুর্গত ও অসহায় নরনারীর জীবন রক্ষার জন্য অবিলম্বে সাহায্য প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশন ইতিমধ্যেই বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলগুলিতে ত্রাণকার্যে নেমেছেন। মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার, ইংলিশ বাজারের এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জংগীপুর মহকুমার বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক সাহায্য হিসেবে চিঁড়ে, গুড় প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সাহায্যের ভূমিকা হিসেবে তদারকের কাজ শেষ করে নিয়মিত খাদ্যশস্য-বিতরণও আরম্ভ হয়েছে।

আসামের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ মহকুমার বন্যাবিধ্বস্ত কয়েকটি অঞ্চলেও মিশন ত্রাণকার্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধির সংগে সংগে এখন আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এই অগণিত বন্যাক্লিষ্ট নরনারায়ণের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশনকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। দান—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। চেক—"রামকৃষ্ণ মিশন" এই নামে কাটতে হবে এবং সাহায্য পাঠাবার সময় 'রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা তহবিলের জন্য' এই কথার উল্লেখ প্রয়োজন।

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫নং ডিহী এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪

৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার কলিকাতা ৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অব্ কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯

বেলুড় মঠ,
১লা সেপ্টেম্বর,
১৯৬৯

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

শিলং-এ গুরুপূর্ণিমা উৎসব

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমপ্রাঙ্গণে স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে গত ২৯শে জুলাই গুরু-পূর্ণিমা উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা, পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও বিকালে ভক্তসম্মেলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে প্রেরিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর এই পত্রখানি সম্মেলনে পঠিত হয় :

"শুনে খুব খুশী হলাম, শিলং-এর ভক্তেরা আগে যেমন কেবল গুরুভাইদের নিয়ে নিজ নিজ গুরুর জন্মদিন পৃথকভাবে অনুষ্ঠান করত, এবারে তা না করে সকলে একত্রে গুরুপূর্ণিমার দিনটিই পালন করতে মনস্থ করেছে। আগে যা করা হোত, তাতে 'আমার গুরু, আমার গুরু' ব'লে বিভিন্ন ভক্তদের নিয়ে একটা দল বাঁধার প্রবণতা ছিল—যার কোন মানে হয় না। নিজ নিজ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থাকা তো খুবই ভাল, তার প্রয়োজনও রয়েছে; কিন্তু নিজ গুরুকে কেন্দ্র করে দল সৃষ্টি করা খুবই খারাপ। এই মনোভাব যাতে গজিয়ে না উঠতে পারে সেজন্য বেলুড় মঠ থেকে মঠের সব কেন্দ্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণ ছাড়া, তাঁরা দীক্ষাগুরু হন বা না হন, আর সকলেরই জন্মতিথি পালন করা নিষিদ্ধ আছে। আমাদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরই গুরু, ইষ্ট সব; তিনিই আমাদের 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।' এই কথাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের মুখে শুনেছি, এই কথাই আপনাদেরও বলি; 'গুরুদেব' সম্বোধন তাঁরা কেউ-ই সইতে পারতেন না। আগে আমাদের সঙ্ঘে 'গুরুদেব' কথাটি অজানাই ছিল; আজকালকার ভক্তেরা কথাটিকে চালু করেছেন।

"আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে, দীক্ষিত হোক বা নাই হোক, ঠাকুরের সব ভক্তই আমাদের অতি আপনজন। ভারত জুড়ে ঠাকুরের এমন বহু ভক্ত রয়েছেন যাঁরা দীক্ষিত না হয়েও বহু দীক্ষিত ভক্তের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে নানাভাবে তাঁর এবং তাঁর আদর্শের সেবা করে যাচ্ছেন। আশা করছি, আপনারা আপনাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য সব ভক্তদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যাঁরা 'আমার গুরু', 'আমার গুরুভাই', 'আমার গুরুভগ্নী' ইত্যাদি ব'লে বেড়ান, তাঁরা যেন ছোট ডোবার মাছের মতো, সে-ক্ষুদ্রগণ্ডির ভেতরে থেকেই তৃপ্ত; তাঁরা জানেন না বা জানতে চানও না যে, সেখান থেকে গঙ্গায়—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীরূপ প্রধান স্রোতে না পড়লে সমুদ্রে, লক্ষ্যে পৌঁছবার সম্ভাবনা খুবই কম।

"আমাদের সকলের আসল গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজাদির মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা পালনে আপনাদের এই প্রচেষ্টায় আমি পুনরায় আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঐ দিন সন্ধ্যায় যে ভক্তসম্মেলন হবে, তাতে যেন শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদ-গণের কথাই আলোচিত হয়, আর কারো নয়। ব্যক্তিগত গুরুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে কাউকে কোন আলোচনা করতে দেবেন না; সেটা নিজস্ব ব্যাপার থাকুক। আমাদের গুরুবাদের একটা বিশেষত্ব আছে; দেখবেন, এই ধরনের হালকা আলোচনা করতে দিয়ে সে বিশেষত্বকে যেন সাধারণ স্তরে টেনে নামিয়ে আনা না হয়। একে গুরুভক্তি বলে না; নিজ গুরুর নির্দেশমতো নীরব সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ নিজ জীবনে ফুটিয়ে তোলাই হল যথার্থ গুরুভক্তি।

"শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা, এই শুভদিনে সব ভক্তের শিরেই যেন তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।"

সমালোচনা

বিবেকানন্দ শিলা স্মারক গ্রন্থ : সম্পাদক—অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার ও অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ। বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, ৬০।২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। ১৩৭৬। মূল্য তিন টাকা।

পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জনগণের দুঃখমোচনের উপায় অন্বেষণের চিন্তায় বহু বিনিদ্র রজনী কাটাইবার পর কন্যাকুমারিকায় 'ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া' ধ্যাননেত্রে ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি সুস্পষ্টভাবে দর্শনান্তে নিশ্চিত পথের সন্ধান পান। সে পথে প্রথম পদক্ষেপ তাঁহার চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান এবং সেখানে বিশ্বসভায় ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মকে উচ্চাসনে বসানো—যাহার ফলে ভারতীয় জাতির আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ হয় এবং পরে স্বদেশ-প্রত্যাগত তাঁহারই সিংহনাদে পূর্ণ জাগ্রত হইয়া জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে শুরু করে। স্বামীজীর জীবনেতিহাসে এবং ভারতীয় জাতির নবজাগরণে তাই কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, বর্তমানে সেই শিলাখণ্ডের উপরে নির্মীয়মাণ মন্দিরটি সেই তাৎপর্যেরই প্রতীকস্বরূপ। যাঁহাদের অক্লান্ত উদ্যমে এই সর্বমানবের তীর্থমন্দির রূপায়িত হইতেছে, তাঁহারা সমগ্র জাতির অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলির যোগ্য। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতির উদ্যোগে অর্থসংগ্রহের অভিযান সুসমাপ্ত। এক্ষণে আলোচ্য স্মারকগ্রন্থখানির মাধ্যমে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পূর্ণতা।

প্রচ্ছদপটে বিবেকানন্দ শিলা ও ভাবী মন্দিরের ছবি দুইটি নয়নাভিরাম সুষমায় পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের প্রকাশক শিলা সমিতির সংগঠন-সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ ঘোষের বিবেকানন্দ শিলা ও শিলা-স্মারক প্রবন্ধটির মাধ্যমে এ মন্দির নির্মাণের ইতিহাস সুচারুরূপে বিধৃত। সম্পাদকীয় নিবেদনে সম্পাদকদ্বয় আশা প্রকাশ করিয়াছেন, 'কন্যাকুমারিকার নির্মীয়মাণ মন্দিরটি বিবেকানন্দ-জীবনের শিখা থেকে আরও লক্ষ লক্ষ তরুণ-বিবেক-চিত্তে অগ্নি-সঞ্চারের আদিপ্রেরণা হোক'—সে প্রার্থনা আলোচ্য স্মারকগ্রন্থটি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণীপূত।

স্বামী সারদানন্দজীর 'স্বামী বিবেকানন্দ' সংগীতটি গ্রন্থের শুভ সূচনা। স্বামী নিরাময়ানন্দজীর 'কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর ধ্যান'-শীর্ষক ভাবগম্ভীর নিবন্ধটি এবং শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে' নামে কাব্যময় রচনাটি আলোচ্য স্মারক-গ্রন্থের ভাবসত্যের সার্থক প্রকাশ। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীমণি মিত্র, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত প্রভৃতির কয়েকটি মননশীল নিবন্ধ পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে—'বেদান্তমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ', 'আচার্যবরিষ্ঠ', 'পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও স্বামী বিবেকানন্দ', 'ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিচারে স্বামী বিবেকানন্দ', 'হে ভারত, ভুলিও না', 'Swami Vivekananda and Modern India', 'The Relevance of Vivekananda to the Present-day India', 'Vivekananda's World Mission as the Wave of the Future', 'Vivekananda—Lord of Language'.

ইংরেজী অংশ অপেক্ষা এ গ্রন্থের বাংলা অংশটি বিষয়-বৈচিত্র্য ও রচনাসৌকর্যে অধিকতর সার্থক। শ্রীআলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'হে মহাজীবন হে মহামরণ' কাব্য-নাট্যটি ভাব-ভাষা-ব্যঞ্জনা সর্ব দিক হইতেই বিশিষ্ট সৃষ্টি। শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষের 'বিবেকানন্দ-মন্দির' নামে সনেটটি বিবেকানন্দ-মন্দিরের সার্থক বাণীরূপ। সমগ্র গ্রন্থটির পরিকল্পনায় নিষ্ঠা, শুচিতা, শিল্পবোধ ও আদর্শপরায়ণতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ব্যক্তিগত সংগ্রহে ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এ স্মারকগ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত হইবার যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: (ক) **মালদহ ও মুর্শিদাবাদ** জেলায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্ত-সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। গত ২২শে আগস্ট, ১৯৬৯ মালদহ জেলার ২নং ব্লকের (পঞ্চানন্দপুর) ৭টি গ্রামের ৩৪০টি পরিবারকে ১০০ কেজি চিড়া, ৮৫ কেজি ছোলা, ৪০ কেজি ছাতু, ২৭ কেজি গুড়, ১০০ কেজি লবণ এবং ১ টিন বিস্কুট বিতরণ করা হইয়াছে। অন্য একটি ব্লকের (ইংরেজবাজার) ১২টি গ্রামের ৭১২ জনকে ৪০০ কেজি চাল দেওয়া হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে এবং মালদহের উপরি-উক্ত এলাকায় বন্যাক্লিষ্টদের নিয়মিতভাবে 'ডোল' দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(খ) **জলপাইগুড়ি** শহরে এবং শহরের বাহিরে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা-সরঞ্জাম বিতরণ করা হইতেছে। দুঃস্থদের বসবাসের জন্য কুটিরনির্মাণকার্য এখনও চলিতেছে।

কাছাড়ে বন্যার্তসেবা: শিলচর ও করিমগঞ্জ আশ্রমদ্বয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় কাছাড়ে বন্যার্তদের জন্য সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ১,০০০ কেজি আটা, ৪০০ কেজি চিড়া এবং ১,৫০০ কেজি চাল বিতরিত হইয়াছে।

অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা: গুন্টুর জেলার চিরালায় দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য পাথরের দেওয়াল এবং ম্যাঙ্গালোর টালির ছাদ বিশিষ্ট ১০০টি গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কার্যাদি শুরু হইয়া গিয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: বন্যায় বিপর্যস্ত জনগণের সেবাকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনর্বাসন-কার্য পরিকল্পিত হইতেছে।

চেরাপুঞ্জি বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা

গত ২২শে আগস্ট চেরাপুঞ্জি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভা মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আয়োজিত সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আসাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজয়ভদ্র হাগজীর।

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির নূতন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন

গত ২৬. ৭. ৬৯ তারিখে আমেরিকার মিশিগান স্টেটের গাঞ্জেস টাউনশিপে ৮০ একর উদ্যানভূমিতে চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত

সোসাইটির পল্লীনিবাস ও আশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে উক্ত ভূমিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর চিত্র শোভিত মনোরম মণ্ডপে একটি সভা আয়োজিত হয়। সভার প্রারম্ভে চিকাগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ সমাগত সকলকে স্বাগত জানাইবার পর চিকাগো কেন্দ্রের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ বেদমন্ত্র পাঠ এবং শ্রীমতী কলা কৃপালিনী ভজনগান করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিবার পর আরাত্রিক সঙ্গীত গীত হয়। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ, অধ্যাপক স্যামুয়েল ক্লার্ক ও মিঃ গ্লেন ওভারটন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বেদান্ত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। পরে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ পরিকল্পিত মঠ-বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করেন; চিকাগোর নর্থ ডিয়ার-বোর্ন স্ট্রীটের হেল-পরিবারের যে বাড়ীটিতে স্বামী বিবেকানন্দ দারুণ দুর্দিনে অতিথিরূপে পরমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং বহুবার বাস করিয়াছিলেন, এই ভিত্তিপ্রস্তরটি সেই বাড়ীরই ভগ্ন অংশ হইতে সংগৃহীত (হেল-পরিবারের বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে)।

উৎসবান্তে ভোজে ভারতীয় খাদ্য পরিবেশিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীমতী বীণা শুক্লা, ডক্টর মনোমোহন মজুমদার, শ্রীমতী সুমন নাদকার্ণী, মিস করিন স্কোমার ও মিসেস হেমা সেণ্ডে যন্ত্র- ও কণ্ঠ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আঁটপুর রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রমে গত ২৯শে জুলাই শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা-হোম-পাঠাদির মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া ভজন সহ নগর-পরিক্রমার পর আশ্রমে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় সভাপতি মহারাজ ও শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য ভাষণ দেন। পরে রাত্রি ৮॥টা পর্যন্ত ভজন-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

প্রাচীন মানবাস্থি আবিষ্কার

তুরস্কের আসলানটেপ জেলার বাড়েবাসী গ্রামে একটি অতি প্রাচীন নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইটালীর একদল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভূগর্ভ হইতে এটি আবিষ্কার করিয়াছেন। কঙ্কালটি ৫,০০০ বছরের প্রাচীন বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

চিকাগো বক্তৃতার ৭৬তম স্মারক উৎসব

গত ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হলে স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতার ৭৬তম স্মারক উৎসব সভা 'বিশ্বধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ' প্লাটিনাম জয়ন্তী কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় সভার উদ্বোধক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন, 'চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের সম্মুখে ভারতের সুমহান ঐতিহ্যকে বিস্ময়কর-ভাবে তুলে ধরেছে।' সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, 'বর্তমান অনিশ্চয়তা থেকে সারা দেশকে মুক্তির পথে আনতে হলে স্বামীজীর আদর্শ ও বাণীকে সমগ্র জাতির হৃদয়ে সঞ্জীবিত করে দিতে হবে।' শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, 'স্বামীজীর চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা-গুলি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত—দেশের তরুণসমাজকে তা চরিত্র-গঠনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করবে।' শ্রীনবকুমার শীল বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই দেশের বর্তমান সঙ্কট হইতে মুক্তির একমাত্র পথ।'

এই সংখ্যার লেখকগণ

১। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ :
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড়

২। স্বামী বীতশোকানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড়

৩। স্বামী আদিনাথানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামসেদপুর

৪। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ :
বেদান্ত সোসাইটি, স্যানফ্রান্সিস্কো, ক্যালিফর্নিয়া, আমেরিকা

৫। শ্রীদিলীপকুমার রায় : পুণা

৬। স্বামী চণ্ডিকানন্দ : বেলুড় মঠ

৭। ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার : কলিকাতা

৮। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৯। সেখ সদরউদ্দীন :
প্রধান শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ, পানিহাটী (২৪ পরগণা)

১০। ডক্টর রমা চৌধুরী :
উপাধ্যক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

১১। শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী : কলিকাতা

১২। মৌলভী রেজাউল করীম : বহরমপুর

১৩। শ্রীশান্তশীল দাশ :
পানিহাটী, (২৪ পরগণা)

১৪। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক :
কোগ্রাম (বর্ধমান)

১৫। শ্রীকালিদাস রায় : কলিকাতা

১৬। শ্রীনরেন্দ্র দেব : কলিকাতা

১৭। বনফুল : কলিকাতা

১৮। শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ :
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯। শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় :
বড় আন্দুলিয়া (নদীয়া)

২০। শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী :
অধ্যাপক (সংস্কৃত), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

২১। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার : কলিকাতা

২২। ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস :
অধ্যাপক, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটুট, কলিকাতা

২৩। স্বামী জীবানন্দ :
উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

২৪। শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় : কলিকাতা

২৫। ডক্টর অনিলচন্দ্র বসু : অধ্যক্ষ, রানাঘাট কলেজ

২৬। ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত : অধ্যাপক
শ্যামসুন্দর কলেজ, বর্ধমান

দিব্য বাণী

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়

(মনেরও অতীত দেশে স্বরূপ যে সবাকার,
অফুরন্ত আনন্দের সাগর ভিতরে !
মনেরে আপনা ভেবে ভুলেছি যে কথা তার,
বাহিরের পানে তাই ছুটি সুখ তরে।)
যেই জন এ স্বরূপে, এ-আনন্দপারাবারে
শুধু আপনারে লয়ে সদা তুষ্ট রয়,
(আনন্দের তরে যারে বাহিরে বিষয়-দ্বারে
কাঙালের বেশে আর ছুটিতে না হয়),
ত্যজে যবে মনোগত কামনারে সর্ববিধ
(মনাতীতে গেলে যাহা স্বতঃ যায় চ'লে),
দুঃখে যে উদ্বিগ্ন নয়, সুখে যার স্পৃহা নাই,
ক্রোধ-ভয়াসক্তি নাই, স্থিতপ্রজ্ঞ তাহাকেই বলে।

কোন কিছুতেই আর মন নাহি টানে যার,
সে-সবের সংযোগের ফলে
শুভ ঘটিলেও তবু আনন্দে বিহ্বল কভু
নাহি হয়, অশুভ আসিলে
তাহাতেও স্থির রয়—দূরে যেতে নাহি চায়,
স্থিতপ্রজ্ঞ তাহারেই বলে।
কূর্ম যথা পেলে ভয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি লয়
আপনার দেহেতে গুটায়ে
সেরূপ বিষয় হতে গুটাইয়া সযত্নেতে
আনে যেই ইন্দ্রিয়নিচয়ে—
(বিষয়ে ইন্দ্রিয়দ্বারে পরশনও করিবারে
মন যার সদাই বিরত,)
মহানন্দ-নিকেতনে, আপন স্বরূপজ্ঞানে
সেই জন সদা প্রতিষ্ঠিত।

কথাপ্রসঙ্গে

মা-কালী ও তাঁর খেলা

"তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।" তাহা হইলে তিনি আবার মা হইলেন কেমন করিয়া? মা তো আমাদের জন্মদাত্রী, অসীম স্নেহময়ী পালয়িত্রী; তিনি কি তাঁহার সন্তানকে বা তাহার আবাসকে বিনষ্ট করিতে পারেন কখনো?

পারেন যে তাহা তো নিত্যই দেখিতেছি; অবশ্য চোখ খুলিয়া দেখিলে। এ জগতে আমাদের দৃষ্টি যতদূর যায়, আমরা দেখিতে পাই যে-শক্তি সৃষ্টি এবং পালন করে, বিনাশও করে সেই একই শক্তি, দ্বিতীয় কোন শক্তি নহে। তিনি যদি জগজ্জননী হন, তাহা হইলে তিনি ছাড়া আর কে "মৃত্যু"রূপে জনে জনে "রোগমহামারী বিষকুম্ভ ভরি" বিতরণ করিবেন?

যাঁহাদের চোখ খুলিয়াছে, যাঁহারা মা ও তাঁর সন্তানের আসল রূপ দেখিতে পান, তাঁহারা দেখেন, মায়ের মতো তাঁহার সন্তানেরও আসলে বিনাশ বলিয়া কিছু নাই,—যাহাকে মৃত্যু বলি আমরা তাহা একটা খেলাঘর হইতে ছেলেদের সরাইয়া আনিয়া, পুরানো পোষাক খুলিয়া নূতন পোষাক পরাইয়া নূতন খেলার জন্য পাঠানো মাত্র। আবার, সত্যের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত যাঁহাদের দৃষ্টি অবারিত, তাঁহারা দেখেন মা ও ছেলে বলিয়া আলাদা কিছু নাই. একজনই দুই সাজিয়াছেন।

ছেলেদের খেলা দেখিবার জন্য মা যেন তাহাদের নিজের ভিতর হইতেই বাহির করেন, কোলে বসাইয়া রাখেন কিছুক্ষণ, তাহার পর নানারকম পোষাক পরাইয়া, নানা রকম খেলাঘর তৈয়ারী করিয়া সেখানে খেলিতে

পাঠান। এই খেলাঘরগুলিই এক-একটি জগৎ, স্থূল ও সূক্ষ্ম অসংখ্য জগৎ। আর পোষাকগুলিও অসংখ্য ধরনের—একটি ঠিক অপরটির মতো নয়, কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটিরই আছে। তবে মোটামুটি এগুলি তিন শ্রেণীর। সব চেয়ে সূক্ষ্ম পোষাকটি মা পরাইয়া দেন, ছেলেদের যখন কোলে লইয়া ঘুম পাড়ান, তখন। এ পোষাকটির নাম কারণ-শরীর। ইহার উপর আর একটি আর একটু স্থূল পোষাক পরাইয়া মা আমাদের স্বর্গাদি সূক্ষ্ম খেলাঘরে খেলিতে পাঠান; এটির নাম সূক্ষ্ম-শরীর। ইহারও উপর সব চেয়ে স্থূল পোষাক, স্থূল-শরীর পরাইয়া মা আমাদের খেলিতে পাঠান স্থূল-জগতে। এ পোষাকটি একটানা বেশীদিন থাকে না, সহজে জীর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায়, সহজে নষ্ট করাও যায়; মা তখন সেটি খুলিয়া লইয়া হয় ভিতরকার সূক্ষ্ম-পোষাক পরা অবস্থাতেই সূক্ষ্ম জগতে খেলিতে পাঠান, আর না হয় আর একটি স্থূল-পোষাক পরাইয়া দেন। এই পোষাক পাল্টানোকেই আমরা জন্ম-মৃত্যু মনে করি।

মনে করি, কারণ অসংখ্যবার এভাবে খেলিতে খেলিতে আমাদের মাথায় পাকা-পাকিভাবে বসিয়া গিয়াছে যে এই খেলাঘর-গুলিই আমাদের আবাস, আর পোষাক-পরা অবস্থাই আমাদের আসল রূপ—পোষাকগুলিই আমি। তাই পোষাক খুলিবার বা পাল্‌টাইবার সময় ভয় পাই—আমিই বুঝি বিনষ্ট হইলাম ভাবিয়া। তাই মা যখন পোষাক খুলিয়া দিতে আসেন, খেলাঘর ভাঙিয়া দিতে আসেন, তখন আমরা ভয়ে আঁতকাইয়া উঠি, তখন তাঁহাকে ভয়ঙ্করী বলিয়াই ভাবি, করুণাময়ী মা বলিয়া চিনিতেই পারি না।

কিন্তু খেলিতে খেলিতে যাঁহাদের খেলার মাঝেই হঠাৎ নিজের আসল রূপের কথা, মায়ের কথা মনে পড়িয়া যায়, যাঁহারা জীবনকে খেলা বলিয়া এবং দেহকে, পোষাককে পোষাক বলিয়াই বুঝিতে পারেন, খেলা আর তাঁহাদের ভাল লাগে না; মা খেলা ভাঙিয়া ও পোষাক খুলিয়া দিতে আসিলে তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হন। তাঁহারাই নিজের চেষ্টায় সব পোষাক খুলিতে যখন অপারগ হন, তখন খড়্গধারিণী মাকালীর কাছে সব পোষাক ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া, সব জগৎ ভাঙিয়া দিয়া আসল আবাসে, পরমধামে ফিরাইয়া লইবার জন্য প্রার্থনা করেন, "দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ! হেরি পথ আলোকচ্ছটায়।"

মা যখন এরকম দু'চার জন ছেলের পোষাক খুলিয়া তাহাদের সব জগৎ সব খেলাঘর ভাঙিয়া ঘরে ফিরাইয়া নেন, তখন অপর ছেলেদের খেলা কিন্তু চলিতে থাকে। একদিন কিন্তু মা নিজেই সব ছেলেকে কোলে পাইতে চান; তখন নিজেই সব খেলাঘর, সব জগৎ ভাঙিয়া দেন, সব ছেলেরই স্থূল ও সূক্ষ্ম দুটি পোষাকই খুলিয়া দেন—তৃণ, কীট, পশু, মানব, দেবতা, এমনকি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি তাঁহার সব সন্তানেরই। ইহার নাম প্রলয়। ছেলেদের সবচেয়ে সূক্ষ্ম পোষাকটি, কারণ-শরীরটি কিন্তু মা তখনো খোলেন না—সেটি পরিয়াই সকলে তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া থাকে। কিছুকাল পরে, কল্পান্তে মায়ের আবার সাধ হয়, ছেলেদের খেলা দেখিবেন; তখন আগের মতোই আবার সব খেলাঘর গড়িয়া, পোষাক পরাইয়া ছেলেদের খেলিতে পাঠান। আবার ভাঙেন, আবার গড়েন। মা এই-ই করিতেছেন। এই ভাঙা-গড়াই তাঁহার খেলা, লীলা।

ছেলেদের সব চেয়ে সূক্ষ্ম পোষাকটি কি

তিনি কখনো খোলেন না ? খোলেন বৈ কি। যদি কোন ছেলে চায়, তখনই প্রসন্না হইয়া খুলিয়া দেন, খেলা হইতে একেবারে ছুটি দিয়া তাহাকে পরমধামে পাঠাইয়া দেন ; কল্লান্তেও আর খেলিতে আসিতে হয় না তাহাকে— "স্বর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।" সেখানে কিন্তু মা ও ছেলে বলিয়া আলাদা কিছু থাকে না—মা নিজেও যে একটি পোষাক পরিয়া মা হন ! সে পোষাকটি খুলিয়া ফেলিয়া তখন ছেলের সঙ্গে একই নামরূপহীন আনন্দময় সত্তায় মিশিয়া যান। মায়ের ছিন্নমস্তা রূপ, যে রূপে মা নিজের মুণ্ড নিজেই কাটিতেছেন, বোধ হয় এই সত্যেরই প্রতীক।

খেলা আর যখন ভাল লাগে না, তখন খেলা হইতে আমাদের মন যত উঠিতে থাকে, যতই মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রবল হয়, মা ততই আমাদের পোষাকের বাঁধন আলগা করিয়া দিতে থাকেন, আমাদের কাছে স্থূল সূক্ষ্ম খেলাঘরগুলির অস্তিত্ব ততই অবাস্তব বলিয়া বোধ করাইতে থাকেন। মা কখনো কখনো কোন কোন ছেলের সব-পোষাক-পরা অবস্থাতেই সব পোষাকের বাঁধন একেবারে আলগা করিয়া, তাহার সব জগৎকেই তাহার নিকট অবাস্তব বলিয়া অথবা তিনিই বলিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকেন। সে-সব সন্তান দেহ থাকিতেই খেলা হইতে ছুটি পাইয়া যান। তাঁহারা জীবন্মুক্ত।

বা, অন্য ভাষায়, আমাদের মন যতই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের দৃষ্টাদৃষ্ট সর্ববিধ ভোগ্য বস্তু হইতে সরিয়া আসিতে থাকে, আমরা যতই বাসনাশূন্য হইতে থাকি, ততই আমাদের মন ক্রমে শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম হইতে থাকে, পূর্বানুভূত জগৎ লুপ্ত হইয়া মনের সে-সব অবস্থার স্পন্দনানুরূপ জগৎ প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। সব শেষে স্বরূপানুভূতি হয়।

অপর ভাষায় এই পোষাক ও খেলাঘর হইতে মুক্তিলাভের নাম প্রকৃতি হইতে, ক্ষেত্র হইতে, অচেতন বস্তু হইতে নিজেকে, ক্ষেত্রজ্ঞকে, চেতন সত্তাকে পৃথক রূপে প্রত্যক্ষ করা।

অথবা তন্ত্রের ভাষায়, মা-কালীই কুল-কুণ্ডলিনীরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া, সুপ্ত হইয়া আছেন আমাদের মেরুরজ্জুর অভ্যন্তরস্থ ফাঁকা পথটির বা সুষুম্নার সর্বনিম্ন প্রদেশে। মায়ের কাছে ফিরিবার চেষ্টার, সাধনার ফলে মা, কুণ্ডলিনী শক্তি সেখান হইতে যখন ক্রমে উপরের দিকে উঠেন, তখন তাঁহার 'নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে'—মনের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থাগুলি ক্রমবিকশিত হয়, উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যের উদ্ভাস হৃদয় আলো করিয়া দেয়। আর পিছনে ফেলিয়া আসা মনের প্রত্যেকটি অবস্থার অনুরূপ জগৎও, খেলাঘরগুলিও বিনষ্ট হইয়া চলে—"তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।" শেষে সহস্রারে উঠিয়া মা সর্বোচ্চ সত্য প্রত্যক্ষ করান।

মহাত্মা গান্ধী—
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবালোকে

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন : আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য জননী জন্মভূমি তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হোন, অন্য সব অকেজো দেবতাকে এই কয় বৎসর ভুলিলেও ক্ষতি নাই।

পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও কথাটি আমরা আজও ব্যবহার করি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক অর্থে। দেশসেবা বা সীমিত অর্থে রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিই, কিন্তু দেশকে, দেশের জনগণকে দেবতা ভাবিবার

কোন প্রয়োজনই বোধ করি না, মানুষকে ভগবান ভাবিয়া দেশসেবাকে ভগবদুপাসনায় রূপায়িত করাই যে স্বামীজীর এই উক্তিটির লক্ষ্য, তাহা না বুঝিয়া ভাবি স্বামীজী ভগবদারাধনা ছাড়িয়া ধর্ম ছাড়িয়া কেবল রাজনীতি করিবার কথাই বলিয়াছিলেন। অথচ স্বামীজী বারংবার বলিয়াছেন, ধর্মই ভারতীয় জাতির প্রাণধারা, তাহার দেহের রক্তস্বরূপ ; ধর্মের ভিতর দিয়া জাতিকে উন্নত করার পথই ভারতে স্বল্পতম বাধার পথ। বলিয়াছেন, "এটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ না যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।" কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম আমাদের জাগতিক কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া কেবল মন্দিরে, গুহায় বা অরণ্যে সীমিত হইয়া ছিল ; সেই ধর্মকে জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃত করিবার কথাই, প্রতিটি কর্মকে আরাধনায় রূপায়িত করিবার, প্রতিটি কর্মক্ষেত্রকেই ভগবানের পূজা-মন্দিরে রূপায়িত করিবার কথাই বহুভাবে বলিয়াছেন তিনি। এসব কথা ভুলিয়া গেলে ভারতীয় জাতির উন্নতিকল্পে স্বামীজীর প্রদত্ত কোন কথারই অর্থ যথাযথ-ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। পূর্বোক্ত কথা-টিরও লক্ষ্য তাহাই, শুধু এ কয় বৎসর প্রধান কর্মক্ষেত্র করিতে বলিয়াছিলেন দেশসেবাকে।

আমরা অনেকে ভুল করিলেও একদল দেশপ্রেমিক কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে স্বামীজীর এই ভাবকে যথাযথ অর্থেই জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন, প্রায় এই পঞ্চাশ বছর ধরিয়াই ; মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক সন্ন্যাসী গুরু রামদাস-প্রদত্ত গৈরিকপতাকাবাহী শিবাজীর আদর্শে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সংগ্রামকে ধর্মাচরণ বলিয়া প্রচার হইতেই ইহার সূত্রপাত বলা যায়। তাঁহাদের প্রেরণার উৎস স্বামীজীর বাণী কি না, তাহা আমাদের বিচার্য নহে ; আমাদের বক্তব্য, স্বামীজীর এই আদর্শই তাঁহাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়া-ছিল দেখিতেছি : তাঁহারা সকলেই ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়াই রাজনীতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে ইহা বলিয়াছেনও যে দেশসেবাই তাঁহাদের ভগবানলাভের সাধনা, ভগবদুপাসনা। সংযম ও জপধ্যানাদির মাধ্যমে শ্রীভগবানে মনের একাগ্রতা-অভ্যাসকে তাঁহারা বাদ তো দেন-ই নাই বরং ইহাকেই দেশসেবার শক্তি ও প্রেরণার উৎসরূপে, ভাব বজায় রাখার জন্য অবশ্যকরণীয় রূপে জানিয়া ইহার উপর জীবনের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। অগ্নি-যুগের পূজারিগণ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহাদের অনুগামী বহুজনের জীবনেই ইহা সুপরিস্ফুট। প্রাত্যহিক জীবনের চরম সঙ্কটের মুহূর্তগুলি, জেলখানা, ফাঁসীর আদেশ, কোন কিছুই পূজা, জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়, প্রার্থনাদির অভ্যাস হইতে তাঁহাদের বিরত করিতে পারে নাই। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, যাহা স্বামীজীর পূর্বোক্ত উক্তির ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই আসিয়াছিল, বহু দেশপ্রেমিকের প্রচেষ্টার সংযুক্ত ফল রূপে লব্ধ হইলেও তাহাতে ইঁহাদের অবদানই যে সর্বাধিক, এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কর্মক্ষেত্রে ইঁহাদের নীতি ভিন্ন, কোথাও কোথাও পরস্পর-বিরোধীও, কিন্তু সকলেরই জীবনের ভিত্তি, শক্তি ও প্রেরণার উৎস একই—তাঁহাদের সকলেরই জীবন ধর্ম- বা আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক ; তাঁহাদের সকলেরই কর্ম নিছক কর্মমাত্র নয়,

ভগবদুপাসনাও। ইঁহাদের অনেকের কর্ম-প্রচেষ্টায় বহু আপাত বা যথার্থ সাময়িক ব্যর্থতা এবং কর্মপদ্ধতি বা নীতির দিক হইতে ভুলভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও ইঁহারাই যথার্থ 'ভারতীয় নেতা'; ভারতীয়তা বজায় রাখিয়া ভারতের জনচিত্তকে বিপুলভাবে নাড়া দিতে পারিয়াছিলেন ইঁহারাই।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে মহাত্মা গান্ধীর জীবনে দেখিতে পাই, ধর্মই তাহার ভিত্তি; সত্য-, সংযম- ও তিতিক্ষা-পূত সে জীবন, নিয়মিত ভজন-প্রার্থনাদির মাধ্যমে সে-জীবনের প্রতিটি কর্মসাধনাই ভগবদুপাসনার ভাবে বিধৃত। সংযম ও নিয়মিত একাগ্রতার অভ্যাসই যে মানুষের অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তির ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের উপায়, ইহা ভারতীয় চিন্তার সহিত পরিচিত সকলেই জানেন। মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক জীবনে যে বিপুল ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহাই জাতির চিত্তের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়া সেখানে জাতীয়তাবোধকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাঁহার রাজনীতি নহে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সর্বজনচিত্তে প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্বের বিকাশের মূল কথাও তাহাই। এদিক দিয়া দেখিলে ভারতের রাজনৈতিক গগনে আধুনিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে নেতাজী ও মহাত্মাজী অনন্যসাধারণ ভাস্বরতা লইয়া বিরাজমান।

স্বামীজী আদর্শ জনসেবকের যে লক্ষণগুলি বলিয়াছিলেন, মহাত্মাজীর জীবনে সেগুলি সুস্পষ্ট আকারে দেখিতে পাওয়া যায়: প্রথমত:, দেশবাসীর দুঃখকষ্ট মনেপ্রাণে অনুভব করা চাই, দ্বিতীয়ত:, সে দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য একটি উপায় আবিষ্কার করা চাই এবং তৃতীয়ত:, সে উপায়কে কার্যকর করার জন্য নিজের বলিতে যাহাকিছু তাহা সবই উৎসর্গ করা চাই।

অপরের দুঃখে সমব্যথী হওয়ার কথা, সকলের সহিত নিজেকে এক করার কথা, সাম্যের কথা আমরা বহু শুনি, কিন্তু তাহা জীবনে রূপায়িত দেখিতে পাই অতি অল্প কয়েকজনের মধ্যেই। মহাত্মাজী সেই স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তিদের অন্যতম। দক্ষিণ আফ্রিকায় অপমানিত ভারতীয়দের উপর অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে সত্যাগ্রহ আরম্ভের প্রাক্কালে তাহাদের সহিত, এবং ভারতে ফিরিয়া ভারতের দরিদ্র জনগণের সহিত একাত্মতা-বোধ দৃঢ় করার জন্য তিনি খাওয়া-পরা যতটা সম্ভব তাহাদেরই মত করিতেন; ইহা সাময়িক হৃদয়োচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র নহে, আমরণ তিনি নিষ্ঠার সহিত ইহা করিয়াছিলেন। "আমি আবার জন্মাইতে চাই না; কিন্তু যদি জন্মাইতে হয়, তবে যেন আমি অস্পৃশ্য হইয়া জন্মাই, যাহাতে তাহাদের দুঃখবেদনা ও অপমানের অংশীদার হইতে পারি"—অপমানিত অস্পৃশ্যদের প্রতি তাঁহার গভীর সমবেদনা শুধু এই কথাতেই নহে, তাঁহার আচরণেও সুপরিস্ফুট—তাহাদের পল্লীতে তিনি বাসও করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ও ভারতে জনগণের দুর্দশা দূর করিবার একটি নিজস্ব উপায়ও, পথও তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। উহা প্রেমের পথ, সত্যের পথ, সর্বধর্মমিলনের পথ, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিবাদের, সত্যাগ্রহের পথ। এই পথে চলার ও জাতিকে চালিত করার প্রচেষ্টার ইতিহাসই মহাত্মাজীর জীবনেতিহাস। সর্বসাধারণকে

এ পথে চলিবার যোগ্য করিয়া তোলা যায় কি না, এ পথে চলা সর্বক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে কি না, এমন কি আমাদের বহু বর্তমান দুঃখদুর্দশার মূল এ পথেরই কোন কোন স্থান হইতে প্রসারিত কি না, তাহা লইয়া তাঁহার জীবন-কালেই এবং পরে বহু মনীষীর মনে বহু প্রশ্ন জাগিয়াছে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরও উদ্ভব হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এই পথে তাঁহার নেতৃত্ব অনুসরণে চলার ইতিহাসই হইল আমাদের মুক্তিসংগ্রামের একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

জাতির দুর্দশা নিবারণের এই উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহার বাস্তব রূপায়ণের জন্য গান্ধীজী নিজের মন, প্রাণ, সর্বস্ব তাহাতে নিয়োজিতও করিয়াছিলেন, এ পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন আমরণ।

স্বামীজীর ভাবের বাহক বলিতে আমরা আজকাল প্রায়ই মস্ত একটি ভুল করি—স্বামীজীর বহুবিধ ভাব ও আদর্শকে একটিমাত্র জীবনে বা প্রতিষ্ঠানে মূর্ত দেখিতে চাই। মনের এই অসম্ভব ও অবাস্তব চাহিদা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই দেখিতে পাইব, ভারতের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রূপ যে মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা-রূপে তাহার পথপ্রদর্শন করিয়াছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী সেই ভাবানুরূপ একটি পথই প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন, স্বামীজীরই বহুবিধ ভাবের একটি ভাবকে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

ভারতকে জাগিতে হইবে তাহার নিজস্বতা, আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক জীবন লইয়া শুধু নিজের কল্যাণের জন্য নয়, সমগ্র মানব-জাতিরই কল্যাণের জন্য! কারণ, যে এক-পৃথিবী গঠন আজ আমাদের একান্ত কাম্য, সকলে শান্তিতে বাস করিবার জন্য তো বটেই, তাহা অপেক্ষাও বড় কথা মানবসভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য, তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে ভারত। একমাত্র ভারতই অধ্যাত্মিকতা ও জাগতিক উন্নতির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইয়া জগতের সম্মুখে উদাহরণ স্থাপন করিতে পারে, যাহা না দেখিলে কেবল কথায় কোন দেশই সে আদর্শ গ্রহণ করিবে না। আর, জীবনে ধর্মের রূপায়ণ ছাড়া 'মানবপ্রেম' 'বিশ্বপ্রেম' প্রভৃতি কথাগুলি যে শব্দমাত্রই থাকিয়া যায়, চিরদিনই থাকিবে, এক-পৃথিবী কোন দিনই গড়িতে পারিবে না—আজিকার পৃথিবীই তাহার সাক্ষ্য। এখানে ধর্ম বলিতে পৃথিবীর কয়েকটি স্থানে আধুনিক যুগেও যে ধর্মোন্মত্ত-তার ধ্বংসলীলা ঘটিয়া গেল বা ঘটিতেছে, তাহার কথা বলা হইতেছে না, ধর্মের মূল কথাই, আধ্যাত্মিকতাই আমাদের লক্ষ্য—যাহা সব ধর্মমতেই বিদ্যমান, যাহা উচ্চতর সত্যের পথে জীবনের অভ্যুদয় ঘটায়, যাহা সব ধর্মকে, সব ধর্মমতাবলম্বীকে সমভাবে ভালবাসিতে পারে। এই ধর্মই এবং তাহা হইতে উদ্ভূত যথার্থ মানবপ্রেমই আজ মানবজাতিকে তথা মানবসভ্যতাকে পরস্পরসংঘর্ষজনিত আশঙ্কিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারে, এক-পৃথিবী গড়িতে পারে;—বিভিন্ন রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বাহ্য বিভেদগুলি ভাঙিয়া মানুষকে এক করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নহে, সে-সবের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের মাধ্যমে। রাজনীতি যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। বর্তমান যুগে সাম্যবাদের ভিত্তিতে সবক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন দ্রুতপদসঞ্চারে সারা পৃথিবীর দিকে অগ্রসর, সর্বত্রই তাহা পৌঁছিবে অদূর ভবিষ্যতে। এটি একটি শুভ- এবং সঙ্কট-মুহূর্তও সারা

পৃথিবীর পক্ষেই, বিশেষ করিয়া ভারতের পক্ষে। কারণ এই পরিবর্তনের মুখে ভারতও অপরের দেখাদেখি ইহার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বোধে তাহার শক্তির মূল উৎস ধর্মকে এবং উহার ভিত্তি সত্য ও পবিত্রতাকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে। যদি তাহা ঘটে, নিজস্বতা হারাইয়া ভারত যদি মৃত হয়, তাহা হইলে, স্বামীজীর ভাষায়, "জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; চরিত্রের মহান আদর্শগুলি বিলুপ্ত হইবে, সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশব বল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা তাহার বলি।" তবে তাহা হইবার নহে—"এ-অবস্থা কখনও হইতে পারে না।" ইহার প্রতিরোধকল্পে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব, ইহার প্রতিরোধকল্পেই স্বামীজীর বাণী—দেশে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ভাবপ্রচারের আগে দেশকে উপনিষদের ভাবের প্লাবনে প্লাবিত কর। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত এই পথেই মহাত্মাজী চলিয়াছিলেন;—স্বধর্মে পূর্ণভাবে নিরত থাকিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বধর্মকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়া জাতীয় জীবনকে সর্বাবস্থায় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

অপর দিকে, আমাদের জানা নেই, জনগণের বস্ত্রাভাব ও অন্নাভাবের জন্য নিজেও স্বল্প অন্ন-বস্ত্রে সন্তুষ্ট, অভিজাত-শ্রেণীর ঘৃণাস্পদ অস্পৃশ্য জনগণকে বুকে টানিয়া লইবার জন্য তাহাদের পল্লীবাসী সেই 'অর্ধনগ্ন ফকিরে'র মত,—যিনি ইংলণ্ডে রাজার সহিত দেখা করিবার সময়ও এই সব নিপীড়িত, অত্যাচারিত দুঃস্থ জনগণের একজন বলিয়াই নিজেকে পরিচিত করিতে চাহিয়াছিলেন, "কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া" জগৎসমক্ষে যেন সদর্পে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই", তাহাদের অপেক্ষা নিজেকে এতটুকুও বড় বলিয়া ভাবিতে চান নাই,—তাঁহার মত সাম্যবাদীর সংখ্যা জগতে কয়জন? অথচ তিনি ধর্মকেও, সত্য সংযম এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসকেও জীবনের সর্বস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আজ ভারতে এবং সারা জগতে এরূপ জীবনাদর্শের প্রয়োজন, যদি আমরা মানব-সভ্যতাকে, মানবজাতিকে বাঁচাইতে চাই। দেশে ভোগ- ও অধিকার-সাম্য আমাদের আনিতেই হইবে, কিন্তু জীবনের উচ্চতর সত্যকে বিসর্জন দিয়া এবং যন্ত্রে পরিণত হইয়া নহে, দেবভাবাপন্ন ও স্বাধীনচিন্তা-সম্পন্ন মানুষ হইয়া, —সত্যকে, সংযমকে, ঈশ্বর-বিশ্বাসকে ভগবদুপাসনার নিয়মিত অভ্যাসকে অটুট রাখিয়াই! হাতে হাতে ইহা করিয়া দেখানো একমাত্র ভারতের পক্ষেই সম্ভব এবং ভারতকে তাহা নিজে করিয়া দেখাইতে এবং উহারই মাধ্যমে জগতে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। নতুবা, সাম্যবাদই হউক বা গণতন্ত্রই হউক, বা যে-কোন বাদই হউক, একক বা সংযুক্ত-ভাবে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেগুলির বাহ্য চাকচিক্যের অন্তরালে লুক্কায়িত অর্থরূপী পুরোহিতের এবং পাশববল- ও প্রতি-দ্বন্দ্বিতারূপ পূজাপদ্ধতির মনুষ্যত্বমেধ যজ্ঞের বলি হওয়া হইতে বিশ্বমানবাত্মাকে রক্ষা করা যাইবে না।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ নয় (তিনি নিজেই বলিয়াছেন, রাজনৈতিক আদর্শ চিরপরিবর্তনশীল), রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার জীবনই তাই শুধু ভারতের কেন সারা জগতেরই জীবনপথপ্রদর্শক একটি আলোকস্তম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

[গান : সুর—কাফি-খৎ]

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভবতারিণীর মাঝে নিজেরে পূজিলে।
মা'র সাথে এক হয়ে লীলা ধরাতলে ॥
মায়েরি মাঝারে তুমি হের আপনাকে
আপনার মাঝে দেখ লীলাময়ী মাকে
'আমি মা, মা-ই আমি' আচরি শিখালে।

বর্গভীমা*

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

অদূরে প্রণামরত রূপনারায়ণ,
সমুখে মানবস্রোত নিত্য বহমান,
বিশ্বজননীর যত সন্তান আপন
হেরে মাতৃচেতনায় স্পন্দিত পাষাণ।
উদয়-উষার লগ্নে ফোটে রক্তজবা,
শাণিত খড়্গের দীপ্তি জ্বলে মধ্যদিন,
ছিন্নশির দিনান্তের সুলোহিত শোভা
অনন্ত তমিস্রাবক্ষে হতে চায় লীন।

লোলজিহ্বা বরাভয়া ভ্রূকুটি-ভীষণা,
আনন্দ-তাণ্ডবে মত্তা মৃত্যুরূপা কালী,
কালরাত্রে একা জাগে উগ্রা শবাসনা,
শ্মশান-আলোকে দীপ্ত ভীমা মুণ্ডমালী।
পদতলে পড়ে থাকে স্তব্ধ একাকার,
জন্ম মৃত্যু লয় সৃষ্টি কালের পাহাড়।

---

* তমলুকে বর্গভীমা-মন্দির-দর্শনে

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে—মহাত্মা গান্ধী

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনকথা বাস্তবরূপায়িত ধর্মেরই কাহিনী। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করতে তাঁর জীবন আমাদের সামর্থ্য জোগায়। তাঁর জীবনকথা পড়লে ভগবানই যে একমাত্র সত্য এবং আর সবই যে অলীক, এ দৃঢ় প্রত্যয় মনে জাগবেই, এর অন্যথা হতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরত্বের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর বাণীগুলি কোন পণ্ডিতের কথামাত্র নয়, সেগুলি জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা। তিনি নিজে যা উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কথাগুলি সেই উপলব্ধিরই বিবৃতি। এইজন্যই সে বাণীর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য—পাঠকের মনের ওপর তা গভীর ছাপ রেখে যাবেই। এই অবিশ্বাসের যুগে রামকৃষ্ণ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন জ্বলন্ত জীবন্ত বিশ্বাসকে, যা হাজার হাজার নরনারীকে সান্ত্বনা দিয়েছে; এ না হলে আধ্যাত্মিকতার আলোক থেকেই বঞ্চিত থাকতে হত তাদের। রামকৃষ্ণের জীবন অহিংসার জীবন্ত উদাহরণ। তাঁর ভালবাসার কোন সীমা ছিল না—ভৌগোলিক বা অন্য কোন সীমাই না।...

সবরমতী
মার্গশীর্ষ, কৃষ্ণা ১
বিক্রম সম্বৎ ১৯৮১
[১২ই নভেম্বর, ১৯২৪]

এম. কে. গান্ধী

* অনুবাদ—'Life of Sri Ramakrishna' গ্রন্থের প্রাক্‌কথন—সং

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে—মহাত্মা গান্ধী

(১)

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত দেখা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী একবার বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন (বা পরে কখনো) তাঁহার সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ নাই। এই প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে গান্ধীজী লিখিয়াছেন,

"ব্রাহ্মসমাজে যথেষ্ট কিছু দেখার পরে, স্বামী বিবেকানন্দকে না দেখে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বিপুল উৎসাহের সঙ্গে বেলুড় মঠে গেলাম। অধিকাংশ পথ, কিংবা হয়তো গোটা পথটাই, পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম। লোকালয় থেকে দূরে মঠের নিভৃত পরিবেশটি আমার বিশেষ ভাল লেগেছিল। কিন্তু খুবই আশাহত ও দুঃখিত হলাম, যখন শুনলাম স্বামীজীর দর্শন পাওয়া যাবে না, কারণ অসুস্থ অবস্থায় তিনি তাঁর কলকাতার আবাসে রয়েছেন।"[১]

(২)

"১৯২১ সালে স্বামীজীর উৎসবের দিন সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মহম্মদ আলি এবং আরও কতিপয় সহকর্মীকে সঙ্গে করিয়া বেলুড় মঠ দর্শন করিতে আসেন। মহাপুরুষজী তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঠাকুর ও স্বামীজীর ঘর প্রভৃতি দর্শন করাইয়াছিলেন।···মহাত্মাজী ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং তাঁহার হাতের লেখা (যাহা বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে) বিশেষ আগ্রহ সহকারে দেখেন।···বিপুল জনতার বিশেষ আগ্রহে তিনি স্বামীজীর ঘরের সংলগ্ন দ্বিতলের বারান্দা হইতে নিম্নে গঙ্গাতীরে সমবেত জনগণকে হিন্দীভাষায় সময়োপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি এখানে অসহযোগ আন্দোলন বা চরখা প্রচার করতে আসিনি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন-অনুষ্ঠানে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও নমস্কার জ্ঞাপন করার জন্যই আজ এখানে এসেছি। আমি স্বামীজীর পুস্তকাবলী ভাল করে পড়েছি—তার ফলে পূর্বে দেশের প্রতি আমার যে ভালবাসা ছিল তা আরও অনেক বেড়েছে। যুবকদের কাছে আমার এই অনুরোধ—স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বাস করতেন এবং যেখানে দেহত্যাগ করেছেন, সেস্থানের ভাবধারা অন্তত: কিছুটা গ্রহণ না করে শূন্যহাতে আজ ফিরে যেও না।' "[২]

---

১ 'An Autobiography' by M. K. Gandhi, pp, 178

২ 'মহাপুরুষ শিবানন্দ', (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ: ১৮৫

ঈশ্বর ও বিশ্বাস*

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

একটা রহস্যময় শক্তি সবকিছুতেই ওতপ্রোত, ভাষায় যে শক্তির বর্ণনা দেওয়া যায় না। সে শক্তিকে আমি দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করি। ইন্দ্রিয়সহায়ে আমি যা কিছু উপলব্ধি করি, সে-সব থেকে এ অদৃশ্য শক্তি অন্য ধরনের; এ শক্তি তাই উপলব্ধ হয় কিন্তু সর্ববিধ প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে। এ শক্তি অতীন্দ্রিয়; তবু বিচারের দ্বারা একটা সীমা পর্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব।

আমরা তো দেখতে পাই, সাধারণ ব্যাপারেও লোকে জানে না কে তাদের শাসন করছে, কেন করছে, কিভাবে করছে; তবু এ কথা জানে যে, শক্তি একটা রয়েছে এবং নিশ্চয় সেই শক্তিই নিয়ন্ত্রণ করছে।

গত বছর মহীশূর ভ্রমণকালে বহু দরিদ্র পল্লীবাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়; তাদের জিজ্ঞেস করে বুঝলাম যে, মহীশূরের শাসক কে তা তারা জানে না। শুধু বললে, 'কোন দেবতা এর শাসক হবেন।' নিজেদের রাজা সম্বন্ধে দরিদ্র লোকগুলির ধারণা যদি এত সীমিত হয়, তাহলে রাজার রাজা ভগবানের অস্তিত্ব আমি যদি উপলব্ধি করতে না পারি, তাতে আমার আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কারণ পল্লীবাসীরা তাদের রাজার তুলনায় যতখানি ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের তুলনায় আমি তার অনন্তগুণ বেশী ক্ষুদ্র।

মহীশূর সম্বন্ধে দরিদ্র পল্লীবাসীদের যা ধারণা, বিশ্ব সম্বন্ধে আমার ধারণাও সেইরূপ—আমি গভীরভাবে অনুভব করি যে, বিশ্বে একটা সুনিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এক অমোঘ নিয়ম-দ্বারা সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, যা-কিছুর জীবন আছে তা সবই। এ নিয়ম অন্ধ নয়, কারণ অন্ধ নিয়ম চেতন প্রাণীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর অদ্ভুত গবেষণাকে ধন্যবাদ—এখন প্রমাণ করা যায় যে, জড়বস্তুরও জীবন আছে। কাজেই যে-নিয়ম সব জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করে তাই-ই ঈশ্বর—নিয়ম ও নিয়মস্রষ্টা এক।

নিয়ম ও নিয়মস্রষ্টাকে আমি অস্বীকার করতে পারি না, কারণ নিয়ম বা নিয়মস্রষ্টা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সামান্য। যেমন কোন জাগতিক শক্তির অস্তিত্বে আমার অজ্ঞতায় বা অস্বীকারে আমার কোন লাভ নেই, তেমনি ঈশ্বর বা তাঁর বিধানকে অস্বীকার করলেও তার ক্রিয়ার হাত থেকে আমি রেহাই পাব না।

---

* 'কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী' কর্তৃক রেকর্ড করা মূল ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ। ১৩৫৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'উদ্বোধনে'ও ইহার অনুবাদ "ঈশ্বর সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর ধারণা"—এই শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডনে অবস্থানকালে 'কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী'র জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার কয়েকটি ভাষণ রেকর্ড করিবার জন্য রাজনীতি বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী উহাতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি একটি মাত্র রেকর্ড করিবার মতো কিছু বলিতে পারেন, তাহাও রাজনৈতিক বিষয়ে নহে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে—যাহা সর্বকালে সব লোকে শুনিবে; বলেন, রাজনৈতিক ব্যাপারগুলি অস্থায়ী, আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি চিরস্থায়ী ও গভীর। ২০.১০.১৯৩১ তারিখে এই ভাষণটি রেকর্ড করা হয়।—সঃ

পক্ষান্তরে, কোন জাগতিক শাসন মেনে নিলে তার ভেতর জীবনযাত্রা যেমন সহজতর হয়, নম্রভাবে নীরবে ঈশ্বরের প্রভুত্ব মেনে নিলে তেমনি জীবনের পথও অধিকতর সুগম হয়।

আমার চারদিকের সবকিছুই চিরপরিবর্তনশীল, চিরমরণশীল হলেও, আমি অস্পষ্টভাবে অনুভব করি সে-সব পরিবর্তনের মূলে একটি জীবন্ত শক্তি রয়েছে যা অপরিবর্তনশীল, যা সবকিছুকে একত্র-সংহত করে রেখেছে, যা সৃষ্টি করে, বিনাশ করে, আবার নতুন করে সৃষ্টি করে। সেই সঞ্জীবক শক্তিই, জীবনীশক্তিই—আত্মাই—ঈশ্বর। সেই জীবন্ত শক্তি বা ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই, কেবল ইন্দ্রিয়সহায়ে যা কিছু অনুভব করি তার কোন কিছুই চিরস্থায়ী হবে না বা হতে পারে না; একমাত্র তিনিই নিত্য। এখন, তাঁকে দয়াময় বলব, না নির্দয় বলব? আমি তো তাঁকে করুণাময়রূপেই দেখছি। কারণ দেখছি মৃত্যুর মাঝেও জীবন স্থায়ী, অসত্যের মাঝেও সত্য স্থায়ী, অন্ধকারের মধ্যেও আলোক স্থায়ী। এ থেকে আমার ধারণা, ঈশ্বরই জীবন, তিনিই সত্য, তিনিই আলোক। তিনি প্রেমস্বরূপ, তিনি পরম মঙ্গলস্বরূপ।

কিন্তু যিনি কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করেন—অবশ্য যদি কখনো তা করেন—তিনি ঈশ্বরই নন। ঈশ্বর হতে হলে ঈশ্বরকে আমাদের হৃদয়ের রাজা হয়ে সেখানে পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। তাঁর উপাসকের তুচ্ছতম কর্মের মধ্যেও তাঁকে প্রকাশিত হতে হবে। পঞ্চেন্দ্রিয় আমাদের যা উপলব্ধি করাতে পারে, তার চেয়ে অধিকতর বাস্তব, স্পষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমেই তা সম্ভব। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি আমাদের কাছে যত বাস্তব বলেই প্রতীত হোক না কেন, তা অসত্য ও বিভ্রান্তিজনক হতে পারে, আর প্রায়ই তাই হয়-ও। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই অভ্রান্ত। কোন বাহ্য প্রমাণ দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না; হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন—এ যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁদের পরিবর্তিত আচরণ ও চরিত্রই তার প্রমাণ। সব দেশে সব যুগে যে-সব আচার্য ও মুনি-ঋষিগণ অবিচ্ছিন্ন ধারায় আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের অনুভূতির ভেতরই এর প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। এ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা মানে আত্মবঞ্চনা করা।

অটল বিশ্বাস আসার পর এ উপলব্ধি আসে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্তবতা যিনি নিজে যাচাই করে নিতে চান, তিনি জীবন্ত বিশ্বাস সহায়ে তা করতে পারেন; আর বিশ্বাস নিজেই কোন বাহ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় না বলে জগতের নৈতিক শাসনে এবং কাজেকাজেই নৈতিক নিয়মের, সত্য ও প্রেমের নিয়মের আধিপত্যে বিশ্বাসস্থাপন করাই হল সবচেয়ে নিরাপদ পথ। যা কিছু সত্য-ও প্রেম-বিরোধী তা সরাসরি ত্যাগ করার স্থির সংকল্পই বিশ্বাস অনুশীলনের সবচেয়ে নিরাপদ উপায়। আমি স্বীকার করছি, বিচারের মাধ্যমে প্রত্যয় উৎপাদন করার মতো কোন যুক্তি আমার নেই; বিশ্বাস যুক্তি-বিচারের উর্ধ্বে। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, যা অসম্ভব তা সম্ভব করার জন্য চেষ্টা করতে নেই।

আমি কোন যুক্তিপূর্ণ উপায় দ্বারা অসতের অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারি না। তা করতে চাইলে ঈশ্বরের সমান হতে হয়। এজন্য অসৎকে আমি অসৎ বলেই নম্রভাবে গ্রহণ করি। আমি জানি যে ঈশ্বরে কোন অসৎ ভাব নেই; তবু, যদি তা থেকে থাকে, তাহলে ঈশ্বরই তার স্রষ্টা, কিন্তু তা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

আমি আরও জানি যে, আমি যদি জীবন পণ করে অসতের সঙ্গে সংগ্রাম না করি এবং তার বিরুদ্ধে না চলি, তাহলে কখনো ঈশ্বরকে জানতে পারব না। আমার সামান্য ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি এ বিশ্বাসে সুরক্ষিত। আমি যতই পবিত্র হতে চেষ্টা করি, ততই ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্তী হচ্ছি বলে অনুভব করি। বর্তমানে আমার বিশ্বাস যেমন শুধু পক্ষসমর্থনমাত্র, তা না হয়ে এ বিশ্বাস যদি হিমালয় পর্বতের ন্যায় অটল এবং তার শীর্ষস্থ শুভ্র তুষারের মতো হত, তাহলে আমি ঈশ্বরের আরো কত বেশী কাছে চলে যেতাম!

"আমি যদি জানতাম, হিমালয়ের গুহায় গেলে ভগবানকে পাব তাহলে আমি তখনই সেখানে যেতাম। কিন্তু আমি জানি, এই দরিদ্র অসহায় ভারতবাসীদের সেবার ভিতর দিয়েই আমি তাঁকে খুঁজে পাব।"

"ভীরুতা ও অন্যান্য বদভ্যাস দূর করবার সবচেয়ে ভাল উপায় যে আন্তরিক প্রার্থনা—এর প্রমাণ আমার নিজের জীবন থেকে দিতে পারি।"

"পূর্ণ ব্রহ্মচর্যই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।"

"প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, তার গোপনতম চিন্তাও তাকে এবং অপরকেও প্রভাবান্বিত করে।"

"শাস্ত্রের বাণী কখনো যুক্তি ও সত্যকে অতিক্রম করতে পারে না। তাদের উদ্দেশ্যই হল বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করা ও সত্যকে উদ্ভাসিত করা।"

—মহাত্মা গান্ধী

নোয়াখালিতে গান্ধীজী

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

গান্ধীজী নভেম্বর মাসের ৭ই (১৯৪৬) খ্রীঃ নোয়াখালি পৌঁছান। যাইবার পূর্বে তাঁহার নির্দেশ অনুসারে অনুসন্ধান করিয়া আমরা সন্ধান দিই যে, দাঙ্গার পূর্বে নোয়াখালির জনসংখ্যা শতকরা ১৮ হিন্দু ও ৮২ মুসলমান ছিল। হিন্দুদের অধিকারে জেলার বার আনা জমি এবং মুসলমানদের অধিকারে চার আনা।

যে-সকল গ্রামে দাঙ্গা হইয়াছিল, গান্ধীজী তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি পরিদর্শন করেন। নিপীড়িত হিন্দু পরিবার এবং মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ লোকের সঙ্গে দেখাশুনা করিয়া ঘটনার সত্যতা যথাসম্ভব বুঝিবার চেষ্টা করেন। সে সময়ে গভর্নমেণ্ট দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবারগুলিকে অস্থায়িভাবে আশ্রয় দিয়া খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গান্ধীজী কিন্তু জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পরামর্শ দেন যে, তিনি মানুষকে ভিক্ষান্ন না দিয়া যেন কাজের সুযোগ দেন। কেহ সুতা কাটিবে, কেহ রাস্তা বা নিজেদের ভাঙা বাড়ি মেরামতের কাজে যোগ দিবে, কেহ বা পুষ্করিণী পরিষ্কার করিবে। যাহার যেমন ক্ষমতা সে তদনুসারে ২ হইতে ৪ ঘণ্টা কাজ করিলে তাহাকে যেন যথাযোগ্য র‍্যাশন দেওয়া হয়। শরণার্থীরা ভিক্ষান্নে পালিত হউক, ইহা তিনি একেবারে চাহেন নাই।

একদিন এক চিকিৎসক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি ব্যবসায় ব্যপদেশে চাঁদপুর থাকিতেন, কিন্তু বাড়ি দাঙ্গাবিধ্বস্ত একটি গ্রামে। তাঁহাকে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার ডাক্তারি পড়ার খরচ কে বহন করিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে, যে-সকল চাষী তাঁহার পিতার অধীনে কাজ করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার শিক্ষার সুযোগের জন্য দায়ী। তখন গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা ইহারা কি ভাবে লাভবান হইতেছে? আপনার উচিত ইহাদের ঋণকে শোধ করা। আপনি গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামবাসীকে শেখান, কেমন করিয়া রোগ নিবারণ করিতে হয়, সুষম খাদ্য আহরণ করিতে হয়, পানীয় জল পরিষ্কার করিতে হয়, আবর্জনা হইতে সার উৎপাদন করিতে হয়, ইত্যাদি। যদি নিজে না আসিতে পারেন, তবে কয়েক জন মিলিয়া বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এক মাসের আয় সমবেত করিয়া গ্রামে কর্মী রাখিয়া এই প্রকারের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করুন। তবেই আপনাদের ঋণ কিয়ৎ পরিমাণে শোধ দেওয়া সম্ভব হইবে।

তাঁহার কিছুদিন পর হইতে গান্ধীজী প্রার্থনাসভায় এক বিচিত্র উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের সকলের ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, যিনি এই দাঙ্গার উপলক্ষ্যে সকল সঞ্চিত ধন কাড়িয়া লইয়া নূতনভাবে জীবন-যাত্রার এক দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সেরূপ জীবনে ধনী নাই,

নির্ধন নাই, উচ্চনীচ-ভেদাভেদ নাই, সকলে শরীর-শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে।

আজিকার দুর্দিনে যদি আমাদের সকল কষ্ট, সকল দুর্ভোগের ঊর্ধ্বে উঠিয়া ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া নবজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারি, তবে যাহা কিছু অকল্যাণ তাহা পরিপূর্ণভাবে কল্যাণের আকর হইয়া উঠিবে।

গান্ধীজীর এইরূপ বিপ্লবাত্মক চিন্তা হিন্দু অথবা মুসলমান, কাহারও হৃদয় অথবা বুদ্ধিকে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার আদর্শ কি ছিল, দারুণ বিপদের মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পোষণ করিতেন, তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

"কর্মী হতে গেলে খাঁটী ও সৎ হওয়া চাই। অপরের দোষ দেখবে না, বরং নিজেরই দোষের দিকে দৃষ্টি রাখবে।" "মানুষ নিজের দুর্বলতা দেখতে পায় না, দেখতে চায়ও না। নিজের অন্যায় আচরণের সপক্ষে অনেক বৃথা যুক্তি প্রয়োগ করে।"

"আপনারা জাগতিক নানা আন্দোলন ও ঘটনাপ্রবাহের ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেন কেন?···স্বাধীনতালাভ যদি হয়েই যায় তাহলে কি সব শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই তা হবে না। বহির্জগতের সংগ্রাম আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করে না, পরন্তু জাগতিক বিষয়ের প্রতি আমাদের অত্যধিক আসক্তি এবং ঐগুলি পাবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে মানসিক চাঞ্চল্য। ···আপনারা রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলছিলেন? তা মহাত্মা গান্ধীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন তো! তিনি তো সংগ্রামের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনি কি বলতে চান যে, এত বহুবিধ বাহ্যিক সংগ্রামের মধ্যে থেকেও তিনি মানসিক প্রশান্তি-লাভের সাধনা বা ভগবানের স্মরণ-মনন করেন না? প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামের ভেতরও মানসিক সাম্যরক্ষার সাধনা করুন। জগতে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের এ একমাত্র উপায়। গান্ধীজীর জীবনের এ ভাবটি সম্যক্‌রূপে বোঝা উচিত।"

"প্রকৃত শান্তিলাভ করতে হলে ত্যাগ চাই, আত্মসংশোধন চাই, এই হল সনাতন সত্য। তা আধ্যাত্মিক জীবনেই বলুন বা রাজনৈতিক জীবনেই বলুন—স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত না থাকলে কোন কার্যেই সফলতা আশা করা সুদূরপরাহত। বাস্তবিকপক্ষে এই বিরাট জগৎ স্বার্থত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিজ্ঞানভিক্ষু

সাধুজীবন

"মহাপুরুষের লক্ষণ হচ্ছে—তাঁদের কথা সত্য; যা তাঁদের মুখ থেকে বেরোয় তা নিশ্চয়ই ঘটবে। আর সাধুর চিহ্ন হচ্ছে এই যে, তাঁকে দশঘা মার, আর তা-ও তিনি যদি অম্লানবদনে সহ্য করেন, তাহলেই তিনি যথার্থ সাধুপুরুষ।" "সাধু হওয়া দাদা, বড়ই কঠিন। কায়-সংযম, বাক্য-সংযম, মনঃসংযম চাই। ধীর, স্থির, গম্ভীর হওয়া চাই।" "যে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে, সেই প্রকৃত সাধু।"

"সাধু তিনি, যিনি দেশ-কাল-নিমিত্তকে জেনে তার পারে গেছেন।···তবে এই 'জানা'টা বড় কঠিন ব্যাপার। জানা মানে অনুভূতি।"

"সমস্ত সংস্কারের পুঁটলি ফেলে দিয়ে যে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে, শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারে, সেই তো সন্ন্যাসী। সব বাসনা-কামনা গিয়ে লীন হবে শ্রীভগবানে। মাকে ছাড়া আর কিছুই চাইনে, এমন ভাবটি হওয়া চাই।"

"সন্ন্যাসজীবন বড় কঠিন। বিশেষ করে যারা ঠাকুরের নামে সন্ন্যাসী হয়েছে তাদের জীবন সর্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই। কায়মনোবাক্যে কামকাঞ্চনত্যাগ সন্ন্যাস-জীবনের একমাত্র আদর্শ।···আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্যই তোমাদের জীবন।"

"সম্পূর্ণ অনাসক্ত না হলে যত ধ্যানই কর, যত জপই কর, যত কাজকর্মই কর বা যত পাণ্ডিত্যই অর্জন কর না কেন, কিছুতেই কিছু হবে না। ঠাকুর বলতেন--সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখবে না। তা বলে স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করতে হবে বা অবজ্ঞার চোখে দেখতে হবে, তা নয়। বরং তাদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখবে—মন্দিরে যে মা আছেন, ঠিক তেমনি মনে করতে হবে তাঁদের। তাঁরা মায়ের জাত, তাঁদের দূর থেকে প্রণাম করবে। তোমরা যে সন্ন্যাসী, তাই তো তোমাদের জীবনের আদর্শ এত মহান! মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করবে না। অবশ্য তোমাদের পাঁচ রকম কর্মের ভিতর থাকতে হয়, তাতে মেয়েদের একেবারে বাদ দেওয়া বড়ই মুস্কিল। তবে কি জান? কাজ তো ঠাকুরেরই, আর সন্ন্যাসীর পক্ষে এই যে উপদেশ, তাও দিয়েছেন তিনি। এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে নিতে হবে।···কাজের সম্পর্কে মেলামেশা তা আর কতক্ষণই বা! কিন্তু সাবধান, তার অতিরিক্ত যেন না হয়।··· কাজকর্ম করবে চিত্তশুদ্ধির উপায় জ্ঞানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনাদর্শের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে হবে।···বসে বসে পশ্চিমে সাধুদের মতো গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করার চাইতে এসব সেবাদি কর্মে মনকে লিপ্ত রাখা সহস্রগুণে শ্রেয়।···স্বামীজীর সঙ্গে একদিন এবিষয়ে আমার অনেক কথাবার্তা হয়েছিল।"

"আত্মোপলব্ধির জন্য শরীরধারণ। ঐ দেহ-ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পেলেই সন্তুষ্ট থাকবে আর ভগবানের কাজ নিষ্কাম ভাবে করবে।"

"আমি তো সর্বদা সবার জন্য আর আমার জন্যও প্রাণ থেকে প্রার্থনা করছি—সকলের মঙ্গল হোক। এ প্রার্থনাটি খুব বড় জিনিস।··· খুব নাম কর দাদা, কিছু ভয় নাই।"

"তোমাদের ভাবনা কি? সাক্ষাৎ ঠাকুরের কাছে রয়েছ।···খুব নাম করবে প্রাণভরে। চব্বিশ ঘণ্টা—কাজের ভিতরে বাইরে সব সময়। বাইরে কাজ, ভিতরে নাম।···কোন সংশয় যেন এসে না যায় দেখো। তা তোমাদের কোন ভাবনা নেই।"

বিবিধ

"ভগবান হলেন সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। তাঁর রূপ অনন্ত, নাম বহু।"

"লোকে বলে ঈশ্বরকে স্মরণ কর। বোঝে না, তিনি মনের অতীত; তাঁকে কি মন দিয়ে স্মরণ করা যায়? সসীম কখনো অসীমকে ধরতে পারে না; অংশ কি কখনো পূর্ণকে ধারণ করতে পারে? সসীম মন বোঝে না যে, তার যতটুকু গণ্ডী সে-গণ্ডীর বাইরে ঈশ্বর। মন তার গণ্ডীর ভিতর ঈশ্বরকে যতটা জানতে পারে, তাতেই তৃপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ জানাতে কি ভগবানের সবটুকু জানা হল?"

"জগতে সব জিনিসই মিশ্র, কেবলমাত্র ঈশ্বরই অবিমিশ্র। বেদান্তে দেশকালনিমিত্তকে মায়া বলেছে। ইনিই 'মা', ইনিই শক্তি।"

"প্রত্যেক বস্তুরই তিনটি aspect (দিক বা ভাব) আছে—নাম, রূপ ও মূল সত্তা। যতক্ষণ না নামরূপের গণ্ডীর পারে যাব, ততক্ষণ আমরা সত্যের অন্তস্তলে বা মূল সত্তায় পৌঁছুতে পারব না। আর যখন সকল পদার্থের সত্তারূপ আত্মাতে পৌঁছব, তখনই লাভ করব প্রকৃত শান্তি।"

"এ জগতে বহুত্বের পিছনে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সত্তাকে যেন আমরা দেখতে পাই।"

"সব দেহের সঙ্গেই চৈতন্য রয়েছে। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি হতে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত সর্বত্রই চৈতন্য ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। আর এই চৈতন্য আছে বলেই সব কিছু গতিশীল।" এই চৈতন্যই মূল সত্তা বা ব্রহ্ম।"

"ব্রহ্ম স্থিরসর্প-স্বরূপ; আর শক্তি হচ্ছেন চলন্ত সর্পের মতন। উহাই কুণ্ডলিনী শক্তি। এই আধ্যাত্মিক শক্তিস্রোত যখন ঊর্ধ্বগামী হয়, তখন মনেরও হয় ঊর্ধ্বগতি—আর ঐ শক্তিস্রোত নিম্নগামী হলে মনের অধোগতি হয় —মন তমসাচ্ছন্ন হয়ে যায়। দেখেছি যে স্ত্রীলোকদের ভিতর এই ঊর্ধ্বগামিনী শক্তির বিকাশ বেশী দেখতে পাওয়া যায়। মেয়েরা শক্তির অংশ কি না!··· স্ত্রীলোক দেখলেই ঠাকুরের কুণ্ডলিনী শক্তি জেগে উঠত।"

"কল্পে কল্পে একই ভাবে সৃষ্টিপ্রবাহ চলেছে। যেমন কাদার তাল হতে একটা মূর্তি গড়া হল—আবার তা-ই ভাঙ্গা হল— আবার গড়া হল। এই লীলাখেলা চলছে— এতে নতুন কিছু হচ্ছে না, বারংবার পুনরাবৃত্তি মাত্র।"

"কারণ সবটাই কার্যরূপে প্রকাশিত হয় না, খানিকটা অব্যক্ত থাকে।"

"জীব অমর। সত্য সত্যই অমর! জীবের ভিতর যিনি রয়েছেন তিনি অনাদি, অনন্ত, জন্মমৃত্যুরহিত। তাঁর মৃত্যু বলে কিছু নেই।"

"ঈশ্বরদর্শনই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ একমাত্র ইহাই আমাদিগকে ভূমানন্দ ও শাশ্বতী শান্তি দান করতে পারে।"

"অবিদ্যাপ্রসূত অহংকারই আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মহিমা ওতপ্রোতভাবে সর্বত্র বিরাজিত। অথচ আমরা তাঁকে দেখতে পাইনে। কারণ এই অবিদ্যার আবরণকে আমরা দূর করতে চাই না। (এই আবরণ) সরিয়ে ফেল, দেখবে তিনি সর্বত্র স্বপ্রকাশ হয়ে আছেন।"

"মৃত্যুকালে যে নাম নেবে বা যে ভাবে মন নিবিষ্ট থাকবে, মৃত্যুর পর তদনুরূপ গতিই লাভ হয়।"

"মানুষ মৃত্যুর সময়ে মুহ্যমান ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সে সময় যদি একটিবারও ভগবানের নাম করতে পারে, তবেই হল।···আর কিছুই ভাবতে হয় না, শ্রীভগবান তার সব ভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস না থাকলে মৃত্যুযন্ত্রণায় সব গুলিয়ে দেয়—একটি বারের জন্যও শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করতে পারে না। তাই দরকার নিরন্তর তাঁর নামজপ, স্মরণ-মনন আর প্রার্থনা।"

"আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, মনে পবিত্র চিন্তার ও ভগবচ্চিন্তার অভাববশতঃ মানুষ মৃত্যুকালে অতীব ভীত হয়।··· শ্রীভগবানের নামের প্রভাব এসব ভয়কে তো দূর করে দেয়ই, অধিকন্তু আমাদের চিরকালের জন্য মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে।"

"আমার আবার মরা মানুষ দেখলে নিজে যে বেঁচে আছি তাই-ই ভ্রম হয়ে যায়। নেহাত জোর করে শরীরের ওপর মন এনে তবে বুঝতে পারি যে আমি বেঁচে আছি।"

"জগৎটাকে যদি কল্পনা বলে মনে করে নেওয়া যায়, তাহলে কত আনন্দ! আর যখনই এই পৃথিবীকে সত্য মনে করলে, অমনি কষ্ট!"

"অবতারপুরুষেরা নিজমুখে প্রচার করেছেন তাঁরা কে। তা না হলে লোকে তাঁদের বুঝতে পারে না।"

"গুরু ইষ্ট এক। তবে যতক্ষণ নামরূপের এলাকায় রয়েছ, ততক্ষণ নাম-রূপ-ভেদ রাখতে হবে। তারপর আসল জিনিস দেখতে পেলে দেখা যায় দুই-ই এক। দাদা, এটি ঠিক ঠিক জানতে হলে সাধন করতে হয়।" "যখন মনের ভিতর একটু আধটু ভগবানের ভাব আসে, গুরু-ইষ্ট-ভেদ, জাতিভেদ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার—এসব মেনে চলতে হয় বৈ কি! নিষ্ঠা রাখতে হয়। তা না হলে সামান্য যা ভগবানের ভাব হয়েছে তা-ও গুলিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। আর ভেতরে যখন ব্রহ্ম-জ্ঞানাগ্নি জ্বলতে থাকে, তখন···সব একাকার হয়ে যায়।"

"গুরু রয়েছেন হৃদয়ে, তাঁকে আর কোথাও খুঁজতে হবে না।"

"মহাপুরুষদের বাক্য শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বাস করবে। প্রকৃত মহাপুরুষরা conscious ও super-conscious stage-এ (মানস ও অতি-মানস অবস্থার সন্ধিস্থলে) থেকে বলেন যে, জীবের কল্যাণের জন্য তাঁরা হাজার হাজার জন্ম নিতেও প্রস্তুত। ঐ সন্ধিস্থলের উপরে গেলে এসব ভাব আর থাকে না।"

"ত্রিবেণীতে স্নান করার জন্য দেবতারা ও সাধু মহাপুরুষেরা আসেন।···তাঁরা না এলে সেস্থান আর তীর্থ বলে পরিগণিত হয় না।"

"বিশেষ বিশেষ পর্বদিনের তাৎপর্য এই যে, ঐ সকল দিনে কোন মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি যতটা শক্তিলাভ করে-ছিলেন, ততটা পরিমাণ শক্তির বিকাশ সেই

সেই দিনে হতে থাকবে।”

কোন বিশেষ দিনে (যোগ প্রভৃতিতে) স্নান ব্রত উপবাসাদির সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ—এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলেন, “দেখ যারা নিরন্তর ভগবৎ-ধ্যান-চিন্তনে মগ্ন থাকে, তাদের জন্য যতটা না হোক, সাধারণ লোকের পক্ষে এ সকলের বিশেষ উপকারিতা আছে বৈকি! তবু তো ঐ সব বিশেষ দিন স্মরণ করে মন ভগবন্মুখী হয়ে থাকে। তা ছাড়া মনের ওপর ঐসব সময়ে (অন্তর্মুখীতার) একটা প্রভাব পড়ে।...শাস্ত্র নিরর্থক কিছু ব্যবস্থা করেনি। তবে সেগুলির যথাযথ মর্ম জানা দরকার। স্থূলদৃষ্টিতে অনেক কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু মন শুদ্ধ হলে অনেক কিছু অনুভব করা যায়।”

“রথযাত্রা ও স্নানযাত্রার আধ্যাত্মিক অর্থ হল—এ শরীরটি রথ, এ দেহরূপ রথে যে ভগবানকে বসিয়ে আনন্দ করে, সে রথযাত্রার আনন্দ পায়।...স্নানযাত্রা—উচ্চ ও পবিত্র চিন্তায় অবগাহন করা।”

“আবরণ দেবতাদেরও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। আবরণ দেবতা কি জান? প্রচ্ছায়িক বা উপচ্ছায়িক বা প্রতিফলিত জ্যোতি। যেমন একটি আলো। তার দুরকম ছায়া পড়ে—umbra ও penumbra (প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া)। তেমনি ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীসহ জ্যোতির্ময় দেবতা; আর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও নারদাদি ভক্তগণ umbric ও penumbric deity (আবরণ দেবতা; সেই দেবতার জ্যোতিঃ তাঁহাদের মধ্যে স্বল্প ও স্বল্পতর রূপে প্রকাশিত।)”

“বিল্বপত্রের তিনটি পাতা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জ্ঞাপক, আর সমগ্র বিল্বপত্রটি ভগবানের মাতৃভাবের জ্ঞাপক।”

“কোন দর্শন সত্য কিনা, তা জানবার উপায় হচ্ছে যে, ঠিক ঠিক দর্শন হলে সে ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে আর আনন্দ ও জ্ঞান হবে।”

“সূর্য উঠলে বলে দিতে হয় না এই সূর্য। কারণ তিনি নিজের আলোতেই প্রকাশমান।”

“মায়ের সন্তান আমরা, আমাদের ভয় কি? সত্য পথে দাঁড়াও আর তাঁকে ডাক, তিনি মঙ্গল করবেনই।”

“এই সকল নামরূপের পারে সেই বিভু পরম শান্তিময় আত্মা স্বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান। আপনারা সকলে সম্বোধি লাভ করুন, সেই পরম সত্য দর্শন করে শাশ্বতী শান্তি লাভ করুন, শ্রীভগবানের নিকট আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা।”

“ভাল থাক। প্রাণ থেকে আশীর্বাদ করছি তোমাদের কল্যাণ হোক।” “প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি।”

স্বামীজীর ধৈর্য ও সহনশীলতা

ব্রহ্মচারী শশাঙ্ক

স্বামীজী তখন নরেন্দ্রনাথ। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সাংসারিক বিপর্যয়ে এবং আত্মীয়গণের প্রতারণায় তিনি একান্ত অসহায় হয়ে পড়েছেন। এদিকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সঙ্গলাভের ফলে হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের তীব্র ব্যাকুলতা। এই অবস্থায় সংসারে স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী মানুষদের হৃদয়হীনতায় তিনি অভিমানে নীরব থাকতেন, ববং সমর্থনই জানাতেন যখন তাঁকে নাস্তিক, স্বেচ্ছাচারী ও অধঃপতিত বলে প্রচার করা হত। ফলে নরেন্দ্রনাথের নিন্দায় ও অপবাদে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে তাঁর যত বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি চির-বিশ্বস্ত "নরেন্দ্র"। নরেন্দ্রনাথের কুৎসাকারিগণকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "চুপ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।"[১] এই সময়ের কথা উল্লেখ করে নরেন্দ্রনাথ বলতেন, "একা ঠাকুরই আমাকে প্রথম দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা-ভাইরাও নহে। তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস-ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারে অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভান মাত্র করিয়া থাকে।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবী বিবেকানন্দরূপী বিশাল বটবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম করে গেছেন, বরাহনগর মঠে তা পল্লবিত হতে শুরু হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ গুরুভাইদের ঘরে ঘরে গিয়ে ডেকে আনতে লাগলেন তাঁর এই নতুন সাধন-পীঠে।

নরেন্দ্রনাথের আহ্বানে সকলে একে একে সেখানে এসে জুটলেন। ভূতুরে বাড়ী সত্যিই জমজমাট হয়ে উঠল। তবে তা ভূত-প্রেতের নৃত্য-গীতে নয়—অদ্ভুত গুরুর অদ্ভুত শিষ্যদের আধ্যাত্মিকতার ভাব-প্লাবনে।

সে-সময় ভারতে বিভিন্ন ধর্মভাবের সংমিশ্রণে যে অদ্ভুত মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার কেন্দ্রস্থল ছিল—কলকাতা। পরবর্তীকালে এই সময়ের এক মনোরম বর্ণনা আমরা স্বামী অদ্ভুতানন্দের (স্বামীজীর গুরুভাই) মুখ থেকে শুনতে পাই— "...ঢাক পিটে কি ধর্মপ্রচার হয়? ধর্ম কি বাইরের জিনিস যে একজন বলতে থাকলেই আর একজন তা নিতে পারবে?... এই দেখুন না। দশ-পনের কি বিশ বছর আগে এই কলকাতা শহরে কেমন ধর্মের ঢেউ উঠেছিল, জানেন তো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাদ্রীর দল (Salvation Army) লেকচার দিতো। সমাজে ব্রাহ্মরা সব বক্তৃতা দিতো। পাড়ায় পাড়ায় হরিসভায় কীর্তন হোত। তখনকার কথা মনে করুন। একদিন কোম্পানীর (বিডন) বাগানে কেশববাবু (কেশবচন্দ্র সেন) বক্তৃতা দিলেন তো তার পরের দিন সেই বাগানে খ্রীষ্টান কালী (Rev. Kali Charan Banerjee) লেকচার দিলেন। লোকে তাঁদের কথা শুনলো। আবার একদিন কৃষ্ণানন্দ স্বামী এলেন,

১. ২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ২৩৯। ২৪৯

তিনিও বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। লোকে তাও শুনলো। একদল বক্তা হিন্দুধর্মকে গালাগালি দিল, আর একদল সেই ধর্মের সুখ্যাতি করলো।…এত জবরভাবে ধর্মের প্রচার হতে লাগল…।"[৩]

এ-হেন পরিস্থিতির মধ্যে এই নবীন সন্ন্যাসিদলের উদ্ভব। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই—নিধিরাম সর্দার! কী ব্যাপার! শিক্ষিত ছেলেরা ঘর ছেড়ে, অর্থের নেশা ছেড়ে ভুতুড়ে বাড়ীতে ভূতের মতোই রহস্যজনকভাবে দিন যাপন করছেন।

অবাক লাগে বৈ কি! আরও আশ্চর্য লাগে ঐ ছেলেটিকে নরেন্দ্র! স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলতেন—লিডার! যত বাধা-ঝক্কি আর ঝড়-ঝাপটা এই লিডারকেই সামলাতে হয়। হাসিমুখে সহ্য করেন নিজ আত্মীয়দের আর এইসব গুরুভাইদের পিতামাতার বিদ্রূপ! এ কী মতিভ্রম! সুদর্শন, বুদ্ধিমান, তেজীয়ান যুবক নিজের বংশমর্যাদা ভুলে, পাণ্ডিত্য ভুলে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে! গাছতলা বৈ কি—এই কি মনুষ্যযোগ্য বাসস্থান! গুরুভাইদের পিতা-মাতা নরেন্দ্রনাথকে দোষারোপ করেন আর নিজ নিজ অপত্যস্নেহে অধীর হয়ে চোখের জলে ভাসেন। "এখানে কর্তা কে? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া! ওরা ত বেশ বাড়ীতে ফিরে গিছিল। পড়াশুনা আবার কচ্ছিল।"[৪]

এই সময় সর্ববিধ উপেক্ষা ও অবজ্ঞার মধ্যে তাঁরা সঙ্কল্পে কি রকম অটুট ছিলেন তার একটু পরিচয় আমরা পাই স্বামীজীর কথাতেই—"আমাদের বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেহ ছিল না।…একবার ভাবিয়া দেখুন, বারোটি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর বিষয়ে পরিণতি ঘটিল। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল।…বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে? যে কল্পনার ফলে অপরকে (অর্থাৎ আত্মীয়-বর্গকে) এত কষ্ট পাইতে হয়, সেই কল্পনার প্রতিই বা কে সহানুভূতি জানাইবে?…"[৫]

আদর্শবান পুরুষের বাধা যত প্রবল হয়, আদর্শের উপর তাঁর নিষ্ঠা ততই প্রবলতর হয়। পরবর্তীকালে এই আদর্শ-নিষ্ঠার কথায় স্বামীজী বলেছেন, "কি জানিস্ বাবা, সংসার সবই দুনিয়াদারি! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব দুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, ওসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোনও মহৎ কার্য করা যায় না। এই শ্লোকটা জানিস্ না?—

'নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেচ্ছম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥'

—লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা যুগান্তে তোর দেহপাত হোক, যেন ন্যায় পথ থেকে ভ্রষ্ট হোস্‌নি। কত বড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌঁছান যায়! যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন

---

৩ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৬৪

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (২য় ভাগ) পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩২৭

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—পৃঃ ১০।১৬৪-৬৫

ঘসেমেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে।"[৬]

পরিব্রাজক জীবনেও তাঁকে এই ধৈর্যরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সর্বাবস্থায়, সর্ববিধ দ্বন্দ্বে তিনি অবিচলিত ছিলেন গীতোক্ত যোগীর মতো :

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥

স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবন তাঁর এই মানসিক স্থৈর্যেরই নিদর্শন: "পথে বহুবার তাঁকে অনাহারের ও সমূহ জীবন-সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর শান্ত, স্থির মানস-সায়রে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ কখনো ওঠেনি। মরুভূমিতে ও অরণ্যপথে তিনি একাকী ভ্রমণ করেছেন, ধর্মোন্মাদ তান্ত্রিকদের কবলে পরে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, কোথাও কখনো বা অনাহারে প্রায় মরণের দ্বারে গিয়ে পৌঁছেছেন, কত হৃদয়হীন অপরিচিতের বিদ্রূপ এবং নিন্দাবাদও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু দুঃসাহসিক পরিব্রাজক-জীবনের এই বিপদসঙ্কুল পথের উপর দিয়ে তিনি সব বাধা পায়ে দলে নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন। ধনী ব্যক্তিদের গৃহে তিনি যখন অতিথিরূপে বাস করেছেন, তখন তাঁদের সহৃদয়তায় কখনো আনন্দ-উদ্বেল হয়ে ওঠেননি, গুণমুগ্ধ অভ্যাগতদের শ্রদ্ধায় ত্যাগের কঠোর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিতও হননি। দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র-ধারী, মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক-বসন এই সন্ন্যাসী সামন্ত রাজাদের আতিথেয়তা যতখানি প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি নিয়ে গ্রহণ করেছেন, দীন পারিয়ার আতিথ্যও গ্রহণ করেছেন ঠিক ততখানি তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে। আবার যাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের দ্বার থেকেও ফিরে এসেছেন সমপরিমাণ মানসিক স্থৈর্য নিয়েই।"[৭]

যে বিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যা এতদিন আগ্নেয়গিরির মতোই সুপ্তাবস্থায় ছিল, তার যথার্থ স্ফুরণ হয়েছিল পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায়। সেই বিরাট মনীষার কাছে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও স্তব্ধবাক হয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ ঝঞ্ঝার মতো এসেই তা তাঁদের হৃদয়কে তোল-পাড় করেছিল।

কিন্তু তাঁর এই বিজয়-পথ কুসুমাকীর্ণ ছিল না। একদিকে খ্রীষ্টান মিশনারিগণের অপপ্রচার আর একদিকে তাঁর স্বদেশবাসী ও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদের ঈর্ষা-দ্বেষের শাণিত শর। "...যাহা হউক আমি আমেরিকায় যাইলাম। টাকা আমার নিকট অতি অল্প ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই সমুদয় খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিল। আমার কেবল পাতলা গ্রীষ্মোপযোগী বস্ত্র ছিল। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ যদি আমি রাস্তায় বাহির হই, তাহার ফল এই হইবে যে, আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। আমি মাদ্রাজস্থ কয়েকটি বন্ধুর নিকট তার করিলাম। থিওজফিস্টরা এই ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন, 'শয়তানটা শীঘ্র মরিবে—ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।'...আমি এখন এসব কথা বলিতাম না, কিন্তু হে আমার স্বদেশ-

৬ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ (পূর্বকাণ্ড), পৃঃ ১৪১

৭ স্বামী নির্বেদানন্দের Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance হ'তে অনূদিত (উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৭৫)।

বাসিগণ, আপনারা জোর করিয়া ইহা বাহির করিলেন। আমি তিন বৎসর এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। নীরবতাই আমার মূল-মন্ত্র ছিল…”

“তাহার পর তাঁহারা অপর বিরুদ্ধ পক্ষ খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহিত যোগদান করিলেন। এই শেষোক্তেরা আমার বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছিল, যাহা কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না। তাহারা আমাকে প্রত্যেক বাড়ী হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং যে কেহ আমার বন্ধু হইল, তাহাকেই আমার শত্রু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা আমেরিকাবাসী সকলকে আমাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিতে এবং অনশনে মারিয়া ফেলিতে বলিতে লাগিল; আর আমার বলিতে লজ্জাবোধ হইতেছে যে, আমার একজন স্বদেশবাসী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন—আর তিনি ভারতের সংস্কারকদলের একজন নেতা।…আমি ইঁহাকে অতি বাল্যকাল হইতেই জানিতাম, তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। অনেক বর্ষ যাবৎ আমার সহিত আমার স্বদেশবাসীর সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম! যেদিন ধর্ম-মহাসভায় আমি প্রশংসা পাইলাম, যেদিন চিকাগোয় আমি লোকপ্রিয় হইলাম, সেইদিন হইতে তাঁহার সুর বদলাইয়া গেল এবং তিনি প্রকাশ্যেই আমার অনিষ্টাচরণ করিতে, আমাকে অনশনে মারিয়া ফেলিতে, আমেরিকা হইতে লাথি মারিয়া তাড়াইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।”[৮]

পাশ্চাত্যদেশে যারা স্বামীজীর অপাপবিদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল, সেইসব চক্রান্তকারী ও কুৎসা-কারীর বিরুদ্ধে তিনি কোন দিন একটিও অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ করেননি এবং অন্য কাউকেও এসবের প্রতিবিধান করতে বলেননি। নীরবে তিনি সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। এই সময় স্বামীজী যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার অনেক বিবরণ মেরী লুই বার্ক-প্রণীত ‘Swami Vivekananda in America : New Discoveries’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখিকা স্বামীজীর তিতিক্ষা ও ও পবিত্রতারূপ চরিত্র-মাধুর্যে অভিভূত হয়ে গভীর বিস্ময়ে লিখেছেন, “Thus, during a period of outward trial and tribulation, Swamiji's inner mind and heart were filled only with spiritual joy and love. Inscrutable indeed are the ways of God and God men!” (p. 413).

স্বামীজী চরিত্রের এই যে আর একটি রূপ, যা ধৈর্য, সহনশীলতা ও পবিত্রতার সৌরভে সুরভিত, তা আলোচনা করিতে গিয়ে স্বতই আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে—এর মূল কোথায়? কোন্ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি সব রকম সংঘাতকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন? স্বামীজী নিজেই এর স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন একটি চিঠিতে—“ মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম—কেউ আমায় চিনত না—তখন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা ত খোকা! ওরা আর এর চেয়ে বেশী বুঝবে কি করে? কি! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব?…”[৯]

---

৮ ভারতে বিবেকানন্দ (উদ্বোধন-প্রকাশিত), পৃঃ ১৭৯

৯ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪৪-৪৭

এসো মা-জননী, আনন্দময়ী

সেখ সদরউদ্দীন

দুর্গা এসো মা, দুর্গতি নাশো
অনাচার দূর করো,
দশভুজা মাগো, দশটি হাতেতে
ধরো গো কৃপাণ ধরো।
দনুজের দলে ছেয়ে গেছে আজ
সারাটা বিশ্বভূমি,
এসো মা চণ্ডী, এসো ভৈরবী,
দনুজ-দলনী তুমি

এসো পার্বতী, শংকরী মাগো,
সন্তান কাঁদে দুখে,
অন্নপূর্ণা দাও মা অন্ন
ক্ষুধিত জনের মুখে।
এসো মা সারদা জগজ্জননী
জগৎ করো মা আলো,
জগদ্ধাত্রী-আগমনে আজ
ধুয়ে মুছে যাক কালো।

এসো মা-জননী আনন্দময়ী,
আনন্দ নাহি ধরে,
মহোৎসবের বাজনা বেজেছে
বাংলার ঘরে ঘরে।

মহাত্মা গান্ধী ও দরিদ্রনারায়ণ*

স্বামী অমলানন্দ

দরিদ্রের জন্য যাঁর হৃদয় কাঁদে, যিনি হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দু ক্ষয় করেন দরিদ্রের দুঃখমোচনে, আমরা তাঁকেই বলি মহাত্মা। কথাগুলি স্বামী বিবেকানন্দের। মহাত্মা নামের এই সংজ্ঞা আক্ষরিক ভাবে সত্য হয়েছিল গান্ধীজীর জীবনে। দরিদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল ভারতবাসী ছিল তাঁর একান্ত আপনার জন। তাই ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা গান্ধী একটি পুণ্য নাম। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত উদ্বেলিত হয়েছিল এই নামের প্রভাবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় চরিত্র। রোঁমা রোঁলার কথায়, "ইনি সেই মানুষ, যিনি তিরিশ কোটি মানুষকে কর্ম-প্রেরণায় জাগিয়ে তুলেছেন, সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে করেছেন কম্পমান, যিনি মানুষের রাজনীতির মধ্যে প্রবর্তন করেছেন দু'হাজার বছরের সব থেকে শক্তিমান এক নীতির আন্দোলন।" সত্য ও অহিংসার পূজারী এই প্রচণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতার শক্তির উৎস ছিল তাঁর কুসুম-কোমল হৃদয়, যে-হৃদয় দীন দরিদ্র অবহেলিত অবজ্ঞাতের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্তমোক্ষণ করে চলেছিল।

কী জ্বালা অবহেলিত মানবত্বের, কী দুঃখ দরিদ্র মানুষের, তার পরিচয় গান্ধীজী পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। ধনী ব্যবসায়ীর কাজকর্ম দেখবার জন্যই তিনি গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু বিধাতাপুরুষ তাঁকে নিয়োগ করলেন দীন দুঃখী গিরিমিটিয়াদের দুঃখমোচনে। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে গিরিমিটিয়া বলতে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের বোঝাত। ডারবানে তিনি যখন পৌঁচেছেন, তখন লক্ষাধিক ভারতীয় সেখানে বাস করছে। অল্পকিছু ধনী ব্যবসায়ী ছাড়া তার বেশীর ভাগই হল দরিদ্র শ্রমিক যারা রুজি-রোজগারের জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে সমুদ্র পার হয়ে বিদেশ বিভুঁইতে হাজির হয়েছে। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজনেই তাদের যেতে হয়েছিল সেখানে; ইংরেজরা তখন সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভারতীয়েরা তাদের সম্পদ সৃষ্টি করলেন। তাঁদেরই পরিশ্রমে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যভূমিতে গড়ে উঠেছে লোকালয়। কিন্তু তার বিনিময়ে ভারতীয়রা পেয়েছে অকথ্য অত্যাচার আর লাঞ্ছনা; পেয়েছে গিরিমিটিয়া ও কুলি নামের অপমানকর আখ্যা।

মোহনদাসকেও কুলি-ব্যারিস্টাররূপে সেই অপমান এবং দৈহিক লাঞ্ছনার ভাগ নিতে হয়েছিল। দীন দুঃখীর দুঃখ, অপমানিতের ব্যথা বুঝবার জন্য বোধহয় এরও প্রয়োজন ছিল। মহাত্মা হওয়ার প্রথম পাঠ তিনি পেয়েছিলেন এর ভিতর দিয়ে। অবশ্য গুজরাটি একটি সঙ্গীত পূর্বেই তাঁর মানসভূমি প্রস্তুত করে রেখেছিল :

> বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে,
> যে পীড় পরাই জানেরে।
> পরদুঃখে উপকার করে তোয়ে
> মন অভিমান ন আনেরে॥

তাঁকেই সত্যিকারের বৈষ্ণব বলি যিনি পরের

---

* আকাশবাণী (কলিকাতা)-র সৌজন্যে

দুঃখ বোঝেন, পরের উপকার করেন এবং তা করে যাঁর মনে অভিমান জাগে না। পরের উপকার করে আমরা যেন ভাবতে পারি আমরাই কৃতার্থ হলাম। যাকে দয়া করলাম সে নয়। গান্ধীজীর জীবনচর্যায় এই কথাই স্পষ্ট দেখতে পাই। পরোপকার করে তিনি নিজে কৃতার্থ হচ্ছেন, কেন না দরিদ্রের মধ্যেই তিনি নারায়ণকে দেখেছিলেন। সেই দরিদ্রনারায়ণের সেবাই ছিল তাঁর পূজা, তাঁর জীবনব্রত।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়—গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিরিমিটিয়াদের জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছেন—নাটাল কংগ্রেস স্থাপন করছেন, তখন পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে আর এক মহাপুরুষ বলছেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

পৃথিবীর দুই প্রান্তে একই তত্ত্বের, একই জীবন-দর্শনের বাতাবরন সৃষ্টি হচ্ছে এবং যার অন্তরের কথাই দরিদ্রনারায়ণের সেবা।

ঊনবিংশ শতক বিদায় নিল; নূতন শতকের নবীন চেতনা নিয়ে সূর্য উঠল পূবের আকাশে। ভারতের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন গান্ধীজী। ১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাসভায় তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—"যখন ভারতের কোন এক প্রান্তে একখানি বিরাট অট্টালিকা দেখি, তখন মনে হয় উহা দরিদ্র কৃষকের রক্ত দিয়ে তৈরী।" ধনী ও নির্ধনের বৈষম্য এবং বিশাল জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। দেশবাসীর সামনে রাখলেন চরখা ও গ্রামোদ্যোগ পরিকল্পনা। চরখা ও কুটিরশিল্প দিয়ে ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে কিনা সে বিষয়ে হয়ত বিতর্কের অবকাশ আছে; কিন্তু যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ লোক বাস করে গ্রামে, সেখানে গ্রামের উন্নয়ন সকলের আগে। সম্পদ উৎ-পাদনের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে সেই সম্পদের সুষম বণ্টন হোক—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি বলতেন, ভূমি গোপালকী, জমি ভগবানের। জমির ফসলে মালিকের যেমন অধিকার, শ্রমিকেরও তেমনি অধিকার। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন:

"ভারতের কোটি কোটি লোকের এক বেলার বেশী আহার জোটে না। এই অগণিত লোকের খাওয়া পরার পরে যা বাঁচবে তাতেই আমাদের অধিকার, তার বেশীতে নয়।"

ভারতের জাতীয় সংগ্রামের সর্বময় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছিলেন গান্ধীজী। তখন জাতীয় কংগ্রেসে এল যুগান্তর। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের যেন এক জন্মান্তর ঘটে গেল। বিশাল এই দেশের বিপুল জনতার সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে উঠলেন।

চম্পারণের একদিনের ঘটনা। নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজী আন্দোলন পরি-চালনা করছেন; একদিন তিনি দেখলেন মেয়েরা বড নোংরা কাপড় পরে থাকে। তিনি কস্তুরবাকে বললেন মেয়েদের যেন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে উপদেশ দেয়। কস্তুরবা মেয়েদের ডেকে বুঝিয়ে বললেন। তখন একটি মেয়ে সাহসে ভর করে কস্তুরবাকে বললেন, "তুমি তো মা আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলছ—কার না সাধ হয় পরিষ্কার কাপড় পরতে! কিন্তু তা করি কি

করে? আমাদের যে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই।" গান্ধীজী একথা শুনলেন। সেইদিন থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন দুখানির বেশী তিনখানি কাপড় তিনি ব্যবহার করবেন না। দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব ভাইদের মত তিনি হাঁটুর উপরে কাপড় পরতে লাগলেন। বহু-প্রত্যাশিত ভারতের জনগণের অধিনায়ককে ভারতবাসীরা খুঁজে পেল কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে।

কিন্তু তিনি নিজেকে নেতা না মনে করে জনগণের একজন বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন :

"অগণিত জনতার আমি একজন। তাদের আমি জানি, এই দাবী আমি রাখি। অষ্টপ্রহর আমি তাদের সঙ্গে। তারাই আমার দিবস-রজনীর একমাত্র ভাবনা। কারণ মূক জনের হৃদয়নিবাসী ভগবান ব্যতীত আমি ভগবান মানি না। ভগবানের সান্নিধ্য তারা অনুভব করে না, আমি করি। আর এই অগণিত জনতার সেবার মাধ্যমেই আমি ভগবানরূপী সত্যের বা সত্যরূপী ভগবানের আরাধনা করি।"

জনগণের কথাই তিনি অষ্টপ্রহর ভেবেছেন। তাদের ভিতর আবার যারা অস্পৃশ্য—যাদের তিনি 'হরিজন' আখ্যা দিয়েছিলেন তাদের জন্যও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন :

"আমি পুনরায় জন্মাতে চাই না। যদি পুনরায় জন্মাতে হয় তবে আমি যেন অস্পৃশ্যদের মধ্যেই জন্মি। তাহলে তাদের দুঃখ, বেদনা, তাদের জীবনাধিকারের শরিক হতে পারব।"

বলা বাহুল্য শুধু হরিজনদের জন্য নয়, সাধারণভাবে সকল অবহেলিত, সকল দরিদ্রের জন্য তাঁর এই আকুতি। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তিনি এই জীবনের সব কিছু দিয়েছিলেন —জন্মান্তরের জন্যও তিনি রেখে গেলেন তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা।

মহাত্মা গান্ধী কালজয়ী মহাপুরুষ। একটি যুগের বিশেষ প্রয়োজন পূর্ণ করেই তাঁর জীবনের অবদান শেষ হয়ে যায়নি। দেশ ও কালকে অতিক্রম করে মহাকালের দৃশ্যপটে এই মহা-জীবনের যে শাশ্বত ও জ্যোতির্ময় ছবি ফুটে উঠেছে তার প্রয়োজন ও প্রেরণা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য। মহামানবের সেই কালজয়ী ভাবমূর্তিকে আমরা যেন "চিত্ত ভরিয়া নিত্য স্মরণ করি।"

"মানুষ হতে হলে প্রথমেই চাই বিনয় অর্থাৎ একটু নত হওয়ার মনোভাব, আর নিজের সত্যতা সম্বন্ধে একটু সন্দেহ, আর চাই অন্যের কাছ থেকে শেখবার, নেবার ইচ্ছা।"

"যে সেবার মধ্যে বিনয় নেই, সেই সেবা স্বার্থপরতা ও স্বাভিমানের সমান।"

—মহাত্মা গান্ধী

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্রিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

চার

পরিশিষ্ট : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বসুমতী ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত পত্রিকা-প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। 'দৈনিক বসুমতী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে' (১৩৭১) আমি 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ও বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রধানতঃ তা থেকেই তথ্য-সংগ্রহ করে দিচ্ছি। কিছু সংবাদ ঐ স্মারক গ্রন্থের অন্যান্য রচনা থেকেও নিয়েছি।

উক্ত প্রবন্ধ-সূচনায় লিখেছিলাম :

"বসুমতী সংবাদপত্রগোষ্ঠী ও বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের সংস্কৃতি-জীবনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম। দুঃখের বিষয় বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই শ্রেষ্ঠ কর্মী মানুষটির যোগ্য স্থান এখনো নির্ধারিত হয়নি। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে একদা বসুমতী তাদের 'নিজস্ব' সংবাদ-পত্র ;······বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের সুলভ প্রকাশনগুলি দীর্ঘদিন ধরে সর্বসাধারণের কাছে শ্রেষ্ঠ ও নাতিশ্রেষ্ঠ রসসাহিত্য, ধর্মসাহিত্য, বিদেশী ক্ল্যাসিকের অনুবাদ পৌঁছে দিয়ে এসেছে।···

"বাংলার লোকশিক্ষার এই সংগঠক মানুষটি তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎসরূপে পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং গুরুভ্রাতা ও বাল্যবন্ধু স্বামী বিবেকানন্দকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের সংযোগ প্রথমাবধি। অবশ্য সূচনাপর্বে তাঁর ভূমিকা খুব বড নয়। পরবর্তীকালেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। তিনি গৃহী ও ব্যবসায়ী থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ভক্ত গৃহী এবং পুস্তকই তাঁর ব্যবসায়-সামগ্রী। অধিকন্তু তিনি সংবাদপত্রের পরিচালক। সুতরাং আমরা দেখতে পাই ভক্ত উপেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকা এবং প্রকাশনের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করে যাচ্ছেন প্রবল উৎসাহে। সাধারণ বাঙালীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে উপেন্দ্রনাথের বসুমতীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।"

উপেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন না, একথা স্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উপেন্দ্রনাথের উল্লেখ মাত্র একবার পাওয়া গিয়েছে। শোনা যায় কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শেষ অসুখের সময়ে যখন 'আত্মপ্রকাশে ভক্তদের অভয়দান' করেছিলেন (যা এখন শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু-ভাব নামে সুপরিচিত) তখন সেখানে উপেন্দ্র-নাথ উপস্থিত ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ-পত্নীর স্মৃতিকথায় (শ্রীমতী রানী চন্দ-সংগৃহীত) উপেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের স্নেহের কথা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁকে দাহ করতে যাঁরা নিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্র-নাথ ছিলেন এবং ফেরার পথে বিষাক্তসর্পদষ্ট হয়েও আশ্চর্যভাবে পরিত্রাণ পান।

ভাবাদর্শে উপেন্দ্রনাথ কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকা-

নন্দ-সমর্থক ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁর দেহাস্থি সংরক্ষণের ব্যাপারে, এবং তাঁর জীবন ও বাণী প্রচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে ভক্তদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এক দিকের নেতা ছিলেন বৈষ্ণবপন্থী গৃহী ডাঃ রাম দত্ত, অন্য পক্ষে অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাম দত্ত চেয়েছিলেন, কাঁকুড়গাছিতে তাঁর বাগানে দেহাস্থি সংরক্ষণ করা হোক ; সন্ন্যাসী শিষ্যদের অভিপ্রায় ছিল গঙ্গাতীরে কোনো স্থানে তাকে স্থাপনা করবেন। রাম দত্তের ইচ্ছাই তখন কার্যকরী হয়েছিল, কারণ গৃহত্যাগী নিঃসম্বল সন্ন্যাসী যুবকদের ইচ্ছানুরূপ সামর্থ্য ছিল না। উপেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে রাম দত্তেরই সমর্থক, 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থ থেকে তা পাই।

এ-ব্যাপারেই শুধু নয়, রাম দত্ত যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার আরম্ভ করেন প্রকাশ্য বক্তৃতায় ও কীর্তনাদির দ্বারা (১৮৮৭-১৮৯৩) তখনো উপেন্দ্রনাথ আরও কয়েকজনের সঙ্গে রাম দত্তের সহায়তা করেন প্রবল উৎসাহে, একথা পেয়েছি তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় এবং 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে।

এই সব তথ্য থেকে বুঝতে পারি, স্বামীজীর পক্ষে উপেন্দ্রনাথকে নিজ ভাবপ্রচারে শ্রেষ্ঠ সহায়ক মনে করা সম্ভব ছিল না। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অগস্ট সাপ্তাহিক বসুমতী ভূমিষ্ঠ হয়েছিল—তা সত্ত্বেও স্বামীজী সংঘ-ভাববাহন একটি বাংলা পত্রিকার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যায় যে 'আত্মনিবেদন' বেরিয়েছিল, তার মধ্যেও লেখা ছিল না শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের জন্যই এই পত্রিকার জন্ম ; সাধারণ একটি সংবাদপত্ররূপেই বসুমতীর আবির্ভাব, এই রকমই ঘোষিত হয়েছিল।[1] আমাদের বিশ্বাস তার ফল ভালই হয়েছিল, কারণ সংঘ-মুখপত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রচারিত বলে ধরে নেওয়া হয়, সেজন্য পাঠকের অধিক আকর্ষণ ও অধিক বিকর্ষণ দুই-ই তা পায় ; কিন্তু দলীয় মুখপত্ররূপে চিহ্নিত নয়, এমন পত্রিকার প্রচারণা স্বচ্ছন্দে পাঠকচিত্তে প্রবেশ করে যায়।

যাইহোক, শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"আমাদের নরেন আর উপেন প্রচারের কাজ করবে। নরেন লেকচার দেবে, উপেন ছাপাখানা করবে।"[2] আরও শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ উপেন্দ্রের বটতলার ছোট বইয়ের দোকানে গিয়েছিলেন। দোকানের দরজা ছোট, নীচু। বিব্রত উপেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'যা, তোর দরজা বড় হবে।'[3]

বটতলায় একখানি 'ছোট কেতাবের দোকান' করে উপেন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ। ১৮৮০ (১৮৮১ ?) খ্রীষ্টাব্দে ঐ দোকানের পত্তন। উপেন্দ্রনাথ অতীব সাহসের সঙ্গে সংসাহিত্য প্রচারের পরিকল্পনা করেন, যা ভবিষ্যতে বাংলার সংস্কৃতিজীবনে তাঁর ভূমিকাকে গৌরবান্বিত করবে। তিনি অত্যন্ত অল্প মূল্যে বাংলা,

---

১ 'আত্মনিবেদনে'র অংশ : "সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয় রাজনীতিও ইহাতে থাকিবে, দেশের অভাব-অভিযোগাদির কথাও থাকিবে। তদ্ভিন্ন ইতিহাস, দেশ-নগরাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, হিন্দুর পুরাতন মহিমার কথা, ধর্মশাস্ত্রাদির কথা, উপন্যাস, রঙ্গরহস্য প্রভৃতি সুখপাঠ্য বিষয় থাকিবে। অন্নপ্রাণ বাঙালী অবসন্ন প্রাণে যাহাতে দুটো সুখের কথা, দুটো অর্থের কথা, দুটো উপায়ের কথা, দুটো আশার কথা, দুটো হাসির কথা, পড়িতে পায়, বসুমতীতে প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টা করা যাইবে।"

(বসুমতী স্মারক গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'বসুমতীর ইতিকথা')

২ প্রাণতোষ ঘটক-লিখিত 'জয়তু দৈনিক বসুমতী' রচনা। (বসুমতী স্মারক গ্রন্থ)

৩ *Seven Gates of Wisdom*—দিলীপ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ। (ঐ)

সংস্কৃত ও বিদেশী সাহিত্যের (অনুবাদে) প্রচারের ব্যবস্থা করেন।*

উপেন্দ্রনাথ এতেই সন্তুষ্ট থাকেননি। পত্রপত্রিকা প্রকাশে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রথম পর্যায়ে তাঁর এই বিষয়ে প্রচেষ্টা সম্বন্ধে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি জানিয়েছেন, 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রবর্তন উপেন্দ্রনাথই করেন। "উপেন্দ্রবাবুর সহিত 'সাহিত্যে'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৯৬ (১৮৮৯) সালে উপেন্দ্রনাথ ৩নং বিডন স্কোয়ার হইতে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামে একখানি মাসিকপত্রের প্রচার করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' প্রকাশিত হয়। শিবপ্রসন্নবাবু চারি পাঁচ মাস 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, অগ্রহায়ণ মাসে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' আমার চোখে পড়ে এবং আমি উপেন্দ্রবাবুর সাহিত্যে পরিচিত হই। উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, আমার অগ্রজ-তুল্য সুহৃৎ মথুরানাথ সিংহের প্রেরণায়, আমি 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। আমার সহিত 'কল্পদ্রুমের' কোনও আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না।···চৈত্র মাসে প্রথম খণ্ড শেষ করিয়া আমি বৈশাখ হইতে বর্ষ গণনার ও নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা করি এবং 'কল্পদ্রুম' বর্জন করিয়া 'সাহিত্য' নাম রাখি। কিন্তু ডাকঘরে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র নামে স্ট্যাম্পের টাকা জমা ছিল। এই জমা (জমার জন্য) প্রথম তিন মাস 'সাহিত্যে'র মলাটে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র নামও রাখিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালেও উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১২৯৭ সালের শেষভাগে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্ব ও স্বামিত্ব ত্যাগ করেন। আমি ১২৯৮ সাল হইতে 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হই। আমাকে 'সাহিত্য' দিবার পর বোধ হয় ১২৯৮ সালে উপেন্দ্রবাবু আবার 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র প্রচার করিয়াছিলেন। সে পর্যায়ে সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তফী 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। অল্পকাল পরে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' বন্ধ করিয়া দেন।" সমাজপতি জানিয়েছেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'র প্রতি প্রীতি বজায় রেখেছিলেন, এবং তার বিপদের দিনে সাহায্য করেছেন।

'সাহিত্য কল্পদ্রুম' ও 'সাহিত্যের' প্রবর্তন হয়েছিল বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে। বাংলা দেশে এইকালে প্রধান সাময়িক পত্রিকাগুলি

---

* এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন—"তিনি যখন সাহিত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন বাংলায় এত পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। তখন মধুসূদন 'মহীর পদে মহানিদ্রাগত', বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তখন মধ্যগগনে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কেবল অরুণবিকাশ সূচনা। তখনও 'বটতলা' বাংলার পুরাতন সাহিত্যের দ্বারপাল; পরিষদের কল্পনা তখনও বিকশিত হয় নাই। সেই সময়ে উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পরিণতি বসুমতী সাহিত্যমন্দিরে। এই সাহিত্যমন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলি নামমাত্র মূল্যে বাঙালীর গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়াছে। সেই মন্দির হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ, সঞ্জীবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে। এই সাহিত্য-প্রচারই বোধহয় তাঁহার নিয়তিনির্দিষ্ট কার্য ছিল।...... পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের মধ্যে এক এক জন এক এক দিকে দিক্‌পাল। এক এক জন এক এক দিকে কাজ করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের মত উপেন্দ্রনাথও এক বিভাগে কার্যের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

সংস্কারবাদী ও ব্রাহ্মদের করায়ত্ত। তার ফলে হিন্দু ঐতিহ্যবাদীরা যথেষ্ট পরিমাণে নিজ বক্তব্য তুলে ধরতে পারতেন না। সেই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রথমে উপেন্দ্রনাথ, পরে সমাজপতি এগিয়ে এসেছিলেন। এ বিষয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৭ চৈত্র, ১৩২৫ সালে দৈনিক বসুমতীতে লিখেছিলেন: "যে 'সাহিত্য' আজ সমাজপতির সম্পাদকত্বে সর্বত্র সমাদৃত, উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক। তখন বাংলায় উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রের অভাব ছিল—বিশেষ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাহেতু তখনকার মাসিকপত্রগুলি সম্প্রদায়বিশেষরই রচনায় সমৃদ্ধ হইত—নূতন লেখকদিগের প্রতিভা সাহিত্যে প্রযুক্ত হইবার অবসর পাইত না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য 'সাহিত্যে'র প্রচার—উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক, সমাজপতি তাহার সম্পাদক।" সংবাদপত্র-জগতে উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা হেমেন্দ্রপ্রসাদ অতঃপর লিখেছেন: "একসময়ে 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্র, 'হিতবাদী'র কাব্য-বিশারদ ও 'বসুমতী'র উপেন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রত্রয়ের পরিচালক ছিলেন,—উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদের শেষ।"

আগেই বলা হয়েছে, নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যাবধি পরিচয়। সে পরিচয়ের অল্প হলেও অন্তরঙ্গ ছবি দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ-পত্নী তাঁর স্মৃতিকথনে (রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থে)। মামার বাড়িতে মানুষ দরিদ্র বালক উপেনের প্রতি কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেরই গভীর স্নেহ-সহানুভূতি ছিল। এবিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন:

"উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্রাহ্মণকুমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট 'আমার অং হউক' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাশীপুর বাগানের শেষ সময় বা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দেহত্যাগের পর যোগেন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) চৌদ্দ টাকা দিয়া একটি পুরাতন হ্যাণ্ড প্রেস (যাহার কাঠ মাত্র অবশেষ ছিল) কিনিয়া উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেন। তারপর তিনি চিৎপুর রোডে বটতলায় একখানি ছোট দোকান করেন।[৫] যোগেন মহারাজ সেই দোকানের সামনে দিয়া যাইলে উপেন মুখোপাধ্যায় আসিয়া প্রণাম করিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতেন। ১৮৯০ সালে উপেন মুখোপাধ্যায় বিডন উদ্যানের পূর্বদিকের রাস্তাটির দক্ষিণ কোণে একখানি বাড়ি ভাড়া লইয়া একটি ছাপাখানা স্থাপন করিলেন, এবং

---

৫ দোকানটি বোধহয় কিছু আগেই হয়েছিল, সম্ভবতঃ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। মাসিক বসুমতী স্মারক গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দোকানে গিয়েছিলেন—নিশ্চয়ই তিনি শেষ অসুখের আগেই গেছেন। আগে বটতলায় দোকান, তারপরে সেখানে প্রেস—এমন হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ উপেন্দ্রনাথের দোকানে সত্যই গিয়েছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। বসুমতী স্মারক গ্রন্থে দিলীপ দাশগুপ্ত লিখেছেন, তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু গ্রন্থের মূল সম্পাদকীয়ের ('লহ প্রণাম') বিবরণ অন্য প্রকার: "দৈনিক বসুমতী তখনও প্রকাশিত হয়নি সাপ্তাহিকও না। উপেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বসুমতী সাহিত্য মন্দির তখন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল ধর্মগ্রন্থ থেকে শুরু করে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাবলী সুলভে প্রকাশ করে সুধীসমাজে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।... বিরাট চাহিদা মেটাতে হিমসিম খান উপেন্দ্রনাথ। ছোট্ট প্রেস, সময়মত বই ছেপে বা করার ভীষণ সমস্যা। ছোট্ট বাড়ি, ছাপা বই রাখবার স্থান সঙ্কুলান হয় না।... দৈনিক বিক্রি হাজার-বারশো টাকার মত, সে যুগে এক অকল্পনীয় ঘটনা। কিন্তু ঋণও অনেক।.. হাতে প্রয়োজনমত টাকা জমে না। বড় বাড়ি, বড় প্রেস স্বপ্নেই থেকে যায়। শেষে একদিন কথায় কথায় এই সমস্যার কথা নিবেদন করলেন উপেন্দ্রনাথ গুরুদেব রামকৃষ্ণের কাছে। সব শুনে সস্নেহে ঠাকুর বললেন—"উপীন, য তোর দরজা বড় হবে।"

সময় পাইলেই নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও সর্ববিষয়ে পরামর্শ লইতেন। তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন মহারাজের নিতান্ত অনুগত এবং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে প্রায় সন্ধ্যার সময় আসিতেন। পুস্তক ছাপিবার বিষয় নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উপাদান দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে তিনি 'রাজভাষা' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার বিশেষ অর্থাগম হয়।[৬] নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁহার ছাপাখানার বাড়িতে যাইতেন।"[৭] ('শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', প্রথম খণ্ড)

১৮৮০-৮১ থেকে ১৮৯০-৯১ পর্যন্ত সময়ে নরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথের পুস্তকব্যবসায়ে কতখানি সাহায্য করেছিলেন, তার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে সাহায্যের পরিমাণ যে সবিশেষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইকালে নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন স্বামীর কাছে পরামর্শ নিতে উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন, এবং ঐ দুজনে উপেন্দ্রনাথের বিডন স্ট্রীটের দোকানে প্রায়ই যেতেন, এই প্রয়োজনীয় সংবাদ মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে পেয়েছি। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত, তাঁর পরামর্শকে বন্ধুবান্ধবেরা মান্য করতেন; এবং বিস্ময়কর হলেও সত্য,—নরেন্দ্রনাথের বাস্তব বুদ্ধি ছিল অসাধারণ, বৈষয়িক পরামর্শ দিতে পারতেন, দিতেনও সহজ খুশিতে, অবশ্য নিজের জন্য সে বিষয়বুদ্ধি প্রয়োগ করা তাঁর হয়ে ওঠেনি, কারণ ঈশ্বর তাঁকে বিষয়াসক্তি দেননি। 'রাজভাষা' গ্রন্থের পরিকল্পনা নরেন্দ্রনাথেরই, মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, এই বইটির আর্থিক সাফল্য, যতদূর শোনা যায়, উপেন্দ্রনাথকে বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উপেন্দ্রের ব্যবসার প্রয়োজনেই নরেন্দ্রনাথ হারবার্ট স্পেনসারের এডুকেশন বইটি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। এ জাতীয় সাহায্য করতে নরেন্দ্রনাথ অভ্যস্ত ছিলেন। "কোনো দরিদ্র সঙ্গীতপুস্তক-প্রকাশককে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।"[৮]

উপেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার প্রতি নরেন্দ্রনাথের সহানুভূতির আর একটি প্রমাণ, উপেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত পূর্বোক্ত 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকার একেবারে প্রথম সংখ্যায় তিনি টমাস-আ-কেম্পিসের *Imitation of Christ* গ্রন্থটির অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন 'ঈশা-অনুসরণ' নাম দিয়ে। অনুবাদ-সূচনায় তিনি একটি ভূমিকাও নিজস্বভাবে যোগ করেছিলেন। অনুবাদটি অবশ্য শেষ হয়নি, পাঁচ সংখ্যা মাত্র বেরিয়েছিল, কারণ ঈশা ও ঈশ্বর অনুসরণে নরেন্দ্রনাথ অতঃপর বেরিয়ে পড়েছিলেন।

---

৬ বসুমতী স্মারক গ্রন্থে শ্রীসুধীর বেরা লিখেছেন: "বসুমতী-প্রকাশিত 'রাজভাষা' ইংরেজি শিক্ষায় প্রামাণ্য বই হিসাবে স্বীকৃত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।"
এই বইখানি 'উপেন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি।'

৭ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৯০?) উপেন্দ্রনাথ বিডন স্ট্রীটের বাড়িটি কিনে যোগেন মহারাজকে খবর দিতে যান বলরাম বসুর বাড়িতে—সেখানে উপস্থিত মহেন্দ্রনাথ দত্ত সে বিষয়ে লিখেছেন। ঐ বাড়িটি ১৩,০০০ টাকায় কেনা হয়েছিল। "উপেন মুখুজ্জে যোগেন মহারাজকে গুরুর মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, তাই আহ্লাদ করিয়া খবরটি দিতে আসিয়াছেন।" ('ঘটনাবলী', ২য়)।

৮ বইটির নাম "সঙ্গীত কল্পতরু"। "শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি.এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত।" প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১২৯৪ সালে। বইটির ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা নরেন্দ্রনাথের লেখা; বৈষ্ণবচরণ বসাক প্রথম সংস্করণে জানিয়েছিলেন, সঙ্গীত-সঙ্কলনের কাজ নরেন্দ্রনাথই প্রধানতঃ করেন।

পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ এর পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে পড়বেন। স্বামী বিবেকানন্দ নামক হিন্দু-সন্ন্যাসী যে আসলে রামকৃষ্ণ-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নন, একথা রামকৃষ্ণগোষ্ঠীতে ধরা পড়া মাত্র সকলে আনন্দবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন—উপেন্দ্রনাথও তার ভাগ নিয়েছিলেন তা না বললেও চলে। সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতা যখন আমেরিকাস্থ বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত, তখন কিছু ভিন্ন কণ্ঠও শোনা গিয়েছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও তাঁর অনুবর্তীদের কার্যকলাপের কথা এখানে বাদ দিচ্ছি. বিস্ময়ের কথা বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও লেখক (এবং অধ্যাপক) নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন. এন. ঘোষ), যিনি অল্প কিছুদিন পরে বিবেকানন্দ-বন্দনায় উচ্চকণ্ঠ হবেন, তিনিও বিরূপ সমালোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান নেশন' নামক সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকার মালিক-সম্পাদক। স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় নবম দিবসে 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সেই প্রবন্ধটিকে এন. ঘোষের কাগজে ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করা হয়। 'হিন্দুধর্ম' রচনাটি, স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে পড়ে, একথা সেই সময়েই বহু জন বলেছিলেন। হিন্দু তত্ত্ববিদ্যার অন্যতম অধরিটি বালগঙ্গাধর তিলকের 'মারহাট্টা' পত্রিকায় ঐ রচনাটির প্রশংসা করে বলা হয়েছিল, স্বামীজী 'true principles of Hinduism'-কে যথার্থই প্রকাশ করেছেন; এই 'precious gem' সম্বন্ধে সাধুবাদ অন্যত্রও যথেষ্ট ছিল; ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর রচনা সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা বলেছেন, এই লেখাটি সম্বন্ধে তা বিশেষভাবে সত্য: 'We have, what is, not only a gospel to the world at large, but also, to its own children the Charter of the Hindu faith.' এমন একটি লেখাকেই এন. এন. ঘোষ আক্রমণ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, হিন্দুধর্মের মত জটিল ধর্মকে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে কখনই প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সুতরাং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য 'not merely inadequate, but is inaccurate, inconsistent, inconclusive.'

এন. ঘোষের লেখার যথেষ্ট প্রতিবাদ হলেও ক্ষতির দিক সম্পূর্ণ দূর হয়নি। হিন্দুধর্মের এই বরেণ্য আচার্যের দ্বারা প্রচারিত মত যে খাঁটি হিন্দুধর্ম নয়, একথা যখন জনৈক সুপরিচিত হিন্দুর দ্বারা লিখিত হল, তখন তার সুযোগ গ্রহণ করতে খ্রীস্টান মিশনারী ও ব্রাহ্মরা দেরী করেননি। তাঁদের বিবেকানন্দ-বিরোধী রচনাসমূহে বহুভাবে এন. ঘোষের রচনাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। এন. ঘোষ অল্প দিনের মধ্যেই বুঝেছিলেন, তিনি কী অন্যায় করেছেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য, কিংবা হঠাৎ-বিখ্যাত ব্যক্তির জারিজুরি ভেঙে দেওয়ার জন্য, কিংবা অন্য কোনো সদভিপ্রায়ে তিনি ঐ লেখাগুলি লিখেছিলেন বলতে পারব না, রচনার কারণ যাই হোক, তিনি পরে দোষ স্বীকার করেছিলেন এবং অনুতপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, স্বামীজীকে বাঙালীরা চিনতে পারেনি—মাদ্রাজীরাই তাঁর প্রতিভার যথার্থ সমাদর করেছে: "We as a people, be it said to our eternal discredit, have never exhibited a faculty for appreciating our own great men."

স্বামীজীর বন্ধু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এন. ঘোষের অযথা আক্রমণের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি ঠিক কি

লিখেছিলেন, কোথায় তা প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা তা জানি না। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের প্রতিবাদ এমন জোরালো হয় যে, এন. ঘোষ তার উত্তর দিতে বাধ্য হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ান নেশনে এন. ঘোষ উপেন্দ্রনাথের প্রতিবাদের উত্তরে যা লিখেছিলেন তার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি :

"Our friend Babu Upendra Nath Mukerjee of Shampukur Street is charming in company but is apt to be fretful in controversy on paper. Our notice of Swami Vivekananda's paper on Hinduism has elicited from him a criticism which is quite needlessly snappish, and, we feel bound to say, is not nearly as acute and coherent as we might expect. He is angry for our calling the name 'Swami Vivekananda' a disguise ; but we meant no offence. Every disguise is not dishonest, and a change of name is a disguise. We pass on to his arguments⋯."

এন. ঘোষ অতঃপর বিস্তৃতভাবে উপেন্দ্রনাথের আপত্তির উত্তর দিয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথের লেখার বিরুদ্ধে তিনি যেসব সমালোচনা করেছেন, সেগুলি ঠিক কি বেঠিক বলা সম্ভব নয়, কারণ উপেন্দ্রনাথের লেখা আমরা পাইনি, কিন্তু এন. ঘোষের লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ঐ প্রতিবাদ তাঁকে যথেষ্ট বিচলিত করেছিল, যার ফলে উত্তর দেবার সময়ে তাঁকে অনেক 'যদি'র উপর নির্ভর করতে হয়।[৯]

অনুপস্থিত বন্ধুর পক্ষসমর্থনে দাঁড়িয়ে মাত্র উপেন্দ্রনাথ বন্ধুকৃত্য করেননি, তিনি বন্ধুর ইচ্ছাপূরণেও এগিয়ে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের জন্য পত্রপত্রিকার প্রকাশে স্বামীজী কতখানি উৎকণ্ঠিত ছিলেন আমরা আগে প্রচুর-ভাবে দেখে এসেছি। স্বামীজীর ভারতত্যাগের পূর্বে, উপেন্দ্রনাথ যখন বসুমতী সাহিত্যমন্দির স্থাপন করে ফেলেছেন, স্বামীজীর সঙ্গে তখন নিশ্চয় তাঁর পত্রপত্রিকা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। স্বামীজী নিশ্চয় তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' দিয়ে উপেন্দ্রনাথের কার্যারম্ভ, তার প্রথম পরিণত রূপ সাপ্তাহিক বসুমতী। আগেই জানিয়েছি, পত্রিকাটি বেরিয়েছিল ১৮৯৬ সালের অগস্ট মাসে। স্বামীজী তখন কিন্তু বিদেশে। তিনি ভারতে ফেরেন ১৮৯৭ সালের গোড়ায়। অথচ ১৮৯৬ সালের অগস্ট মাসের সাপ্তাহিক বসুমতী প্রাণমন্ত্ররূপে স্বামীজীর প্রদত্ত 'নমো নারায়ণায়' বাণীকে শিরোধার্য করেছিলেন।[১০] দুভাবে তা হওয়া সম্ভবপর ; হয়, স্বামীজী ভারতত্যাগের আগেই মন্ত্রটি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, নয়, আমেরিকা থেকে পত্রযোগে বাণীটি পাঠিয়েছিলেন।[১১]

---

৯ এখানে আমরা ধরে নিয়েছি 'শ্যামপুকুরের উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' বসুমতীর উপেন্দ্রনাথই।

এই সব রচনা গোটাগুটি পাওয়া যাবে প্রকাশিতব্য *Vivekananda in Indian Newspapers* গ্রন্থে।

১০ সাপ্তাহিক বসুমতীর এই কালের ফাইল পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক শুধু তার প্রথম সংখ্যাটি পেয়েছিলেন, সেটি তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন, এবং তার উপর নির্ভর করে ব্রজেন্দ্রনাথ বসুমতী সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে কিন্তু স্বামীজী-প্রদত্ত 'নমো নারায়ণায়' বাণীর উল্লেখ নেই। সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যাটিও এখন প্রাপ্তব্য নয়, ব্রজেন্দ্রনাথের হঠাৎ মৃত্যুর ফলে তা অদৃশ্য। প্রাণতোষবাবু আমাকে জানিয়ে দেন, 'নমো নারায়ণায়' বাণী ঐ প্রথম সংখ্যাতে ছিল, তাঁর বেশ মনে আছে।

১১ তৃতীয় সম্ভাবনা, প্রাণতোষবাবুর স্মৃতি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে—সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যাতে ঐ মন্ত্রটি ছিল না ; স্বামীজী ভারতে ফেরার পরে ওটি দেন, এবং পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক বসুমতী, ও তারও অনেক পরে দৈনিক বসুমতী সেটি গ্রহণ করে।

স্বামীজী 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্রটি কেন দিয়েছিলেন—বসুমতীকে এবং তার পাঠকবৃন্দকে প্রচলিত হিন্দুধর্মমতে 'নারায়ণ'-উপাসক করবার জন্য ? মনে হয় না। স্বামীজীর

কিন্তু বসুমতী-প্রবর্তনে বিবেকানন্দেরই যে মূল প্রেরণা, একথা প্রায়-সমসাময়িক কালের সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের রচনা থেকে পাই। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি হেমেন্দ্রপ্রসাদের রচনাংশ উদ্ধৃত করেছিলেন তাঁর লেখায় :

"যেদিন তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেহত্যাগ করেন, সেদিন উপেন্দ্রনাথ যেরূপে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বটে। গুরু দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার শব জাহ্নবীপুলিনে শ্মশানে আনিয়াছিলেন—পথে উপেন্দ্রনাথ বিষধর-দশন-দষ্ট হইলেন। তিনি নীলবর্ণ হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। সে অবস্থায় কেহ জীবনলাভ করে না। কিন্তু একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই উপেন্দ্রনাথ জীবনলাভ করিলেন। যে জীবনের কাজ তখন কেবল আরম্ভ হইয়াছে, সে কাজ সম্পন্ন না করিলে তিনি ত যাইতে পারেন না। …সেই ভাববিকাশের অন্যতম উপায় 'বসুমতী'। **বিবেকানন্দ যখন তাঁহার গুরুভাই উপেন্দ্রনাথকে পুনঃ পুনঃ সংবাদপত্র প্রচারে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তখন উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'সাহস হয় না'।** তিনি তখন সে কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি তখন বাংলা সাহিত্যের সাধনা করিতেছিলেন। তদবধি তিনি একাধিক পত্র প্রচার করেন—নানা কারণে সে সকলের স্থায়িত্ব সম্ভব হয় নাই। তাহার পর বসুমতী প্রচার।"

১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাপ্তাহিক বসুমতী নিশ্চয় যথাসম্ভব রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করে গেছে, ধরে নেওয়া যায়। কিছু কিছু সংবাদ অন্য সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হয়েছে দেখেছি। ইণ্ডিয়ান মিরারে ৩০ জানুয়ারী, ১৮৯৮ এবং ২৯ মার্চ, ১৮৯৮ তারিখে বসুমতী থেকে বিবেকানন্দ-সংবাদ গৃহীত হয়েছিল।

লাটু মহারাজের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের গভীর প্রীতির সম্পর্ক। উপেন্দ্রনাথ লাটু মহারাজের বহু সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় সংকলিত লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথার মধ্যে তার অনেক বিবরণ পাই। সেখান থেকে একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনার উল্লেখ করছি, যাতে স্বামীজী, লাটু মহারাজ ও উপেন্দ্রনাথ জড়িত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস, স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ সাঙ্গ করে হঠাৎ মঠে হাজির। কোনো খবর দিয়ে আসেননি। তাঁকে পেয়ে মঠে আনন্দের প্লাবন। লাটু মহারাজ গঙ্গাতীরে ধ্যান করছিলেন। এক ভক্ত ছুটে গিয়ে তাঁকে সংবাদ দিলেন। তাতেও লাটু মহারাজ অচঞ্চল, উল্টোপক্ষে ভক্তটিকে বললেন, 'আরে! বসো বসো! এখানে এখন রাতে একটু ধ্যেন করো।'

আহারাদি শেষ করে স্বামীজী লাটু মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার জন্য গঙ্গাতীরে এলেন। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন পরম প্রেমে। রাত্রি জ্যোৎস্নাভরা—সুনীল সুন্দর। তার নীচে ভালবাসার পবিত্র দৃশ্য।

"স্বামীজী লাটু মহারাজকে বলিলেন—'হ্যাঁরে! আমি যে অনেকক্ষণ এসেছি। সবাই

নারায়ণ শুধু বৈকুণ্ঠে থাকতেন না, তিনি সর্বজীবের অন্তরশায়ী নারায়ণ। স্বামীজীর সেই অপূর্ব মানবতার বাণী স্মরণ করি: "নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে-ভগবান বিদ্যমান; একমাত্র যে-ভগবানে আমি বিশ্বাসী,—এই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ।" 'নমো নারায়ণায়' বলে সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে সম্বোধন করেন, নমস্কার করেন, তা করেন পরস্পরের অন্তরদেবতাকে লক্ষ্য করেই—এমনই নমস্কারমন্ত্র স্বামীজী বসুমতীকে দিয়েছিলেন।

দেখা করলে, তুই যে বড় এখানে বসে রইলি তোর কি অভিমান হয়েছে ?'

"লাটু মহারাজ তাহাতে বলিলেন—'অভিমান আবার কিসের ? এখানে হামার মন বসে থাকতে চাইলে, তাই গেলুম না।'

"স্বামীজী বলিলেন—'হ্যাঁরে! শুনলুম তুই ত মঠে থাকতিসনি, এদিক ওদিক বিগড়ে বিগড়ে থাকতিস—তোর চলতো কিসে ?'

"তাহার উত্তরে লাটু মহারাজ বলিলেন—'কেনো! ওপেন ঠাকুর (উপেন্দ্রনাথ) সাহায্য করতো। যেদিন কুছু জুটতো না, সেদিন তার দোকানের সামনে দাঁড়ালেই সে বুঝতে পারতো—সিকিটা, দুয়ানীটা দিয়ে দিতো।'

"এই কথা শুনিয়া স্বামীজী ঊর্ধ্বমুখ হইয়া বলিলেন—'ঠাকুর! উপেনের কল্যাণ করুন।'

শেষে একটি মূল্যবান তথ্য দিচ্ছি। ১৮৯৭ সালের গোড়ায় স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পরে বসুমতী-সম্পাদক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের কথোপকথন বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বসুমতীর ফাইল না পাওয়ায় কথোপকথনের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু আমাদের জানা নেই। সুখের বিষয় নব্যভারত পত্রিকায় মধুসূদন সরকার একটি প্রবন্ধে ঐ কথোপকথন থেকে খানিক অংশ উদ্ধৃত করেছেন, সেইটুকু আমরা পাঠককে উপহার দিচ্ছি। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, বসুমতী-সম্পাদকের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে স্বামীজী সমাজ-সমস্যার কয়েকটি দিক সম্বন্ধে যে-সকল মন্তব্য করেছিলেন, তার মধ্যে কি ধরনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রগতিশীল মনোভাব ফুটে উঠেছিল। হিন্দুসমাজের বর্ণগত অসাম্যের বিরুদ্ধে, দেখা যাবে, স্বামীজীর মনোভাব কী দারুণ কঠোর! সংস্কারকশ্রেষ্ঠ রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধানিবেদনও লক্ষণীয়। স্বামীজীর মতে, রামমোহনের অনুবর্তীরা তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেননি। বাংলা দেশে মুসলমান-প্রাধান্যের কারণ স্বামীজী ঐ আলোচনায় তীক্ষ্ণ সত্যবাদিতার সঙ্গে খুলে ধরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান চরিত্রচিত্রণের ব্যাপারে বাঙালী হিন্দু লেখকদের অনুচিত আচরণ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যও কৌতূহলের সৃষ্টি করবে, অন্ততঃ সেই যুগে করেছিল, এবং ব্রাহ্ম-মতানুবর্তী নব্যভারত পত্রিকায় বসুমতীতে প্রকাশিত ঐ কথোপকথনটির উপর নির্ভর করে সমাজ-সমস্যামূলক একটি প্রবন্ধ রচনা করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন পূর্বোক্ত মধুসূদন সরকার। তাঁর প্রবন্ধে কথোপকথনটির উদ্ধৃত অংশ :

"প্রশ্ন। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম এখনো আছে কেন ?

উত্তর। দুই কারণে। খ্রীষ্টধর্ম যেরূপ প্রকৃতির উপযোগী, সেইরূপ সরল বিশ্বাসী অনেক মহাত্মা আছেন বলিয়া এবং উহা পৈতৃক ধর্ম বলিয়া। (যেমন) এখানে আজকালকার অশাস্ত্রীয় ছুঁই ছুঁই ধর্ম—শাস্ত্রীয় ধর্মবোধে, সরল বিশ্বাসে এক শ্রেণীর লোক তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে। অপর শ্রেণী ইহা না মানিলেও পৈতৃক আচার বলিয়া রক্ষা করে মাত্র।

প্র। আগে কি এইরূপ ছুঁই ছুঁই ভাব ছিল না ?

উ। না। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক পুরাণ পর্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন, শাস্ত্রে কুত্রাপি এমন পাইবেন না যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের মধ্যে পরস্পরের স্পৃষ্ট অন্নাহার সম্বন্ধীয় কোনো বাধা ছিল।

শুদ্ধ তাহা নহে, পূর্বে দ্বিজবর্ণের পাচক শূদ্রই ছিল। এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন না। আপনারা কি মনে করেন, বাঙ্গালার এত লোক মুসলমান হইয়াছিল কেবল তরবারির জোরে? বাঙালী, মুসলমান জাতিকে সকল নাটকের বদমাইসের স্থানীয় করিয়া মুসলমান-চিত্র বড়ই বিকৃত করিয়া আঁকিয়াছে। মুসলমানের সদ্বংশ বাঙালী আদৌ দেখিতে পায় না। মুসলমানধর্ম হিন্দু-ধর্মের ইতর শ্রেণীর পক্ষে জুড়াইবার আশ্রয়স্থান-স্বরূপ হইয়াছিল বলিয়া এত মুসলমান হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছি, মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ যে-পথে যান, চণ্ডাল সেই পথে যাইতে পায় না; কিন্তু চণ্ডাল খ্রীষ্টান হইলে অবাধে সেই পথে চলিতে পারে।

প্র। যে হিন্দুধর্মে অদ্বৈতবাদ রহিয়াছে, সে হিন্দুধর্মে এত ছুঁই-ছুঁই ভাব কেন?

উ। খ্রীষ্টধর্মের স্রোত আমাদের জাতীয়তা নাশ করিতেছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সেই জাতীয়তা বজায় রাখিয়া তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই মহান উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জনকয়েক লোক পাশ্চাত্য মতপ্রচার দ্বারা আমাদিগকে জাতীয়তাশূন্য করিতে প্রয়াসী হইতেছিল; এখনো দুই-একজন করিতেছে। ইহারই বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া এখন চলিতেছে। এই ভাব নষ্ট করিবার জন্য কয়েক বর্ষ ধরিয়া এক বিপুল আন্দোলন-স্রোত চলিতেছে। তাহাতে শাস্ত্রীয় তত্ত্বপ্রচারের সঙ্গে স্থানীয় আচারপ্রসূত জাতিবিদ্বেষও প্রচারিত হইতেছে। তাই আপনি এ সময়ে এই ছুঁই-ছুঁই ভাবের এত প্রাদুর্ভাব দেখিতেছেন।[১২] এখনও ঠিক সাম্যাবস্থা হয় নাই। আমাদের পরেই যে বংশাবলী আসিতেছে, তাহারা ঠিক শাস্ত্রীয় পন্থার অনুসরণ করিবে। তখন আর ছুঁই-ছুঁই ভাব থাকিবে না, অথচ সকলে পূর্ণ হিন্দু-হৃদয় লাভ করিবে। এই প্রতিক্রিয়া না থাকিলে আমরা এতদিনে জাতীয়তা হারাইতাম।

প্র। সকল বর্ণের কি সন্ন্যাসে অধিকার আছে?

উ। আছে।”

এই কথোপকথন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মধুসূদন সরকার স্বামীজীর মুক্ত দৃষ্টির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন: “এ দেশের সমস্ত হিন্দু জাতির অবস্থাজ্ঞান ও তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্যক জ্ঞান যে বক্তার হৃদয়কন্দরে লুক্কায়িত, তাহা অনুভূত হইতেছে। সার্বভৌম হিন্দুধর্ম-প্রচারকের ভিন্ন এরূপ সমুদয় অবস্থা-জ্ঞান আর কাহার নিকট আশা করা যাইতে পারে?” বঙ্গীয় মুসলমানদের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের জন্য তাঁকে সাধুবাদ দিয়ে লেখক বলেছেন “তাহা আরও তত্ত্বশালিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী।” লেখক আরও অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করেছেন: “স্বামীজী কি এই সকল কোরাণিক হিন্দুকে হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে পুনরানীত করিবার জন্য বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে উৎসাহিত করিবেন?” কায়স্থ সমাজকে উৎসাহিত করাতে বলার কারণ “কায়স্থ জাতিই দীর্ঘকাল সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী”, এবং স্বামীজী “কায়স্থকুলের রত্ন”। স্বামীজীর মত,

১২ স্বামীজীর কথা ঠিকভাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে। এখানে সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

উক্ত লেখকও, ধরে নেওয়া যায় কায়স্থকুলের সন্তান। সুতরাং সহজেই তিনি স্বামীজীকে জড়িয়ে কায়স্থ সমাজের গুণগান করেছেন: "স্বামীজী যে-বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন কর্মই তাহাদের ধর্ম।...সমাজসংস্কারের জন্য এই ক্ষত্র বা কায়স্থানুরূপ মধ্যবর্তী জাতিই প্রসিদ্ধ। পুরাণে যে-সকল অবতারের কল্পনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক পরশুরাম ভিন্ন সকলেই বিবেকানন্দের বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।... নিম্নশ্রেণীকে উন্নত করিয়া, উচ্চশ্রেণীকে সংযত করিয়া, নিজে নম্র হইয়া, সমাজকে সাম্যাবস্থায় আনয়নপূর্বক নববলে বলীয়ান করার ভার বিধাতা কায়স্থাদি মধ্যবর্তী জাতির উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন।...স্বামীজী স্বয়ং ইহার উদাহরণস্থল।" লেখক সবশেষে ভরসা করেছিলেন, বিবেকানন্দকে অবলম্বন করে জাতীয় জাগরণ ঘটবে: "তাঁহার হৃদয় যেমন প্রশস্ত, চিন্তা যেরূপ সর্বত্র-প্রসারিণী, যদি কার্যকারিণী শক্তি সেরূপ বিকশিত হয়, বা অন্যত্র হইতে আসিয়া জোটে, তবেই বঙ্গে প্রকৃত সমাজসংস্কারকের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে।"

রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে উপেন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু ও গুণগ্রাহী, সুবিখ্যাত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রচনাংশ উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। এটি তিনি উপেন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে ১৮ চৈত্র, ১৩২৫-এ দৈনিক বসুমতীর জন্য লিখেছিলেন:

"বাংলার বিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় – আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিতের ও বসুমতীর উপেন মুখুজ্জে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত ও তদীয় ভক্তমণ্ডলীর চিরপ্রিয় উপেন,...ধর্মপ্রাণ, ধর্মনিষ্ঠ, রামকৃষ্ণ-চরণ-কমলের মধুমত্ত মত্ত ভৃঙ্গ উপেন অন্তিমে তাঁহারই নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে সেই চিরবাঞ্ছিত পদারবিন্দে শান্তি ও নিবৃত্তি লাভ করিলেন।...

"কৈশোরে উপেন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সেই দেবতার পূজাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। 'তস্য প্রিয়কার্যসাধনম্' যদি 'তদুপাসনম্' হয়, তাহা হইলে ভক্ত গৃহী উপেন্দ্রনাথ চিরজীবন তাঁহারই উপাসনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বাংলায় অবতীর্ণ হইয়া বাঙালীকে যে মুক্তিমন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন রূপে তাহা সপ্রকাশ। উপেন্দ্রনাথের ঐহিক কর্মেও সেই দেবতার আশীর্বাদ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ধর্মজীবনের উপযোগী কর্মজীবন গঠন করিবার জন্য স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ গৌড়ভূমির উর্বর ক্ষেত্রে যে লোকশিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ললাটের স্বেদে সেই বীজে জলসেচ করিয়াছেন। ইহাই ত 'তদুপাসনম্।'

"উপেন্দ্রনাথের কর্মসূচনা ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। সাংসারিক প্রয়োজনে তাহার সৃষ্টি; ঐহিক ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার পুষ্টি; আপাতদৃষ্টিতে তাহা সংসারীর খেলাঘর বটে। কিন্তু এই ঐহিক কর্মের সিকতাবিস্তারের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবাহিণী বহিয়া গিয়াছে, তাহা সেই রামকৃষ্ণ-ভক্তির মন্দাকিনী; বাংলা দেশে তাহা জ্ঞানের, ভাবের অমৃত বিতরণ করিয়াছে।

"উপেন্দ্রনাথ সংকল্প করিয়া, লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া, নবভাবের নূতন উচ্ছ্বাস বাংলার

গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিবার জন্য বটতলায় সেই ছোট কেতাবের দোকানখানির পত্তন করিয়াছিলেন, তাহার পর সেই ক্ষুদ্র সূচনা বসুমতীর বর্তমান সাফল্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতার গুরুমন্ত্রপ্রচারে সহায় হইয়াছিল···

"বসুমতীর একজন প্রিণ্টার ৺রাধিকাপ্রসাদ একদিন বলিয়াছিলেন, 'এটা বসুমতীর অফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদাব্রত।' ইহা সত্য। উপেন্দ্রনাথ এই সদাব্রতের ভাণ্ডারী ছিলেন। এই সদাব্রত হইতে ভাঁড়ারী উপেন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ পুঁথি প্রচার করিয়া বাঙালীকে মনের খোরাক জোগাইয়াছেন।···

"বসুমতীর প্রবর্তক হইতে নিম্নপর্যায়ের সেবক পর্যন্ত সকলেই রামকৃষ্ণভক্ত। এ সমবায় আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া এ ভক্তমণ্ডলীর গঠন করেন নাই। তিনি গুরুর কৃপায় যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই রামকৃষ্ণ-পরিবারে পরিণত হইয়াছিল।"

হাউই

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

পৃথিবার প্রাসাদে প্রাসাদে খুঁজে খুঁজে ফিরিলাম
নেতাদের নাম।
তারা কি অনেক জন চাঁদ তারা সূর্যের মতন
আলোকের দেহময় কখনো নেভে না,
সে আলো-কে তেল বাতি সলিতায় বাড়ানো যায় না,
কড়ি দিয়ে যায় নাকো কেনা,
সে আলোর সবখানে যাওয়া আসা আছে,
শিশুর হাসির মতো হাসে সব ঘরে,
ফুলের মতন ফোটে গাছে?

* * *

হেরিলাম উঠিয়াছে ছুটিয়াছে জ্বলিতেছে নিভিতেছে
আকাশেতে অনেক হাউই।
তারপর হে পৃথিবী, তোমার মুখের 'পরে
নেমে আসে মুঠো মুঠো ছাই।
মুঠো মুঠো ছাই-ই শুধুই।

গান্ধীজী ঃ বেদান্তের ধ্যানমূর্তি

শ্রীমনকুমার সেন

বেদ-বেদান্তের সারাৎসার, মানুষের ধর্ম-কর্মের এক অভাবনীয় ভাবরূপ হচ্ছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এই ভাবকে আশ্রয় করেই বিপ্লবী যৌবনের মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ স্পর্শ করেছিলেন ভারতের অন্তরাত্মাকে, নাড়া দিয়েছিলেন গোটা জগৎকে। আনুষ্ঠানিক নানামুখী ধর্মের সংঘাতকে গভীর অধ্যাত্মবোধের অগ্নিতে শুদ্ধ করে, সাম্প্রদায়িক ধর্মকে সর্বজনীন অধ্যাত্মবাদে উন্নীত করে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে যে নিঃশব্দ বিপ্লব এনেছেন, আজও বোধ করি তার ঠিক ঠিক মূল্যাঙ্কন করা হয়নি। হলে দেখা যাবে সব পথ এক রাজপথে এসে কী অপূর্বভাবে মিলে গেছে, মিশে গেছে! 'ধারণ' অর্থে যদি 'ধর্ম' হয়,—নিছক মঠ, মসজিদ, গির্জার অনুষ্ঠান না হয়,—তাহলে মানুষের স্মরণীয় ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধারক।

এই অনন্য, শ্রুতকীর্তি, আধ্যাত্মিকতার ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য হচ্ছেন বিবেকানন্দ—মাত্র এই তথ্যটুকু মনে রাখলেই বোঝা যাবে স্বামীজী কী ধাতুতে গড়া ছিলেন। যদি এক বিবেকানন্দ জগতের চিন্তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে থাকেন, তাহলে এরকম সহস্র বিবেকানন্দের উৎসস্বরূপ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজীর সামাজিক অর্থনৈতিক আদর্শকে বা তাঁর সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাঁর নবজীবনের উৎসরূপ, এই বিপুল আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠভূমির চিত্রটিকে সামনে রাখা। ঠিক এই কারণেই স্বামীজীর সমাজতন্ত্রের বা নতুনসমাজ-পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা,—আবার আধ্যাত্মিকতারও ব্যবহারিক প্রয়োগনীতি হল সেবা।

এই সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ থেকেই আশা করি পরিষ্কার হবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা, বা বেদান্তের যে ধ্যান পুণ্যভূমি ভারতকে তথা নবজন্মের বেদনায় অস্থির আধুনিক জগৎকে এক নতুনদিগন্তমুখী করেছে, মহাত্মা গান্ধী সেই ধ্যানেরই এক বিস্ময়কর মূর্তি। বস্তুতঃ জনজাগরণ ও জননেতৃত্বের জন্য স্বামীজী স্বয়ং 'মহাত্মা'র কল্পনা ও গভীর প্রত্যাশা করেছিলেন,—দীনদরিদ্রের বেদনায় যাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠবে। আর বীর্যশীল শুদ্ধাত্মা পুরুষের কল্পনা কখনও মিথ্যা হয় না।

কথাটা একটু বেশী কাল্পনিক বা ভাবপ্রবণ শোনাতে পারে, কিন্তু গভীরে তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব আসলে কল্পনাই বিপ্লব। বাস্তবে আমরা স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ, কল্পনায় আমরা অসীম। সত্যিকার বিপ্লবীর চিন্তা এই অসীমের সন্ধানে ও অসীমকে জুড়ে অগ্রসর হয়ে থাকে; অবশ্য 'ব্যবহারিক আদর্শবাদী' রূপে বিচরণের বা প্রত্যহ প্রয়োগের জন্য তাঁর পায়ের তলায় মাটি থাকা চাই: অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত থাকবে দিগন্তের অসীমে, কিন্তু কর্মে তাঁর প্রতিদিনের ছন্দ সঞ্চারিত হবে সীমাবদ্ধ, দৃশ্যমান ক্ষেত্রে।

বিশ্বপথিক বিবেকানন্দেরই একটি ভাবের এক অসামান্য ব্যবহারিক রূপ হচ্ছেন বিশ্বমানব গান্ধীজী। স্বামীজীর কল্পনার, দীন-দুঃখী, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষের জন্য অহর্নিশ তাঁর মর্ম-

বেদনার হৃদয়স্পর্শী রূপ হচ্ছেন গান্ধীজী।

কোন বিপ্লবী ভাবনা স্থিতিশীল হতে পারে না, একস্থানে অনড় হয়ে থাকতে পারে না; ঠিক সেই কারণেই 'স্টেটাস্‌কো' বা সমাজের স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে সত্যিকার বিপ্লবীর সংগ্রাম অপরিহার্য। বিবেকানন্দকে যদি বিপ্লবী বলে না ভাবতে পারি তাহলে অন্য কোন বিবেকানন্দের তেমন কোন ভূমিকার কথা আমি ভাবতে পারি না। আধ্যাত্মিকতাকেই যদি বাছাই করতে হয় তাহলে মহীরুহকেই ধরব, মহাসাগরেই অবগাহন করব—যিনি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, এই আধ্যাত্মিকতারই ব্যবহারিক বিপ্লবী ধ্যান হলেন স্বামী বিবেকানন্দ,—আর স্বামীজীর একটি ধ্যানেরই মূর্তি হলেন মহাত্মা গান্ধী। এই গতিশীলতাই বিপ্লবী চিন্তার পরিচয়পত্র; এবং আমার সংশয়াতীত সিদ্ধান্ত, বেদান্তের এই বৈপ্লবিক ও ব্যবহারিক সম্ভাবনাকে একটি দিকে সত্য করে তুলবার জন্যই গান্ধীজীর আবির্ভাব। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কারসমূহ আজ যে গতির সৃষ্টি করেছে, তাতে কোন ব্যক্তি বা কোন চিন্তা যদি স্থাণুবৎ একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, এগিয়ে যেতে না চায়, তাহলে সেই ব্যক্তি বা সেই চিন্তা দাঁড়িয়েও থাকতে পারবে না, পিছিয়ে পড়বে। বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত স্বামীজী সম্বন্ধে একথা কত বেশী সত্য!

আবার, ঠিক এই সমন্বয়ের দৃষ্টিতেই গান্ধীজী হচ্ছেন স্বামীজীর উত্তরসাধক। ঈশ্বর, সত্য, নীতিধর্ম প্রভৃতি মূল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে তাঁর আপসহীন দৃঢ়তা,—এ হচ্ছে আত্মজ্ঞানীর পরিচয়; আর এই আত্মজ্ঞানকে ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে নবজীবনের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করবার যে ব্যাকুলতা, সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানীর পরিচয়। আত্মজ্ঞান-ভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত নতুন সমাজ রচনার যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজী এবং যার জন্য মাত্র ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালের মধ্যেই দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, গান্ধীজীর জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে সেই স্বপ্নই বহুলাংশে সত্য হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও সেই মৌলিক কথাটি মনে রাখা দরকার: কোন আদর্শ আদর্শ-বাদীর জীবদ্দশায় মাত্র আংশিকভাবেই সত্য হয়ে উঠতে পারে; কেননা, আদর্শ যদি ষোলআনা সত্য হয়ে যায় তাহলে তা আর আদর্শ থাকে না: বাস্তবে আমরা তাকে ধরে যত এগুবো, আদর্শ তত দূরে চলে যাবে। এইজন্যই বাস্তবের চেয়েও কল্পনার মাহাত্ম্য বেশী, আবার বাস্তবকে বাদ দিয়ে কল্পনা মাত্র কবি-কল্পনাই হতে পারে, তাতে সমাজ-বিপ্লবের স্পন্দন থাকা অসম্ভব।

গান্ধীজী নিজেকে বলতেন 'ব্যবহারিক আদর্শবাদী'। স্বামীজী বলতেন, জীবনে একটি আদর্শকে বেছে নাও এবং দরকার হলে তার জন্য মৃত্যুবরণ কর। এই মন্ত্র গান্ধীজীর জীবনে প্রচণ্ডরূপে সত্য।

এবং যে আদর্শের জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাও গণ্ডীকে অতিক্রম করে। ধর্ম, সম্প্রদায়, সমাজ, এমন কি দেশকেও ছাড়িয়ে তাঁর জীবনাদর্শ বিশ্বাদর্শে পরিণত হয়েছিল। কল্পনায় তিনি যে এক-পৃথিবী ও এক-মানবজাতির রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল একথা ঘোষণা করতে যে, ভারতে যদি এমন কোন স্বাধীনতা আসে যে-স্বাধীনতা বিশ্বশান্তির পরিপন্থী, তিনি তেমন স্বাধীনতা চান না। তাঁর আদর্শ-সমাজ ছিল বিশ্বসমাজ আর তাঁর ব্যবহারিক-সমাজ ছিল ভারত-সমাজ।

স্বামীজী বলছেন—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু
সর্বভূতে সেই প্রেমময়।

* *

জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

অবিকল এই বিশ্বানুভূতিরই এক জীবন্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী, যিনি বলছেন, 'মানুষের সেবার মধ্যে দিয়েই আমি ঈশ্বরকে দেখবার চেষ্টা করছি, কারণ আমি জানি ঈশ্বর স্বর্গেও নেই, পাতালেও নেই; ঈশ্বর আছেন প্রত্যেকের হৃদয়ে।' জীব-সেবা ও দরিদ্রনারায়ণের যে-মন্দির রচনা করেছিলেন স্বামীজী, গান্ধীজী সেই মন্দিরেই এক অনন্য-সাধারণ উপাসক।

স্বামী বিবেকানন্দ একাধিকবার বলেছেন, 'ভুলিও না, আমি শুধু ভারতের নই, সারা বিশ্বের।' এই বিশ্বানুভূতি সত্ত্বেও বিশ্বের কল্যাণের জন্যই স্বামীজীর সেবার আশু প্রয়োগের ক্ষেত্র হয়েছিল স্বদেশ ভারতভূমি। স্বামীজী দৃপ্ত ও আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই।" গান্ধীজীর বিশ্বানুভূতি সত্ত্বেও তাঁর আশু সংগ্রাম ও প্রাত্যহিক প্রয়োগের ক্ষেত্রও হচ্ছে এই ভারতবর্ষ। কী নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ তেজবীর্য নিয়ে গান্ধীজী স্বদেশ- ও বিদেশাত্মার সেবা করেছেন, তার ইতিহাস কে না জানে?

গান্ধীজী অসংখ্য বার একথা বলেছেন, যদি হিমালয়ে গেলে আমার মোক্ষলাভ হবে আমি জানতাম তাহলে আমি হিমালয়েই যেতাম। তা হয় না। আমার মোক্ষ আমার প্রতিবেশ ও আমার স্বদেশের সেবার মধ্যেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, "আমি জানি স্বদেশের সম্যক্ সেবার মধ্য দিয়েই আমি সর্বদেশের সার্থক সেবা করতে পারি।" এই হচ্ছে ব্যবহারিক আদর্শবাদীর একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী। জীবাত্মা ও পরমাত্মার দুই বিন্দুতে যে জীবন চলাচল করে, সেই জীবনই মহাজীবন। এই মহাজীবনের অধিকারী বলেই গান্ধীজীকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করে বলেছেন 'মহাত্মা' আর এই মহাজীবনের অতুলনীয় দেশাত্মবোধ ও জননায়কের অনন্য ভূমিকায় অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে সম্বোধন করেছেন 'জাতির জনক' বলে।

সত্য ও অভয়ের ব্যক্তিরূপ হচ্ছেন স্বামীজী, তার সামাজিক রূপকার হলেন গান্ধীজী। 'অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, অন্যায় সহ্য করো না'—এই হচ্ছে স্বামীজীর দেওয়া মন্ত্র। গান্ধীজীর সমগ্র জীবন এই মন্ত্রশক্তিকে ধারণ করেই অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী রূপ ধারণ করেছে।

কিন্তু কোন্ উপায়ে বা কোন্ পথে এই সংগ্রাম করতে হবে? লক্ষ্যে পৌঁছুবার পন্থা কী হবে? উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় কী হবে? স্বামীজী বলছেন, প্রেমই শ্রেষ্ঠ শক্তি, সর্বোত্তম সমাধান। বেদান্তের সোজা ভাষায় বলছেন, সারা বিশ্ব আবৃত করে আছেন সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষপ্রধান; বলছেন সর্বভূতে এক আত্মা বিরাজমান। কাজেই আঘাত করবে কাকে, কোথায়? অন্যকে আঘাত করা মানেই নিজের আত্মাকে আঘাত করা,—ধর্মচ্যুত ও আত্মদ্রোহী হওয়া।

উপায়ের এই শুদ্ধতা ও সর্বজনীন চরিত্রই গান্ধীকে করেছে মহাত্মা গান্ধী। সত্য ছিল

তাঁর লক্ষ্য, অহিংসা বা প্রেম ছিল তাঁর পন্থা। আসলে দুটিকে পৃথক করে ভাবাও যায় না; কেন না অহিংসার পূর্ণরূপই হচ্ছে পূর্ণসত্য—অর্থাৎ ঈশ্বর। এই অহিংসা বা প্রেম হচ্ছে গান্ধীজীর দৃষ্টিতেও সার্বভৌম নীতি; আর সব নীতি হবে এই সর্বোচ্চ নীতির অনুগত।

এই নীতি দুর্বল বা ভীরুর জন্য নয়, এ হচ্ছে বীর্যবানের জন্য। অন্যকে আঘাত করা, হত্যা করা কাপুরুষের কাজ; অন্যকে ভালবাসা, আপন করা, অন্যকে রক্ষা করা হচ্ছে বীরের কাজ। তা যদি না হত, তাহলে স্বামীজী শোনাতেন না 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—এই আত্মাকে বলহীন পেতে পারে না। অহিংসা বা প্রেম হচ্ছে আত্মস্থ, আত্মমুখী, বীর্যবানের চলার মন্ত্র। বাংলাদেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত অন্যায় অবিচার পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সর্বজনীন প্রেমে, সবার পিছে সবার নীচে যারা তাদের প্রতি বিগলিত করুণায়, যে নবসংস্কৃতির ধারা চলে এসেছে, —যা হচ্ছে ব্যবহারিক বেদান্তেরই ধারা,—গান্ধীজীর মধ্যে সেই ধারাই প্রবাহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হচ্ছেন ধর্মের ব্যবহারিক রূপ। তাঁর জীবন থেকে আমরা ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখতে পারি।' স্বামীজী-প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উক্তি: 'স্বামীজীর বাণী আমার স্বদেশপ্রেমকে শতগুণ বর্ধিত করেছে।' ব্যবহারিক ধর্ম বা অধ্যাত্ম-এবং দেশাত্মবোধ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়া মহাত্মা গান্ধী সামাজিক অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিক জীবনে প্রয়োগবাদী বেদান্তের এক অভ্রান্ত নিশানা।

"আমাদের ধারণা কি জান? ঠাকুর-স্বামীজীর এক একটি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা (গান্ধীজী প্রভৃতি) এই সব কাজ করছেন। আর মহাত্মাজী যে বাস্তবিক শক্তিমান পুরুষ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই আদ্যাশক্তি জগন্মাতার একটা বিশেষ বিকাশ যে তাঁর মধ্যে হয়েছে, তা-ও ঠিক।···শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্মাতার যে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেই শক্তিই আধার-বিশেষকে অবলম্বন করে নানাভাবে কাজ করছে। স্বামীজী বহু স্থানে ভারতের কিভাবে বাস্তব কল্যাণ হবে, তা বলে গেছেন। আজ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে দেশের কল্যাণের জন্য তিনি যেসকল কথা বলেছিলেন,—এই ছুঁৎমার্গ-পরিহার, অনুন্নত জাতিদের উন্নয়ন, দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ইত্যাদি ইত্যাদি—সে-সব ভাবই তো মহাত্মা গান্ধী এখন প্রচার করছেন। এতে দেশের বাস্তব কল্যাণ হবে নিশ্চয়। ···মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিক ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে ঐ সব কাজ করছেন।" ('শিবানন্দ-বাণী', ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ১৫)।

"স্বামীজীর দেশপ্রীতিটা গান্ধীজীকে ভর করেছে। গান্ধীজীর চরিত্র সকলেরই অনুকরণীয়। দেশে দেশে ঐ রকম লোক জন্মালে তবে শান্তির একটা ব্যবস্থা হবে।" ('মহাপুরুষ শিবানন্দ', ২য় সং, পৃঃ ১৮৫)।

—স্বামী শিবানন্দ

শিল্প ও আধ্যাত্মিক সাধনা*

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

[অনুবাদ : স্বামী চেতনানন্দ]

আর্ট বা শিল্প হল আনন্দের অভিব্যক্তি। সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে সেই আনন্দের ধারা। উপনিষদ্‌ বলছেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। (তৈঃ উপঃ ৩।৬) অর্থাৎ এই জগৎ আনন্দ থেকে বেরিয়ে এসেছে; আনন্দের মধ্যেই বেড়ে চলেছে; আর শেষে সেই আনন্দের মধ্যেই মিশে যাচ্ছে। শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যেও সেই আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে। প্রকৃত শিল্পের কষ্টিপাথর হচ্ছে মনুষ্য-হৃদয়কে আনন্দোল্লাসে ভরিয়ে তোলা। এই আনন্দের পরশ একবারও যদি জীবনে লাগে তবে আর মরণ নেই। যদি অজন্তা-ইলোরার সেই অত্যাশ্চর্য শিল্পকলা ধ্বংস হয়ে যায় এবং কোন শিল্পীর ভাগ্যে একবারও যদি তার চকিত দর্শন ঘটে থাকে—তাহলে ঐ শিল্প-সুষমা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। ঐ শিল্পীর ভাবজগতে হৃদয়ের মণিকোঠায় তা বেঁচে থাকবে এবং তাকে অনুপ্রাণিত করবে ঐগুলির নবরূপ প্রদানে। মৃত অতীতের হবে পুনর্জন্ম। অকৃত্রিম শিল্প মরণজয়ী। এর সত্তা জৈবপ্রায়। দীর্ঘ বংশপরম্পরায় তার পুনর্জন্মগুলি খুবই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিশ কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এসেছিলেন। শিল্প যে কালজয়ী একথা তিনিও মনে করতেন। সে সময় আমরা প্রাচীরচিত্র (Fresco) আঁকবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তখন আমাদের অভাব ছিল বিভিন্ন উপাদানের; আর কলাকৌশল জানা না থাকায় প্রকল্পটা ছেড়ে দিতে হয়। আমাদের নিরুৎসাহ দেখে অধ্যাপক মর্মাহত হয়ে বললেন : 'তোমরা থামছ কেন? তোমরা যদি একখণ্ড কাঠকয়লা দিয়ে কাজটা কর এবং একজন দর্শকও যদি তোমাদের অঙ্কন দেখে তারিফ করে—তাহলে তা তোমাদের সব পুরস্কারকে ছাপিয়ে যাবে। যদিও প্রাচীরগাত্রে তোমাদের শিল্পকলার পরমায়ু হবে একদিন, কিন্তু ঐ দর্শকের হৃদয়ে তা অঙ্কিত থাকবে চিরদিন। যদি তোমরা কাজ না কর, তবে তোমাদের চিন্তা, তোমাদের ভাব নষ্ট হয়ে যাবে—তোমাদের মানসপটে জন্মের পূর্বেই তা মরে যাবে। না—এ জগতের কেউ তাতে উপকৃত হবে না, এমন কি তুমি নিজেও না।'

ভাস্কর্য, চিত্র, কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য—সমস্ত শিল্পকলার রয়েছে একমুখী চেষ্টা। প্রত্যেকেরই রয়েছে স্বকীয় ছন্দ। ঐ ছন্দ নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে রূপায়িত করছে আনন্দকে—আর ঐ আনন্দই সৃষ্টির উৎস। এদিক থেকে যোগ বা আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার কোন ভেদ নেই। আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য—পরিদৃশ্যমান বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান, যাঁকে জানলে সব জানা যায়। শিল্পীর লক্ষ্যও তাই। জনৈক চৈনিক শিল্পী বলেছেন : 'শিল্পীর কাছে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ও একটি সবুজ দূর্বাপত্র একই; কারণ তা তার মনে ফুটিয়ে তোলে একই আনন্দের

---

* ১৯৪২ সালের ১৮ই জুন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে 'আর্ট ও আধ্যাত্মিক সাধনা' প্রসঙ্গে শ্রীনন্দলাল বসুর কথোপকথন হতে গৃহীত এবং ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা থেকে অনূদিত।

অভিব্যক্তি।' এ কিন্তু দেবমূর্তির অবমাননা নয়, পরন্তু সবুজ দূর্বাপত্রের মর্যাদাদান।

শিল্পী থাকবে নির্লিপ্ত। জীব বা সমাজের সভ্যরূপে তার ব্যক্তিগত আবেগ বা ভাবপ্রবণতা থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পীকে সৃষ্টিকালে সব কিছুর ঊর্ধ্বে যেতে হবে। কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ শিল্পীর দৃষ্টিকে ঢেকে দেয়, গতিকে করে রুদ্ধ; আর নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ভাব করে লাঞ্ছিত। শিল্প-সৃষ্টিতে শিল্পীকে দৈনন্দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, যৌনবোধ ইত্যাদি অতিক্রম করে যেতে হবে। তাকে যেতে হবে সেখানে, যেখানে সে নিজের ভাবকে মিশিয়ে দেবে অনন্ত নৈর্ব্যক্তিক রসসাগরে—আনন্দময় সত্তায়।

শিল্পী তার বিষয়বস্তু—হৃদয়বিদারী বা মনোরম—যেটা খুশি বেছে নিতে পারে। তার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, কারণ সে অনাসক্ত ও নির্দিষ্ট ভাবাবেগ থেকে মুক্ত। সে চায় সীমার গণ্ডী পেরিয়ে আনন্দরসে ডুবে যেতে এবং তা দিয়ে রূপ দিতে চায় তার শিল্পের কাঠামোটাকে। আনন্দ যদি শিল্পীর লক্ষ্য না হয় এবং শিল্পে যদি তার স্ফুরণ না হয় তবে ঐ সৃষ্টি আকর্ষণ বা বিদ্বেষ, সুখ বা দুঃখরূপ দ্বৈতভাবাবেগের দ্বারা হয় বিকারগ্রস্ত। সুতরাং সাধকের মত শিল্পীও লাভ করতে চায় সেই পবিত্র, নিরপেক্ষ, সার্বিক আনন্দকে। সে জপ, ধ্যান বা কৃচ্ছ্রতাসাধন না করতে পারে—তবুও তাঁর কর্মই উপাসনা।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, নটরাজ বা কালীর কল্পনা। যে ব্যক্তি তার চেতনাতে ঐ সত্তার প্রথম আবির্ভাব দর্শন করেছিল—সে সাধক হতে পারে, আবার শিল্পীও বটে। যে মানুষ ঐ ভাবের স্থূল রূপ দিয়েছিল, তার শিল্পী সত্তা থাকা সত্ত্বেও সে সাধক। সাধক-শিল্পী একটা অনুপম রসের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, ছন্দ-গতি-রূপ-রং ও অন্যান্য কল্পিত বস্তু দিয়ে, চিন্তা করেছিল একটা সামগ্রিক সত্তাকে।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে নৈতিক মূল্য বিচারিত হয়—শিল্পক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যে বস্তুটি সমাজে অবহেলিত, তা হয়ত বা কখন শিল্পীকে একটা সুন্দর সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দেয় এবং পরবর্তীকালে তা বহুলোককে অনুপ্রাণিত ও উন্নত করে। সাধারণ মানুষ অনৈতিক বলে কোন বস্তুকে ঘৃণা করতে পারে, কিন্তু কোন গুণী শিল্পীর তুলিকার যাদুস্পর্শে তা থেকে উদ্ভাসিত হয় একটা অপূর্ব সৃষ্টি; যে সৃষ্টি লুকিয়ে ছিল সেখানে, অথবা শিল্পীর অন্তর থেকে কিছু ধার নিয়ে, সে রূপ নিল। ঘৃণিত বস্তু রূপান্তরিত হল সুন্দরে—মহিমায়। এর সব কিছু নির্ভর করছে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির উপর—ভাল-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক বা কোন উচ্চরাজ্যে তার শিল্পের বিষয়বস্তু অবস্থান করছে কিনা তার উপর। উপনিষদ্ বলছেন: 'যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে॥' (কঠ, ২।১।৩) অর্থাৎ যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারা মানুষ রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মিলনসুখ অবগত হয়, সেই আত্মার নিকট এই জগতে কোন্ বস্তু অবিজ্ঞেয়রূপে অবশিষ্ট থাকতে পারে?

সুতরাং ভাল-মন্দ গুণ বিষয়বস্তুতে থাকে না। সৃষ্টিকর্তা যেমন নিজে সৃষ্টি করে তার মধ্যেই আনন্দে মগ্ন হন, তেমনি শিল্পীও যদি পবিত্র আনন্দ ও রসের সন্ধান পায় এবং তা সৃষ্টি করে, তাহলে গরল অমৃতে, পার্থিব স্বর্গীয়ে রূপান্তরিত হয়ে উঠে। বস্তুত বিপদ তখনই ঘনিয়ে আসে যখন ভাবাবেগ বা বস্তুর উপরই

জোর পড়ে, আর মন পায় না রসের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা। যদি রোগের পরিবর্তে রোগীর দিকেই শুধু ডাক্তার নজর দেয় তবে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কেউ যদি বলে যে সমাজের দৃষ্টিতে যেটা অনৈতিক বস্তু তার রূপ দেওয়া কি সমাজের ক্ষতি নয়? এটা কি করে সম্ভব? কোন প্রকৃত শিল্প[১] যদি ভাল বা মন্দ ভাব প্রকাশে অসমর্থও হয় তবুও তা রস ও ছন্দের মধ্যেই থাকে। ঐ রস ও ছন্দ শিল্পীকে বা কোন শিল্প-প্রেমিককে দৈনন্দিন জীবনের সীমিত গণ্ডী, বিধিবদ্ধ অভ্যাস ও সামাজিক কুসংস্কারের উর্ধ্বে নিয়ে যায়। মানবজীবনে শিল্পের এই সামান্যতম অবদান সমাজে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল আনবে না। অবশ্য দুর্বল স্নায়বিক রোগগ্রস্ত মন জীবনের এই অপূর্ব রসাস্বাদে অক্ষম। যাহোক এ সব দুর্বলমনারা তুলা-পশমের আবরণে লুকিয়ে থাকুন, আর বৃদ্ধ-শিশুরা কাঁচ-ঘেরা শো-কেসে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখুন। নিরাপদে অক্ষত থাকুন তাঁরা। এতে কিছুই আসে যায় না। আর্ট নিজেকে নীচু করে হীন ঘৃণিত স্তরে কখনও নিয়ে যাবে না। শিল্পীরাই শিল্পকে বহন করে নিয়ে যাবে একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে, প্রাচুর্যের মধ্যে। বিজ্ঞ ও সবলেরই আর্টে অধিকার।

কয়েক বছর আগে পুরী ও কোণারকের মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত কামকলাপূর্ণ মূর্তিগুলি ধ্বংস করবার আন্দোলন উঠেছিল। কী অসঙ্গত ভ্রান্ত প্রস্তাব! যদি এটা ঘটত—তবে তা হত এক চরম বর্বরতা, আর বিলুপ্ত হত আমাদের বহু শিল্পগৌরব। আমি জানি না কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে তারা ওটা করতে যাচ্ছিল। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েই থাকে। আমি এটুকু বলতে পারি যে, ঐসব মন্দিরগাত্রে নবরসের মধ্যে একটি রসের রূপ দেওয়া হয়েছে—যে-রসটি আদিম এবং জীবনের সমগ্র গতির সঙ্গে যুক্ত। শিল্পরূপে ঐগুলি মহান অনন্য শিল্পের নিদর্শন।

শিল্পী তাঁর জীবনের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়। কখনও সে দেবভাবমণ্ডিত বস্তুর রূপ দেয় এবং স্পর্শ করে—চৈনিক শিল্পীর ভাষায়—'অনন্তের আঙি-নাকে'। কখনও বা তাঁর সৃষ্টি অত উঁচু ধাপে উঠে না। কি আসে যায় তাতে? একই শিল্পীর মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা, বিভিন্ন পরিবেশ তাকে প্রকাশ করে বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তা রূপে। যে মুহূর্তে সে রসমাধুর্য অনুভব করে এবং ছন্দের রহস্য ধরতে পারে—তখনই সে উচ্চ তত্ত্বে প্রবেশাধিকার পায়। কিন্তু এ মাহেন্দ্রক্ষণ দুর্লভ। দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত শিল্পীর স্মৃতিকে করে অবলুপ্ত, পথকে করে নিষ্প্রভ। অচঞ্চল আনন্দ-প্রবাহের সঙ্গে সমতালে চলাই তার জীবনের লক্ষ্য—যা সে তখনও লাভ করতে পারেনি।

সাধককেও চলতে হয় ধাপে ধাপে—জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অদ্বৈতের পথে। শিল্পীর চলার পথও তেমনি। সাধকের মনে হতে পারে যে, শিল্পী ক্ষণিক মায়াময় অনিত্য বস্তুতে আবদ্ধ। কিন্তু কেন? এর উত্তরে শিল্পী বলছে: এই বিশ্বসৃষ্টি ও শিল্প—উভয়েরই অধিষ্ঠান মায়া। সৃষ্টিকর্তা কখনও নিজের মায়াশক্তির দ্বারা প্রতারিত হন না। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—সাপের বিষ সাপকে ধ্বংস করতে পারে না। শিল্পীও সেই

[১ যা উজ্জ্বল তাই সোনা নয়। এখানকার আলোচ্য বিষয় প্রকৃত শিল্প। অবশ্য অনেক শিল্পে ভ্রান্তভাবে নীচু প্রবৃত্তির চরিতার্থতা দেখান হয়; ওসব হাটের পণ্যের মত। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মত প্রকৃত শিল্প সমস্ত নৈতিক মানের উর্ধ্বে।]

বিশ্বশিল্পী সৃষ্টিকর্তার শিষ্য। শিল্পীও তার জ্ঞান ও কলাকৌশলের দ্বারা মায়ার উপর প্রভুত্ব লাভ করে। তখন তার কাছে মায়া হয় লীলাখেলা। শিল্পের বিষয়বস্তু তুচ্ছ বা মহান, ক্ষণিক বা শাশ্বত—যা কিছু হোক না কেন, শিল্পীর লক্ষ্য থাকবে তার সৃষ্টির সঙ্গে একত্বের সংযোগ-স্থাপন। আর ঐ একত্বই বিশ্বের নানা রূপ ও লীলাচঞ্চল গতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র বিষয়-তন্ময়তা তো পতন। ও তো মায়ার বন্ধন। প্রকৃত শিল্পীর চোখে মায়া হচ্ছে একত্বের মধ্যে একটা সহজ স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি ও ছন্দ।

সার্বিক-একত্বের-বোধহীন শিল্পী বেছে নেয় কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা ভাব। তাই অচিরেই তার অনুপ্রেরণা যায় শুকিয়ে। শাশ্বত আনন্দের উৎস তার কাছে থাকে অজ্ঞাত।

আমি একজন হিন্দু এবং হিন্দুভাবধারায় পুষ্ট। সুতরাং আমি যে বহু দেবদেবীর ছবি এঁকেছি—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এখন আমি দেবদেবীর সঙ্গে নৈসর্গিক দৃশ্য ও সাধারণ মনুষ্যজীবনের চিত্রও আঁকি; এবং উভয়ের মধ্য থেকে একই আনন্দ ও তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করি। আগে ভাবতুম যে, দেবদেবীর ধারণা দৈনন্দিন মনুষ্য-জীবন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে বহুগুণে উন্নত; কিন্তু মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এখন কোন একটা নির্দিষ্ট রূপ বা দৃশ্যের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।

দৃশ্যনিচয় অলক্ষিত ছন্দের উপর দিয়ে ভেসে ওঠে আবার চলে যায়; আর ঐ ক্ষণিক স্থিতির মধ্যে রূপ দিয়ে যায় সেই অদ্বিতীয় সত্তাকে। উপনিষদ্ বলছেন: 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' (কঠ ২।৩।২) অর্থাৎ এই চরাচর সমস্ত বস্তু সেই পরব্রহ্মের সত্তা থেকে বেরিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। চৈনিক শিল্পীর ভাষায়—এই সত্তা হচ্ছে জীবনের গতি ও ছন্দ। আমি সামান্যভাবে ঐ সত্তাকে বুঝতে ও রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। ফলে আমি উচ্চ-নীচ, তুচ্ছ-বিরাট প্রভৃতির মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিনি। পূর্বে আমি দেবতাদের মধ্যেই কেবল দৈবী সত্তা দেখতে অভ্যস্ত ছিলুম। এখন আমি আকাশ, জল, পর্বত, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, মানুষ প্রভৃতির মধ্যে ঐ দৈবী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করি।

সর্বদেশে সর্বকালে উৎকৃষ্ট শিল্প বেরিয়েছে মহান ভাবরাশি থেকে। খ্রীষ্টধর্ম-প্রভাবে মধ্যযুগীয় ইউরোপের শিল্পকলা, কৃষ্ণ ও বুদ্ধের দ্বারা প্রাচীন ভারতের শিল্প ও তাও-এর দ্বারা চৈনিক-শিল্প হয়েছে সমৃদ্ধ। যখনই কোন মহামানবের ব্যক্তিত্ব আদর্শের প্রতাকরূপে পূজিত হয়, তখন অতি শীঘ্রই ঐ আদর্শ ব্যক্তিত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত ও অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতি ও জীবন হয় অবহেলিত। প্রেম ও জ্ঞানের আলোর হয় ক্ষীণতম স্ফুরণ। ভারতবর্ষে এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আমি বিশ্বাস করি, সাধকের হৃদয়ে যে কালী- বা শিব-মূর্তি প্রথম প্রতিভাত হয়েছিল—তা প্রকৃতি থেকে। আর আমাদের বর্তমান শিল্প-চেতনায় প্রকৃতির আকর্ষণ ও উৎসাহ খুবই অল্প। ঈশ উপনিষদ্ আমাদের প্রথম পর্যায়েই শিক্ষা দিচ্ছেন: ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' অর্থাৎ এ পৃথিবীতে যা কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু আছে—সব কিছুতেই ঈশ্বরের সত্তা বিরাজমান। ভারতকে তার চিন্তাজগতের পরতে পরতে এই উপলব্ধি লাভ করতে হবে। আর এ ভাবেই ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প সন্দর্শন লাভ করবে এক নবোদ্ভাসিত জগৎ এবং প্রকাশ করবে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-কে।

ঠাঁই দিও মা রাঙা পায়ে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নীল নটিনী ধায় তটিনী মনমোহিনী এঁকে বেঁকে
পদে পদে ডিঙিয়ে বাধার বাঁধ অগাধ অধীর আবেগে।
নিশানা তার জানে না সে,
জানে শুধু—ভালোবাসে
রঙিন নেশায় অকূল আশে
গভীর তৃষায় কার—জানে কে?
আকাশ হাসে: "কেউ কি জানে—কার টানে ধায় আনন্দে কে?

তেমনি ছোটে আকুল হৃদয়ে অদেখা তার মায়ের পানে
নাম শুনে সে-সুদূরিকায় বরণ ক'রে গানে গানে।
পদে পদে ভুল করে সে,
তবু চলে কেঁদে হেসে
আবেগ-উধাও নিরুদ্দেশে—
দুরন্তকে রুখবে সে কে?
ভক্ত হাসে: "কেউ কি জানে—পায় পাথেয় কোন্ পথে কে?"

মুক্তি অমল, দুঃখহরা, অভয়, অটল ঘোর বিপদে,
সাধনজাগা জ্ঞানের আলোয় চলে কেটে পথ বিপথে।
গম্ভীর সে—শান্ত, প্রবীণ,
ধোঁয়ায় ধুলায় রয় অমলিন,
নেই শোক, নয় কারো অধীন—
চলে ধ্যানের জ্ঞানের রথে:
সবার মাঝে থেকেও ধরা দেয় না কারেও এ-জগতে।

না না—দিয়ো ভক্তি আমায়, ক্ষীণ যদি হয় শক্তি মাগো,
অবসাদও আনবে প্রসাদ—তুমি যদি প্রাণে জাগো।
যদি ধুলা লাগে গায়ে,
ঠাঁই দিও মা রাঙা পায়ে
স্নেহের স্নানে অসহায়ে
দীক্ষা দিও শরণব্রতে।
গানের ফসল ফলিয়ে কোরো আমায় কোমল প্রেমদরদে॥

সমালোচনা

স্বামীজীর আহ্বান (প্রথম সংস্করণ, মহালয়া, ১৩৭৬) প্রকাশক : উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৭৬+১২ ; মূল্য পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

নূতন যুগের ইতিহাস-রচনা-কল্পে যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষভাবে তরুণ সমাজকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, শত শত তরুণচিত্ত সেই প্রাণস্পর্শী আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল, তাহারই ফলে জাগ্রত ভারত মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। ভারতের পরাধীনতা-শৃঙ্খল ভাঙিয়াছে সত্য, কিন্তু শুভশক্তির উদ্বোধনের জন্য আজও প্রয়োজন প্রকৃত জাগরণ ; সেই জাগরণেই আসিবে উপযুক্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তাহারই উদ্দেশ্যে 'স্বামীজীর আহ্বান'—"ওঠ, জাগো, নিজে জেগে অপরকে জাগাও।"

বর্তমান প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই 'সংকলন-গ্রন্থে' স্বামীজীর সঞ্জীবনী বাণী হইতে বিষয়বস্তু নির্বাচিত হইয়াছে : 'আত্মবিশ্বাস', 'হে ভারত, ভুলিও না', 'নূতন ভারত', 'বাঙলা ও বাঙালী', 'শিক্ষা', 'জীবই শিব', 'নারীশক্তি', 'শূদ্র-জাগরণ', 'সমাজ-চেতনা', 'ভবিষ্যতের ইঙ্গিত', 'মা, আমায় মানুষ কর।'

গ্রন্থারম্ভে 'জাগরণের অগ্রদূত' নামক পরিচ্ছেদে, ভারতাত্মা স্বামীজীর জীবন পরিক্রমা করা হইয়াছে এবং তাঁহার অমূল্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে। প্রচ্ছদপটে ভারত-জননীর বাণীমূর্তি বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়া আপামর সকলকে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিতেছেন—এই ভাবটি সুপরিস্ফুট।

আমরা আশা করি, বাঙলার ঘরে ঘরে, স্কুলকলেজের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর হাতে এই গ্রন্থ বিরাজ করিবে, স্বামীজীর আহ্বানে যুবসমাজ স্বদেশ ও বিশ্বের কল্যাণব্রতে নির্ভীক হৃদয়ে আত্মনিয়োগ করিবে।

Krishna in History and Legend : বিমানবিহারী মজুমদার। প্রকাশক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; পৃষ্ঠা ৩০৭ ; মূল্য ২০ টাকা।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ নাম। তাঁর গবেষণার পরিধি বহুবিস্তৃত এবং বিষয়বস্তু বহুমুখ। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ ও সফল বিচরণ। ইংরেজী ও বাংলা বহু গ্রন্থের তিনি সার্থক রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় তিনি যে ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহারই মুদ্রিত রূপ এই আলোচ্য গ্রন্থখানি।

শ্রীকৃষ্ণ ভারতমানসের চিরন্তন উপাস্য ভগবান। ব্রহ্মপুত্র থেকে সিন্ধুতট পর্যন্ত সমগ্র জনপদ আজও শ্রীকৃষ্ণ নামে মুখরিত। নিরবধি কাল এই পুণ্য নামের জয় ঘোষণা করছে। সত্যসন্ধানী ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণজীবন ও -চরিত্রের আলোচনা এবং ভারত-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদানের মূল্যাঙ্কন করা এক অতি দুশ্চর কর্ম। ডঃ মজুমদার এই দুরূহ কার্য সম্পাদনে যে সাহস, তথ্যনিষ্ঠা ও আনুগত্য দেখিয়েছেন এবং যার পরিচয় বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় সুপ্রকট তা নিঃসংশয়ে প্রশংসনীয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের আবেদন সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত। তাই ভারতবর্ষের প্রতিটি ভাষাও তাঁকে অবলম্বন করে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগেও শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ভারতবর্ষের

বিদ্বৎসমাজের মননের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিস্তীর্ণ এই বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে বিপুল উপকরণ গ্রন্থকার অশেষ শ্রম স্বীকার করে সংগ্রহ করেছেন-ই, এতদ-তিরিক্ত স্থাপত্য, শিলালেখ প্রভৃতি ও অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগে তিনি সমভাবে দক্ষতা দেখিয়েছেন। গ্রন্থকার একদিকে যেমন ঐতি-হাসিক, অন্যদিকে তেমনি তিনি একনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত। কিন্তু তিনি গ্রন্থে কোথাও তাঁর ভক্ত সত্তাকে উপস্থাপিত করেননি। ঐতিহাসিক সত্তাকে তিনি বরাবর অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সেই জন্য ডঃ মজুমদার ঐতিহাসিক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের দেবভাব যথাসম্ভব বর্জন করে তাঁর মনুষ্যকৃতির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ডঃ মজুমদার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, মুখবন্ধে সেই প্রসঙ্গে বলেছেন— তিনি আকর-উপাদানগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। আর 'পাথুরে প্রমাণ' ছাড়া ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার্য নয়— এই মতে তিনি বিশ্বাসী নন। আলোচনার আরম্ভ তিনি করেছেন ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে।

গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় হচ্ছে—(১) শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও আবির্ভাব সম্বন্ধে সঠিক কাল নির্ধারণে বিভ্রান্তি; (২) সাহিত্যে ও স্থাপত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন; (৩) মহাভারত ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ; (৪) দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ; (৫) শ্রীরাধা এবং (৬) বর্তমান ভারত-বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মূল্যাঙ্কন। এ ছাড়া ৪টি পরিশিষ্টে আছে—(১) ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ: (২) তীর্থপ্রসঙ্গ ইত্যাদি; (৩) মধ্যযুগের সাহিত্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ; (৪) শ্রীকৃষ্ণ আর্য অথবা অনার্য?

তৃতীয় অধ্যায়ে ভাগবতের কালনির্ণয় সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের আলোচনা অবশ্যই প্রণিধান-যোগ্য। এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর অথবা আচার্য রামানুজের কোন গ্রন্থে ভাগবতের অনুল্লেখ সম্বন্ধে তিনি কিছু আলোকপাত করতে পারতেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বিষ্ণু-পুরাণের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

তস্মাদ্ দুর্গং করিষ্যামি যদূনামরিদুর্জয়ম্।
স্ত্রিয়োঽপি যত্র যুধ্যেয়ুঃ কিং পুনর্বৃষ্ণিপুঙ্গবাঃ॥
ময়ি মত্তে প্রমত্তে বা সুপ্তে প্রবসিতেঽপি বা।
যাদবাভিভবং দুষ্টা মা কুর্বন্ত্বারয়োঽধিকাঃ॥
(৫. ২৩. ১১-১২)

গ্রন্থকার বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন "শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী ও জাম্ববতী অপেক্ষা সত্য-ভামার প্রতি অধিক প্রণয়াসক্ত ছিলেন" (পৃ. ১৫৫-৫৬)। কিন্তু ঐ পুরাণের ১.৯.১৪৪ শ্লোকে বলা হচ্ছে যে, রুক্মিণীই ছিলেন তাঁর মূলা শক্তি। রাধা সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের অনেক তথ্য আধুনিক কালের পল্লবগ্রাহী ডিগ্রী-লিপ্সুদের সুবিধা করে দেবে। ১৬৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গাথা-সপ্তশতীর কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে ডঃ রাধা-গোবিন্দ বসাকের মতো একজন প্রবীণ ঐতি-হাসিকের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করলে ভাল হোত। ডঃ বসাকের মতে গাথা-সপ্তশতীর রচনাকাল খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী। মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যায়ে মীরাবাই-এর মতো মরমিয়া গীতিকারের অনুপস্থিতিতে আমাদের প্রত্যাশা কিছুটা অপূর্ণ রয়ে গেল।

অন্তিম বা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আধুনিক যুগে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলা দেশে হয়েছে তার একটি বিশদ বর্ণনা গ্রন্থকার দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রকে এই অধ্যায়ে স্বভাবতই লেখক

প্রাধান্য দিয়েছেন। নবভারত-নির্মাতাদের অনেকেরই উক্তি তিনি উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি অপ্রাসঙ্গিক হোত না: "যে দিকে চাইবি, দেখবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র perfect। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই।" (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬)। আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণজীবনের বিচার কতটা হাস্যাস্পদ ও পাশ্চাত্ত্য মনোভাবের অনুকরণপ্রসূত তা গ্রন্থকার পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ খাঁটী আর্য ছিলেন—গ্রন্থকারের এই ধ্রুব সিদ্ধান্ত পণ্ডিত-মহলের প্রচলিত চিন্তাধারায় নাড়া দেবে বলে মনে হয়।

গ্রন্থকারের অন্যতম সারস্বত প্রচেষ্টাকে আমরা হার্দিক অভিনন্দন জানাই।

—স্বামী বীতশোকানন্দ

কর্মযোগ (২৪শ সংস্করণ)—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ২২৩। মূল্য ২.৮০।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সুপ্রসিদ্ধ 'কর্মযোগ' গ্রন্থের পরিচয়প্রদান অনাবশ্যক হইলেও বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহা শুধু পুনর্মুদ্রণ নয়, কর্মযোগ বিষয়ক স্বামীজীর ছয়টি বক্তৃতা এই সংস্করণে সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন: কর্ম ও তাহার রহস্য, কর্মযোগ-প্রসঙ্গে, কর্মই উপাসনা, স্বার্থরহিত কর্ম, জ্ঞান ও কর্ম, কর্মবিধান ও মুক্তি।

'কর্ম ও তাহার রহস্য' বক্তৃতাটি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জানুআরি লস এঞ্জেলেসে, 'স্বার্থরহিত কর্ম' ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ বাগবাজার বলরাম-মন্দিরে এবং 'জ্ঞান ও কর্ম' ভাষণটি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর লণ্ডনে প্রদত্ত হইয়াছিল। গ্রন্থশেষে 'নির্দেশিকা'টি নূতন সংযোজন।

গীতাতত্ত্ব—গ্রন্থকার ও প্রকাশক শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, পোঃ জগাছা, হাওড়া। পৃষ্ঠা ২৪; মূল্য ৩০ পয়সা।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সার্বভৌম ও অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা যত হয় ততই মঙ্গল। গীতাতত্ত্ব পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে লিপিবদ্ধ গীতা সম্বন্ধে আলোচনা-রীতি প্রশংসনীয়। সংক্ষেপে গীতার সারকথা, শিক্ষা, তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য পরিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে গীতানুশীলনের আগ্রহ হইবে।

দাস গোস্বামী—সঙ্কলক রামকিঙ্কর দাস, তারাস মন্দির (শ্রীকুণ্ড), পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)। পৃষ্ঠা ৬৪৪ + ৫২। মূল্যের উল্লেখ নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁহার জীবন তীব্রবৈরাগ্যমণ্ডিত এবং অপূর্ব ভজনশীলতায় মহিমান্বিত। তিনি সুদীর্ঘকাল শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই ভক্তপ্রবরের জীবন ভক্তগণের আদর্শস্থানীয় এবং আধ্যাত্মিকতার পথে অতীব প্রেরণাদায়ী। আলোচ্য গ্রন্থখানি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি। গ্রন্থের উপাদান প্রধানতঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত এবং অন্যান্য গৌরলীলাবিষয়ক পুস্তকাবলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কীর্তনের বহু পদ- ও উদ্ধৃতি-সমন্বিত এবং অনেকগুলি মনোজ্ঞ চিত্রসংবলিত এই সঙ্কলন-গ্রন্থখানি ভক্তসমাজে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়া উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। সঙ্কলন-কার্যও প্রশংসনীয়।

অর্ধরাত্রবেধ-বাদ—ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবা। প্রকাশক: শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ১২৭ + ৩৯। মূল্য ২.৫০।

এই গ্রন্থে একাদশীর উপবাস সম্পর্কে নিম্বার্কসম্প্রদায়ে প্রচলিত অর্ধরাত্রবেধ-বর্জনের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের অভিমত ও ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে একাদশীব্রত সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশ পাওয়া যাইবে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভক্তগণের নিকট এই পুস্তক বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা : গত সেপ্টেম্বর মাসে (ক) **মালদহে** ইংরেজবাজার, কালিয়াচক ও মানিকচক ব্লকের ১১৬টি গ্রামে বন্যাপীড়িতদিগকে ২২,০১৬ কেজি চাল বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১৩,৭১৮। (খ) **মুর্শিদাবাদে** বরসিমুল ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামে ৫,২৫৪ জনের মধ্যে ৪,৬৪৯ কেজি চাল, ২৭৩ কেজি ডাল, ২১০ কেজি চিড়া, ৬২ কেজি গুড়, ১৪৪ খানি পাঁউরুটি বিতরিত হইয়াছে। (গ) **জলপাইগুড়িতে** বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা-সরঞ্জাম দেওয়া চলিতেছে।

কাছারে বন্যার্তসেবা : গত সেপ্টেম্বর মাসে **করিমগঞ্জ** হইতে ২৭টি গ্রামের ৮,৯৮১ ব্যক্তিকে ৬,৫৫০ কেজি চাল, ২৯৪ খানি ধুতি, ২৮৭টি কম্বল, ২০ মিটার খাকি কাপড়, ২২ মিটার সার্টের কাপড় দেওয়া হইয়াছে।

শিলচর হইতে বন্যার্তসেবায় ১২টি গ্রামের ১,৮৮৩ জন অধিবাসীকে ১,৯৬০ কেজি আটা ও ৪০০ কেজি চিড়া বিতরণ করা হয়। ১২ জনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ৪০টি পরিবারকে কৃষিকার্যের জন্য ধানের চারা দিয়া সাহায্য করা হয়। ২টি পরিবারের বাড়ী তৈরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অন্ধ্রে ঘূর্ণিঝড়-বিপর্যস্তদের সেবা : চিরালায় দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সম্প্রতি অধিকৃত জমিতে গত ২৬শে সেপ্টেম্বর স্বামী গম্ভীরানন্দজী একটি ব্লকের গৃহনির্মাণের জন্য ভিত্তি স্থাপন করেন।

গুজরাটে বন্যার্তসেবাকার্য : বন্যায় বিপর্যস্ত জনগণের সেবাকল্পে কম্যুনিটি-হল প্রভৃতি নির্মাণ-কার্য ভালভাবেই অগ্রসর হইতেছে।

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ—(পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া): এই কেন্দ্রের ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

সারদাপীঠ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিভাগগুলি পরিচালিত হয়: (১) বিদ্যামন্দির, (২) শিক্ষণমন্দির, (৩) শিল্পমন্দির, (৪) শিল্পায়তন, (৫) শিল্পবিদ্যালয়, (৬) জনশিক্ষামন্দির, (৭) তত্ত্বমন্দির।

বিদ্যামন্দির : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত এই আবাসিক ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজে ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের ছাত্রসংখ্যা ২১৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল সন্তোষজনক। ছাত্রগণের শরীর ও মনের সুষম বিকাশসাধনের যথোপযুক্ত যত্ন লওয়া হয়।

শিক্ষণমন্দির : এই আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে বি. টি. পড়িবার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষের ছাত্রসংখ্যা ১৩৪। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৩১ জন বি. টি. পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২৯ জন ডিগ্রী লাভ করেন, তন্মধ্যে ৪ জন ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছিলেন।

শিল্পমন্দির : সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিন বৎসরের ডিপ্লোমাকোর্সে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন বিভাগের মোট ছাত্রসংখ্যা ৪৩৯। শিল্পমন্দির ছাত্রাবাসে ৯০ জন ছাত্র ছিল। শিল্পমন্দিরের ডিপ্লোমা-কোর্সের ফল সন্তোষজনক।

শিল্পায়তন : ১৪ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বালকদের জন্য এই জুনিয়র টেকনিকাল স্কুলে ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৩৪ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে।

শিল্পবিদ্যালয় : এখানে বিদ্যুতের কাজ, অটোমেকানিক, টার্নিং, ফিটিং, কার্পেন্টি ও তাঁতের কাজ শিখানো হয়। আলোচ্য বর্ষে ৬২ জন শিক্ষালাভ করে ; ৫৫ জন ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয় ও ৪২ জন উত্তীর্ণ হয়।

জনশিক্ষামন্দির : এই বিভাগ দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও নানা-প্রকার সেবার কাজ হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ৯টি নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৭০ জন বয়স্ককে সাক্ষর করা হইয়াছে। মোবাইল অডিও-ভিসুয়াল ইউনিট কর্তৃক ৮৮টি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক ফিল্ম দেখানো হয়, মোট ৫৮,০০০ ব্যক্তি যোগদান করেন। প্রধান গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য ইউনিটের মাধ্যমে বিনা-চাঁদায় জন-সাধারণকে ১৮,৩২৬ খানি বই পড়িতে দেওয়া হয়। ২০০ জন শিশুকে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হইয়াছিল। জনশিক্ষা-মন্দিরের অন্যান্য সেবামূলক কর্মের মধ্যে যুবকগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। শিশুগণকে এবং রুগ্ণ জননীদিগকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ বিতরণ করা হয় ; ৪৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এই কার্য পরিচালিত হইয়াছে।

তত্ত্বমন্দির : এখানে সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্য নিয়মিত শাস্ত্রক্লাস এবং জনসাধারণের জন্য সাপ্তাহিক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে সারদাপীঠের অন্যান্য কার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

জলপাইগুড়ি বন্যার্তসেবাকার্যে সারদাপীঠ অংশ গ্রহণ করে এবং বন্যাবিপর্যস্ত অঞ্চলের দুঃস্থ ছাত্রগণকে ৩,৬৪০·৫৮ টাকা মূল্যের পুস্তক দান করে।

সারদাপীঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীদেবীর অর্চনা মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সারদাপীঠের বিভিন্ন বিভাগে ছাত্রগণকর্তৃক শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সুন্দরভাবে ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

পাটনা : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (রামকৃষ্ণ এভিনিউ, পাটনা ৪) এপ্রিল ১৯৬৮ হইতে মার্চ ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

পাটনায় এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে আশ্রমটির ৪৭তম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে।

এই কেন্দ্রের কার্যাবলী প্রধানতঃ ত্রিধারায় পরিচালিত : শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ধর্ম।

আলোচ্য বর্ষশেষে আশ্রমের ছাত্রাবাসে (কেবল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য) ২৩ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১২ জন বিনা-খরচে এবং ৩ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে।

আশ্রম-ছাত্রাবাসের যে-সকল ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়াছিল সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন ছাত্র পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছে এবং আর একজন ছাত্র এম.এসসি-তে ফার্স্টক্লাস পাইয়াছে।

আশ্রমের স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারে ৮,১৮৭ খানি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে ১১৫ খানি পুস্তক দুর্লভ

সংযোজিত। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৬৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক সংখ্যা ১৫,২২৩; গড়ে দৈনিক পাঠকসংখ্যা ৬০।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে বিভিন্ন বিষয়ে ১২টি বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আশ্রম-কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালো-প্যাথিক উভয়বিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৬,৭৯০ (নূতন ৭,৮৭৫) জন রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে।

অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮৯,৬৩৬; তন্মধ্যে নূতন রোগী ১১,৩৪৪।

আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে মোট ২৩৯টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সপ্তাহে দুইদিন পাণিনি-ব্যাকরণের ক্লাস, এবং প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের জন্য গল্প বলার ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। একদশীতে শ্রীশ্রীরামনামসংকীর্তনে বহু ভক্ত যোগদান করেন।

প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে পাটনা অন্ধ স্কুলের ছাত্রগণকে এবং আশ্রম-পরিচালিত ডিস্পেনসারীর রোগীদিগকে ফল বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামনবমী, শ্রীবুদ্ধপূর্ণিমা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, খৃষ্টজন্মদিন, আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি প্রভৃতি উদ্‌যাপিত হয়।

সভানুষ্ঠান

বেলঘরিয়া: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমে গত ২০শে সেপ্টেম্বর স্বামী নির্বেদানন্দ স্মৃতিবক্তৃতা ও আশ্রমের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় সভায় পৌরোহিত্য করেন। আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী ধ্যানাত্মানন্দের বিবৃতিপাঠের পর প্রধান অতিথি অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'রাজ-নীতিতে ধর্মের স্থান' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি রাজনীতিতে পূর্বে এবং বর্তমান সময়েও ধর্মোন্মত্তা, রাজনীতির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ধর্মের মূলভাবের সমন্বয় প্রভৃতি আলো-চনা করিয়া উপসংহার করেন: রাজনীতিতে ধর্মের মূল ভাব না থাকিলে, রাজনীতিকদের জীবনে ধর্মের মূল ভাবগুলির বিকাশ না ঘটিলে আদর্শকে রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব নহে। স্বামী অমলানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

জামসেদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে গত ৪ঠা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর শতবর্ষজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুলের মনোরম পরিবেশে ছোট একটি প্রদর্শনী, গান্ধীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও আবৃত্তি এবং শ্রীবি. এন. সাক্সেনার সভাপতিত্বে একটি আলোচনা ও পুরস্কারবিতরণী সভা আয়োজিত হয়; সভাপতি ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ গান্ধীজীর জীবন আলোচনা করেন, এবং স্কুলের ছাত্রীগণ প্রবন্ধ পাঠ ও আবৃত্তি করেন। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী প্রভা সাক্সেনা। ভজনসঙ্গীত পরি-চালনা করেন বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ইছাপুর-মগ্নাল (আরামবাগ, হুগলী) গ্রামে গত ১০ই আগস্ট স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজাদি হয়; মধ্যাহ্নে প্রায় নয়শত ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন আরামবাগ শহরেও তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গ্রামটিতে যাইবার ভাল রাস্তা ও যানবাহনের একান্ত অভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ উহার সুব্যবস্থা এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মস্থানের উপর একটি চালাঘর তুলিয়া সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পটপ্রতিষ্ঠা ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

পরলোকে অমিয়াবালা বসু

গত ৪ঠা ভাদ্র ১৩৭৬ শ্রীমতী অমিয়াবালা বসু তাঁহার টালিগঞ্জস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

পরলোকে ফণীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

গত ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাক্তার ফণীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন; হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১৩০২ সালে তিনি মৈমনসিং জেলার সহদেবপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তিনিই দিনাজপুরস্থ নিজ ভবনের একটি গৃহে ইহার সূত্রপাত করেন। শেষ বয়সে তিনি কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমেই থাকিয়া সেখানকার ডিসপেনসারীতে সেবাকার্যে নিরত ছিলেন। এদুটি আশ্রমে ছাড়া ব্রহ্মদেশাগত উদ্বাস্তুগণের শিবিরেও তিনি সেবা করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের সারদেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তিলাভ করুক।

এই সংখ্যার লেখকগণ

১। স্বামী চণ্ডিকানন্দ : বেলুড় মঠ
২। শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৩। শ্রীনির্মলকুমার বসু : কমিশনার, অনুন্নত সম্প্রদায়, নিউ দিল্লী
৪। ব্রহ্মচারী শশাঙ্ক : বেলুড় মঠ
৫। সেখ সদরউদ্দীন :
প্রধান শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ, পানিহাটী (২৪ পরগণা)
৬। স্বামী অমলানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া
৭। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৮। শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী : কলিকাতা
৯। শ্রীমনকুমার সেন : বেলঘরিয়া
১০। স্বামী চেতনানন্দ : অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা

দিব্য বাণী

আত্মা জেয়ঃ সদা রাজ্ঞা ততো জেয়াশ্চ শত্রবঃ। ৬৭-৪
রাজ্ঞা হি পূজিতো ধর্মস্ততঃ সর্বত্র পূজ্যতে।
যদ্ যদাচরতে রাজা তৎ প্রজানাং স্ম রোচতে॥ ৭৩-৪

যো ন কামাদ্ভয়াল্লোভাৎ ক্রোধাদ্বা ধর্মমুৎসৃজেৎ।
দক্ষঃ পর্যাপ্তবচনঃ স তে স্যাৎ প্রত্যনন্তরঃ॥ ৭৮-২৭

—মহাভারতম্, শান্তিপর্ব

রাজা যিনি তাঁর করা চাই আগে
নিজ রিপুচয়ে, মনেরে জয়;
তারপরে তিনি জিনিতে যাবেন
বাহিরের যত শত্রুচয়॥
রাজা যদি করে ধর্মাচরণ
প্রজারও ধর্মে মতি যে থাকে,
রাজা যা করেন প্রজাদেরও তাই
করার ইচ্ছা সদাই জাগে॥

কীর্তিমান যে, সদাচারে রত,
কর্মকুশল ব্যক্তির 'পরে যার
নাই বিদ্বেষ, অকারণ কোন
অনর্থপাত করে যেই পরিহার,
দক্ষ যে জন, সদা মিতভাষী,
যে কভু ক্রোধে বা লোভে ভয়ে কামবশে
ধর্ম না ত্যজে, যোগ্য সে শুধু
মন্ত্রী হইয়া বসিতে রাজার পাশে॥

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ী ও অনুরাগী সকলকেই আমরা ✓ বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি।

নেতৃত্ব ও ত্যাগ

বিপুল মানসিক শক্তি, ভালবাসা এবং ভিতরের একটি সুদৃঢ় অবলম্বন না থাকিলে যথার্থ ত্যাগ আসে না। এই শক্তির বিকাশও একদিনে হয় না, অবলম্বনও সহজলভ্য নয়—ইহার জন্য প্রয়োজন বহুদিনের সাধনা, জীবনব্যাপী অনুশীলন।

মানুষ অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে কেন? নিয়মের চাপে বাধ্য হইয়া করিতে পারে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য ভয়ে বা সঙ্কোচে করিতে পারে। কিন্তু এগুলি কোনটিই যথার্থ ত্যাগ নহে। পূর্বোক্ত বাধা অপসৃত হইলেই এসব ক্ষেত্রে স্বার্থ আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার বিকট দ্রংষ্ট্রা লইয়া অপরকে দংশন করিতে উদ্যত হয় এবং সুযোগ পাইলে করেও।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমান পৃথিবীতে এই সত্যটি আজ সর্ব-সমক্ষে অনাবৃত; বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে। দেশের জনগণের দুঃখে যাঁহাদের ঘুম হইতেছে না বলিয়া মনে হইত, দেশের জন-গণের দুঃখ নিবারণকল্পে যাঁহারা স্বার্থকে বলি দিয়াছেন বলিয়া মনে হইত, আজ ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাদের অনেকেই, প্রায় সকলেই, দেশের ও জনগণের স্বার্থকে অবহেলা করিতেছেন। শুধু অবহেলা নয়, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহারা জনগণের স্বার্থকে অম্লানবদনে বলিও দিতেছেন। দেশসেবার, জনসেবার, দেশমাতৃকার পূজার বহুবিধ পদ্ধতি লইয়া দলে দলে বিভক্ত জনগণের সেবকেরা, পূজকেরা আজ বিভিন্ন পতাকাহস্তে পূজাবেদী-তলে সমবেত; কিন্তু সেবার, পূজার মনোভাবই কাহারো মধ্যে আছে বলিয়া মনে করা কঠিন হইতেছে; ব্যক্তিগত, দলগত বা মতবাদগত স্বার্থের উপর সর্বত্রই যেন সেবার একটি চাকচিক্যময় ক্ষীণ আবরণ এতদিন জড়ানো ছিল, যাহা আজ ক্ষীণতর, লুপ্তপ্রায় হইয়া সর্বজনসমক্ষে আসল স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করিতেছে।

চলার পথে জনগণ আজ একযোগে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করিবে কাহাদের নেতৃত্বের উপর? সে নেতারা কোথায়? এ প্রশ্ন আজ ব্যাপকভাবে জনচিত্তে জাগিতেছে।

ত্যাগ ও সেবার ভাবানলে পরিশুদ্ধচিত্ত, সর্বজনচিত্তে অমোঘ প্রভাব বিস্তারকারী সেই অনাগত নেতারা জন্মলাভ করিবেন তরুণ-চিত্তে; যদিও বর্তমান যুবসম্প্রদায়ের দিকে তাকাইলে তাহা কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। তবে সেখানে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আজ আমরা দেখিতেছি তাহা সর্ববিষয়ে স্বাধীনতালাভের নবজাগ্রত প্রবল ইচ্ছাসম্ভূত, এবং শৃঙ্খলানুগামী না হইলে স্বাধীনতা যে অর্থহীন—এই বোধের অভাব হইতেই উদ্ভূত। কল্যাণপথের একটু

সহানুভূতিময় দিঙ্‌নির্দেশ পাইলেই এবং উচ্ছৃঙ্খলতা যে স্বাধীনতা নয় এ বোধ জাগিলেই শিক্ষিত চিন্তাশীল যুবকগণের মধ্য হইতে উহা অপসৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। জাতির উন্নতির পরিকল্পনায় সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তাই এই বিষয়ে।

যুগ-প্রবণতা

তাছাড়া, আজ শুধু ভারতে নয়, সারা জগতেই মানুষের মন সবকিছুর সত্যতা নিজে যাচাইয়া দেখিতে চাহিতেছে; যাহা কিছু উজ্জ্বল, তাহাকেই স্বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সে আজ নারাজ। অপরদিকে ইহারই ফলে সমগ্র মানবজাতির সংস্কার পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে—ব্যক্তিগত ও জাতিগত মনের অবচেতন স্তরে শুভাশুভ যাহা কিছু সংস্কার, এবং মনের চেতন স্তরেও যাহা কিছু অশুভবৃত্তি এতকাল রাষ্ট্র ও সমাজের ভয়ে দমিত হইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল, সবই আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যুবসমস্যা, জাতীয় সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা—আজিকার পৃথিবীর সবকিছু সমস্যার মূলে এই সংস্কার-মুক্তির প্রবণতাই একটি প্রধান ক্রিয়াশীল শক্তি।

সমগ্র মানবজাতির সমকালে সমভাবে এই জীবনবিপ্লবসাধনের প্রচেষ্টা এই বোধ হয় মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বিকশিত এই আত্মবিশ্বাস, এই সবকিছুকে নিজে যাচাইয়া দেখিয়া লইবার ইচ্ছা—এই শুভাশুভ সব সংস্কারের নির্ভীক বিকাশ একদিকে তাহাকে বর্তমানে বহুক্ষেত্রে অশুভ সংস্কারকে মূল্যবান ভাবাইয়া বিপথে চালিত করিয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি করিলেও অদূর ভবিষ্যতে ইহার কুফল তাহাকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করাইবেই; কারণ মানুষের মন ও জীবন সম্বন্ধে মূল সত্যগুলি জড়প্রকৃতির নিয়মের মতোই অপরিবর্তনীয়, কয়েক হাজার বছর আগেও তাহা যেরূপ ছিল আজও সেরূপ আছে, যুগে যুগে যে পরিবর্তন আসে তাহা সেগুলির বহিঃপ্রকাশে, মূল সত্যে নহে। তখন বিশ্বমানবচিত্ত জীবনের অবলম্বনরূপে পাইবার জন্য মানবজাতির যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত ভাণ্ডার একবার অনুসন্ধান করিবে এবং তখন তাহার দৃষ্টি সেখানকার অমূল্য সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু যদি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাহাদের দৃষ্টি অচিরে সেদিকে ফিরাইতে না পারি, হয়তো তাহা ঘটিবে একটি প্রচণ্ড আঘাত পাইবার পর।

এই নবজাগ্রত বিশ্বচিত্ত জীবনের গভীরতর সত্যের সন্ধান পাইবার পর যে নবযুগের অভ্যুদয় হইবে, তাহা হইবে বিশ্ব জুড়িয়া, সমগ্র মানবজাতিকে একসূত্রে বাঁধিয়া, এক লক্ষ্যাভিমুখী করিয়া। আর তাহার নেতৃত্ব-শক্তির বিকাশ হইবে তরুণচিত্ত হইতেই।

নিজ বিচার-বিবেকবশে চলাই প্রগতি, পরানুকরণ নহে

কোন প্রচণ্ড আঘাতের পর সজাগ হইবার জন্য, অথবা কে কবে সজাগ করিতে আসিবে তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখনই সজাগ হইয়া উঠিতে আমরা তাই আবেদন জানাইতেছি তরুণ চিত্তের কাছেই। কোনও মতবাদ বা প্রচলিত সংস্কারকে মানিয়া লইয়া তাহার যন্ত্রের মতো চলিতে হইবে না, কোনও রাষ্ট্র-, সমাজ- বা ধর্ম-নেতার কথা তাহাদের নির্বিচারে মানিয়া লইয়া চলিতে হইবে না—বিচারের, যুক্তির, বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন বাতায়নই রুদ্ধ

রাখিতে হইবে না,—নিজের সর্বশক্তিকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়া কোন কিছুকে গ্রহণ করিবার আগে স্বাধীন সবল নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নিজে তাহা ভালভাবে যাচাই করিয়া লইলেই হইবে। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার নাম করিয়া কাহারো কথামত একটিকে ছাড়িয়া আর একটিকে যেন অন্ধভাবে গ্রহণ করা না হয়, সংস্কারমুক্তির নামে যেন একটি সংস্কার ছাড়িয়া অপর একটি সংস্কারকে, বিশেষ করিয়া কুসংস্কারকে না গ্রহণ করা হয়। নিজের বিচার-বুদ্ধিকে সর্বাগ্রে জাগ্রত ও তীক্ষ্ণ করিয়া তাহারই সহায়ে নিজে যাচাইয়া দেখিয়া তারপর যাহা সত্য বলিয়া, নিজের পক্ষে, জাতির পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে হইবে তাহা গ্রহণ করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিয়া জীবনগঠনে, রাষ্ট্রসেবায় অগ্রসর হইতে হইবে। চোখ বুজিয়া না চলিয়া চোখ খুলিয়া এবং দৃষ্টিকে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ও সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ভালভাবে সব দেখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা যুগধর্মানুসারে প্রগতির পথেই চলা নিজের যুক্তি ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ভালভাবে আগে যাচাই করিয়া দেখিয়া তবে কিছু গ্রহণ করা—কেবল কাহারো কথা শুনিয়া নহে। অভিজ্ঞ লোকের কথা শুনিতে হইবে নিশ্চয়ই, কিন্তু পরীক্ষার জন্য। সোনা বলিয়া কেহ কিছু দেওয়া মাত্র তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া আধুনিক মুক্ত মনের পরিচায়ক নহে, কষ্টিপাথরে যাচাইয়া তাহা যদি অন্যরূপ দেখা যায়, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। আবার, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট হইতে আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাও যেন এই কষ্টিপাথরে একবার যাচাইয়া লই এবং এভাবে দেখিয়া উহার মধ্যে নিখাদ স্বর্ণরূপে যাহা পাইব, অপর কাহারো কথায়, তিনি যত বড় লোকই হউন, তাহা প্রাচীন বলিয়াই যেন ফেলিয়া না দিই। যদি এরূপ না করিতে পারি, তাহা হইলে সত্তর বৎসর পূর্বের ভারতবাসীর যে পুরানুকরণপ্রিয় দুর্বল মানসিক অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "ভালমন্দ-নির্ণয় এখন আর নিজের বিচার-বিবেক দ্বারা হয় না, পাশ্চাত্যবাসীরা যাহা ভাল বলে তাহাই ভাল বলিয়া এবং যাহা মন্দ বলে তাহাই মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়"—সে অবস্থা হইতে প্রগতির পথে আমরা আগাইয়া আসিয়াছি বলা চলিবে কি? আজ প্রগতির যুগে আমাদের যেমন অন্ধভাবে কোন কুসংস্কার আঁকড়াইয়া থাকা চলে না, তেমনি চলে না অন্ধ অনুকরণও; প্রয়োজন, নিজের বিচার-বিবেক দ্বারাই নিজ জীবনের ও জাতির ভালমন্দ নির্ণয় করা।

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জননেতাদের কথা আমাদের প্রথমে শুনিতেই হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুনিবার পর নিজের বিচার-বিবেক দ্বারা তাহা যাচাইয়া দেখিয়া এবং যেখানে সম্ভব নিজে কিছুটা পরীক্ষা করিয়া তবে তাঁহাদের কথামত স্রোতে গা-ভাসানোই ভাল। নতুবা সময় ও ঘটনার স্রোতের টানে পড়িয়া প্রপাতের মুখে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার প্রাক্কালে সজাগ হইলে কোন লাভই নাই।

মানিয়া লওয়া নয়, যাচাইয়া লওয়া

জীবনের পক্ষে কোন্‌টি কল্যাণকর, কোন্‌টি অকল্যাণকর তাহা আন্তরিক চেষ্টা করিলে আমরা সকলেই নিজে দেখিয়া বুঝিয়া লইতে পারি। খুব সাধারণভাবে বলা যায়, যাহা কিছু দেহ-মনকে সবল করে, তাহাই জীবনের পক্ষে কল্যাণকর, তাহার বিপরীত যাহা—যাহা প্রথম হইতেই দেহমনে দুর্বলতার সঞ্চার করে,

অথবা প্রথমে হাউই-এর মত উদ্ভাসিত হইয়া, সাময়িক শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া পরে মনকে শূন্যগর্ভপ্রায় করিয়া তোলে, অবসাদ আনে, দুর্বলতা আনে, তাহাই অকল্যাণকর। যেমন একটি উদাহরণ দিতেছি। আজকাল সংস্কার-মুক্তির নামে আমরা ভারতীয় জীবনপরিকল্পনায় অনুপ্রবিষ্ট কিছু অশুভ সংস্কারের সঙ্গে সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস প্রভৃতি সে পরিকল্পনার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি শুভসংস্কারেরও উচ্ছেদ সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি, এবং উহাকেই প্রগতির পথ বলিয়া, বুদ্ধিমত্তার, নির্ভীকতার পরিচায়ক বলিয়া ভাবিতেছি। কিন্তু কখনও নিজে অভ্যাস করিয়া মনের অনুভূতির কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি কি—এগুলির অভ্যাস দেহমনকে, ইচ্ছাশক্তিকে, পৌরুষকে অধিকতর বিকশিত করে কি না, জাতির সেবার জন্য একান্ত প্রয়োজন স্বার্থত্যাগের শক্তি আনে কি না ? জীবনের কত সময় তো কত বৃথা কাজে আমরা ব্যয়িত করি ; জীবনকে লইয়া নিজেই ছিনিমিনি খেলিবার বা অপরকে খেলিতে দেওয়ার আগে অল্প কিছুদিন এগুলি অভ্যাস করিয়া নিজে দেখিয়া লইতে ক্ষতি কি ? জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি যতখানি সত্য, সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস যে দেহমনকে সবলতর করে ইহাও ততখানি সত্য। মাত্র কয়েকদিনের আন্তরিক অভ্যাসেই ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে ; প্রতিটি দিনের অভ্যাস অধিকতর শক্তির দ্বার খুলিয়া দিবেই। কোন পাত্রে রক্ষিত জল সর্বদা নড়িলে যেমন তাহাতে সূর্যের যথাযথ প্রতিবিম্ব পড়ে না, জলটি যত স্থির হয় প্রতিবিম্ব তত পরিষ্কার হয়, তেমনি সদাচঞ্চল মনও, বিক্ষিপ্ত একাগ্রতাহীন মনও কখনো সত্যকে যথাযথরূপে ধরিতে পারে না।

আজ মনকে ভোগলোলুপ ও চঞ্চল করাইবার আয়োজন প্রচুর। উহাতে প্রলুব্ধ হইলে মন স্বতই সত্যকে চিনিবার শক্তি হারায়। এরূপ দুর্বল মনকে ভুলাইয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগানো সহজ ; তাহার উপর যদি একটা আদর্শের সমর্থন তাহাতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। তারপর ? তারপর আমার তো কার্যসিদ্ধি হইল—তোমরা তোমাদের মেরুদণ্ডহীন স্বাধীনচিন্তাহীন ভবিষ্যৎ জীবন বরণ কর, আমাদের আরো সুবিধা হইবে ; আর যদি বা তখন সত্যের সন্ধান করিতে চাও কেহ, তাহার পথে এমন বাধা সৃষ্টি করিব যে আমাদের কথা মানিয়া লওয়া ছাড়া তোমার আর গত্যন্তর থাকিবে না।

নেতৃত্ব ও ত্যাগ

অপরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা, ইহা অপেক্ষা বড় আদর্শ, জীবনের সার্থকতা আর কিছুই নাই, ইহা অতি সত্য ; কিন্তু যদি তাহা সত্যই উৎসর্গ হয়, যদি তাহা নিরুপায় হইয়া করা না হয়, যদি তাহাতে স্বার্থসিদ্ধিরও কোন গন্ধ না থাকে। নিজ স্বার্থরক্ষার্থে সমষ্টির জন্য যেটুকু স্বার্থ আমাদের বলি দিতেই হয়, না দিলে চলে না, বা দিতে বাধ্য হইতে হয়, উহা ত্যাগ নহে, স্বার্থহীনতা নহে, উহা সর্বসাধারণের কর্তব্য ; যেমন রাষ্ট্র বা সমাজ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম মানিয়া চলা। উহা করিতে না পারিলে মনুষ্যসমাজে বাস করিবার অধিকারও তো থাকে না। কিন্তু স্বার্থ-ত্যাগ আরো বড় জিনিস। সেখানে নিজের জন্য কিছু চাওয়া, কোন দাবী থাকে না, অপরের—রাষ্ট্রের, সমাজের কল্যাণই থাকে পূজাপীঠে, আর নিজের সব কিছু, এমন কি প্রয়োজন হইলে নিজের মতও অর্ঘ্যরূপে বিসর্জিত হয় সে পূজাপীঠতলে। সেখানে কোন 'আমি' দেহমন-

বুদ্ধির কোন দাবী লইয়া থাকে না। স্বামীজীর ভাষায়, "আমিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে" তবে যথার্থ দেশসেবা বা সমাজসেবা করা চলে। যদি অন্যায়-অবিচারও করে দেশবাসী সে সেবকের প্রতি, তথাপি 'আমি তোমাদের জন্য এত করিলাম, আমার কি এই প্রাপ্য?'—এ দাবী লইয়াও কোন 'আমি' মাথা তোলে না সেখানে। গুরু গোবিন্দের উদাহরণ দিয়াছেন স্বামীজী— দেশের কল্যাণের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিলেন তিনি; তাঁকেই দেশবাসীরা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাহারও উপর কোন দোষারোপ করিলেন না তিনি—নীরবে দাক্ষিণাত্যে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন।

দেশের, সমাজের কোটি কোটি লোকের ভবিষ্যৎ যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদের এরূপই হইতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগী, সত্যকে চিনিবার মতো দৃষ্টিসম্পন্ন, অচঞ্চল ও প্রবল মানসিক শক্তিসম্পন্ন। সংযম ও একাগ্রতার সাধনাই নেতাকে এরূপ গুণভূষিত করিতে পারে। আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস এরূপ বহু দেশসেবকের নাম স্বর্ণাক্ষরে বুকে আঁকিয়া রাখিয়াছে—দেশের কল্যাণে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প, বজ্রদৃঢ় মানসিক শক্তিসম্পন্ন যাঁহারা। মানুষটি যদি খাঁটি হয়, দেশের জনগণের কল্যাণই যদি তাহার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহার স্বার্থ যদি সে-কল্যাণসাধনের পথে কোথাও বাধারূপে না দাঁড়ায়, তাহা হইলে মতবাদে খুব বেশী কিছু আসে যায় না; যদি তাহাতে কিছু ভুলও থাকে, পরে নজরে আসা মাত্র তাহা সংশোধিত হইয়া যাইবেই।

তরুণদের নিকট আবেদন

এই খাঁটি মানুষই এখন প্রয়োজন নেতৃত্বের জন্য। আমরা তাহার জন্য উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছি তরুণচিত্তের দিকে, তাহার সাময়িক বহু ত্রুটি সত্ত্বেও। দোষ ত্রুটি প্রায় সকলেরই থাকে, কম-বেশী; তাছাড়া এমন কোন দোষ নাই যাহা মানুষের উন্নতিপথ চির-রুদ্ধ করিতে পারে। প্রয়োজন শুধু দোষটি নজরে আসামাত্র তাহা সংশোধনের চেষ্টা, মন যত নীচেই নামিয়া আসুক তাহা লইয়া মনকে ভারাক্রান্ত না করিয়া উপরের দিকে দৃষ্টি যাওয়ামাত্র মুক্ত বিহঙ্গের মতো উর্ধ্বগামী হওয়া—"Spit out your actions, good or bad, never think of them again.…be *azad.*" দেশে খাঁটি মনের অভাব, একথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু প্রয়োজনের সময় নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে তাহার থাকা না-থাকা সমান। তরুণগণকে তাই আজ আমরা আকুল আবেদন জানাই— নিজেদের বিচারবুদ্ধি যতদূর সম্ভব গভীর কর, বিস্তৃত কর, কিন্তু আংশিক-ভাবে নহে, দেশবিশেষের জ্ঞানভাণ্ডারমাত্র হইতে নহে, 'মানবজাতির' জ্ঞানভাণ্ডার হইতে—কেবল বহির্জগতের নহে, ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতেও জ্ঞান আহরণ করিয়া। জীবনকে দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, গরিষ্ঠ করিবার জন্য তোমার স্বদেশের মহামানবগণ যাহা বলিয়া-ছেন, তাহাও সত্য কি না নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখ, এবং উহা সত্য বলিয়া অনুভব করিলে সে উপায়ে, বা অন্য যে উপায় তুমি সত্য বলিয়া অনুভব করিবে, সে উপায়ে নিজের দেহমনকে বলিষ্ঠ করিয়া তোল; অপরের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিবার মতো শক্তি সঞ্চয় কর। ভারতকে মহীয়সীর আসনে তুলিতে হইবে তোমাকেই। কৌশলে ইহা হইবার নহে, "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না",—ইহার জন্য প্রয়োজন বিপুল আত্ম-ত্যাগ; কেবল নেতাদের নহে, কোটি কোটি

জনগণেরও; কিন্তু ভুলিও না, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা বাধ্য হইয়া ত্যাগ নহে—উহা ত্যাগ পদবাচ্যই নয়—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মনিবেদন। চিরকালই অপরের কল্যাণ সাধনের একমাত্র উপায় এই ত্যাগ বা আত্মবিসর্জন—"আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের ধারা—হায়, যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। পৃথিবীতে যাঁরা বীরোত্তম ও সর্বোত্তম, তাঁদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে 'বহুজনহিতায়' 'বহুজনসুখায়'।"

এ ত্যাগ তোমাকে বঞ্চিত করিবে না—আনন্দের অমৃতত্বের উৎসদ্বার খুলিয়া দিবে তোমার অন্তরে—যাহার অতি সামান্য অংশমাত্রই ভোগে পাওয়া যায়। আর যদি পার, দেশকে মানুষকে এক পরমসত্তার, তোমার নিজেরই সত্তার বিকাশমাত্র ভাবিয়া সেই সত্তার, 'ঈশ্বরের' পূজার্ঘ্যরূপে ত্যাগ করিতে শিখিও। তরুণচিত্তই শিক্ষার উপযুক্ত ভূমি। তোমাদের উপরই তাই স্বামীজী ভরসা করিয়াছিলেন সর্বাধিক;—"এই-ই সময় তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন-গতি স্থির করিবার—যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজ ভাব রহিয়াছে; কাজে লাগ, এই-ই সময়। কারণ, নবপ্রস্ফুটিত, অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি উহা গ্রহণ করেন।" সেই মানুষরূপী ভগবানের চরণে "তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই শ্রেষ্ঠ কর্ম।" আত্মবলিদানেরই অপর নাম স্বার্থত্যাগ।

"শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই যিনি 'শিশুর মতো নেতৃত্ব করেন।' শিশুকে আপাততঃ অন্যের উপর নির্ভরশীল মনে হলেও, সেই-ই বাড়ীর রাজা। অন্ততঃ আমার ধারণায় এখানেই নেতৃত্বের রহস্য।"

"এস, মানুষ হও।···তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।···মানুষ সর্বকালে যতটুকু শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যে কোনও শক্তির যে পরিমাণে উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে।··· তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি- ও শ্রদ্ধা-বিরহিত হইলে পূজার সম্পূর্ণ ফললাভ অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে। যে-পূজায় যে-যে উপকরণ আবশ্যক, তাহা আয়াস-সাধ্য হইলেও একত্র করিতে হইবে; যে কারণসমূহের সংযোগে যে বিশেষ ফলের উৎপত্তি, সে সমূহের একত্র সংযোগ চাই। এ কথাটি যেমন বড়ই সোজা, তেমনি বার বার মানুষ ভুলিয়াও যায়। এদেশে আমরা এ কথাটি আজকাল কতই না ভুলিয়াছি ফলও তদ্রূপ পাইতেছি। সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নির্বীর্য, ধর্মহান, বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহান, শ্রীহীন। দোষ— পূজাবিধির ব্যতিক্রম। রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবে বলিয়া যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন ও নির্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকে, তাহার ফল-প্রত্যাশা কোথায়? ···মহামারীর প্রতিবিধান-উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহ্যশৌচের বিধানসকল সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া, খাদ্য-পানীয়ের বিচার না রাখিয়া কেবলমাত্র কয়েকঘণ্টা উচ্চরোলে হরিসংকীর্তন করে, তবে তাহার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?···স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য যিনি অহরহঃ বক্তৃতাদানেই ব্যস্ত, কিন্তু একবিন্দু স্বার্থত্যাগে সর্বদাই পশ্চাৎপদ, তাঁহার উপাসনাই বা কি ফল প্রদান করিবে? কথায় বলে, 'যে বিবাহের যে মন্ত্র' তাহার উচ্চারণ চাই। এরূপ শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পূজা করিয়া বলিব, 'পূজার ফল তো পাইলাম না।' হায় মানব, তোমার সহজ বুদ্ধির কি একান্ত অভাবই হইয়াছে!" ('ভারতে শক্তিপূজা')

—স্বামী সারদানন্দ

সাম্যবাদ ও স্বামীজী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

সাম্যবাদ বলতে বর্তমানে আমরা ধন-বৈষম্যের বিরোধী ভাবকে বুঝে থাকি। ধনসাম্যই ইহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ভারতে প্রাচীনকাল হতে যে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী জগতের বিভিন্ন অংশে প্রচারিত হয়ে আসছে, তার মূল কথা ধনসাম্যই শুধু নয়। বলপ্রয়োগের দ্বারা ধনসাম্য প্রতিষ্ঠিত করলেও তা থেকে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মৈত্রী থাকে বহু দূরে। মৈত্রীই হল ভারতের বাণী।

বর্তমান সমাজে শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত আছে। পূর্বেও ইহা ছিল। এই জাতি-বিভাগের সহিত ধনবৈষম্যের কোন সংস্রব ছিল না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে—আর্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্ব হতেই তাদের মধ্যে জাতিবিভাগ বর্তমান ছিল, কোন-না-কোন আকারে।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ?" এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, শ্রীভগবান "চতুর্বর্ণ" শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি বলেছেন—"চাতুর্বর্ণ্যং", অর্থাৎ শব্দটি গুণবাচক বিশেষ্য পদ। উক্ত গুণগুলি ও কর্মসকলের পরিমাণ ও অনুপাতের ক্রম অনুসারেই আমাদের মধ্যে জাতিবিভাগ এসেছিল, কালক্রমে এই অতি প্রয়োজনীয় প্রথাটি, যার উপরে ভিত্তি ক'রে সমাজ গঠিত হয়েছিল—হয়ে পড়ে দূষণীয় এবং অপরিবর্তনীয়। বংশানুক্রমণই বৃহৎ আকারে দেখা দেয় এবং গুণ ও কর্মের বিচার ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়।

তাই পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"হিন্দুগণ। তোমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, এই মহান জাতীয় অর্ণবপোত শত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে, হয়তো উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণও হইয়া পড়িয়াছে—যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া পোতের জীর্ণতা সংস্কার করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।" দেখা যায় শ্রীমৎ স্বামীজী, জাতিভেদ যা বর্তমানে প্রচলিত আছে তার বিরোধী ছিলেন, তবে 'গুণকর্মবিভাগশঃ' যে জাতিবিভাগ স্বামীজী তা উচ্ছেদ করতে প্রয়াসী নন; স্বামীজী সংস্কার করতে ইচ্ছুক তবে সংস্কারের পন্থা হিসাবে তাঁর পূর্ববর্তী সংস্কারকগণ যে উপায় অবলম্বন করেছেন, স্বামীজী তার বিরোধী ছিলেন। স্বামীজীর মতে শুধু নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণের দ্বারা সংস্কার সম্ভব নয়।

স্বামীজী বলেছেন—"এই শতবর্ষব্যাপী সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে কোন স্থায়ী শুভফল হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে—হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সমাজের বাস্তবিক কোন উপকার হয় নাই।" কেন হয় নাই? ইহার উত্তরে স্বামীজী বলছেন, "প্রথমতঃ আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য

রক্ষা করিতে হইবে—কিন্তু দেখা যায়, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্যপ্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণ মাত্র। ভারতে ইহার দ্বারা কাজ হইবে না। দ্বিতীয়ত: কাহারও কল্যাণ সাধন করিতে হইলে নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন ফল হয় না।”

সুতরাং এ থেকে প্রতিপাদন করা যায় যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শ্রেণী-বিভাগকে নষ্ট বা ধ্বংস করলেই যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে—একথা বলা যায় না। স্বামীজীর প্রকল্পিত সাম্যের ভিত্তি ছিল মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই স্বামীজী কখনও বিনাশ বা ধ্বংস চাইতেন না, তিনি চাইতেন সংস্কার বা adjustment.

ভারতীয় আদর্শ শ্রেণীবিভাগের শীর্ষস্থানে ছিলেন ব্রাহ্মণ। স্বামীজী বলছেন—“ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। ‘ব্রাহ্মণ আদর্শ’ বলিতে আমি কি অর্থ বুঝিতেছি? —যাহাতে সাংসারিকতা একেবারে নাই, এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, তাহাই আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। ইহাই হিন্দুজাতির আদর্শ।”

ব্রাহ্মণ বলিতে এমন এক ব্যক্তিকে বুঝায়, “যিনি স্বার্থপরতা একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন। যাঁহার জীবন জ্ঞান-প্রেম লাভ করিতে ও উহা বিস্তার করিতেই নিযুক্ত, তাঁহাকে কাহারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহার কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন?”

স্বামীজী বলছেন -“সত্যযুগে একমাত্র এই ব্রাহ্মণজাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই—প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের যতই অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সত্য-যুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন।” সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উচ্চবর্ণকে টেনে নীচে নামালে, আহারবিহারে যথেচ্ছাচারিতা দেখালে বা নিজ নিজ বর্ণের মর্যাদা লঙ্ঘন করলেই জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হবে না। পরন্তু আমরা প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হবার চেষ্টা করি, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হই, তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হবে। নতুবা নয়। শুধু ভারতেই নয়, সমস্ত পৃথিবীতে এই আদর্শ প্রচার করতে হবে। আমাদের জাতিভেদের অর্থ হল এই। এইভাবে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে তখন আর ধনবৈষম্য ও ধনকৌলীন্য বলপ্রয়োগে নষ্ট করতে হবে না।

আমরা যারা ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করেছি, তারা বলি যে, বিগত ফরাসী বিপ্লবেই প্রথমে আমরা শুনলাম গণতন্ত্রের বাণী এবং সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী। স্বামীজী বলছেন—আমাদের বেদান্তের বাণীই হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী। আত্মার স্বাধীনতা, আত্মার একত্বের উপলব্ধিই হল বেদান্তধর্মের মূলকথা।

স্বামীজী ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি প্রচার করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত practical religion। তাই তিনি বলতেন—যে ভগবান ইহলোকে তোর জন্য দুটি ডাল-ভাতের ব্যবস্থাও করতে পারেন না, সে ভগবান দেবেন তোকে পরকালে মুক্তি—একথা আমি বিশ্বাস করি না।

বলতেন—আমি সর্বদা বলি “দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।” দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, ইহারাই আমাদের দেবতা হোক—এই তিনি বলতেন।

তিনি বলতেন ব্রাহ্মণযুগ অতীত হয়ে গেছে। ক্ষত্রিয়যুগেরও অবসান হয়েছে। বৈশ্যযুগ অবসিতপ্রায়। এখন শূদ্রযুগ আসছে। অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকের যুগ এসে যাচ্ছে। এরাই করবে এখন শাসন। কিন্তু স্বামীজী প্রাচীন জাতিবিভাগ-তত্ত্বের সারবত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও তথাকথিত অর্থহীন কঠোর ও নিষ্ঠুর জাতিবিভাগ এবং উচ্চবর্ণীয়দের নিম্নশ্রেণীর উপরে নিপীড়ন সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ লক্ষণীয়।

তিনি বলছেন, "তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ, দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই (নিম্ন-বর্ণীয়দের) মধ্যে। আর চলমান শ্মশান হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয় যেন ঠান-দিদির মুখে গল্প শুনছি!…এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা—তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল—লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব একসঙ্গে।… ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য; তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্।…ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?…তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্ত-বীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

স্বামীজী উক্ত কথাগুলি বলেছেন ১৮৯৯ সালে, যখন তিনি দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন। আর আজ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। আজ উচ্চবর্ণেরা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, এবং মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে শ্রমিক-ও কৃষকশ্রেণী। শাসনতন্ত্রও নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছে এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণী। এখানে আমরা দেখতে পাই স্বামীজী যা বলেছিলেন, তাই হতে চলেছে। তবে তাঁর সাম্যবাদ ধ্বংসাত্মক নয়। সে সাম্যবাদ কালানুযায়ী ঘটনা-পরম্পরার সংঘাতজনিত, ইতিহাসের অমোঘ ফলস্বরূপ, গঠনাত্মক সাম্যবাদ, ধর্ম-ভিত্তিক।

আমাদের শাস্ত্রে আছে 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'। কিন্তু স্বামীজীই শুধু বলছেন "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।" অর্থাৎ দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

আরও তিনি বলেছেন—"যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না,

এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।" এর চেয়ে দরদের কথা বা সাম্য ও মৈত্রীর কথা আর কি হতে পারে, তা আমাদের জানা নেই।

স্বামীজী বলছেন : জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। যদি পর্বত মহম্মদের নিকট না আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকটে যাইতে হইবে।" দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় পৌঁছিতে হইবে। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তাদের উন্নত করতে হবে।

"ঘৃণাশক্তি হইতে প্রেমশক্তি অনন্তগুণে অধিক শক্তিমান"—এই উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, স্বামীজী যে সাম্যবাদের কথা বলেছেন, তার মূল শক্তি নিহিত কোথায়, বর্তমানে প্রবর্তিত সাম্যবাদ ও স্বামীজীর উক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে তফাত কোথায়।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কোন এক জড়বাদী প্রতিভাধর ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে সাম্যবাদে ধর্মের কোন স্থান থাকতে পারে না বা তিনি হয়তো বলতে পারেন যে, religion is the opium of the people ; কিন্তু তাঁর এই উক্তি এখানে বিচার্য বিষয় নয়। উক্তিটি কেন তিনি করলেন, তা জানতে হলে আমাদের এগুতে হবে জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে তা অর্থহীন। অধিকন্তু সেই দেশের, সেই কালের অবস্থা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কথা ভাবতে হবে, যখন ধর্ম অধিকাংশ স্থলে শুধু স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত, আসল ধর্মের রূপ যখন চোখেই পড়ত না। উক্তিটির সার্থকতা সেখানে। কিন্তু স্বামীজীর সাম্যবাদ দেশ-ও কাল-বিচারের ঊর্ধ্বে। তিনি যখন যা বলেছেন, তা বলেছেন সর্বজনীনতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাঁর উক্তিসমূহ সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং এগুলি সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন সত্য।

স্বামীজী স্বদেশে ভারতবাসীকে, তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ করে বলছেন, "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ;··· ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই !··· বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ" ইত্যাদি।—এর চেয়ে উঁচু ধর্মাদর্শ, সাম্যবাদ ও দেশপ্রেমের কথা আর কি থাকতে পারে, তা আমাদের জানা নাই। স্বামীজী এখানে তাঁর স্বদেশবাসিগণের উদ্দেশে যদিও বলেছেন কথাগুলি, তবুও তাঁর এই বাণীসমূহ বিশ্বজনীন এবং দেশ-কালের ঊর্ধ্বে—বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বপ্রেমের প্রতীক ও প্রতিধ্বনি। স্বামীজী ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জনগণের উদ্দেশে, তাঁদের শিক্ষা সম্বন্ধে যা বলেছেন—তাও এখানে প্রণিধানযোগ্য। সাম্যবাদের ভিত্তিতেই তাঁর এই উক্তি। তিনি

বলছেন—"হে ব্রাহ্মণগণ, তোমাদের সন্তান-গণের জন্য, যারা স্বভাবতই তীক্ষ্ণধী, যদি প্রয়োজন হয় একজন শিক্ষকের, তাহলে শূদ্রের সন্তানগণ—যারা স্বাভাবিকভাবেই অনগ্রসর, তাদের জন্য প্রয়োজন হবে চারজন শিক্ষকের।" যখন অন্ত্যজ বা শূদ্রদের শোষণ ক'রে তুমি আজ সম্ভ্রান্তপদবাচ্য ও বিত্তশালী, তখন তাদের প্রতিও তোমার কর্তব্য আছে। অর্থাৎ তাদের জন্য তোমাকেই চারজন শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অন্যথা তুমি হবে প্রত্যবায়ভাগী। দলিত ও চির-অনাদৃত ও নিষ্পেষিতদের জন্য তাঁর হৃদয় মথিত ক'রে এই বাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। তাই বলা যায়, স্বামীজীর বাণীসমূহে যে-সাম্যবাদের কথা সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে শুনতে পাই, তা অতীব অনন্যসাধারণ ও বিস্ময়কর।

তাই মনে হয়, আমাদের অগ্রগতির পথে স্বামীজীর বাণী সর্বদা স্মরণে রেখে এগুলে জাতির যথার্থ উন্নতি হবে, উন্নতির পথ সমধিক বাধামুক্ত হবে।

মৈত্রেয়ী

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

যুগান্তের পার হতে ভেসে আসে শ্রবণে শ্রবণে চিরকাল
হে মৈত্রেয়ী লোকাতীত তোমার কাহিনী।
যে নহেক শুধু মাতা শুধু জায়া জননী গৃহিণী।
নয় শুধু মাতৃমূর্তি পূজনীয়া বিশ্বের বন্দিতা।
যশোদা দুলাল কোলে, খৃষ্ট কোলে মাতা মেরী,
হিমক্রোড়ে হৈমবতী পর্বতদুহিতা!
মহাভাগা জীবধাত্রী যারা সর্বকাল।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বে ধরিয়া রেখেছে ক্রোড়ে
প্রাণ আর জীবনের বিশ্বরূপ। বিশ্বের দুলাল!

* *

অথবা সাবিত্রী সীতা পার্বতী ও সতী,
শকুন্তলা, কাব্যকাহিনীর সেই কন্যা রূপবতী।—
রূপে মোহে প্রেমে যাহাদের যুগে যুগে হল পুরুষ উন্মাদ
জগতে ছড়ায়ে দিল দুঃখ শোক প্রমাদ বিষাদ।
যাদের দেখেছি মোরা কবির স্বপনে চিরকাল
নানা নামে নানা রূপে বুকে ধরে আছে মহাকাল!

* *

সেথা নহে। আর এক যবনিকাপারে মহাদূরে,
আলো অন্ধকারে মেশা অতীতের মহা মূক পুরে,
হে মৈত্রেয়ী জ্বলিতেছে অনির্বাণ দীপ সম তোমার কাহিনী
ছিলে নাকো শুধু জায়া শুধুমাত্র দুহিতা ভগিনী।
দেখিলাম প্রৌঢ়া জায়া সেবারত, তপঃক্লান্ত পতি।
দেখিনু প্রৌঢ়ত্বপারে শান্ত এক পবিত্র মূরতি।
দেখিলাম চারিদিকে কর্মস্রোত গৃহ পরিজন
কর্মব্যস্ত নারীলোক-দেবকার্য-যজ্ঞশালা-শিষ্য ও স্বজন।
পত্নীদ্বয়ে বলিলেন ডাকি মুনি বানপ্রস্থগামী
হে প্রেয়সী বাঁটি লও দোঁহে ধনধান্য সব—বনে যাই আমি।
থমকি' দাঁড়াল নারী। হাতে দর্বী করেন রন্ধন।
ক্ষুধাতুর গৃহজন। গোশালায় ডাকিছে গোধন।
গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বামী।

* *

দুইখানি কর্মব্যস্ত হাত তাঁর, থামে অকস্মাৎ।
পাশে কর্ম তরঙ্গে তরঙ্গে ডেকে করে যাতায়াত।
শোনে না শ্রবণ।
মিলালো আঁখির আগে গৃহ বিত্ত আর পরিজন।
যেন কে ভাঙালো ঘুম।—কহিলেন সতী,
প্রভু, এ সম্পদরাশি—একি শ্রেয়? একি প্রভু সত্য চিরন্তন?
এই ধনে লভিব কি সেই মহাধন,
যার লাগি তুমি ত্যজি যাও গৃহ ঘর,
—সেই সম্পদ অমর?

দাক্ষিণাত্যে তীর্থদর্শন

স্বামী দীপ্ত্যানন্দ

ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ দেশ। দেশব্যাপী অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির। যদিও এদেশে বহু শিবমন্দির আছে এবং সেখানে ভক্তগণ তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন ক'রে থাকেন অকুণ্ঠচিত্তে, তথাপি নিম্নলিখিত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ প্রত্যেক সনাতনধর্মাবলম্বীর চিত্ত অধিকতর আকর্ষণ ক'রে থাকে। উক্ত বিগ্রহগুলি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বলে সমগ্র ভারতে খ্যাত। শিবপুরাণ মতে এই দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গ :

১। শ্রীসোমনাথ—ইহা গুজরাটরাজ্যের (সৌরাষ্ট্র) অন্তর্গত বীরবলের (Veerabal) সন্নিকটবর্তী প্রভাস পাটান নামক স্থানে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

২। শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী—ইহা অন্ধ্ররাজ্যের কুর্নোল জিলার শ্রীশৈলম্ নামক পর্বতমালার উপর অবস্থিত। অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ হ'তে একশত ত্রিশ মাইল দূরে।

৩। শ্রীমহাকালেশ্বর—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনী নামক স্থানে অবস্থিত।

৪। শ্রীওঁকারেশ্বর বা শ্রীওঁকারনাথ—মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডওয়া (Khandwa) জিলার মোরটাকা নামক রেলওয়ে স্টেশন হ'তে সাত মাইল দূরে নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত। ইন্দোর হ'তেও ওখানে যাওয়া যায়। এই জ্যোতির্লিঙ্গটি শ্রীঅমরেশ্বর বা শ্রীঅমলেশ্বর বলেও কথিত হয়ে থাকে।

৫। শ্রীকেদারনাথ—হিমালয়ে অবস্থিত।

৬। শ্রীউমাশংকর—এই জ্যোতির্লিঙ্গটির অবস্থান নিয়ে দ্বিমত আছে : এক মতে উহা মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বোম্বে-পুণা রেল-লাইনের 'নেরল' নামক রেলস্টেশনের নিকটবর্তী। অপর মতে উহা আসাম-রাজ্যস্থিত গৌহাটির নিকটবর্তী ব্রহ্মাপুর নামক পাহাড়ে অবস্থিত।

৭। ৺কাশীর শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ।

৮। শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর—উহা মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত নাসিক শহরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত।

৯। শ্রীবৈদ্যনাথ—এই জ্যোতির্লিঙ্গটি সম্বন্ধেও দ্বিমত আছে : এক মতে উহা অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ শহরের নিকটবর্তী পার্‌লী নামক স্থানে অবস্থিত। অপর মতে উহা বিহাররাজ্যস্থিত সাঁওতাল পরগণার দেওঘর নামক স্থানে অবস্থিত।

১০। শ্রীনাগেশ্বর—এই জ্যোতির্লিঙ্গটির অবস্থান সম্বন্ধেও দ্বিমত আছে : এক মতে উহা গুজরাটরাজ্যের দ্বারকা ও বেট দ্বারকার মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। অপর মতে উহা অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী পূর্ণাজংশনের অনতিদূরে আউধা-গ্রামে অবস্থিত।

১১। শ্রীরামেশ্বরম্ — তামিলনাড়ের সেতুবন্ধে অবস্থিত।

১২। শ্রীঘুমেশ্বর — মহারাষ্ট্ররাজ্যস্থিত ঔরঙ্গাবাদ জিলার ইলোরা গুহার নিকটবর্তী। ঔরঙ্গাবাদ শহর হ'তে tourist bus-এ ইলোরা অজন্তা যাওয়ার সময় এই মন্দিরটিও দেখানো হয়ে থাকে।

কথিত আছে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত

পাঁচটি শিবলিঙ্গ পঞ্চভূতের প্রতীক। যথা :

১। কাঞ্চীপুরস্থিত শ্রীএকাম্রেশ্বর শিবলিঙ্গ পৃথ্বীর প্রতীক।

২। ত্রিচিনপল্লীস্থিত শ্রীজম্বুকেশ্বর শিবলিঙ্গ অপের।

৩। মহীশূররাজ্যস্থিত তিরুভান্নামালাই শহরে অবস্থিত শ্রীঅরুণাচলম্ শিবলিঙ্গ তেজের প্রতীক।

৪। তামিলনাডের চিদাম্বরম্‌স্থিত শ্রীনটরাজ শিব আকাশের।

৫। তিরুপতির নিকটবর্তী কালাহস্তীস্থিত শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবলিঙ্গ বায়ুর প্রতীক।

দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণকারী প্রায় সকলেই শ্রীশৈলম্ পর্বতমালার উপরে অবস্থিত শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী শিবমন্দির দর্শন করে থাকেন। মন্দিরটি অতি প্রাচীন। এই তীর্থদর্শনের যোগাযোগ হওয়ায় অনুসন্ধান করে শ্রীশৈলম্‌পর্বতস্থিত শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী মন্দিরে পৌঁছানোর দুটি রাস্তা জানা গেল। একটি হল বাঙ্গালোর হ'তে সোজা হায়দ্রাবাদগামী ট্রেনে গিয়ে কুর্নোল নামক স্থানে এবং সেখান হতে সরকারী বাসে একশ মাইল গিয়ে শ্রীশৈলম্ পৌঁছানো যায়; অথবা বাঙ্গালোর হতে সোজা সরকারী বাসে কুর্নোল গিয়ে সেখান হতে আবার বাসে শ্রীশৈলম্। কুর্নোল হতে সরকারী বাস শ্রীশৈলম্ পর্বতের মন্দির পর্যন্ত যাতায়াত করে। অপরটি হ'ল, হায়দ্রাবাদ শহর হতে সরকারী বাসে সোজা শ্রীশৈলম্—দূরত্ব একশত চল্লিশ মাইল। এই রাস্তায় একটি বড় বাধা হল পার্বত্য নদী কৃষ্ণা বা পাতালগঙ্গা। কৃষ্ণা নদীর অপর পারে শ্রীমল্লিকার্জুন মন্দির। কুর্নোল হ'তে এলে এ বাধা থাকে না, কারণ কুর্নোল নদীর ওপারে। হায়দ্রাবাদ হতে সরকারী বাস শ্রীশৈলম্ পর্বতের নদীর নিকটবর্তী Eagle Point নামক স্থান পর্যন্ত যায়। তার পরই গভীর খাদ—মধ্যে পার্বত্য নদী কৃষ্ণা গর্জন করতে করতে খরস্রোতে পর্বত অতিক্রম করে সমুদ্রাভিমুখে ছুটে চলেছে। অপর তীরে উচ্চ পর্বতের উপর মন্দির। Eagle Point হতে মন্দিরের দূরত্ব সোজা দুই-তিন মাইল, কিন্তু বাস যায় পার্বত্য আঁকাবাঁকা রাস্তায় ষোল মাইল অতিক্রম করে। এই Eagle Point হতেই অন্ধ্র সরকারের উনষাট কোটি টাকার *Power-Project Scheme*-এর কাজ শুরু হয়েছে। আটশ ফিট উঁচু একটি dam তৈরী হবে এই কৃষ্ণা নদীকে বাঁধবার জন্য। এই dam থেকে hydro-electric plant চালু করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এবং তা সমগ্র অন্ধ্ররাজ্যে বিতরিত হবে। অর্থাভাবে কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে না। সম্পূর্ণ schemeটি শেষ করতে দশ বৎসর লাগবে। Dam-site-এ দিনরাত কাজ চলছে। এখন মাত্র ভিত্তিস্থাপনের কাজ হচ্ছে। নদীর অপর পারে বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকা জুড়ে শহর তৈরী হয়েছে সরকারী কর্মচারীদের বসবাসের জন্যে এবং অফিসাদির জন্যে। Eagle Point-এও অনেক বাড়ী তৈরী হয়েছে কর্মীদের থাকবার জন্যে। সুতরাং উভয়তীরেই মালপত্রাদি ও লোকজন বহন করার জন্যে অনবরত সরকারী জীপ্ বা লরী চলাচল করছে। হায়দ্রাবাদ হতে যাত্রীবাহী বাস এই Eagle Point-এ এসে থেমে যায়। যাত্রীদের তখন সুবিধামত উক্ত সরকারী জিপ বা লরীতে করে Dam-site পর্যন্ত গিয়ে পায়ে হেঁটে নদীর ধারে ধারে পাতালগঙ্গা-ঘাট পর্যন্ত যেতে হয়। তারপর ওখান থেকে আবার চড়াই করে প্রায়

সহস্রাধিক সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের পাদদেশে পৌঁছুতে হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় দর্শনার্থী যাত্রীদের সুবিধার জন্য শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী-দেবস্থানম্-এর কর্তৃপক্ষ Eagle Point ও মন্দির—এই দুইটির মধ্যে নিজস্ব বাস চলাচলের ব্যবস্থা করেন। ফেব্রুয়ারী মাস হতে এপ্রিল পর্যন্ত মন্দিরে উৎসবাদি থাকে। শিবরাত্রিতে শিবের উৎসব; তখন সেখানে লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। তাই বাসের ব্যবস্থা হয়। ভাড়া যাতায়াত চার টাকা। দূরত্ব ষোল মাইল।

সৌভাগ্যবশতঃ শিবরাত্রি থাকাতে আমি Eagle Point-এ পৌঁছে দেবস্থানম্-এর বাস পেয়েছিলাম। শিবরাত্রি অতি নিকটে—বাসের ব্যবস্থা থাকবে জেনেই হায়দ্রাবাদ থেকে সোজা শ্রীশৈলম্ যাই। সেখানকার কটেজগুলিতে থাকার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

অতি প্রত্যূষে বাসে উঠলাম। তখন ঘোর অন্ধকার! বাসে যাত্রী ভরতি। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ছাড়ল। শহর ছাড়িয়ে ক্রমশঃ উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ছুটে চলল। এক্স্প্রেস্ বাস—চলে খুব জোরে, থামবার স্টেশনও অল্প-সংখ্যক। বাসে বসবার ব্যবস্থাদিও আরাম-প্রদ। যাত্রাপথ দীর্ঘ বলে নির্দিষ্টসংখ্যক যাত্রী নেওয়া হয়েছে। তখনও অন্ধকার—রাস্তার দুধারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না—কেবল দূরে গ্রামে একটা-দুটো আলো মিটমিট করছিল। প্রায় আটটার সময় চা-পানের জন্য বাসটি একটি নির্দিষ্ট স্টেশনে রেঁস্তোরার সামনে এসে দাঁড়াল। যাত্রীরা নেমে চা-পানাদি সমাপন করলেন। আধ ঘণ্টার পর আবার যাত্রা শুরু হল। এতক্ষণে সূর্যালোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত দেখাল। বহু দূরে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে নীলাভ পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার দু'পাশে বসতি নেই—কেবল জংগলাকীর্ণ ভূমি-খণ্ড। এভাবে ছয় ঘণ্টা যাত্রার পর বেলা সাড়ে এগারটায় এসে Eagle Point-এ গাড়ী থামল। যাত্রীরা নেমে পড়লেন। সেখান থেকে অদূরে পাহাড়ের উপরে মন্দিরের গোপুরম্গুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দেবস্থানমের বাসে করে এক ঘণ্টার মধ্যেই মন্দিরের পাদদেশে পৌঁছুলাম।

অন্ধ্ররাজ্যে মন্দিরাদির পরিচালনাভার সরকার গ্রহণ করেছেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে লক্ষাধিক যাত্রীসমাগম হবে। তখনও দুদিন বাকি। তাই সরকারের পক্ষ হতে যাত্রীদের থাকা, দর্শনাদির ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী একটি কটেজে স্থান পেলাম। দুটি কক্ষ, স্নানাগারাদি সহ কটেজটি বেশ আরামপ্রদই ছিল। খাওয়া can'een-এ। শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষ্য করে অনেক canteen, দোকান ইত্যাদি খোলা হয়েছে। স্নানাদি শেষ করে খেতে খেতে প্রায় দেড়টা বাজল।

দুপুরে মন্দির বন্ধ ছিল। অপরাহ্ণ ছয়টায় মন্দির খুলল। প্রধান ফটকে দাক্ষিণাত্যের প্রথানুযায়ী পদধৌত করে মন্দিরের সীমানায় প্রবেশ করবার জন্যে ভূমিতে সংলগ্ন নল হতে জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই ফটকের উপরই একটি গোপুরম্—রামেশ্বরম্, মীনাক্ষী, তিরুভান্নামালাইর মন্দিরের মত এত উঁচু নয়, কিন্তু সুচারুরূপে আলোকমালায় সুসজ্জিত। শিবরাত্রির দুদিন বাকি বলে মন্দিরে দর্শনার্থীর ভিড় তত ছিল না। মূল মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বে একটি টাকা দিয়ে টিকিট করতে হল। টিকিট করে মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছি—প্রথম ফটক, দ্বিতীয় ফটক পার হয়ে গর্ভমন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হলাম। গর্ভমন্দিরটি স্বল্পপরিসর, দর্শন-

স্পর্শনের জন্যে অতি অল্পসংখ্যক যাত্রীই সেখানে একত্র হতে পারে। তাই গর্ভ-মন্দিরের বাহির হতেই দর্শনার্থীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ ও বহির্নির্গমন যাতে খুব সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় তজ্জন্য সরকারপক্ষ হইতে পুলিশ, হোমগার্ড, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি নিয়োজিত হয়েছে। গর্ভমন্দিরটি আলোকিত করার জন্য একদিন বিজলীবাতির ব্যবস্থা; বৎসরের অন্যান্য সময়ে প্রাচীন প্রথানুযায়ী তৈলপ্রদীপ দ্বারাই ক্ষীণভাবে আলোকিত হয়। মন্দির খোলবার সঙ্গে সঙ্গে সুললিত স্বরে 'নাদস্বরম্' বাজতে আরম্ভ হল। আমরা ধীরপদক্ষেপে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হ'য়ে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলাম। স্বয়ম্ভূলিঙ্গের দর্শন ও স্পর্শন লাভ হল। বহু-আকাঙ্ক্ষিত বিগ্রহের দর্শনে মন স্বভাবতই পুলকিত। পরদিন আবার 'সুপ্রভাতম্' দেখার জন্য ভোর সাড়ে চারটায় মন্দিরে উপস্থিত হলাম।

শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী মন্দিরটি পূর্বাভিমুখী এবং উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত সামানার মধ্যস্থলে অবস্থিত। পশ্চিমদিকে মাতৃমন্দির; পূর্বদিকের মুখ্য দ্বারের একটু উত্তরে—ভিতরে আর একটি ছোট শিবমন্দির। এই মন্দিরটিই পুরাতন শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী মন্দির বলে কথিত হয়। তার আর একটু উত্তরে সহস্রলিঙ্গ শিব। একটি বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গের গায়ে অতি নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে খোদিত সহস্র শিবলিঙ্গ। এই সহস্রলিঙ্গ শিব তিনমস্তক-বিশিষ্ট নাগরাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সূক্ষ্মকারুকার্যপূর্ণ প্রস্তরখণ্ডের উপর সংস্থাপিত।

স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, প্রাচীন কালে চন্দ্রাবতী নামে এক সুন্দরী রাজকন্যা ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত চন্দ্রগুপ্তপুরম্ নামক নগরীর শাসনকর্তা। বিশেষ কারণে পিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে চন্দ্রাবতী পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'রে শ্রীশৈলম্ পর্বতে এসে উপস্থিত হন। অল্প পরেই তাঁর পিতা দৈব দুর্ঘটনায় কৃষ্ণানদীতে বা পাতাল-গঙ্গায় ডুবে মারা যান। চন্দ্রাবতী শ্রীশৈলম্ পর্বতে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি কয়েকটি গাভী পালন করতেন। তাঁর পালিত গাভীগুলির মধ্যে একটি দুধ দিচ্ছে না দেখে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, গাভীটি স্বেচ্ছায় ও গোপনে তার দুধ একটি শিবলিঙ্গের মাথায় রোজ ঢেলে আসে। একদিন রাজকুমারী স্বপ্নাবিষ্টা হয়ে দেখলেন যে, স্বয়ং শিবঠাকুর ঐ শিবলিঙ্গের রূপ ধারণ করে তথায় আবির্ভূত হয়েছেন। চন্দ্রাবতী সেই শিবলিঙ্গের উপরে একটি মন্দির নির্মাণ করে প্রতিদিন ভক্তিভরে শিবকে মল্লিকা ফুল দিয়ে পূজা করতে লাগলেন। সেই অবধি এই মন্দির শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী শিবমন্দির নামে অভিহিত হয়ে আসছে। প্রবাদটি এই মন্দিরের বহিঃ-প্রাচীরের প্রস্তরখণ্ডে খোদিত আছে।

আর একটি প্রবাদে আছে যে, চেঞ্চু নামক পার্বত্য জাতির এক সুন্দরী কন্যা এই শ্রীশৈলম্-এ ব্যাধরূপে শিবের দর্শন ও তাঁকে পতিরূপে লাভ করেন। চেঞ্চু নামক পার্বত্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় এই শ্রীমল্লিকার্জুন 'চেঞ্চু মাল্লায়্যা' নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন।

লম্বায় ছয়শত ফুট, প্রস্থে পাঁচশত ফুট একটি ভূখণ্ডের উপর এই মন্দিরটি স্থাপিত এবং উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বে দ্বার আছে। পশ্চিমদিকে দ্বারের পরিবর্তে মাতৃমন্দির অবস্থিত। এ অঞ্চলে এই দেবী মাধবী, ভ্রমরাম্বা অথবা আম্মান নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। দেবী

শ্রীশ্রীকালীর প্রতিমূর্তি। এখানে পশুবলি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ভ্রমরাম্বিকা দেবী অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত; স্থানটি শক্তিপীঠগুলির অন্যতম বলে খ্যাত। এই মন্দিরে শিব ও শক্তি উভয়েরই উৎসব হয়ে থাকে। শিবের উৎসব শিবরাত্রির সময় আরম্ভ হয় এবং কিছুদিন চলে। তারপর আরম্ভ হয় শক্তির উৎসব। সাধারণতঃ শিবের উৎসবের চেয়ে শক্তির উৎসবই অধিকতর জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয় ও দীর্ঘদিন ধরে চলে।

মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত আছে, শিব পার্বতীকে নিয়ে এই শ্রীশৈলম্ পর্বতে বা শ্রীপর্বতে অবস্থান করেন। লিঙ্গপুরাণেও এখানকার জ্যোতির্লিঙ্গের কথা উল্লিখিত আছে। শিবের আটটি প্রধান নিবাসের মধ্যে শ্রীশৈলম্ পর্বত অন্যতম।

ষষ্ঠ শতাব্দীর কদম্ববংশীয় জনৈক নৃপতি এই শ্রীশৈলম্ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এখানকার পাতালগঙ্গা বা কৃষ্ণা নদী হ'তে শিবলিঙ্গের জন্য প্রস্তরখণ্ড সংগৃহীত হত। এমন কি এখনও লিঙ্গাইত সম্প্রদায়ের লোকেরা শরীরে ধারণ করার জন্য শিবলিঙ্গের উপযোগী প্রস্তরখণ্ড এই শ্রীশৈলম্ পর্বতস্থিত পাতালগঙ্গা হতেই সংগ্রহ করে থাকেন। পাতালগঙ্গা হতে পর্বতোপরি শ্রীমল্লিকার্জুন মন্দির পর্যন্ত যে সহস্রাধিক সিঁড়ি উঠেছে তা রেড্ডীবংশীয় নৃপতি শ্রীভীমা রেড্ডী চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেছিলেন। তদীয় পুত্র শ্রীঅন্নভীমা রেড্ডী বীরদের উদ্দেশ্যে এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

লিঙ্গাইত ব্রাহ্মণদের এই শ্রীশৈলম্ পর্বতে পাঁচটি বড় বড় মঠ আছে—তন্মধ্যে প্রধান মঠের নাম হচ্ছে বীর-শৈবসিদ্ধ-ভিক্ষাবৃত্তি মঠ। বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হুয়েন সাং এই শ্রীশৈলম্ পর্বতের সঙ্গে নাগার্জুনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁদের বিবরণীতে উল্লেখ করেছিলেন।

লিঙ্গাইত ব্রাহ্মণেরা শ্রীমল্লিকার্জুনের একনিষ্ঠ উপাসক হলেও এই মন্দিরের পরিচালন-ব্যবস্থাদি পুষ্পগিরির ব্রাহ্মণেরাই এতদিন ক'রে আসছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত লিঙ্গাইতদের প্রাধান্য ছিল।

ভগবান শ্রীশংকরাচার্য তাঁর 'ব্রহ্মাম্বাষ্টকম্' স্তবে বলেছেন :

"গায়ত্রীং গরুড়ধ্বজাং গগনগাং
গান্ধর্বগানপ্রিয়াং,
গম্ভীরাং গজগামিনীং গিরিসুতাং
গন্ধাক্ষতালংকৃতাম্।
গঙ্গাগৌতমগর্গসংনুতপদাং
তাং গৌতমীং গোমতীং,
শ্রীশৈলস্থলবাসিনীং ভগবতীং
শ্রীমাতরং ভাবয়॥"

শ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর অনুধ্যান কর। তিনি গায়ত্রী, গরুড়ধ্বজাসমন্বিতা, আকাশচারিণী, গান্ধর্বগান-প্রিয়া, গন্ধ ও অক্ষত দ্বারা অলংকৃতা, গঙ্গা, গৌতম ও গর্গ কর্তৃক পূজিতা।

গৈরিকমীড়ে

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

যা গীঃ সাধ্বী পুরাণী সুষমকুশলদা মা গৃধঃ কস্যচিচ্চ
ভুঞ্জীথাস্ত্যক্তকামো নিজপরসমদৃক্ সর্বমীশেতি বাস্যম্ ।
ইত্থং জ্ঞানেন শুভ্রং স্বহৃদি সকলহৃদ্‌ভাবরাগেণ পীতং
প্রাণৌজোবীর্যরক্তং ত্রিতয়সুবলিতং গৈরিকং বর্ণমীড়ে ॥
(কেতনং গৈরিকাভম্ ॥)

‘ওঁ ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্ ॥’—
এই যে পুরাণী প্রজ্ঞানবাণী,
সাধু সনাতনী,
সর্বজীবে সুষমকুশলবিধায়িনী ।
আত্মপর-সমদৃষ্টি হ’য়ে, ত্যজ স্বার্থকাম,
জ্ঞান’—পরধনে শ্যেনদৃষ্টি আত্মবিঘাতিনী ।
এ কি মহানের মহামহিমায়, রেণু কি বিরাট,
ওতপ্রোত সারাবিশ্ব, সবকিছু চালক, চালিত ।
এই অববোধে শুদ্ধবোধ, ধবলছটায়,
সকল অন্তর অন্ধকক্ষ করুক দীপিত ॥
আপন হৃদয় স্পন্দিত সবাকার,
হৃদয়স্পন্দনে,
এই ভাবরাগে, প্রেমে হও পীতরাগ ।
আর, কর্মোদ্বেল প্রাণের প্রাচুর্য, ওজোবীর্যরাগে,
জীবন রাঙিয়া দিক নিত্যনব বসন্তের ফাগ ॥
এই তিন রঙ—শুভ্র, পীত, রক্ত,
জ্ঞান, ভাব, বীর্য,
ত্রিতয়ের সুষমমিলনে যে রাগ গৈরিক ।
তারে, সেই দীপ্ত গৈরিক কেতনে আজি,
করি আবাহন,
ঐহিকেরে তুড়ি দিয়ে তুচ্ছ করা ‘সন্ন্যাসের’ সে তো নয়
নিঝুম নিরালা প্রতীক ॥

স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ ও আচার্য শঙ্কর*

ব্রহ্মচারী অমিতাভ

গত ষাট বছরের বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করতে পারি। প্রাচীন বিজ্ঞানের ধারণাগুলি একে একে পাল্‌টাতে পাল্‌টাতে আজ বিজ্ঞান এক সম্পূর্ণ নতুন স্তরে এসে পৌঁছিয়েছে। আইনস্টাইন, বোর, হাইজেনবার্গ, এডিংটন, হোয়াইটহেড, জীন্‌স্ প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় বিজ্ঞানের দৃষ্টি আজ সুদূরপ্রসারিত। ব্রিটিশ পদার্থতত্ত্ববিদ স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ বিকিরণ (Radiation) ও মহাজাগতিক বলবিদ্যাকে (Steller Dynamics) উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, যা মূলত: রেডিওঅ্যাক্‌টিভিটি, কোয়ান্টা, থিওরি অব্ রিলেটিভিটি ও ইনডিটারমিনেন্সী থিওরির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, প্রাচীন বিজ্ঞান থেকে অনেকখানিই সরে এসেছে।

স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ জগৎটাকে পুরোপুরি সত্য বলে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে—"জগৎটা রামধনুর মতো" (The New Background of Science, page 2)। রামধনুর দৃশ্যত্ব কেবল এই সাদাচোখেই সম্ভব। আপনার আমার মতো রামধনুর কোন বিশেষ সত্তা নেই; সূর্যরশ্মি মেঘের জলবিন্দু দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে রামধনুরূপে, যা প্রত্যেকের কাছে বিভিন্ন। অর্থাৎ, আপনার দৃশ্য রামধনু থেকে আমারটি আলাদা। এইভাবে রামধনুর মতো জগৎটিও একটি objective truth; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ভ্রান্তিমাত্র। অবশ্য 'ভ্রান্তি' শব্দটির দ্বারা জগৎটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে 'নেহী হ্যায়' বলা জীন্‌সের উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলছেন—"এর অর্থ নয় যে, আমি বলছি জগৎটা একেবারেই নেই; আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপাতত এর সত্তার ধারণা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। আমাদের নিজের সৃষ্ট রঙীন কাঁচের সাহায্যে বাড়িয়ে আমরা এই জগৎটাকে দেখতে পাই" (Ibid, page 4) জগৎ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের মতও অনেকটা স্যার জীন্‌সের মতো। তিনি লিখেছেন—"এই জগতের চরম সত্তা শ্রুতি (বেদ) স্বীকার করেন না; এটি অবিদ্যাকল্পিত নামরূপবান ব্যবহারসিদ্ধ বস্তু" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২ : ১ : ৩১)। যেখানে স্যার জীন্‌স্ জগৎটাকে তুলনা করেছেন রামধনুর সঙ্গে, সেখানে আচার্য শঙ্কর দিয়েছেন মরীচিকার উপমা। এই যে ভ্রান্ত ধারণা, একেই তিনি বলেছেন 'অধ্যাস'।

এই জগতের স্রষ্টা কে? স্যার জীন্‌স্ লিখছেন—"শুদ্ধ চেতনা (Pure Intelligence) থেকেই এই জগতের সৃষ্টি" (Mysterious Universe, page 114)। তাঁর মতে, এই শুদ্ধ চেতনা একজন শ্রেষ্ঠ গণিততত্ত্ববিদ্, যিনি এই জগতের কেবল স্রষ্টাই নন, পালনকর্তাও।

---

* চরম সত্তা সম্বন্ধে মনবুদ্ধিরও অতীতপ্রদেশচারী সত্যদ্রষ্টাগণের কথাই চরম প্রমাণ; অবশ্য আমরা সকলেই নিজে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, সামর্থ্য অর্জন করিয়া। এখানে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের কথার যে সামঞ্জস্য দেখাইবার প্রচেষ্টা, তাহা আচার্যের কথার প্রমাণ হিসাবে নহে, আচার্যোক্ত সত্যকে বৈজ্ঞানিক-চিন্তাসম্পন্ন মনে ধারণা করার সুবিধার জন্য।—সঃ

বিশ্বের এই বিভিন্ন ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য দেখতে পেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, চেতন-নির্দিষ্ট হয়েই সর্বব্যবহার নিষ্পন্ন হচ্ছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্র. সূ. ১ : ১ : ২) সূত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলে গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে "চেতনং ব্রহ্ম" (ব্র. সূ.-ভাষ্য, ১ : ১ : ৬)। "চৈতন্যমাত্ররূপো…পরমাত্মা" (শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্‌ভাষ্য : উপোদ্‌ঘাত) শব্দগুলি ব্যবহার করে ব্রহ্মকে শুদ্ধচেতন বলে নির্দেশ করলেন, জগৎটা যে একজনের নির্দেশে সুশৃঙ্খলভাবে চলছে তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখলেন—"তাঁর শাসনে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি নিয়মানুসারে চলছে" (কঠ উপ ভাষ্য ২ : ৩ : ২)। স্যার জীন্‌সের মতেও "সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যেই জগৎ আবর্তিত হচ্ছে" (The New Background of Science, page 49)। Mysterious Universe বইয়ে তিনি লিখছেন—"The Universe begins to look more like a great thought than like a great machine Mind no longer appears as an accidental intruder into the realm of matter ; we are beginning to suspect that we ought rather hail it as the creator and governor of the realm of matter, not of course our individual minds, but the mind in which the atoms, out of which our individual minds have grown, exist as thoughts." (Page 137)। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। স্যার জীন্‌স্ এখানে বিশ্ব-মনকে (Cosmic Mind) স্রষ্টা ও পালয়িতা বলে ব্যক্তি-মনকে (individual mind) তার অংশ হিসাবে বর্ণনা করছেন। আচার্য শঙ্করেরও একই মত—"আগুন ও তার স্ফুলিঙ্গের মত ঈশ্বর ও জীবের অংশ-অংশী সম্পর্ক।…ব্যক্তি-মন বিশ্বমনের একটি অংশ" (ব্র. সূ. ভাষ্য ২ : ৩ : ৪৩)। তিনি ঘোষণা করলেন যে, চরম সত্তাই সমস্ত আপেক্ষিকতার কারণ। "ব্রহ্মই সেই কারণ যা থেকে এই নাম-রূপ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হচ্ছে, যা এই বিভিন্নতা থেকে আলাদা নয়, কর্ম ও কর্মফলের আলম্ব এবং নিয়মিত দেশ-কাল-নিমিত্তে আবদ্ধ" (ব্র. সূ. ভাষ্য ১ : ১ : ২)। স্রষ্টা কর্তৃক জগৎপালন সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য যা বলেছেন, তার পুনরুক্তি তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদেও করেছেন—"এই পরম সত্তার শাসনে চন্দ্র-সূর্য সৃষ্ট, বিধৃত ও চালিত।…তাঁর শাসনে মহাকাল ও পৃথিবী নিয়মিতভাবে কাজ করছে। এই অখণ্ড সবকিছুর বিভিন্নতাকে রূপদান করেছেন" (ভাষ্য ৩ : ৮ : ৯)।

জগতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে স্যার জীন্‌স্ বলছেন যে, এই বিশ্ব একটি বুদ্বুদের মতো (Mysterious Universe, page 101)। "যদি একটানা সোজাপথে চলতে পারি"—তিনি লিখছেন, "তাহলে আমরা আবার যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে সেখানেই ফিরে আসবো" (Stars in their Courses, page 141)। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই ব্রহ্মাণ্ডকে একটা গোল বলের মত মনে করছেন। বেদান্তের এ ধারণা হাজার বছর আগেই ছিল। বেদান্ত অবশ্য 'ব্রহ্মাণ্ড' শব্দটির দ্বারা গোলাকারের চেয়ে ডিম্বাকৃতি দিকটার প্রতিই বেশি নজর দিয়েছিল মনে হয়, যাতে আজ রিম্যান্ জ্যামিতির সাহায্যে বিজ্ঞানের সমর্থন পাওয়া যায়।

আকাশ কি? 'আকাশ মানে শূন্য'—বিজ্ঞানের এই চলতি ধারণাটিকে আজকাল

পরিত্যাগ করা হয়েছে। "ইথার বলে কিছু থাকুক, আর নাই থাকুক"—আইনস্টাইনের মতে—"এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, আকাশও একটি পদার্থ (Substance)।" স্যার জীন্‌স্‌ বলছেন—"সময়ের মতো আকাশেরও একটি সসীম সত্তা (finite extent) আছে" (Mysterious Universe, page 132)। তাহলে দেখতে পাছি, আকাশ একটি পদার্থ ও সসীম। হাজার বছর আগে শঙ্করাচার্যেরও একই মত ছিল—"এটা অযৌক্তিক কথাই হবে যে, আকাশের কোন সত্তা নেই, কারণ অন্যান্য বস্তুর মতো এরও নাম-রূপ ধ্বংস হয়। বেদের প্রামাণ্যবলে 'ব্রহ্ম থেকে আকাশের উৎপত্তি হল' (তৈত্তিরীয় উপ ২ : ১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আকাশের পদার্থত্ব প্রমাণিত" (ব্র. সূ. ভাষ্য, ২ : ২ : ২৪)। আমাদের রোজকার চলতি আকাশ ও কালকে তিনি যথাক্রমে স্থূল আকাশ ও স্থূল কাল বলে অভিহিত করেছেন।

এখন স্যার জীন্‌সের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দেখা যাক। তিনি বললেন—"সময়ের স্রোত ধরে আমরা যদি অতীতের দিকে ফিরে যেতে পারি, তবে এমন এক অবস্থায় আসব যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ছিল না—এই তথ্যের পেছনে অনেক প্রমাণ রয়েছে" (Mysterious Universe, page 132)। ব্রহ্মাণ্ডের শেষাবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন—"নক্ষত্রগুলি উত্তাপ ছড়াতে ছড়াতে বিকিরণের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে,⋯ ব্রহ্মাণ্ডের মাল-মশলা ক্রমেই কমে আসছে, কিন্তু যেটুকু রয়ে গেল তা ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রহ্মাণ্ডের সকল নক্ষত্রপুঞ্জের একই অবস্থা। তারপর এ জগৎ বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেল; সিনেমা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো এ সৃষ্টি একটা কবি-গাথার মতো কোথায় হারিয়ে গেল" (Stars in their Courses, page 152-3)। তাপবলবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী স্যার জীন্‌সের এই চিত্র প্রায় নিখুঁত। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় শুধু যে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাই সমর্থিত হয়েছে তা নয়, আচার্য শঙ্করও একই মত পোষণ করে গেছেন। অবশ্য তিনি কখনোই এই সৃষ্টি-ব্যাপারটাকে একটা accident বলে মনে করেননি। Big Bang, Steady State এবং Oscillating—এই তিনটি cosmological view-ই আজকাল বিশেষ সমর্থিত, যদিও বৈজ্ঞানিকেরা কোন সর্বজনসমর্থিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারেননি। তবে তাঁদের মোটামুটি এই ধারণা যে, আজ থেকে দশ বিলিয়ন বছর আগে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি শুরু হয়েছিল এবং আজ থেকে সত্তর বিলিয়ন বছর পরে এ ধ্বংস পাবে বা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। সেখান থেকে আবার নতুন সৃষ্টি হবে এবং এইভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যে দিয়ে অনন্ত শৃঙ্খল চলবে। আচার্য শঙ্করও ঠিক একই মত পোষণ করেছেন, যদিও বছরের হিসেব নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাননি।

আগেই বলেছি যে, স্যার জীন্‌স্‌ জগৎটাকে বাহ্যিক ভাবেই (in secondary sense) গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, সেই শুদ্ধ চেতনার মনের প্রতিফলনই এই বিশ্ব। বহু-আলোচিত 'Wave of Probability' জীন্‌সের মতে চিন্তা-তরঙ্গ মাত্র। "দেশ ও কাল সসীম—এই তথ্য আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছে যে, জগৎটা কোন চিন্তারই ফলবিশেষ"—তিনি লিখছেন, "দেশ-কাল ও এই বিশ্ব মনেরই একটি সৃষ্টি; আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি বেশ ভাল করেই বুঝিয়েছে যে, একজন চিত্রকরের মতোই সৃষ্টিকর্তা দেশ-কালের বাইরে থেকে এসব

কিছু সৃষ্টি করেছেন।…The act of creation (is) the materialisation of the thought" (Mysterious Universe, page 134)। তাই জীন্‌সের মতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাই সেই শুদ্ধ চেতনার মনের একটি প্রতিচ্ছবিমাত্র। এবিষয় সম্পর্কে আচার্য শঙ্কর বলছেন—"সেই মহান পুরুষ ইচ্ছার সাহায্যে সৃষ্টি করলেন" (প্রশ্ন উপ. ভাষ্য, ৬ : ৪)। ঐতরেয় উপনিষদের ১ : ১ : ২ শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"একজন স্থপতি যেমন বাড়ি তৈরি করার আগে চিন্তা করে তারপর বাড়িটি তৈরি করেন, সেই মহান পুরুষও তেমনি চিন্তা করেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।"

"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—আচার্য শঙ্করের এই বেদান্ত-দুন্দুভির অনুরণন স্যার জীন্‌স্‌কেও ভাবিয়ে তুলেছে। স্যার জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ তাঁর Physics and Philosophy বইয়ের ৩৯৫ পাতায় বলছেন—"দেশ-কালের ভেতর থেকে দেখলে আমাদের ব্যক্তি-চেতনা নিশ্চিতরূপেই আলাদা, কিন্তু এই দেশ-কালকে অতিক্রম করে গেলে এই-সমস্ত খণ্ড ব্যক্তি-চেতনাসমূহ একটি অখণ্ড চেতনার মধ্যে হয়তো প্রবেশ করবে।" আর একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, দেশ-কালের দরুনই এই বিভিন্নতার সৃষ্টি এবং একে অতিক্রম করে গিয়ে উচ্চতর সত্যে (Deeper Reality) উপনীত হলে বোঝা যাবে—একই সত্য। হাজার বছর আগে শঙ্করাচার্য যে-মত প্রচার করেছিলেন, জীন্‌সের মত তারই প্রতিধ্বনি। তাঁর মতে ব্যবহারিক জগতের ব্যক্তিচেতনাসমূহ, যাকে 'জীব' বলা হয়, পরমার্থতঃ বিভিন্ন নয়, তারা এক। জীন্‌সের শুদ্ধ চেতনাই দেশ-কালের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিচেতনারূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের Wave of Probability জীন্‌সের মতে একটি অলীক কল্পনামাত্র। তিনি লিখছেন—"এই তরঙ্গ যে একেবারেই নেই তা নয়, এ তরঙ্গ আমাদেরই মনের দৃষ্টিমাত্র। কিন্তু আমাদের মনের বাইরেও একটা কিছু (Something) নিশ্চয়ই আছে, যা আমাদের মনে বিভিন্ন ধারণার জন্ম দেয়। এই 'একটি কিছুকেই' আমরা 'সত্য' (Reality) বলতে পারি" (Mysterious Universe, page 70)। এই বইয়েরই ১২৭ পাতায় তিনি বলেছেন—"বিভিন্ন বস্তু আমাদের মনেই আছে, কি অন্য কোন মনে আছে—সেটা কোন কথা নয়, আসল কথা—এই বাহ্যিক জগতের উৎপত্তি কোন একটি চিরন্তন সত্তা (Eternal Spirit) থেকে।" আচার্য শঙ্করের মতও এবিষয়ে জীন্‌সের মতোই—"এ সবকিছুই চেতনার তরঙ্গমাত্র" (মাণ্ডুক্য উপনিষদ—গৌড়পাদ-কারিকা ৪ : ৭২)।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হল, তাতে দেখা গেল—জীন্‌সের মতে এ জগৎ একটি তরঙ্গ মাত্র, যার অস্তিত্ব কেবল ব্যবহারিক তলেই (relative plane) সীমাবদ্ধ। কিন্তু দেশ-কাল অতিক্রম করে উচ্চতর সত্যে পৌঁছুলে এর অস্তিত্ব থাকে না। তিনি কিন্তু এই তরঙ্গকে 'অলীক' (fictitious) বলেই ছেড়ে দিচ্ছেন। শঙ্করাচার্য এই তরঙ্গকেই বলেছেন 'মায়া', যার স্বরূপ 'অনির্বচনীয়'। কিন্তু জীন্‌স্‌ যেখানে কেবল দেশ-কালকেই ব্যবহারিক জগতের ভিত্তি বলে নির্দেশ করলেন, আচার্য শঙ্কর সেখানে আর একটু এগিয়ে দেশ ও কালের সঙ্গে 'নিমিত্ত' (causation) শব্দটিকেও যোগ করে দিলেন। হাইজেনবার্গের 'অনির্দেশ্যবাদ' (Theory of Indeterminancy) আবিষ্কারের পর শঙ্করাচার্যের মতকে বৈজ্ঞানিকেরা সম্পূর্ণ-

রূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন। বিকিরণের দ্বৈতস্বভাব আবিষ্কারের পর বোঝা গেলো subject এবং object সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়; এ দুটির বিভিন্নতা সরিয়ে দিলেই আমরা আসল রূপটিতে গিয়ে পৌঁছুবো—জীন্‌স্ একথা বললেন। হাইজেনবার্গ দেখালেন যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি ইলেকট্রনের গতি ও স্থিতি (velocity and position) একই সঙ্গে মাপা যাবে না। এর ফলে প্রমাণিত হল—এ জগতের আরো বিভিন্ন মাত্রা (dimension) থাকতে পারে যা এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। আইনস্টাইনও এই মতটির প্রতি তাঁর স্বীকৃতি জানালেন। এইভাবে দেখতে পাওয়া গেল যে, জগতের স্বরূপটি চিরকালই অনির্বচনীয় হয়ে থাকবে। ভাববেন না যেন উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কার করে এ ত্রুটি দূর করা যাবে; বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন, প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি মায়ার গণ্ডী (margin of error) আছে, যার মধ্যে সব-রকম সূক্ষ্ম মাপজোখ ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই জীন্‌সের রামধনু উপমাটি বেশ সার্থক হয়েছে। আচার্য শঙ্করকে 'মায়াবাদী' বলে যে-সমস্ত আক্রমণ করা হয়েছে, তা নিতান্তই তাঁকে ভুল বোঝার জন্য। তিনি কখনোই জগৎকে 'নেহী হ্যায়' বলে উড়িয়ে দেননি। তাঁর মতে, জগতের অস্তিত্ব ভ্রান্তি থেকে এবং ভ্রান্তিটিকেই 'মায়া' বলে অভিহিত করেছেন, যার কেবল ব্যবহারিক সত্তাই আছে, চরম সত্তা নেই। স্বামী বিবেকানন্দের মতে—"ঘটনা-পরম্পরার বিবৃতিই মায়া" (**Maya is the statement of facts**)।

স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ ও আচার্য শঙ্কর যে-সমস্ত ক্ষুরধার যুক্তির সাহায্যে তাঁদের মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে-সমস্ত না দিয়ে কেবল তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীটুকুই এখানে আলেচনা করা হল। জীন্‌স্ যেখানে Absolute এবং Pure Intelligenceকে এক করে দিয়েছেন, সেখানে শঙ্করাচার্য ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে সামান্য পার্থক্য বজায় রেখেছেন ব্যাখ্যা করার জন্য। তাঁর মত সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ও ন্যায়সঙ্গত; বিজ্ঞান এখনো তার শেষ কথা উচ্চারণ করেনি। সে শুধু এইটুকুই বলছে যে, একটি অখণ্ড সত্তা না থাকলে এই খণ্ডসমূহের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের মনের সাহায্যে চরম সত্তার ধারণা সম্ভব নয়—জীন্‌সের এই কথা শুধু শঙ্করাচার্য নন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও সমর্থন করছেন। খুব সুন্দর প্রশ্ন তুলেছেন আইনস্টাইন তাঁর The World as I see It বইয়ে—"Why we bother on such topic? *Let us think why we think ourselves free*". বর্তমান মনস্তত্ত্ব এ বিষয় নিয়ে প্রচুর আলোচনা করছেন। ইয়ূং তাঁর In Search of a Soul বইয়ে যে-সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন, সেগুলিকে আরো এগিয়ে নিয়ে এসেছেন রাজ-স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারা-সাইকোলজির প্রধান অধ্যাপক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান জগতের মানুষের কাছে তাদের মনই (mind) সর্ব-প্রধান হাতিয়ার (apparatus)। ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি লেবোরেটরিতে কাজ শুরু করার আগে প্রধান কাজ ভোল্টমিটার, এ্যামমিটার বা ব্যুরেট, গুজ ক্রুসিবল্ ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা দেখে নেওয়া, কারণ যন্ত্রে ত্রুটি থাকলে এক্সপেরিমেন্ট ভুল হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের এই মতটি শঙ্করাচার্যও অনুসরণ করেছেন। মনই আমাদের জ্ঞানার্জনের প্রধান হাতিয়ার বলে তাঁর নির্দেশ—প্রথমেই এটিকে ত্রুটিহীন করে

নেওয়া। সাইকোলজিস্টদের মতে একজন মানুষ তার মনের পূর্ণশক্তির মাত্র ১০-১৫% কাজে লাগাতে পারে, বাকি ৮৫-৯০%-ই থেকে যায় অব্যবহৃত। তাই আচার্য শঙ্কর বলছেন, মনের শক্তি বাড়িয়ে তার পুরোটাই ব্যবহার করতে হবে এবং পূর্ণশক্তির অধিকারী মনের দ্বারাই চরম সত্তা ব্রহ্মের সন্ধান করা যেতে পারে। স্যার জীন্‌স্‌ যেখানে চরম সত্তার আভাস দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন, সেখানে আচার্য শঙ্কর সরাসরি তাঁর ঠিকানা বলে দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

(গান)

স্বামী জীবানন্দ

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ
করুণার অবতার,
ধরণীর ঘন তমসা নাশিতে
এস তুমি বার বার।
মহিমা তব অপার !
জ্ঞানের দীপ জ্বেলে নিয়ে হাতে
মানুষের হুঁশ ফিরায়ে আনিতে,
ধ্রুব লক্ষ্যের পথ দেখাইতে,
খুলিতে মনের দ্বার
নেমে এস বার বার।
রাম ও কৃষ্ণ তুমি একাধারে,
সব ভাব আছে তোমার ভিতরে,
তোমারে স্মরিলে দুখ যায় দূরে
আনন্দ-পারাবার !
করুণার অবতার !
'যত মত তত পথ' মহামন্ত্র
স্থাপিল জগতে নবীন তন্ত্র,
ঘোচাল ভেদের সকল রন্ধ্র,
করিল সবারে উদার
তুলি সমন্বয়-ঝংকার।

কথামৃতের সহজ বাণীতে
অমিয় সিঞ্চিলে মানবের চিতে,
কে পারে তোমারে চিনিতে বুঝিতে,
তুমি হে যুগাবতার !
করুণার অবতার !
তুমি নবীন যুগের স্রষ্টা,
ভূতভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা,
তুমি কল্পতরু মুক্তিদাতা
অশেষ করুণাধার,
করুণার অবতার !
জ্ঞানভক্তির তব অমৃতবাণী
অদ্ভুত সুধানির্ঝর-ধ্বনি !
মরমে পশিয়া দুঃখ ভোলায়
পাপী তাপী সবাকার।
করুণার অবতার !
ঐক্য সাম্য তব মহাভাবে,
বিশ্ববাসী সব এক হবে,
আনন্দ মৈত্রী শান্তি লভিবে,
মহাধ্যানে মানবতার।
করুণার অবতার !

ভগিনী নিবেদিতা ও জাতীয়তা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে বাংলাদেশে যাঁরা ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ্, সাহিতি্যক, সাংবাদিক, বিপ্লবী প্রভৃতি দেশ ও সমাজের সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষতঃ কলকাতা শহরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেও তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগস্থাপন, যাদের তিনি অভিহিত করতেন 'Our people' বলে। ভাষাগত ব্যবধানের ফলে তা সম্ভব হয়নি, যদিও বুদ্ধি ও হৃদয়ের দিক থেকে তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ তাঁর সম্পূর্ণভাবেই ঘটেছিল। আর যে বাগবাজার পল্লীতে তিনি কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেছিলেন, সেখানকার স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল এই সম্পর্কে তাঁর ইংরেজ বন্ধু স্টেট্সম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন, "পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তিনি আশ্চর্যভাবে মিশে গিয়েছেলেন। হিন্দু প্রতিবেশিগণ তাঁকে একান্ত আত্মীয় জ্ঞান করত। বাজারে, পথে, গঙ্গাতীরে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এবং পথ দিয়ে চলবার সময় সকলেই তাঁকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে অভিবাদন করত, তা সত্যই সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী।"

বক্তৃতা তাঁকে ইংরেজিতেই দিতে হোত এবং সে বক্তৃতার মর্ম অনুধাবন কেবল ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল প্রাণস্পর্শী, কারণ হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে বিদ্যমান ছিল তাঁর অনন্য-সাধারণ চরিত্র। কলকাতার শিক্ষিত সমাজ অল্পকালের মধ্যেই জেনেছিল, ভারতের নবজাগরণের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা এ দেশকে ভালবেসেছেন এবং তার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এই শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষতঃ ছাত্র-যুব-সম্প্রদায়ের উপর নিবেদিতার প্রথমাবধি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি জানতেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং তার নবরূপ-সংগঠনে এরাই হবে প্রধান সহায়। ভারতের জাতীয় জীবনে নিবেদিতার দান কতখানি তার মাত্রা নিরূপণ করা কঠিন। সাধারণতঃ তিনি বিপ্লবিরূপে পরিচিত, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধারূপে অভিহিত। যে কোন উপায়ে বিদেশী শাসনের অবসান ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। কিন্তু তিনি কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেননি। স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত নবীন ভারতের স্বপ্নও দেখেছিলেন। "ভাবী ভারত তার প্রাচীন গৌরবময় অতীতকে অতিক্রম করবে"—স্বামী বিবেকানন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিবেদিতা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বসভায় ভারতের স্থান সর্বোচ্চে এবং পৃথিবীর নরনারীকে উচ্চতম জীবনের সন্ধান দিতে পারে ভারত—এ বিষয়ে তাঁর ধারণা অতিশয় দৃঢ় ছিল।

এক প্রবন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন, গুরু যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোয়ে

যিনি জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, তিনই প্রকৃত শিষ্য। যদিও সেই আদর্শের রূপদান করতে হবে শিষ্যকে সম্পূর্ণ নিজের ভাবে। নিবেদিতা নিজেই ছিলেন সেই প্রকৃত শিষ্য। "আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখছি, আমাদের সেই প্রাচীনা মাতা আবার জাগরিতা হয়েছেন, পূর্বাপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা ও পুনর্বার নবযৌবনশালিনী হোয়ে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন; শান্তি ও আশীর্বাণী প্রয়োগ সহকারে তাঁর নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।" ভারত সম্বন্ধে এই দিব্যদর্শনের ফলেই অদ্বৈতবাদী ও মানবপ্রেমিক স্বামীজী ভারতের সেবায় জীবন সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর কাছে ভারতের কল্যাণের অর্থ সমগ্র জগতের কল্যাণ; কারণ ভারতই সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিক ভাবরাজি প্রদান করতে সমর্থ, আর তার দ্বারাই মানব-জীবন-সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান সম্ভব। ভারত সম্বন্ধে গুরুর এই দিব্যদর্শনই নিবেদিতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টির সামনে ছিল এক বিরাট ভারতীয় জাতীয়তা—যে জাতীয়তা নবীন, অশেষ-শক্তিসম্পন্ন, পৃথিবীর অন্যান্য যে-কোন দেশের জাতীয়তার সমকক্ষ। তাঁর (স্বামীজীর) মতে নিজ শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত এই জাতীয়তা বৌদ্ধিক, জাগতিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে অসঙ্কোচে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় ধর্মের (national righteousness) সদৃঢ় প্রতিষ্ঠাই হোল জাতীয়তা। নিবেদিতা আরো লিখেছেন, স্বামীজীকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাস, এই জাতীয় ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যই স্বামীজীর দেহ-পরিগ্রহণ।

স্বামী বিবেকানন্দ 'জাতীয়তা' শব্দটি বিশেষ ব্যবহার করেননি। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। উহাই পরে জাতীয় আন্দোলনে (national movement) পরিণত হয় এবং তখন থেকেই 'জাতীয়তা' শব্দের বহুল প্রচলন। নিবেদিতার নিকট জাতীয়তা শব্দটি ছিল বিশেষ প্রিয়, তার অর্থও ছিল গভীর ও ব্যাপক। "আমি বিশ্বাস করি, বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষি-বৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানেতে যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে, আর আজকের দিনে তারই নাম জাতীয়তা।" এই জাতীয়তার মন্ত্রেই তিনি ছাত্র-যুবসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, জাতীয়তার আদর্শ সৃষ্টি করাই বর্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা। তাঁর মতে ভারতীয় ঐক্যের মধ্যেই এই জাতীয়তাবাদ নিহিত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বৈচিত্র্যই ঐক্যের প্রাণ। এই ঐক্য যান্ত্রিক নয়, জীবনধর্মী।

ভারত সম্বন্ধে গুরুর দিব্যদর্শন নিবেদিতার সমগ্র মনপ্রাণ অধিকার করেছিল। তাই একদিকে যেমন স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার সংগ্রামে ছিল তাঁর সহানুভূতি, সমর্থন ও সহযোগিতা, অপরদিকে তেমনি ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে ভারতের অগ্রগতির জন্য ছিল আন্তরিক প্রচেষ্টা। বস্তুতঃ গভীরভাবে চিন্তা করলে নিবেদিতার বহুবিধ কার্যকলাপের এই মূল সূত্রটি আবিষ্কার করা যায়। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তিসাধন ও পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে জগৎ সমক্ষে তার প্রতিষ্ঠা। দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের যাঁরা সাধক, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে-কোন উপায়ে

দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন। আবার কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী প্রভৃতি মনীষিগণ ছিলেন নিজ নিজ সাধনায় তন্ময়, যদিও ভারতের পরাধীনতা তাঁদের বিচলিত করেছিল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদের অবদানও কম নয়। কিন্তু যে সত্যের আভাস তাঁদের অন্তরলোক উদ্ভাসিত করেছিল, তারই পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাধনায় তাঁরা প্রয়োগ করেছিলেন সর্বশক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁদের সাধনলব্ধ ফল নিঃসন্দেহে ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করে বিশ্বসভায় মর্যাদা দান করেছে। ভগিনী নিবেদিতা এই দুই সাধনার সংযোগ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। একই সঙ্গে তিনি দেশের মুক্তি-সাধন ও নবদেশ-সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রথমাবধি যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই এই অখণ্ড স্বপ্নের স্থান ছিল না। স্বাধীনতালাভের পর তার সংরক্ষণ ও নব সংগঠনের মূলেও সেই স্বপ্নের অভাব।

স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের যে মহিমময় রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল তার বাস্তব রূপায়ণ করবে কারা? উদীয়মান তরুণসম্প্রদায়—যারা উৎসাহে মত্ত, প্রাণের আবেগে পূর্ণ; যারা নিরন্তর পথ খুঁজছে আত্মপ্রকাশের। কিন্তু আত্মপ্রকাশের পথ কি ধ্বংসে? নব নব সৃজনের মধ্যেই কি মানুষ তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না? সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হোলেই সৃজনী শক্তির অপচয় ঘটে ধ্বংসে। সৃষ্টির পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মা ছিলেন তপস্যায় মগ্ন। তাঁর মানস-আকাশেই সৃষ্টির রূপটি প্রথম উজ্জ্বল হোয়ে ফুটে ওঠে। সুদক্ষ কারিগর যে মূর্তির রূপ প্রদান করে, তার পূর্বে তাকে সেই রূপের আরাধনায় তন্ময় হতে হয়। কে এই তরুণদের ভারতের মহিমময় মূর্তির ধ্যানে তন্ময় হতে শেখাবে? আর সেই ধ্যানের মূর্তিকে রূপ প্রদানের কাজেই বা সাহায্য করবে কে? যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করবার জন্য প্রয়োজন অসীম ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ হৃদয়বত্তা। নিবেদিতা এই দুই সম্পদেরই অধিকারিণী ছিলেন। তিনি নিজে ভারতকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, মহিমময় ভাবী ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, তার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে ভারতের জাতীয়তার রাগিণী শতধারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতো। তাঁর অগ্নিময় বাণী সকলকে উদ্দীপিত করতো। তাঁর আত্মোৎসর্গ সকলকে দেশসেবায় জীবন-উৎসর্গে অনুপ্রাণিত করত।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে নিবেদিতা কলকাতায় গীতা সোসাইটি, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ডন সোসাইটি, ইয়ংমেনস হিন্দু য়ুনিয়ন কমিটি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন, তরুণ-সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মোপদেশ দিতেন, গীতার ব্যাখ্যা করতেন, স্বামীজীর আদর্শ ও বাণী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করতেন। কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের অন্যত্র অথবা বিভিন্ন প্রদেশে যখন যেখানে গেছেন, সেখানেই তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগস্থাপন ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাঁর প্রত্যেকটি সুচিন্তিত ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে ভারত-জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অকপট অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। বার বার তিনি বলতেন, 'My task is to awake the nation'—সমগ্র জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়ন হোল আমার কাজ। এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধ-জাগার

দ্বারাই তা সম্ভব। ভাবের সঙ্গে তিনি যখন ভারতের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন, ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর স্বদেশপ্রেম বর্ণনা করতেন তখন শ্রোতৃবর্গের চিত্ত অভিভূত হোত। সিংহীর ন্যায় তেজোদৃপ্ত-কণ্ঠে তিনি যখন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য সকলকে জীবনপণে আহ্বান করতেন, সকলে হৃদয়ে প্রবল অনুপ্রেরণা বোধ করত। অনুরাগের সঙ্গে তিনি যখন সর্ববিধ কল্যাণকর কার্যে অগ্রসর হোতে বলতেন তখন হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হোত।

স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হয়। নিবেদিতা ছিলেন ঐ সোসাইটি-স্থাপনের উদ্যোক্তা। স্বামীজীর জীবনাদর্শের প্রচার ও অনুধ্যান ছিল সমিতির লক্ষ্য। নিবেদিতা বহুবার ঐ সমিতির সদস্যগণের নিকট বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি মাদ্রাজ গমন করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজের দূরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসকল সোসাইটির কাজ ছিল সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাসের সঙ্গে পূজা, ভজন ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদান। নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের সর্বত্র ঐরূপ বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হয়। ঐসকল সমিতির মাধ্যমেই ভারতের যুবশক্তি উদ্বুদ্ধ হবে জাতীয়তার মন্ত্রে—এই আশা তিনি অন্তরে পোষণ করতেন। "বর্তমানে প্রকৃত কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার তাৎপর্য ও অর্থবোধের সঙ্গে ভারতের সর্বত্র 'জাতীয়তা' শব্দটি প্রচার করা। এই বিরাট চেতনা সর্বদা ভারতকে পূর্ণরূপে অধিকার করে থাকা চাই। এই জাতীয়তা দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমান দেশের প্রতি এক গভীর অনুরাগে একত্র হবে। এর অর্থ—ইতিহাস ও প্রচলিত রীতিনীতিকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখা; ধর্মের মধ্যে সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ ভাবনার সমাবেশ—সর্বধর্ম-সমন্বয়। বুঝতে হবে যে, রাজনীতিক প্রণালী ও আর্থনীতিক দুর্বিপাক গৌণমাত্র। পরন্তু ভারতবাসী কর্তৃক ভারতের জাতীয়তা উপলব্ধিই প্রকৃত কাজ।"

নিবেদিতা একদিকে যেমন ভারতের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতি অনুশীলনের মধ্যে তার আধ্যাত্মিক রূপটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তার পারিবারিক ও সামাজিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পাল-পার্বণ, উৎসবাদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে তার মর্ম অনুধাবন করেছিলেন, অপরদিকে তার জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যাগুলির প্রত্যেকটির বিশ্লেষণ, চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়ে গিয়েছেন। প্রকৃত-পক্ষে তিনি যতখানি অধীর ছিলেন ভারতের রাজনীতিক মুক্তিলাভের জন্য, ততখানি ব্যগ্র ছিলেন তার সর্ববিধ উন্নতির জন্য। স্বভাবতই ছাত্রসম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বিবেকানন্দ সোসাইটির সদস্যগণের জন্য নির্দিষ্ট কার্যসূচীর কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। 'ভারতীয় বিবেকানন্দ সমিতিগুলির জন্য কার্যের ইঙ্গিত' নামক প্রবন্ধে তার বিবরণ পাওয়া যায়।[১] আপাতদৃষ্টিতে সমাজকল্যাণকর কার্যে ব্রতী হওয়াই ছাত্রগণের পক্ষে সঙ্গত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নিবেদিতা জানতেন, অধিকাংশ ছাত্র দরিদ্র মধ্যবিত্ত-পরিবারভুক্ত। তাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য একাগ্রচিত্তে বিশ্ব-

---

১ Hints on National Education in India, p. 85.

বিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নপূর্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ; কারণ শীঘ্রই তাদের সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে পরিবারের দায়িত্ব বহন করতে হবে। তাছাড়া তখন পর্যন্ত সমাজ-কল্যাণকর কার্যগুলি অধিকাংশ গৃহস্থ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। অতএব অধ্যয়নরূপ তপস্যার সঙ্গে স্বামীজীর আদর্শানুযায়ী চরিত্রগঠন করা ও জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়াই ছাত্রগণের একান্ত কর্তব্য। প্রয়োজন— ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরচর্চা ও নানারকম পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা মনের উৎকর্ষসাধন, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন। জাতীয়তা-বোধের সঞ্চার তখনই সম্ভব যখন দেশমাতৃকার অখণ্ডরূপটি আমাদের মানসনেত্রে প্রতিভাত হয়। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পর্যটন করে স্বামীজী দেশমাতৃকার এই অখণ্ড রূপ দর্শন করেছিলেন, তাই তিনি মহা-জাতীয়তার উদ্বোধক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করেছিল স্বদেশের কল্যাণকর কার্যের অনুষ্ঠানে। তাই ছাত্রবৃন্দের অন্যতম কর্তব্য হবে অবকাশ-সময়ে তীর্থপর্যটন। সুদূর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, কামাখ্যা থেকে দ্বারকা, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্গত সকল তীর্থস্থানই জনসাধারণের মিলনভূমি। কেদার-বদরী মহাতীর্থে নিবেদিতা এ সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে একদল ছাত্রকে সুদূর হিমালয়ে তীর্থপর্যটনে প্রেরণ করেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঐ দলের অন্যতম যাত্রী। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের পক্ষে এই ব্যয়ভার-বহন অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব। অর্থাভাবে প্রতি বৎসর ছাত্রদলকে তীর্থপর্যটনে প্রেরণের পরিকল্পনা তাঁকে বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করতে হয়। স্বদেশের ইতিহাস এবং মহামানবগণের চরিত্র-অধ্যয়ন জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার অন্যতম সহায়। ভারতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল মহত্তম চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে, সেইসব চরিত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করবে মহৎ জীবনযাপনে। কেবল স্বদেশের নয়, বিদেশের ইতিহাস-অধ্যয়নও প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস জাগাবে আত্মপ্রত্যয়। একদিকে স্বাধীনতারক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে বিশ্বমানব-কল্যাণে মনীষিগণের অনলস সাধনায় আত্মোৎসর্গ! তারপর চিন্তা করতে হবে গভীরভাবে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে। সুগভীর চিন্তার মধ্যেই নিহিত থাকে সমাধানের ইঙ্গিত। সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুধ্যান। তিনি লিখেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন বর্তমানে আমি বিশেষভাবে অনুধাবন করছি। আমি দেখতে চাই, আমাদের জনসাধারণ ভারতের সর্বত্র দলে দলে সমবেত হয়েছেন, এবং তাঁদের উদ্দেশ্য কর্ম নয়, কেবল প্রার্থনা আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-অনুধ্যান। এই দুই মহাজীবনের মধ্যেই সমগ্র ভারতের ঐক্য নিহিত। ভারতবর্ষ এই দুই মহাপুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করবে, এইটিই সবচেয়ে প্রয়োজন।"

তদানীন্তন যুবক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নিবেদিতার বাণী কীভাবে অনুরণিত হয়েছিল, তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত বিনয় সরকারের কথায়, "...সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি (নিবেদিতা) ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মারফত ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে। ভারতীয়

নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়ি-মুড়কী খাওয়ার মত সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক ভারতীয় স্বদেশ-সেবকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভারতের বিকাশধারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন।"

দেশের সর্বত্র জাতীয়তাবোধ-সঞ্চারের চিন্তা সর্বক্ষণ নিবেদিতার মনপ্রাণ অধিকার করে থাকত। "পত্রিকাই এই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার শ্রেষ্ঠ উপায়।" সুতরাং একসময়ে *তিনি একখানি পত্রিকা বার করবার জন্য বহু* চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অসংখ্য প্রতিবন্ধক ও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অল্প অর্থ-সাহায্যে তা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে লিখেই মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে হয়েছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশী কংগ্রেস অধিবেশনের পরে 'ভারতের জাতীয় মহাসভা' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "কংগ্রেসের কাজ রাজনীতিক অথবা দলীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করা নয়; কংগ্রেস হচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতিক দিকমাত্র।···বর্তমানে কংগ্রেসের যথার্থ কাজ শিক্ষাসংস্কাররূপে সমগ্র দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করা। যাতে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, সেজন্য কংগ্রেসের সদস্যগণকে নূতনভাবে, নূতন চিন্তায় অভ্যস্ত করতে হবে।" নিবেদিতার এই উক্তির মূল্য কতখানি তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ে তাঁর অসামান্য দানের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের অকুণ্ঠ ভাষণে তার স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি বলতেন, "শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের ওপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। অবশ্য ঐ শিল্প জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।"

নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। জাতীয় জীবনগঠনের সমস্ত পরিকল্পনা অসমাপ্ত রেখে *অসময়ে তাঁকে যাত্রা সমাপ্ত করতে হয়েছিল।* যত সাধ ছিল তত সময় ছিল না। অশেষ মূল্য দিয়ে আমরা আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করেছি, যদিও ভারতমাতার অখণ্ডরূপ আর নেই। ভারত আজ নানাবাদভূমিতে পরিণত। প্রতিদিন বিরাট প্রাণশক্তির অপচয় ঘটছে নানাভাবে। মনে হয়, নিবেদিতা যদি এই সঙ্কটমুহূর্তে এসে দাঁড়াতেন! জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটকালেই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল।

নিবেদিতা চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন অমূল্য চিন্তারাজি, যার মধ্যে রয়েছে জীবনগঠনের সন্ধান, সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত। নিবেদিতার উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা আমাদের কর্তব্য, তেমনি তাঁর গ্রন্থরাজির অধ্যয়ন ও তাঁর মহৎ জীবনের অনুধ্যানও প্রয়োজন, যা আমাদের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করবে আদর্শ জীবনযাপনে।

মহাপ্রভুর ভাবধারা ও বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীচৈতন্যদেব বাঙালী। বাঙলাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং বাঙলার অন্তর-লোকের স্নেহ-কোমলতার বৈশিষ্ট্যের এক মূর্ত বিগ্রহরূপে তিনি কেবল বাঙলাদেশকেই মাতিয়ে তোলেননি, সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তর-লোকেও তাঁর লোকোত্তর ভাবধারাকে তরঙ্গা-য়িত করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালী যিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি প্রেমমন্ত্রে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন। তাঁর লোকোত্তর জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে-ভাবমণ্ডলটি সর্বপ্রথম বাঙলা-দেশে গ'ড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে প্রধান সুর জুগিয়েছিল প্রেম। প্রেম-বিহ্বলতার এক অপরূপ প্রকাশ যেমন ঘটেছিল তাঁর সর্বাঙ্গে, তেমনি কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছিল প্রেমেরই সুমধুর গান, যে-প্রেম সকলকে কাছে টেনে আনে, কাউকেই সরিয়ে দেয় না বরং তার মধ্যে স্বতোৎসারিত করে ভক্তির অশ্রু-নির্ঝরকে। নম্রতায়-শুচিতায়, নিরভিমান সত্তার অকুণ্ঠ প্রকাশে এবং মহিমময় তেজবীর্যের দীপ্তিতে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিচরিত্র যে-ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল, সমগ্র মানব-ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। যেখানে যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়েও অনেক বেশি যেন তিনি দান করেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মূল ধারাটিকেই যেন তাঁর অলৌকিক প্রেম-প্রকাশের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বাঙলাদেশে দু'টি ধারা উদ্ভূত হয়েছিল,—একটি নানুরের চণ্ডীদাস, অপরটি মিথিলার বিদ্যাপতির প্রেমময় গীতধারা। এই দু'টি ধারারই উৎসমূল জয়দেবের গীতগোবিন্দ। বাঙলার প্রেমমধুর প্রাণ-চেতনার ধারাটিকেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্ময় ক'রে তুলেছিলেন। এই যুগ্মধারার সম্মিলিত গীতিবিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যদেব।[১] ষোড়শ শতকের প্রথমাংশের বাঙালীরা এই প্রেমসুন্দর গীতি-বিগ্রহকে সমস্ত অন্তর দিয়ে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন এবং সমগ্র ভারতের বুকে এই গীতি-বিগ্রহের প্রেমরসকে সকলের হৃদয়ের পাত্রে ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন। সেদিনকার বাঙালীর মনে এই যে প্রাণ-চেতনা জেগেছিল, তার মূলে ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং। তিনি বাঙালীর প্রাণের কানে পরম সুরটিকে তুলে' ধরেছিলেন এবং সেই সুরই বিভিন্ন পদাবলী ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মাধ্যমে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছিল।

এই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে কয়েক-জন মনীষাসম্পন্ন বাঙালী বৃন্দাবনে গিয়ে বস-বাস করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে লোকনাথ, ভূগর্ভ, সনাতন এবং রূপ প্রধান। লোকনাথ এবং ভূগর্ভ বরং নিজেদের বেশ কিছুটা নেপথ্যে রেখে দিয়েছিলেন, আর বিপুল পাণ্ডিত্য এবং রস-মাধুর্যের অধিকারী রূপ এবং সনাতন চৈতন্য-মন্ত্রের পাদপীঠের উজ্জ্বল আলোকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের যে রূপ দেখি, সে-রূপ অনন্যসাধারণ; পাণ্ডিত্যে, প্রেমে, ভক্তিতে, রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যায়, অপরিসীম ত্যাগে এবং সমগ্র চৈতন্যভক্তের জীবনচর্যার দিক-নির্দেশে এই দুই ভাই সকলের একটি নমস্যস্থান

১ সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অধিকার ক'রে আছেন। তাঁদেরই মন্ত্রদীক্ষিত ছিলেন তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ট তাঁদেরই আকর্ষণে যেন বৃন্দাবনের রসলোকে ছুটে এসেছিলেন; এবং এই ছুটে আসার পিছনে শ্রীচৈতন্যদেবেরই প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছিল। রঘুনাথ দাস বাঙালী, রঘুনাথ ভট্টও বাঙালী। একমাত্র গোপাল ভট্টই দাক্ষিণাত্য থেকে শ্রীবৃন্দাবনে এসেছিলেন। রঘুনাথ দাস যখন বৃন্দাবনে এসেছিলেন তখন শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটেছে, এবং সমগ্র ভারতব্যাপী চৈতন্য-বিভূতি ছড়িয়ে পড়েছে। সনাতন এবং রূপ তাঁকে একান্ত অনুরোধ জানিয়ে জীবিত রেখেছিলেন, আর মনে প্রাণে চৈতন্যধ্যানী দাসগোস্বামীকে 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু' রচনার উপযোগী স্নিগ্ধসুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিলেন। দাসগোস্বামীর পুণ্যশ্লোক নামটিকে উল্লেখ করতে গিয়েই স্বরূপ দামোদরের কথা অনিবার্যভাবে আলোচ্য হয়ে পড়ে; কারণ তাঁর প্রভাব রঘুনাথ দাসগোস্বামীর জীবনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়েছিল। চৈতন্যপরিকরদের মধ্যে যে-কয়জন বাঙালী ভক্ত বাঙলাদেশ থেকে পুরীতে গিয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে গৌরপারম্যবাদের একটি শুচিসুন্দর ভাবমণ্ডল রচনা করেছিলেন। কিন্তু বাঙলা ত্যাগ ক'রে যে দুই-একজন বাঙালী মহাপ্রভুর সঙ্গলোভে পুরীধামে গিয়ে বাস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছেন স্বরূপ দামোদর। তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের অন্তর্ভুক্ত না হ'য়েও তাঁদের সকলেরই প্রণম্য। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবনের তত্ত্বমাধুর্য তিনিই বিশেষভাবে সকলের কাছে প্রকট করেন। মহাপ্রভুর তত্ত্বনির্ণয়ে এই স্বরূপ দামোদরের অবদান একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে যা' প্রকাশিত হয়েছে, তা' হ'লো এই,—শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কেমন, তিনি আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন সে-মাধুর্য কি প্রকার, আর আমার এই মাধুর্য আস্বাদন ক'রে শ্রীরাধার যে অপরিমেয় আনন্দ সেই আনন্দই বা কিরূপ,—ব্রজভূমিতে অনাস্বাদিত এই তিন ভাবের আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতরণ। এই দৃষ্টি ঋষিদৃষ্টি, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী অভিনব। ছয় গোস্বামীর মধ্যে যদিও এঁর নাম অনুল্লিখিত আছে, তথাপি ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ গোস্বামী যে এঁরই ভাবরূপের অন্যতম প্রকাশ, সে-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সুতরাং ছয় গোস্বামীকে জানতে হ'লে এই স্বরূপ দামোদরের ঋণ সর্বাগ্রে স্বীকার ক'রে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাঁর সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজের উক্তি :

কৃষ্ণরস তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥
সংগীতে গন্ধর্ব সম বুদ্ধো বৃহস্পতি।
দামোদর সম কেহ নাহি মহামতি ॥

* * *

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম রসের সাগর ॥

[চৈ: চ: মধ্যলীলা—১০ম পরি:]

আমাদের মনে হয়, চৈতন্যচরিতামৃতের এই স্বল্পায়তন উক্তিতেই স্বরূপ দামোদরের যথার্থ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের গ্রন্থে স্বরূপ দামোদরের তত্ত্ব ও তথ্য কিরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁর প্রকাশ দিয়েছেন এইভাবে—

চৈতন্যলীলা রত্ন সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।

তাহাঁ কিছু সে শুনিল তাহা ইহাঁ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥
[চৈঃ চঃ মধ্যলীলা—২য় পরিঃ]

স্বরূপ দামোদরের মতবাদই দাস গোস্বামীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং সমগ্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি এই স্বরূপ দামোদরের মতেরই প্রতিধ্বনি।

এখন আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে, বাঙলা দেশের শ্রীচৈতন্য-পরিকরগণ এবং বৃন্দাবনের চৈতন্যভক্তগণ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রীচৈতন্যের জীবনতত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রূপ দান করেছেন। বাঙলা দেশের যে কয়েকজন শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বিহ্বল রূপের প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি এবং যাঁরা চৈতন্যের ধ্যানকে অন্তরের একমাত্র সম্পদ ক'রে বাঙলা দেশেই থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, বংশীবদন প্রভৃতি। অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবৎকালেই তাঁকে ভগবানের অবতার ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই প্রচারে চৈতন্যদেবের বিরক্তি সত্ত্বেও তিনি তা' গ্রাহ্য করেননি। তাঁদের কাছে শ্রীচৈতন্যই একমাত্র ভগবানের রূপ ধ'রে দেখা দিয়েছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের যে-স্নিগ্ধ সুন্দর অলৌকিক রূপ বহু শত দৃষ্টির তৃষ্ণা মেটাতো, তাঁদের দৃষ্টিতে সেই রূপ ভগবানের অলৌকিক রূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, লোচন দাস প্রভৃতি এই অসাধারণ নয়নভুলানো রূপকে ধ্যান ক'রেই নবদ্বীপে নাগরী ভাবের উপাসনার প্রবর্তন করেছিলেন। এই নাগরী-ভাবের প্রেমসাধনা কবিপ্রাণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর নিয়ে জেগে আছে। মনে হয়, শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার, মুরারি প্রভৃতি একমাত্র গৌরমন্ত্রের দ্বারাই উদ্বোধিত হয়েছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের বিগ্রহ-স্বরূপ মনে ক'রে একটি উপাসনার প্রবর্তন করেন এবং সেই উপাসনা যাতে সমগ্র বাঙলা-দেশে উপযুক্ত প্রসার লাভ করে সেজন্য সমস্ত প্রচেষ্টাও নিয়োজিত করেছিলেন। তা' ছাড়া, নরহরি সরকারই গৌরগদাধর-বিগ্রহ স্থাপনের আদি-উদ্যোক্তা। শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁরা পরম উপাস্য মনে করতেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব কেবল রাধাভাবের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য এ পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, এ-কথা যেন তাঁরা স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। বরং শ্রীগৌরাঙ্গই একমাত্র আরাধনার বস্তুরূপে তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁদের স্বরচিত বিভিন্ন পদের মধ্য দিয়েই চৈতন্যদেবের প্রতি প্রাণের ভক্তিময় আকুতি প্রকাশ পেয়েছে।[২] শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি দিকের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। বাঙলাদেশে থেকে মুরারি, বৃন্দাবন দাস, লোচন এবং জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের জীবনকে উপজীব্য ক'রে যে-জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে ষড়গোস্বামীর নাম একবারও উল্লেখ করেননি।

---

২ ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁদের এই চৈতন্যভক্তি বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে—"in these padas, as in the lives of Caitanya which derive their inspiration from the Navadvipa circle, and to which they have natural affinity, no abstruse theology obscures the simple and passionate faith; to them Caitanya is not an image of their supreme deity, but the deity himself incarnated, not a means, but an end in itself" Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal —Dr. Sushil Kumar Dey, P. 61.

অবশ্য রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি ষড়গোস্বামীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন পরবর্তী যুগে। আনুমানিক ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় কবি কর্ণপুর আরও বহুব্যক্তির সঙ্গে চৈতন্যধর্মের সাধনার অন্তরঙ্গ-রূপে সনাতন, রূপ ও জীবগোস্বামীর নাম উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। তাঁর 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকে তো কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও নাট্যরস সৃষ্টির জন্য রূপগোস্বামী প্রভৃতিকে আনতেই হয়েছিল। তা' ছাড়া, এই প্রসঙ্গে এই বিষয়টিও লক্ষণীয় যে মুরারি, বৃন্দাবন দাস, লোচন প্রভৃতির রচনায় শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল-বাসের দীর্ঘ কয়েকটি বৎসরব্যাপী যে প্রেমবিহ্বল বিরহোন্মাদ অবস্থা, তার কোনো বিস্তৃত বর্ণনা নেই। কেবলমাত্র নবদ্বীপলীলারই জয়গান করেছেন তাঁরা। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে যে-একটি তত্ত্বের দিক আছে, এবং যে-তত্ত্ব বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, সেই তত্ত্ব গৌড়দেশে রচিত পদে এবং আচরণে একেবারেই প্রশ্রয় পায়নি। কেবল নরহরি-ভণিতাযুক্ত একটি পদে রাধাপ্রেমের রসাস্বাদন জন্য চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন ব'লে উল্লিখিত হয়েছে :

অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদ্ভুত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কৃষ্ণরস বিলাইতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হ'য়ে
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিত্তে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥

যদি এ-পদ নরহরি সরকারের হ'য়ে থাকে, তবে তা একমাত্র ব্যতিক্রম। কেউ কেউ নরহরি-লিখিত ব'লে এ-পদটিকে স্বীকারও করতে চান না। সে যাই হোক, শ্রীগৌরাঙ্গদেবই মূলতঃ বাঙলা দেশের চৈতন্যভক্তদের কাছে উপাসনার জগতে একমাত্র উপেয় (end in itself) হ'য়ে দেখা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের ধ্যানজ্ঞানের কেন্দ্রমূলে তিনিই সর্বময় হ'য়ে থেকেছেন। বিগ্রহ-রচনার ধ্যান-দৃষ্টিতেও এক চৈতন্যদেব ছাড়া সেদিন আর তাঁদের কাছে কেউ দেখা দিতে পারেননি।

আর যদি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দিকে তাকাই, তাহলে দেখি, শ্রীচৈতন্যের প্রতি অপরিসীম ভক্তিকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে তাঁরা একটি সুগভীর তত্ত্বদৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন। সেই তত্ত্বদৃষ্টির কেন্দ্রভূমিতে শ্রীকৃষ্ণই পরম দৈবতরূপে দেখা দিয়েছেন এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য। তাঁদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে নীলা-চলবাসী চৈতন্যদেবেরই যোগিবেশ প্রতিভাত হয়েছে। নবদ্বীপের গৌরাঙ্গলীলা তাঁদের মনকে যেন আকৃষ্ট করতে পারেনি। এখানেই তাঁদের তত্ত্বদৃষ্টির মূল নিহিত রয়েছে ব'লে মনে হয়। বাঙলার সঙ্গে পুরী আর বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সাধকদের মধ্যে এইখানেই আদিপার্থক্য ব'লে মনে করি। বাঙলায় সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে কেউ গ্রহণ করতে চাননি। অন্যদিকে রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদরের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই শ্রীরাধারূপিণী কাঞ্চন-পঞ্চালিকার লাবণ্যমণ্ডিত রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এ আমাদের স্বীকার করতেই হ'বে যে, শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব নবদ্বীপলীলাতেই সর্বপ্রথম প্রকটিত হয়। মহাপ্রভুর আদি অনুরক্ত পরিকরগণ নবদ্বীপ-লীলায় ঐ রাধা ও কৃষ্ণভাবে অনুভাবিত দেখেই মহাপ্রভুকে অবতার ব'লে মনে করেছিলেন

এবং তা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি। তাঁদের মনোভাবনার এই দিকটিকেই ডঃ সুশীল কুমার দে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"Unlike the Vrindāvana Gosvāmins, they accepted Caitanya as the centre of their thought and object of adoration of their faith. This has been characterised as the Goura-pāramya-vāda, which (whatever may have been their personal attitude) the Vrndāvana Gosvāmins never discuss or set forth in their theological treatises."[৩] চৈতন্য-পরিকরদের মধ্যে কেউ কেউ নবদ্বীপ-লীলায় মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-আবিষ্ট রূপটি প্রত্যক্ষ ক'রে পদ রচনা করেছিলেন। পরিকরদের মধ্যে যিনি চৈতন্যদেবের চেয়েও বয়সে বড় সেই শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার একটি পদে লিখেছেন :

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পহু যমুনার ভানে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পূরব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে;
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে॥

শিবানন্দের একটি পদেও শ্রীচৈতন্যের এই রূপ অঙ্কিত হয়েছে,—

গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শোনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলে পঁহু পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥

নরহরি সরকারের একটি পদে রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভাববিহ্বল রূপটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়—

হেম দরপণি গৌরাঙ্গ-লাবণি
ধূলায় ধূসর কাঁতি।
অশন বসন তেজিয়া রোদন
ব্রজবিলাসিনা ভাঁতি॥
হরি হরি বলি প্রাণনাথ করি
ধরণী ধরিয়া উঠে।
কোথা না যাইব কাহারে কহিব
পরাণ ফাটিয়া উঠে॥

মুরারি গুপ্ত তাঁর একটি পদে রাধাভাবে আকুল গৌরাঙ্গমূর্তি এইভাবে চিত্রিত করেছেন—

খেণে হাসে খেণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি॥

চৈতন্য-সমসাময়িক পরমানন্দ গুপ্তেরও এরূপ ভাবের পদ পাওয়া যায়। [ক্রমশঃ]

৩ Vaishnava Faith and Movement in Bengal, Dr. S. K. Dey. P. 229.

রোমের মনস্বী সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস্

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিক' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—"যতদিন না নৃপতিগণ দার্শনিক হইবেন, রাজপুত্রেরা দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ও উহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার সহিত আত্মিক জ্ঞানের মিলন ঘটিবে, ততদিন কোন নগর হইতে অমঙ্গল সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে না, মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে না।" তিনি আরও বলিয়াছেন, যে-রাষ্ট্রের শাসনকর্তারা শাসনে একান্ত অনিচ্ছুক, সেই রাষ্ট্রই শান্তিপূর্ণভাবে সুশাসিত হয় এবং যে-রাষ্ট্রের শাসকেরা অতীব আগ্রহশীল, সেই রাজ্যের শাসনকার্যই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।"

এই সুচিন্তিত অভিমত বাস্তব জগতে কার্যকরী হইতে পারে কি না সে বিষয়ে প্লেটোর নিজেরই মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। পুরাণে এইরূপ কাহিনী কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায় এই অমৃতবাণী অন্ততঃ একবার কার্যে পরিণত হইয়াছিল। রোমক সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াসের মধ্যে এই দুইটি বিষম গুণের সমাবেশ দেখা গিয়াছিল। তিনি একাধারে দার্শনিক ও নরপতি ছিলেন। রাজপ্রাসাদের কান্তি, দীপ্তি ও প্রমোদ-বিলাস অপেক্ষা নৈষ্ঠিক ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়ন ও নির্জন বাস ভাল বাসিতেন। সৈনিক হিসাবেও তিনি যুদ্ধজয়ের গৌরব অপেক্ষা শান্তিলাভের কৌশলগুলিই বেশী পছন্দ করিতেন। তাঁহার জীবনকথার যতটুকু জানা যায়, আমরা এখানে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

মার্কাস অরেলিয়াসের পিতা অ্যানিয়াস ভেরাস্ এবং মাতা ডোমিসিয়া কালভিলা। রোমান সম্রাট্ এন্টোনিয়াস পায়াস্ অ্যানিয়াস ভেরাসের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কোন সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ না করায় তিনি শ্যালকপুত্র মার্কাস অরেলিয়াসকে দত্তক লইয়া পুত্ররূপে প্রতিপালন করেন।

মার্কাস অরেলিয়াস্ বিশেষ যত্নে ও আদরে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক সুপণ্ডিত এম্ কর্ণেলিয়াস ফ্রণ্টো ছিলেন তাঁহার গৃহশিক্ষক। তৎকালীন শিক্ষানীতি অনুসারে তাঁহাকে কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র রীতিমত শিখিতে হইয়াছিল; কিন্তু দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেই তিনি অধিক ভালবাসিতেন। এগার বৎসর বয়সেই তিনি দার্শনিকদিগের ন্যায় সাদাসিধা পোশাক পরিতে এবং সরল জীবন যাপন করিতে অভ্যাস করেন। বৈরাগ্যের প্রতি তাঁহার সহজ অনুরক্তি থাকায় তিনি তদানীন্তন স্টোয়িক সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন; তীব্র বৈরাগ্য এবং সাম্প্রদায়িক কঠোর শৃঙ্খলার বশবর্তী হইয়া পার্থিব সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ধর্মাচরণেই ইঁহারা আত্মনিয়োগ করিতেন। একজন ভাবী সম্রাটের পক্ষে এইরূপ জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ বিস্ময়ের বস্তু।

স্টোয়িকেরা যদিও নিজেদের সমগ্র পৃথিবীর নাগরিক বলিয়া পরিচয় দিতেন, এবং স্বদেশ-

প্রীতি অপেক্ষা মানবপ্রেমেরই অধিক জয়গান করিতেন, তথাপি বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের শিক্ষাধারার বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যাইত না। কারণ তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্কই ছিল না। অথচ তাঁহারা বলিতেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। মার্কাস অরেলিয়াসের সময় রোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্য; সেই সাম্রাজ্যের যিনি একচ্ছত্র ভাবী সম্রাট্, তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষা স্টোয়িক দার্শনিকেরা কিভাবে দিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আরও আশ্চর্য ব্যাপার—সেই শিক্ষার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়া মার্কাস অরেলিয়াস আজীবন কিভাবে চলিয়াছিলেন।

জুলিয়াস সীজার ও আগস্টাসের রাজত্বকালেই রোমান সাম্রাজ্য বেশী বিস্তার লাভ করে। আগস্টাসের মৃত্যুর পর দেখা যায়, পশ্চিমে আটল্যাণ্টিক মহাসাগর হইতে পূর্বে আরমেনিয়ান পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে আফ্রিকার মরুভূমি এবং উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, রাইন ও ডানিউব নদী, কৃষ্ণসাগর ও ককেসাস পর্বতই উহার প্রসারে বাধা ঘটায়। আগস্টাসের সেনাপতিগণ যখন রাইন নদীর মোহনার দিকে রাজ্যবিস্তার করিতে গিয়া অকৃতকার্য হন, তখন তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া যান—তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করার চেষ্টাই করা উচিত, উহার বিস্তারের চেষ্টা আর না করাই ভাল। সুতরাং ১৪ হইতে ১৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমানেরা মাত্র দুইটি দেশ জয় করেন—একটি বৃটেন, অপরটি ওসিয়া। এই দুইটি দেশ জয় করিয়া কিন্তু তাহাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণই হইয়াছিল বেশী, এবং শেষ পর্যন্ত তাহাও আবার সাম্রাজ্যভুক্ত রাখা যায় নাই।

মার্কাস অরেলিয়াস স্বয়ং শান্তিকামী হইলেও শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। উত্তরে ড্যানিউব নদীর তীরে ও রাইন নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে যে-সকল দুর্ধর্ষ জার্মান জাতি বাস করিত, নৈসর্গিক বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা রোমরাজ্য আক্রমণ করিতে ছাড়িত না। পূর্বদিকস্থ ধৃষ্ট পার্থিয়ানেরাও সর্বদা নানা উপদ্রব করিত। দুইদিকের দুইরকম শত্রুর সহিত মার্কাস অরেলিয়াসকে সর্বদাই লড়িতে হইত। দুরাচার লুসিয়াস ভেরাসের সৈন্যদল সাময়িকভাবে পার্থিয়ানদিগকে দমন করিয়া রাখিলেও মার্কাসের শান্তি মিলে নাই। ড্যানিউব নদীর তীরে জার্মানদের বিরুদ্ধে তিনি নিজে সৈন্য পরিচালনা করিয়া বারংবার তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেও তাঁহার অদৃষ্টে সুখ ছিল না। তবে তাঁহার মনকে এরূপভাবে গঠিত করিয়াছিলেন যে, তুমুল যুদ্ধের মধ্যেও তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইত না। জয়লাভেও তিনি উল্লসিত হইতেন না। সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় তাঁহার নিকট সমান হইয়া গিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরেই প্রাচ্য দেশ হইতে মহামারী আসিয়া ইতালি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। এই মহামারীতে লুসিয়াস ভেরাসের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুতে রোমরাজ্য যেন দুষ্টগ্রহের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে। সম্রাট্ এণ্টোনিয়াসের অভিলাসানুসারে রাজ্যশাসনব্যাপারে লুসিয়াসের সম্পর্ক ঘটে, এবং সেই সম্পর্কসূত্রে লুসিয়াস রাজ্যমধ্যে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি করিত। শাসনকার্যে মার্কাসকে অকপটে সাহায্য করিলেও অসুবিধা অনেক ঘটিত।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়াও রোমরাজ্যে অনেক বার পড়িয়াছিল। মার্কাস অরেলিয়াসের সংগঠনশীলতা ও বদান্যতার ফলে জনসাধারণ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু ইহার জন্যও তাঁহাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এভিডিয়াস কেসিয়াস নামে মার্কাসের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। সিরিয়ায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সমগ্র রোমরাজ্য করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। এভিডিয়াস ভাবিয়াছিলেন বৈরাগ্যবান দার্শনিক সদাশয় সম্রাটকে বিপন্ন করা বিশেষ কঠিন হইবে না, বরং সহজেই তাহা সাধন করা যাইবে। মার্কাস অরেলিয়াস কিন্তু কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহী নেতা নিজের কর্মচারীদিগের হস্তেই নিহত হন। তখন মার্কাস অরেলিয়াস দুঃখ করিয়া বলেন—"ক্ষমা করার আত্মপ্রসাদ হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম।" মার্কাসের মানসিক গঠন এই উক্তিতে স্পষ্ট প্রতিফলিত। ইহার পরে সেই বিদ্রোহসংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রও তিনি নষ্ট করিয়া ফেলেন, পাছে অন্য কেহ এই বিদ্রোহে জড়িত প্রমাণিত হইয়া শাস্তি পায়। মার্কাসের জীবনের সকল কাজেই এইরূপ উদার দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্কাস অরেলিয়াসের ক্ষমা ও উদারতার অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচারের কথাও শুনা যায়। অত্যাচারিত খৃষ্টানদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন জাস্টিন মার্টার ও পলিকার্প। লয়েনস্ ও লিয়েনের গির্জাসমূহের অনেকেই নির্যাতিত হইয়াছিলেন। ধর্মবিদ্বেষ এই নির্যাতনের কারণ নহে, কারণ রাজনৈতিক। মার্কাস অরেলিয়াস খৃষ্টানধর্মের কিছুই জানিতেন না, জানিবার চেষ্টাও কোন দিন করেন নাই। কিন্তু খৃষ্টানেরা যখন দেখিলেন রোমের সম্রাটেরাও দেবতা বলিয়া পূজিত হন, তখন তাঁহারা রোমে প্রচলিত এই ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। যতগুলি ধর্মমত তখন রোমে প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে 'এপিকিউরিয়নরাই' রোমের প্রাচীন ধর্মমত আত্মসাৎ করিয়া লইয়া উহার দেবতা বা বীরদিগের নাম প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া বাহ্যরূপের সহিত আন্তর আলোকের সামঞ্জস্য ঘটাইয়াছিল। খৃষ্টানেরা কিন্তু সেরূপ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা রোমক দেবতাদিগের প্রতি শুধু অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, দেবীমূর্তি ভাঙ্গিয়া দিতেন, এবং ভক্তদিগের সম্মুখেই এইসকল দেবমূর্তির অবমাননা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, স্থানে অস্থানে কারণে অকারণে রোমবাসীদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া গালি দিতেন। এইসকল কারণে রোমানরাও তাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। আবার যখন জানা যাইত যে, খৃষ্টানেরা গোপনে কোথাও কিছু পরামর্শ করিতেছে তখন সেই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিত। খৃষ্টানেরা প্রকাশ্যে যে-সকল অপরাধ করিত তাহা রোমবাসীরা জানিতে পারিত, অধিকন্তু তাহারা কল্পনাও করিয়া লইত অনেক কিছু। এইসকল কারণেই বোধ হয় খৃষ্টানদিগের প্রতি সকল অত্যাচারই আইনানুগ প্রমাণিত হইত এবং মার্কাস অরেলিয়াস এইসকল ক্ষেত্রে ঔদার্য দেখাইতে পারিতেন না।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মার্কাস অরেলিয়াসকে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। ১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশে আবার নূতন করিয়া যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মার্কাস অরেলিয়াসের বন্ধুবর্গের

মনে এই আশঙ্কার উদয় হইল যে, তাঁহাদের সহিত মার্কাসের বুঝি আর দেখা হইবে না। তাঁহারা অনুরোধ করিলেন, বিদায়-বেলায় মার্কাস যেন তাঁহাদের কিছু উপদেশ দিয়া যান। আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যেই মার্কাস অরেলিয়াস তিন দিন ধরিয়া তাঁহাদিগের সহিত গভীর দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিলেন। তাহার পর তিনি প্রধান সেনাপতির বেশেই বিদায় লইলেন। যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রোমে আর ফিরিয়া আসেন নাই। ১৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ প্যানোলিয়া প্রদেশে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র রোমসাম্রাজ্য যেরূপ গভীরভাবে শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, অন্য কোন সম্রাটের মৃত্যুতে অপর কোন দেশেই সেরূপ কখনও হয় নাই।

যে দর্শনতত্ত্ব আরম্ভ করিয়া মার্কাস অরেলিয়াস নিজের জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই মতবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এখানে বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

খৃষ্টপূর্ব ২৯০ অব্দের সন্নিকটবর্তী কোন সময়ে মহামতি জিনো (Zeno) স্টোয়িক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকদিগের প্রবর্তিত আদর্শবাদ কালপ্রবাহে ক্রমশঃ জড়-বাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। যাঁহারা তখন নূতন কোন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সক্রেটিসের আবির্ভাবের পূর্বে যে-সকল তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া সেই যুগের জড়বিজ্ঞানীরা বিশ্বরহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই-সকল তত্ত্বের মধ্য হইতেই একটি তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার উপরই নিজেদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেন। অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ আর জীবন গঠন করিতে চাহিল না, তাই তখনকার দর্শনশাস্ত্র মানুষকে শিক্ষা দিত ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান-প্রণালী ও সামাজিক আদব-কায়দা। তদানীন্তন দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি জড়বিজ্ঞানের উপরই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়া মানুষকে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা স্বয়ং কোনরূপ গবেষণা না করিয়া পূর্বসূরীদিগের গৃহীত নীতিই অবলম্বন করিলেন। এই যুদ্ধে রোমে দুইটি প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায় দেখা দিল—'স্টোয়িক' ও 'এপিকিওরিয়ান।' এপিকিওরিয়ানেরা ডিমক্রিটাসের পরমাণুবাদের সাহায্যে বিশ্বরহস্য বুঝাইতে চেষ্টা করিল আর স্টোয়িকেরা হেরাক্লিটাসের নানারূপ-গ্রাহী শাশ্বত অগ্নিপ্রবাহকেই সৃষ্টির মূল ধরিয়া লইল।

স্টোয়িকদিগের মতে স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টির পূর্বে অগ্নিময় ব্যোমেরই (fiery ether) একমাত্র অস্তিত্ব ছিল। এই ব্যোমই পরিবর্তিত আকারে অন্যান্য মূল উপাদানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা অগ্নির আদি প্রকৃতি ত্যাগ করিতে পারে নাই। অগ্নিময় ব্যোম প্রথমে বাষ্পপিণ্ড, পরে জলীয় তরল পদার্থে পরিণত হয়। ইহা হইতেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ (solid earth, water, destructive fire and atmospheric air) উৎপন্ন হয়। তবে এই তেজ পূর্বকথিত চিরন্তন অগ্নিময় ব্যোম হইতে স্বতন্ত্র। তেজ ও মরুৎ সক্রিয় উপাদান, ক্ষিতি ও অপ্ নিষ্ক্রিয়। পৃথিবী হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পৃথিবী শুষ্ক ও ভারী হওয়ায় উহা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। উহার চতুষ্পার্শ্বে জল সংগৃহীত হইতে থাকে। ইহাদের উপরদিকে

বায়ুমণ্ডল। অগ্নিময় ব্যোম সর্বদাই স্থির উপাদানচতুষ্টয়ের চারিদিকে ঘুরিতেছে। নক্ষত্রগুলি আগ্নেয় পদার্থ ও ব্যোমে সংবদ্ধ। পৃথিবী হইতে যে বাষ্পরাশি উদ্গত হইতেছে, নক্ষত্রগুলি তাহার দ্বারা পুষ্টিলাভ করে। কিন্তু উহারা জীবন্ত, কারণ উহারা প্রাণবান অগ্নি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; উহারা নিকৃষ্ট হইলেও উহাদিগকে পরিদৃশ্যমান দেবতা বলা চলে। মার্কাস অরেলিয়াস বলেন, —সূর্য এবং আকাশস্থিত অন্যান্য দেবতাদিগের বিভিন্ন কর্ম নির্দিষ্ট আছে। সেই সকল কর্ম তাহারা নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকে।

স্টোয়িকেরা বলেন, সৃষ্টির মধ্যে কোন খুঁত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং স্রষ্টা যে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিল্পী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জগতের প্রতি ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সজাগ দৃষ্টির আভাস মেলে, ব্যক্তিগত প্রভাব দৃষ্ট হয়। তবুও স্টোয়িকেরা ব্যক্তিগত ঈশ্বরে (Personal God) বিশ্বাসী নন। অগ্নিময় ব্যোমই তাঁহাদের ঈশ্বর। ইহা সর্বব্যাপী, এবং সকল সৃষ্ট পদার্থের ধারক ও পোষক। ইহাই বিশ্বের আত্মা, সর্বময় দেবতা। ইহাও একপ্রকার একেশ্বরবাদ। মার্কাস অরেলিযাস এইরূপ একেশ্বরবাদীই ছিলেন এবং ঈশ্বরের সর্বময়ত্ব ও সর্বশক্তিমত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। স্টোয়িকেরা বিশ্বাস করিতেন—সকল জিনিসের মুলে আছে আকারহীন বস্তু (formless matter) এবং নিরাকার প্রাণবান ব্যোম। এই বস্তু বা 'ম্যাটার' ইঁহাদের মতে চিরস্থায়ী, কারণ উহার অন্তর্গত অগ্নির কোনদিনই বিনাশ নাই। কিন্তু সকল জিনিসই ক্রমশ: দগ্ধীভূত হইতেছে, এবং একটি নির্দিষ্ট কালের পরে জগদ্ব্যাপী দাহনকার্য আরম্ভ হইবে, তখন সকল সৃষ্ট পদার্থই দেবতার মধ্যে লীন হইয়া যাইবে। আবার নূতন যুগ আসিবে, আবার নূতন করিয়া জগৎ সৃষ্ট হইবে। সেই জগতে চিরপুরাতনেরই আবির্ভাব ঘটিবে। যেমন আবার একজন সক্রেটিস আসিবেন, আর একজন জ্যান্থিপিকে তাঁহার বিবাহ করিতে হইবে, তাঁহার হস্তে সক্রেটিসকে নিপীড়িতও হইতে হইবে, অবশেষে এপিটাস ও মিলিটাসের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া সেই সক্রেটিস অপূর্ব গৌরবের সহিত আত্মসমর্পণ করিবেন, এবং বিলাপরত শিষ্যদিগের সম্মুখে সেই জ্ঞানতপস্বী বিষপানে প্রাণত্যাগও করিবেন।

স্টোয়িকেরা পরলোকে বিশ্বাস করিতেন কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না, কারণ এপিকিউরিয়ানদিগের মত তাঁহারা ইহা তারস্বরে অস্বীকার করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল প্রলয়ই কেবল মৃত্যুভয় দূর করিতে পারে। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক সময় মিলিত হইবে ইহা সুনিশ্চিত, কিন্তু কবে কখন হইবে, প্রলয়কালে বা অন্য সময়, সে-বিষয়ে স্টোয়িকদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। যে-দেবতার (Deity) নিকট হইতে আত্মার (Soul) উৎপত্তি, সে দেবতাতেই আত্মা লীন হইয়া যাইবে, একথা স্টোয়িকদিগের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিতেন। দেবতার সহিত মানুষের এই সম্পর্ক স্টোয়িক ধর্মের মূলকথা। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ দেবতার সহিত জড়িত। কিন্তু তাঁহাদের মতে ঈশ্বর এবং যুক্তি বা বুদ্ধি সমানার্থক। যুক্তিপূর্ণ জীবনই আত্মার আশ্রয়। আবার এইরূপ জীবন ধর্মসাধনসাপেক্ষ। সুতরাং স্টোয়িকদের মতে যুক্তিপূর্ণ জীবন যাপনেই মানুষের চরম মঙ্গল এবং ধর্মই পরম সুখ।

এইরূপে স্টোয়িকেরা তাঁহাদের প্রধান তত্ত্বে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্মই একমাত্র আশ্রয়স্থল, এবং উহাই কেবল প্রশংসার বিষয়। ধর্মের মধ্যেই সব নিহিত, কারণ উহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সৎ লোকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশের কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন হয় না। রোগ বা দারিদ্র্য তাঁহার কোন ক্ষতিই করিতে পারে না। মানুষের মধ্যে তিনি একজন দেবতা। তথাকথিত মঙ্গলকার্যের মধ্যে যদি কোন আধ্যাত্ম কল্যাণ না থাকে, তবে তাহা মঙ্গলও নয়, অমঙ্গলও নয়, মাঝামাঝি কোন একটি জিনিস। ধর্মের এরূপ নিরপেক্ষ রূপ ইওরোপের কোন সম্প্রদায়কেই ইত:পূর্বে দিতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এরিস্টটল বলিতেন, সৎ-চিন্তাপূর্ণ ধর্মজীবন যাপন করিতে মানুষের সুবিধাজনক পরিবেশের প্রয়োজন হইতে পারে। স্টোয়িকেরা কিন্তু এরূপ আপস মনোভাবের প্রশ্রয় দিতেন না। কেবলমাত্র ধর্মই তাঁহাদের কাম্য ছিল। কোন ধার্মিক ব্যক্তি ক্রীতদাস হইতে পারে, রোগগ্রস্ত হইতে পারে, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট হইতে পারে, সকল প্রিয়বস্তু হইতে সে বঞ্চিত হইতে পারে, তবুও সে সম্পূর্ণ সুখী। যে ধার্মিক নয় সে পাপী। মধ্যপন্থা কিছুই নাই। স্টোয়িকদের এই মতবাদ বাস্তব বলিয়া মনে করা যায় না, কারণ পৃথিবীর সকল লোককে কেবল পাপী ও পুণ্যবান এই দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৎ ও অসৎ দুই প্রকার বৃত্তিই দেখা যায়। মানুষ সাধুতাই কামনা করে এবং সে যখন কোন অন্যায় কার্য করিয়া বসে, তখন সে উহা চারিত্রিক দুর্বলতার জন্যই করে, সাধুতার প্রতি বিরাগবশত: করে না। স্টোয়িকেরা যে নিছক ধর্মের কথাই বলিয়া থাকেন এবং বাহ্য জগৎকে অগ্রাহ্য করেন, তাহার ফলে তাঁহারা বলিতে বাধ্য হন পৃথিবীতে জ্ঞানী ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য; বোকার সংখ্যাই বেশী। জ্ঞানী ব্যক্তি-দিগের নাম করিতে হইলে তাঁহারা মাত্র কয়েক জনের নাম করেন—হারকিউলিস্, অন্তিসিউস্, সক্রেটিস্, এনিউথিনিস্, ডায়োজিনিস্ এবং কনিষ্ঠ কেটো।

স্টোয়িসিজমের প্রাথমিক অবস্থায় যে-সকল অযৌক্তিক তথ্য ও নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেগুলি প্রায়ই নিন্দার্হ এবং আধুনিক জগতে অচল। কিন্তু ক্রমশ: তাঁহাদের মধ্যে সহজবুদ্ধির স্ফুরণ হওয়ায়, অনেক সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন আবার অনেক কিছু স্বীকার করিয়াও লইয়াছিলেন। জ্ঞানী লোকের অবাস্তব সংজ্ঞা তাঁহারা সিনিসিজম (cynicism) হইতে আহরণ করিয়াছিলেন। ডাইয়োজিনিস যে একটি টবের (tub) মধ্যে বসিয়া থাকিয়া মহাবীর আলেকজান্দারকে বলিয়াছিলেন—"একটু সরিয়া দাঁড়াও, রৌদ্র আটকাইবে না। তোমার নিকট হইতে আমি আর কিছুই চাহি না।" এ উক্তি বিস্ময়ও উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু সমগ্র সমাজ যদি ডাইয়োজিনিসের ন্যায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া টবের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনও ধারই না ধারে, তাহা হইলে সভ্য জগতের কাজকর্ম চলে কিরূপে? সৌভাগ্যের বিষয়, খৃষ্টীয় জগৎ যেরূপ সেন্ট সাইমিয়ন স্টাইলাইটিসের (St. Simeon Stylites) উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া কয়েকজন সাধু সজ্জনের পবিত্র জীবনযাত্রাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল, স্টোয়িকদিগেরও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ত্যাগ করিয়া বাস্তব জগতে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল।

প্রথমেই কেবল সৎ (absolute good) ও কেবল অসৎ (absolute evil)—এই মত-বাদের সংস্কার করিতে হইয়াছিল। ধর্মই

একমাত্র প্রকৃত সৎ বস্তু, পাপই একমাত্র অসৎ-বস্তু—এই ধারণা থাকা সত্ত্বেও স্টোয়িকেরা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই দুইটি ব্যতীত পৃথিবীতে আরও কয়েকটি বস্তু আছে যাহাকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া গ্রহণ করা যায়, যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সুনাম এবং আরও কয়েকটি জিনিস যাহা তাঁহারা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও স্বীকার করিলেন যে, অপ্রাকৃত আদর্শ পুরুষ ব্যতীত আরও কিছু কিছু নিষ্পাপজীবন ও উচ্চাভিলাষী মানুষ সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহাদিগকে ভালোবাসাও চলে। এমন কতকগুলি জিনিস আছে শুধু সেইগুলিই ত্যাগ করা দরকার। পৃথিবীসুদ্ধ জিনিস ত্যাগ করার প্রয়োজন নাই। এইভাবে স্টোয়িকদের মত-বাদ ক্রমে সহজ ও সরল হইয়া আসিল।

রোমকদিগের সংস্পর্শে আসিয়াই স্টোয়িক-দের এইরূপ বাস্তব পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। রোমকেরা ছিল বিশেষ বাস্তববাদী। তাহারা বীর ও আইনজ্ঞের জাতি হইতে গ্রীক জাতির সংস্কৃতি নিজেদের প্রয়োজনমত করিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই। কয়েকজন উদারচিত্ত রোমক দুই-এক বৎসর গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে থাকিয়া গ্রীক দর্শনও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অন্যেরা গ্রীসের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে রোমে গিয়া তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতে প্ররোচিত করেন। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এইভাবে গ্রীসের সকল দার্শনিক মতবাদ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি রোমে উপস্থিত হইল।

যে-সকল গ্রীক মতবাদ রোমে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে স্টোয়িক মতবাদই বেশীর ভাগ লোক গ্রহণ করে। প্রজাতন্ত্র বিনষ্ট হইয়া রোমে যখন রাজতন্ত্র প্রবেশ করিতে উদ্যত, এবং জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পাইবার উপক্রম, তখন স্টোয়িকদিগের সরলতা, সহজ জীবনযাপন-প্রণালী, সংসারে বৈরাগ্য এবং সকল প্রকার বিপদের মধ্যে ধীর স্থির থাকিবার শিক্ষা মানুষের মন আকৃষ্ট করিল। যখন কোন প্রকারে আর বিপদের সম্মুখে টিকিয়া থাকা যায় না, দুঃখ সহ্য করিতে করিতে ধৈর্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়, যখন আত্ম-হত্যাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়, তখন আত্মহত্যা শুধু শাস্ত্রবিহিত নয়, উহা প্রশংসার্হ, স্টোয়িকদিগের এই অভিমত রোমকদিগের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিল। তাহারা ভাবিল, যে-অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না আত্মহত্যা করিয়া সে-অত্যাচার হইতে তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিবে। প্রজাতন্ত্র সমূলে লুপ্ত হইলে কেটো আত্মহত্যা করিল বটে, ফিলিপ্পি (Philippi) যুদ্ধের পর ব্রুটাস ও কোসিয়াসকে কিন্তু বাঁচিয়া থাকার প্রেরণা দিল এই স্টোয়িক শিক্ষাই।

রোম সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থায় যখন উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি চরম সীমায় উপস্থিত হয় তখন দার্শনিকদিগের প্রতি, বিশেষতঃ স্টোয়িক-দিগের প্রতি গভীর ঘৃণা প্রকাশিত হইতে থাকে। সর্বসমক্ষে এইসকল পাপাচারণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্টোয়িকেরা বিশেষ অপ্রিয় হইয়া উঠেন। অনেক স্থলে তাঁহারা দেশ হইতে নির্বাসিতও হন। এই দুঃসময়ে খঞ্জ ক্রীতদাস স্টোয়িক এপিক্টেটাস নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করেন—"শ্রীভগবানকে সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতে পারি—আমার সহিত তোমরা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু মনে রাখিও তোমাদের মন ও আমার মন একই উপাদানে গঠিত ; আমি তোমাদেরই একজন ;

তোমাদের সন্তুষ্ট করিতে আমি সকল কর্মই করিতে পারি; যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া যাও, যেভাবে ইচ্ছা আমাকে সাজাও, তোমাদের ইচ্ছা হইলে আমি বিচারকের কাজও করিতে পারি, সাধারণ লোকের মত জীবনযাপনও করিতে পারি, নির্বাসিত হইয়া অপর দেশেও যাইতে পারি বা এদেশেও থাকিতে পারি, দরিদ্রও হইতে পারি, আবার ধনীও হইতে পারি, সকল অবস্থাতেই কিন্তু আমি নির্লিপ্ত নির্বিকার থাকিয়া মানবতার গুণ গাহিয়া যাইব।" ইহা কেবল তাঁহার মুখের কথা ছিল না। তিনি নিজ জীবনে ইহা আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছিলেন। স্টোয়িকেরা এইভাবে ধর্মাচরণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। দার্শনিক সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস এইসকল চিন্তাধারাই আরও সুস্পষ্ট ও সুগম করিয়া তাঁহার 'মেডিটেশনে' (Meditation) লিখিয়া গিয়াছেন। যাহারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী নহে, মার্কাসের 'মেডিটেশন' তাহাদিগের নিকট বেদবাক্যের ন্যায় শাশ্বত সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

এই চিন্তাসূত্রগুলি এককালে এবং একত্র লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহা প্রকাশ করিবারও কোন দিন তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। একখানি সাধারণ খাতায় সম্রাট্ তাঁহার চিন্তাসূত্রগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে তিনি নিজের মনের সহিত পরিচিত হইয়া উহাকে ধীর ও শান্ত রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। মার্কাস বৈরাগ্যবান হইলেও স্নেহ-ভালবাসার দাবি তিনি মানিয়া চলিতেন। পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব এবং শিক্ষকদিগের নিকট হইতে যেসকল সৎ শিক্ষা এবং সৎ আদর্শ তিনি জীবনে পাইয়াছিলেন, সেগুলি 'মেডিটেশনের' প্রথম ভাগে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার জন্য তিনি অকুণ্ঠহৃদয়ে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। ঈদৃশ স্নেহপ্রবণতা হইতেই স্টোয়িক মতবাদে বিশ্বপ্রেম ও মানবভ্রাতৃত্বের উদ্ভব হইয়াছে। মার্কাস অরেলিয়াস প্রকৃতই মানবপ্রেমিক ছিলেন এবং নিজেকে মানবসমাজের একজন বলিয়াই মনে করিতেন।

মার্কাস অরেলিয়াসের নিম্নলিখিত চিন্তাসূত্রগুলি তাঁহার মানসিক গঠনের পরিচয় দেয়: "মনুষ্যসমাজ একই আইন মানিয়া চলিবে এবং সেই কারণেই তাহাদের সকলকেই··· একই রাষ্ট্রের অনুগত হইতে হইবে।" ইহা হইতেই বুঝা যায় সমগ্র জগৎ যেন একটি 'কমনওয়েল্থ' বা 'প্রজাতন্ত্ররাজ্য' (মেডিটেশন-৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সূত্র)। "সমাজ-গঠনের জন্যই মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে" (ঐ ৭ম ভাগ, ৫৫ সূত্র)। এই মানবভ্রাতৃত্বই জন-সাধারণের উপকার করিতে প্ররোচিত করে এবং ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদের হিতকর বলিয়াই মনে হয় না।

"যে জিনিস সমগ্র মৌমাছির ঝাঁকের স্বার্থে না লাগে, তাহা একটিমাত্র মৌমাছির কোন স্বার্থেই লাগে না (ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ, ৫৪ সূত্র)।" ইহা আমাদের শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতে এবং উহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেয়।

"সৎকার্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও অসৎ-কার্যের কদর্যতা আমি বুঝিতে শিখিয়াছি, আমি স্থির জানি যে-ব্যক্তি আমার বিরক্তির কারণ ঘটাইতেছে সেও আমার আত্মীয়, যদিও আমরা এক রক্তমাংসে গঠিত নহি, তবুও আমাদের মন সম্পর্কবদ্ধ, কারণ দেবতা হইতেই তাহাদের

[শেষাংশ ৬৩৯ পৃষ্ঠায়]

স্বামীজীর বাণী

ব্রহ্মচারী শক্তিপ্রসাদ

ভারত-ইতিহাসের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে পরানুকরণমোহাচ্ছন্ন, আত্মবিস্মৃত, বিবদমান জাতির ত্রাণকর্তারূপে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব মধ্যাহ্নসূর্যের মত সমগ্র জগতে কিরণ বর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার তপঃসম্ভূত অমিত তেজো-দীপ্তি, তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞান, নির্ভীক আত্মোৎসর্গ ভারতের এক গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছে এবং শুধু ভারতে কেন, বিশ্বমানবের কল্যাণে, বিশ্বশান্তিপ্রচেষ্টায় তাঁহার সেই মহান আদর্শ আজিও শাশ্বত ও অম্লান রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্যাগী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ গুরুকৃপায় এবং কঠোর সাধনা-বলে যে সত্য শিব ও সুন্দরকে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন, ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল সূত্রটিকে যেভাবে তিনি পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি গুরুর আদেশে বিশ্বমানবের হিতের জন্য অকুতোভয়ে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম কি, তাহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি কোথায়, বৈদান্তিক দৃষ্টিতে তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা তিনি জগৎসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই ভারতভূমি হইতেই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া বারবার জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। ধীর-প্রকৃতি হিন্দুর কাছে, হিন্দুধর্মের কাছে জগতের ঋণ অপরিসীম—এই যুক্তির সমর্থনে ভারতের অপূর্ব জীবনব্রত—"ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—স্বামীজী জগতের নিকট দৃপ্ত কণ্ঠে প্রচার করেন।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে। সাধনার দ্বারা ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা ভ্রান্ত পথে চালিত মানবকে যে-সকল শাশ্বত সত্যবাণী শুনাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের তিরোধানের বহুযুগ পরেও একইভাবে মানবের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। ঋষিমুখনিঃসৃত সেই-সকল বাণী যুগ যুগ ধরিয়া মানবসমাজের, রাষ্ট্রের, ধর্মের উন্নতির সহায়ক হইয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল তাহা জগতের সুখ-শান্তি-প্রতিষ্ঠায় হিতকর হইবে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরোপলব্ধি ব্যতীত জগদ্গুরু হওয়া যা[illegible] না। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপায় ঈশ্বরদর্শনে সক্ষম হইয়াছিলেন। কঠোর সাধনা, দেশবিদেশের ধর্ম ও দর্শন অধ্যয়ন, ব্যাপক দেশভ্রমণের দ্বারা যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা[illegible] তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জীবনে[illegible] প্রত্যেকটি শাখাই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং জগতের সর্বজাতির সর্বশ্রেণী[illegible] মানুষের সমস্যা তাঁহাকে আকুল করিয়াছে। দুঃস্থ জনগণের জন্য এই সর্বত্যাগীর চোখের জল পড়িয়াছে। নিরক্ষর নিরন্নের গগনভেদী আর্তরবে তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলি[illegible] হইয়াছে। কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবা[illegible] প্রয়াস হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্রগঠন, নৈতিক উন্নতি, সমাজসেবা

প্রভৃতি সমাজের সর্বশাখার উন্নতিবিধানের জন্য অতি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া তিনি পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

আবার, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই কেবল স্বদেশ ও বিশ্বের তৎকালীন সমস্যাই নয়, ভবিষ্যৎও তিনি ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সম্ভাব্য সমস্যাসমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সেইগুলির সমাধানও দিয়া গিয়াছেন। তাই আজ বর্তমান বিশ্বসমস্যাসমূহের সমাধানের পথ তাঁহার অমর সর্বকালীন বাণীতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রনীতিতে, সমাজশিক্ষায়, ধর্মে, দেশহিতৈষণায় স্বামীজীর সুস্পষ্ট চিন্তাধারা এবং তাহার সুষ্ঠু রূপায়ণই সে সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে পারে। বিশ্বমৈত্রী ও শান্তির ক্ষেত্রে তাহা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিতে সমর্থ।

আজ বহুসমস্যাজর্জরিত আমাদের দেশ। সে সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আমরা আজ যদি স্বামীজীর চিন্তাগুলির দিকে ফিরিয়া চাই, সেখানেই উহার জন্য প্রয়োজনীয় আলোক বিপুল পরিমাণে নিশ্চয়ই পাইব।

[৬৩৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

উৎপত্তি ; আমি বুঝিয়াছি যে, কোন মানুষই আমার প্রকৃত ক্ষতি করিতে পারে না, কারণ কেহই আমার দ্বারা অসদ্ব্যবহার করাইতে পারে না, কিংবা আমার নিজের প্রকৃতি বা পরিবারের প্রতি ঘৃণা বা দ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না। পা ও হাত দুইটি, চোখের পাতা, এবং উপর ও নীচের পাটির দাঁত যেমন পরস্পরকে সাহায্য করে, আমরাও সেইরূপ পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। (ঐ ২য় ভাগের প্রথম্ সূত্র)।"

মার্কাস অরেলিয়াস সকল জিনিসের অনিত্যতা ও অর্থহীনতা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার 'মেডিটেশনে' বলিয়াছেন—"ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ ব্রহ্মাণ্ডের একটি কোণ মাত্র, সমুদ্র জলবিন্দুমাত্র, এথস্ পর্বত বিশ্বের তুলনায় বালুকণামাত্র, বর্তমান মুহূর্ত অনন্তকালের নিকট একটি বিন্দুমাত্র। ইহারা সকলেই অতিক্ষুদ্র, পরিবর্তনশীল এবং নশ্বর।" (ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩৬ সূত্র)

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

Vivekananda: His Call to the Nation (সংকলন); প্রকাশক—অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহী ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪। দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০২+১০; মূল্য ৪০ পয়সা।

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে একটি বলিষ্ঠ, সুস্পষ্ট ও শ্রেয়স্কর জীবন-দর্শন আমাদের একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের উদার জীবন এবং অমৃতবাণী বিভিন্ন ভাবাদর্শের সংঘাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। এই স্থির প্রত্যয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকাশক স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল গ্রন্থরাজি থেকে স্বামীজীর বাণী চয়ন করে ৮টি অধ্যায়ে নিবদ্ধ করেছেন। ৮টি অধ্যায়ে আছে (১) শ্রদ্ধা ও বীর্য, (২) মনের শক্তি, (৩) মানুষ-ই তার নিজের ভাগ্যবিধাতা, (৪) শিক্ষা ও সমাজ, (৫) শিবজ্ঞানে জীবসেবা, (৬ ধর্ম ও নীতি, (৭) ভারতবর্ষ: আমাদের মাতৃভূমি, (৮) বিবিধ। এতদতিরিক্ত বইটির প্রারম্ভে স্বামীজীর একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যানুগ জীবনী আছে। স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর যে-যে খণ্ড থেকে বাণীগুলি উদ্ধৃত, সেই-সেই খণ্ডের সংখ্যা ও পৃষ্ঠা দেওয়া আছে। ইহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আগ্রহবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি যুবসমাজের নিকট স্বামীজীর বাণী নিঃসন্দেহে সুলভ ও সুগম করবে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট প্রকাশকের সুরুচির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পুস্তকটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে; প্রথম সংস্করণ (পঁচিশ হাজার কপি) মাস তিনেকের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

—স্বামী বীতশোকানন্দ

কলিতীর্থ কামারপুকুর: শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রকাশক, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃঃ ৩৬০; মূল্য দশ টাকা।

লেখকের ভাষা সাবলীল ও সুন্দর। ভক্ত পাঠক-পাঠিকাগণ এই পুস্তকপাঠে প্রভূত আনন্দ পাইবেন এবং তাঁহাদের শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বইটি উপন্যাসের ধারায় লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী। একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের এই ভাবে লিখিত একটি বৃহৎ পুস্তক সুপরিচিত রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকটি যে একজন ভক্ত কর্তৃক লিখিত, তাহার প্রমাণ প্রতি পৃষ্ঠাতেই পরিস্ফুট। সেজন্য আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ হয়তো একটু বেশী হইয়াছে মনে হইল, যাহা মননশীল পাঠক নাও পছন্দ করিতে পারেন। বইখানির নাম 'কলিতীর্থ'-নামাঙ্কিত আর একটি বহুল-প্রচারিত বই-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বইখানির বিষয়বস্তু কি, তাহা সম্যক বোঝা গেল না। যদি কামারপুকুর বিষয়বস্তু হয়, তাহা হইলে বইটির একতৃতীয়াংশ মাত্র কামারপুকুরে নিবদ্ধ, বাকী দুই তৃতীয়াংশ তো দক্ষিণেশ্বরের জীবন লইয়া। বিষয়বস্তু যদি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী হয়, তাহা হইলে তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তোতাপুরীর আবির্ভাবের ব্যাপারটি বলিয়া পুস্তক শেষ হইয়াছে; ইহা যে প্রথম ভাগ মাত্র, এরূপ কোন উল্লেখও দেখিলাম না। পুস্তকটির প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

—অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণকর্ণামৃতম্—প্রণেতা: ওট্টুর উন্নিনম্পুতিরিপ্পাট্, Published by Ottur Unni Nambudiripad, 'Thulasivanam' Mayannur P. O. (via) Ottappalam, Kerala State. p. 57+6; price Rs. 1/25.

মূল সংস্কৃতে বিরচিত এবং দেবনাগরী লিপিতে মুদ্রিত 'শ্রীরামকৃষ্ণকর্ণামৃতম্' পুস্তক। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। ১০টি সর্গে ২৮০টি সুললিত শ্লোকে পরিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি শ্লোক ছন্দে, ভাবে, ভাষায় অনবদ্য। গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের সহিত ভক্তির মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিনিমগ্ন চিত্র বর্ণিত:

সুখাসনস্থং মুকুলীকৃতাঞ্জলিং
নিমীলিতাক্ষং নিভৃতাসুবিক্রমম্।
সমাধিমগ্নং স্মিতশাংভিতাননং
গদাধরাখ্যং নিগমার্থমাশ্রয়ে॥

পুস্তকের নামটিরও সার্থকতা আছে। লেখক বলিতেছেন:

'হে রামকৃষ্ণ! মধুরং তব সচ্চরিত্রং
ত্বৎপুণ্যনাম মধুরং, মধুরং ত্বদঙ্গম্।
সংভাষণং চ মধুরং, মধুরং চ গানং
তৎ কিং নু, যন্ন মধুরং ভবতি ত্বদীয়ম্॥' ১২

'কর্ণামৃত' পুস্তকখানি বাস্তবিক কর্ণের অমৃততুল্য, শ্রবণমঙ্গল, মধুবর্ষী। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার আশা করি।

ঈশোপনিষৎ: ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক সম্পাদিত, ৩ নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩। পৃষ্ঠা ৬৪; মূল্য ৫০ পয়সা।

অনাদি অপৌরুষেয় বেদের ব্রহ্মপ্রতিপাদক জ্ঞানপ্রধান অংশ উপনিষৎ নামে সুপ্রসিদ্ধ। উপনিষৎসমূহের মধ্যে প্রথমেই যে উপনিষৎখানির নাম উল্লেখ করা হয়, সেইটিই ঈশোপনিষৎ।

আলোচ্য গ্রন্থখানি পকেটসাইজ। ইহাতে প্রথমে ঈশোপনিষদের মূল সংস্কৃত শ্লোক, তৎপরে প্রতি শ্লোকের বাংলা অর্থসহ অন্বয়, বাংলা অনুবাদ ও অনুধ্যান দেওয়া হইয়াছে; বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করিবার জন্য 'অনুধ্যানে' মহাভারত, গীতা ও অন্যান্য উপনিষৎ হইতে উপযুক্ত উদ্ধৃতি স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভূমিকাটিও সুলিখিত। সর্বদা সঙ্গে রাখিবার উপযোগী ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যোগ্য সমাদর লাভ করিয়া বহুল প্রচারিত হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী: (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়। ১০ এইচ গিরীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৬০+৯৯; মূল্য ৪'২৫।

আলোচ্য গ্রন্থখানি জনপ্রিয়তালাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ইহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণের বিষয়বস্তু বর্তমান সংস্করণে স্থান পাইয়াছে, অধিকন্তু 'দেশ ও কাল', 'শক্তিতত্ত্ব', 'শব্দপ্রমাণ', 'বৃত্তিজ্ঞানের স্বরূপ ও উহার ফল' প্রভৃতি কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণটিও যোগ্য সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বৈষ্ণব-দর্পণ: শ্রীহরিপদ গোস্বামী, ৬ নং রাখালদাস মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১২। মূল্যের উল্লেখ নাই।

'বৈষ্ণব-দর্পণ' পুস্তকখানিতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, গীতা, ভাগবত, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের উপদেশাবলী ও ভক্তগণের বাণী সন্নিবেশিত হইয়াছে। দর্পণে যেমন জড় দেহের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি মানবের অপ্রাকৃত স্বরূপের কিভাবে উপলব্ধি হইতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুস্তকের নাম দেওয়া হইয়াছে 'বৈষ্ণব-দর্পণ'। পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা আশা করি তাহা সফল হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহানন্দে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আবহাওয়া ভাল থাকায় পূজার প্রত্যেক দিনই প্রচুর ভক্তসমাগম হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, কাঁথি, গৌহাটী, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বালিয়াটী, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলং, শিলচর, শেলা (চেরাপুঞ্জী, খাসি হিল) ও শ্রীহট্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

গত ২রা নভেম্বর বিকালে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ৬০তম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

বৈদিক মন্ত্রপাঠের পর সভার কার্য শুরু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাঠ করেন মিশনের সহ-কর্মসচিব স্বামী ভূতেশানন্দ। সভার আনুষ্ঠানিক কাজ-গুলি সম্পন্ন হইবার পর স্বামী বন্দনানন্দ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমেরিকার শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলির কার্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, আমেরিকার কেন্দ্রগুলি ক্লাস, ব্যক্তিগত আলোচনা, প্রকাশন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাব সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিয়া চলিয়াছে। বহু ব্যক্তি এই কেন্দ্রগুলিতে আসিয়া নিয়মিতভাবে জপ-ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। কোন কোন কেন্দ্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা প্রভৃতি উৎসবে পাঁচ-ছয় শতাধিক জনসমাগম হয়। তাছাড়া বহু আমেরিকাবাসী ব্রহ্মচর্য- ও সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মঠে বাস করেন। বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্যও কোন কোন কেন্দ্রে ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলকে শুভেচ্ছা জানাইয়া বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর অধ্যাত্মভাবাদর্শই জগতে নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিবে। এই ভাবধারাকে প্রবাহিত ও প্রসারিত করার কাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে বর্তমানে বহুবিধ বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইতে পারে; কিন্তু আমাদের সকলকেই দৃঢ়তার সহিত উহা অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে যে-সব সমালোচনা আজকাল হইয়া থাকে, আমাদের সকলকেই সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে এবং আমাদের যথার্থ ত্রুটি যদি কিছু থাকে তাহা সংশোধনে তৎপর হইতে হইবে। কিন্তু অনেকে রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে যথাযথ তথ্যাদি না জানার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকেন; সে ক্ষেত্রে মিশনের সভ্যগণ যেন এইজাতীয় সমালোচক-দের নিকট সঠিক তথ্যাদি পরিবেশনের জন্য সচেষ্ট হন। যেমন, তিনি বলেন, রামকৃষ্ণ

মিশনের সেবাকার্য সম্বন্ধে বহু লোকের সঠিক ধারণা নাই ; খবরের কাগজে এসব সংবাদ বেশী প্রচারিত হয় না বলিয়া অনেকের ধারণা রামকৃষ্ণ মিশন এসব কাজ আর করে না। অথচ, আলোচ্য বর্ষের রিপোর্টেই দেখিবেন এ বাবদ মিশন ২২ লক্ষাধিক টাকার কাজ করিয়াছে ; ইহা ছাড়া গুজরাট ও সুরাটে প্রায় ৪০ লক্ষাধিক টাকার কাজ চলিতেছে।

আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া তিনি ভাষণ শেষ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৮-৬৯ সালের কার্যবিবরণী

১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দ আগের বৎসরের মতোই বহুবিধ চাপের মধ্য দিয়াই কাটিয়াছে। সবচেয়ে বেশী অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া. যাহা প্রধানতঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধার উন্নতির জন্য চাপ হইতে এবং অবশ্যপ্রয়োজনীয়-দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমানতা হইতে উদ্ভূত। সরকারের কয়েকটি কার্য-ব্যবস্থার ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির উপর কর্মপরিচালনার অনিশ্চয়তার অতিরিক্ত ভারও চাপিয়াছে। এখনো সেগুলি সমস্যামুক্ত হয় নাই, যদিও অদূর ভবিষ্যতে সেগুলির সন্তোষজনক সমাধানের আশাদীপ এখনো সমুজ্জ্বল ; অবশ্য জোর করিয়া একথা বলা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ দেশব্যাপী আলোড়নসৃষ্টিকারী বৃহত্তর সামাজিক, রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িত।

বর্তমান সমাজচিন্তার একটি প্রধান প্রবণতা হইল অধিকতর দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকাগুলির উপর কার্যকর ভাবে অধিক মনোযোগ দেওয়া। আমাদের মহান প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাই বহু পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন। গভর্নিং বডি সবসময়ই এবিষয়ে পূর্ণ সজাগ ; কিন্তু বিশেষভাবে এই কার্যের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের স্বল্পতা, অন্যান্য কার্যের জন্য প্রতিশ্রুতি এবং প্রয়োজনানুরূপ সাধু-কর্মীর অভাবের জন্য স্বামীজীর এই ভাবকে কার্যে পরিণত করা বহুল পরিমাণে বিঘ্নিত হইয়াছে। তাই বলিয়া একথা ভাবিলে ভুল হইবে যে, চোখে পড়ার মতো কিছুই আমরা করি নাই। পরে যেসব পরিসংখ্যান দেওয়া হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে যথেষ্ট কিছু করা হইয়াছে ; মিশনের সভ্যগণ এবং জনসাধারণও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মিশন গ্রামাঞ্চলের কাজ অধিকতর প্রসারিত করিয়াই চলিয়াছে, এবং সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় একটানা কোন-না-কোন প্রকার ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে এই ত্রাণকার্য সুরাট, গুনটুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কাছাড় প্রভৃতি পরস্পর হইতে বহুদূর বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিতে বিস্তৃত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অনুক্ষণ প্রার্থনা করি, তিনি যেন দরিদ্রনারায়ণসেবার যোগ্যতর যন্ত্ররূপে আমাদের গড়িয়া তোলেন। সেই সঙ্গে একথাও আমাদের ভোলা চলে না যে, আমাদের মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আধ্যা-ত্মিকতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আন্তর্জাতিকতা-বোধ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েরও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছিলেন। মিশনকে এইসব ক্ষেত্রেও কাজ করিতে হইবে। স্বামীজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের মাধ্যমে সকলকে

ব্রাহ্মণত্বের স্তরে তুলিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন, একই নিম্নতম স্তরে সকলকে টানিয়া নামাইতে চান নাই ; বিভিন্ন শ্রেণীর ও জনসাধারণের জন্য কাজ করিবার সময় এই আদর্শকে আমাদের দৃষ্টিপথে সদা-ভাস্বর রাখিতে হইবে।

মিশনের সদস্য-সংখ্যা

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ রামকৃষ্ণ মিশনে ৭০৯ জন সদস্য ছিলেন ; ইঁহাদের মধ্যে ৩৪৬ জন গৃহস্থ এবং ৩৬৩ জন সন্ন্যাসী। গভীর দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে ৪ জন গৃহস্থ ও ৮ জন সন্ন্যাসী সভ্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কর্মপ্রসার

আলোচ্য বর্ষে মিশনের দুইটি নূতন শাখাকেন্দ্র হইয়াছে, একটি গৌহাটীতে এবং অপরটি রায়পুরে। আরও একটি কর্মপ্রসার উল্লেখযোগ্য, রাঁচি আশ্রমে 'দিব্যায়ন' নামে একটি যুবশিক্ষণকেন্দ্র প্রধানতঃ আদিবাসীদের জন্য খোলা হইয়াছে। প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠের দাতব্য চিকিৎসালয়টির আরও ভালভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ফলে দৈনন্দিন রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ জন রোগী এখানে চিকিৎসালাভের জন্য সমাগত হয়। প্রধান কেন্দ্র কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত দরিদ্র ছাত্রগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে ; শাখাকেন্দ্রগুলিতেও অনুরূপ সাহায্যদান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে নূতন নির্মিত ভবনাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কনখল সেবাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ সেনটিনারী মেমোরিয়াল ব্লক, সালেম কেন্দ্রে মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ, রাঁচি টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে অতিথি-ভবন, বারাণসী সেবাশ্রমে অপারেশন থিয়েটার ব্লক, মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজে বটানি ব্লক, মাদ্রাজে ত্যাগরায়নগর নর্থ ব্রাঞ্চ স্কুলে বিজ্ঞান-ভবন এবং দেওঘর বিদ্যাপীঠে গ্রন্থাগার-ভবন, সাধুদের থাকিবার জন্য গৃহ ও ভোজনালয়ের সম্প্রসারণ।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের ডিসপেন্সারী বিল্ডিংও সম্প্রসারিত হইয়াছে।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যধারা

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ছাড়া মিশনের ৭৩টি শাখাকেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া ; বাকি ৬০টি ভারতে। এই সংখ্যার মধ্যে ৬২টি মঠ-কেন্দ্র ধরা হয় নাই। মঠ-কেন্দ্রগুলির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি, পূর্ব পাকিস্তানে ৮টি, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও আরজেনটিনায় একটি করিয়া এবং বাকী ৪১টি ভারতে অবস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক কথিত ও তাঁহার জীবনে রূপায়িত বেদান্তের সত্যসমূহের ভিত্তিতে নিঃস্বার্থ সেবাই মিশনের বিশিষ্ট আদর্শ। মিশনের এই আদর্শানুগ বিভিন্নমুখী কার্যধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ : (১) সেবাকার্য (relief), (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার, (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য।

মঠকেন্দ্রগুলির বিশেষ কার্য জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাববৃদ্ধির সহায়তা করা ; তাহা হইলেও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রগুলি প্রভূত পরিমাণে কর্মরত। মঠ

ও মিশন উভয় কেন্দ্রগুলিরই রাজনীতির সহিত কোন সম্পর্ক নাই। তথাপি বিরুদ্ধ ভাবধারা ও পরিবেশের মধ্যে, এমনকি হিংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও কেন্দ্রসমূহকে কর্মরত থাকিতে হইয়াছে।

(১) **সেবাকার্য :** বিভিন্ন দুর্বিপাকে প্রপীড়িত দেশবাসীর মধ্যে সারা বৎসর ধরিয়াই মিশন কর্তৃক সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ওড়িশায় পট্টমুণ্ডাই-এ সাইক্লোন-রিলিফ ও ঢেনকানলে খরাত্রাণকার্য, পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর হুগলী ও জলপাইগুড়িতে, আসামে কামরূপ ও কাছার জেলায় এবং গুজরাটে সুরাট জেলায় বন্যার্তসেবা, মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় কয়নাতে ভূমিকম্পবিধ্বস্তদের সেবা, আসামে কাছার জেলায় দুর্ভিক্ষত্রাণকার্য, পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে বস্ত্রাভাব-দূরীকরণে সেবাকার্য—প্রধানতঃ এই নয়টি রিলিফ-কার্যে মিশন কর্তৃক ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে জিনিসপত্রের মূল্যসমেত মোট ২২,৫৯,৬১৯ ৩৫ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে মহারাষ্ট্রে ভূমিকম্পের জন্য ও গুজরাটে বন্যার জন্য সেবাকার্যে ব্যয়িত অর্থ ধরা হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মঠ-মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলি স্ব স্ব অঞ্চলে স্থানীয় জনসাধারণকে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা নিয়মিতভাবে সাহায্য করিয়াছে। এইরূপ সেবাকার্যে প্রধান কেন্দ্রও প্রভূত অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রধান কেন্দ্রের কার্য প্রধানতঃ শাখাকেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণ হইলেও, প্রধান কেন্দ্র হইতে দরিদ্র ছাত্রগণকে ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করা হয়। প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ১৪৪টি দুঃস্থ পরিবারকে এবং ১৬৪ জন ছাত্রকে (সিন্ধু ছাত্রদের লইয়া) আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১টি স্কুল, ১৪০টি পরিবার এবং ১০ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। এই সাহায্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩৩,৩০৩ ৭১ টাকা।

(২) **চিকিৎসা :** ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ কেন্দ্র কর্তৃক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পীড়িত জনসাধারণের সেবাকল্পে অনেকগুলি ইনডোর হাসপাতাল ও আউটডোর ডিস্‌পেন্সারী পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতালগুলিতে অন্তর্বিভাগে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ১,০০১ ; এইগুলিতে ২১,৬৬৩ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫৩টি আউটডোর ডিসপেনসারীতে পুরাতন রোগী সহ ২৬,৭৯,৪৬১ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। ডুঙ্গরি, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম এবং নিউ দিল্লীর ক্যারলবাগ হাসপাতাল কেবল যক্ষ্মারোগীদের জন্য। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার অন্যান্য বিভাগ ব্যতীত একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল পরিচালিত হয় ; এই ট্রেনিং স্কুলের দুইটি বিভাগ : সিনিয়র ও জুনিয়র।

মঠকেন্দ্রগুলির ইনডোর হাসপাতালসমূহে পুরাতন রোগীসহ ৭,৯৭৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে; আউটডোরে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫,৪৬,০৩২। ত্রিবান্দ্রম হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য একটি বিভাগ এবং নার্স ট্রেনিং স্কুল আছে।

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে; কোন কোন কেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

(৩) **শিক্ষা :** আলোচ্য বর্ষে মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হইয়াছে :

৪টি মহাবিদ্যালয়, ২টি বি. টি. কলেজ,

১টি স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ১টি প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ৬টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ, ১টি শারীর-শিক্ষা কলেজ, ১টি উচ্চতর গ্রামীণ-শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি-শিক্ষা কলেজ, ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল (পলিটেকনিক), ১৩টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, ৭৫টি ছাত্রাবাস, অনাথাশ্রম প্রভৃতি, ২টি চতুষ্পাঠী, ৩৪টি বহুমুখী, উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৭টি অন্যান্য বিদ্যালয়, ৬৫টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র অথবা কম্যুনিটি সেণ্টার, ১টি পরিষেবিকা-শিক্ষণ স্কুল, ১টি অন্ধ ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়, ১টি দিবা-ছাত্রাবাস এবং ১টি বিভিন্ন ভাষা-শিক্ষার স্কুল।

মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৪,৬৮৮, তন্মধ্যে ছাত্র ৪৮,৪৮৩ এবং ছাত্রী ১৬,২০৫।

মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষায়তন-সমূহে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫,৪৩২, তন্মধ্যে ছাত্র ৩,৪৪৮ এবং ছাত্রী ১,৯৮৪।

(৪) **সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার:** উল্লেখযোগ্য যে, মিশনের এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী উৎসবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যান্টার্ন প্রদর্শন, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ জনগণের মধ্যে বিস্তারলাভ করিতেছে। কয়েকটি কেন্দ্রে পুস্তকাদি প্রকাশনের মাধ্যমেও ইহা করা হইয়া থাকে। এই কার্যে কলিকাতা ইনস্টিট্যুট অব কালচারের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক যে বিপুল ও বিরাট কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে এখানে তাহার উল্লেখ করা হইল না, কারণ সেগুলির নির্বাচিত কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ এই বিভাগেই। বহু পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ ও মন্দির প্রভৃতি মঠকেন্দ্রগুলি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, তদুপরি বক্তৃতা-সফর, শাস্ত্রালোচনা, ক্লাস প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিস্তার করা হয়।

(৫) **গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য:** রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি সবই শহরাঞ্চলে স্থাপিত এবং সেগুলি কেবল উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তদের জন্যই—সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা জন্মিয়াছে। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততঃ ৯টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত, আলোচ্য বর্ষে এই কেন্দ্রগুলি এবং ইহাদের পরিচালনাধীন বহু কেন্দ্র দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া ১৪৬টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছে; তন্মধ্যে ৭টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক, ৩৯টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী, ৩৭টি প্রাথমিক এবং ৬১টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র। ১৩টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ২টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট সহ ২২টি লাইব্রেরী, ১৩৯টি দুগ্ধ বিতরণকেন্দ্র, ৬টি অডিও-ভিসুয়াল ইউনিট, ৮টি কম্যুনিটি সেণ্টার, ৮টি বৃত্তি-শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিলং কেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিসপেন্সারীর মাধ্যমে খাসি পাহাড় অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া আলোচ্য সময়ে ২১,৬৯২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। কামারপুকুর মিশনকেন্দ্র কর্তৃক ১টি চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইয়াছে। আসামে

নেকা কেন্দ্রে উৎসাহের সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এই কার্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের বিপুল সমাদর লাভ করিতেছে।

লক্ষণীয় যে, মিশনের শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার সুযোগলাভ করিতেছে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র অর্থ সাহায্য অথবা বিনা-ব্যয়ে থাকিবার ও শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্তত্রাণ সেবাকার্য (relief) করা হয় এবং এই সেবাকার্যেও সহস্র সহস্র দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য লাভ করে।

বিদেশে কার্য

ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুর, ফিজি, মরিশাস, সিংহল ফ্রান্সে যে কেন্দ্রগুলি অবস্থিত সেগুলি মিশনের কেন্দ্র ; ফ্রান্স ব্যতীত অন্যগুলিতে প্রধানতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশে আমেরিকায় বা অন্যত্র অন্যান্য সমস্ত কেন্দ্রই মঠের শাখাকেন্দ্র। মঠকেন্দ্রগুলি বিদেশে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রচারে নিরত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, আমেরিকায় চিকাগো কেন্দ্র কর্তৃক '১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের যোগদানের ৭৫তম স্মৃতিবার্ষিক উৎসব' আয়োজিত হইয়াছিল। সেণ্ট লুই এবং পোর্টল্যাণ্ডে আলোচ্য বর্ষে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মনে রাখিবেন, শাখাকেন্দ্রগুলিকে চালাইবার জন্য আমাদের মিশন বা মঠের কোন কেন্দ্রীয় তহবিল নাই। প্রত্যেক শাখাকেন্দ্রকে স্থানীয় সাহায্য সহায়ে নিজ ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করিতে হয়। বিদেশের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধেও একথা সমভাবে সত্য। আবার ইহাও সমভাবে সত্য যে, ভারতীয় কেন্দ্রগুলি বিদেশ হইতেও কোন অর্থ সাহায্য পায় না—কোথাও অতি সামান্য যাহা পায়, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে ; প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মিশন ভারতীয় অর্থের উপর নির্ভরশীল।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মীরাদেবী

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শিষ্যা, শ্রীসারদা আশ্রম, শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী-ভবনের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রাণস্বরূপা আশ্রমমাতা মাতৃগতপ্রাণা মীরাদেবী গত ২২শে অক্টোবর বুধবার রাত্রি ১২-৪৫ মিঃ-এ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমাতৃ-অঙ্কে চির আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ১৫ই ভাদ্র, সন ১২৯৮ সালে। প্রয়াণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে কয়েকজন সাধু ও অগণিত ভক্তজন হাসপাতালে, শ্রীসারদা আশ্রমে ও শেষকৃত্যের সময় কেওড়াতলা শ্মশানে সমবেত হইয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ২২ বৎসর বয়সে তিনি ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং তাহার পর হইতে সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর ঐ বিদ্যালয়ের কর্মে জীবন অতিবাহিত করেন। দেশের নারীশিক্ষার জন্যই তিনি আত্মোৎসর্গ করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব তিনি

নিজহস্তে গ্রহণ করেন এবং ঐ কাল হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতমা শিষ্যা শ্রীযুক্তা বাণীদেবীর সহায়তায় পরিপূর্ণ দক্ষতার সহিত ঐ কার্য সম্পাদন করেন। সম্ভবত: ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের রামনবমী তিথিতে মীরাদেবী শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভে ধন্যা হন। তিনি সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের অনুসরণে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি শেষ জীবনে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে নিউ আলিপুরে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তাঁহার ঈপ্সিত শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষতার সহিত আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমাতৃ-অঙ্কে চিরশান্তি লাভ করুক এই প্রার্থনা।

দ্বিতীয়বার চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের জন্য যাত্রা

গত ১৪ই নভেম্বর ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ৫২ মিনিটে আমেরিকার কেপ কেনেডি উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র হইতে অ্যাপোলো-১২ চন্দ্রযানে চার্লস্ কনরাড, রিচার্ড এফ. গর্ডন এবং অ্যালান এল. বীন যাত্রা করিয়াছেন। যানটি পূর্ব অভিযানের মতই, যাত্রার পরিকল্পনাও প্রায় একই রূপ। কেবল এবারের বৈশিষ্ট্য হইল, মহাকাশ-চারিগণ একটু বিপদের ঝুঁকি লইয়া চাঁদের কাছে পৌঁছিবার যাত্রাপথের সামান্য পরিবর্তন করিবেন, এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে যাহাতে ঠিক পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে নামিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবেন। পূর্বের অভিযানে (অ্যাপোলো-১১) মহাকাশচারীদের নির্ধারিত স্থান হইতে কিছু দূরে নামিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

এবারের অভিযানে অভিযাত্রিগণের নামিবার পরিকল্পনা চাঁদের ঝঞ্ঝাসাগরে। ঝঞ্ঝাসাগরে পূর্বে আমেরিকার যাত্রিহীন যান সার্ভেয়ার-৩ অবতরণ করিয়া বহু ছবি তুলিয়া পাঠাইয়াছে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখ সার্ভেয়ার-৩ চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি গর্তের মধ্যে অবতরণ করিয়াছিল। সেই যানটির খুব কাছাকাছি এবার নামিবার ইচ্ছা—যাহাতে সার্ভেয়ার-৩ যানটি কি অবস্থায় আছে, এতদিন চাঁদে থাকিয়া তাহার যন্ত্রগুলির অবস্থা কি, ইত্যাদি স্বচক্ষে তাঁহারা দেখিয়া আসিতে পারেন এবং ফিরিবার সময় উহার কিছু অংশ সঙ্গে করিয়া লইয়াও আসিতে পারেন।

দিব্য বাণী

সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী।
যথাত্মা চ তথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা ॥ ১০
অত এব হি যোগীন্দ্রৈঃ স্ত্রীপুংভেদো ন মন্যতে।
সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎসদপি নারদ ॥ ১১

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্—৯।১

(পরমা প্রকৃতি যিনি বিশ্বের জননী)
ব্রহ্মরূপা তিনি, নিত্যা, তিনি সনাতনী।
অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নিসনে অভেদ যেমন
আত্মা ও তাহার শক্তি সেরূপ অভিন্ন সর্বক্ষণ ॥

ব্রহ্মাপুত্র হে নারদ! শ্রেষ্ঠ যোগীদের চিত্তে তাই
'প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন'—এ চিন্তার কোন স্থান নাই।
সবই ব্রহ্মময় বলি সদা তাঁরা করেন দর্শন,
(শক্তি সৃষ্টি সর্বত্রই) সর্বদা দেখেন সেই
শাশ্বত সত্তারই প্রকাশন।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার হৃদয়কে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "ওরে হৃদে, একে (নিজ শরীর দেখাইয়া) তুই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিস বলে ওকে (শ্রীশ্রীমাকে) আর কখনো এমন কথা বলিসনি। এর ভেতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভেতর যে আছে সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবে না।" রামলালকে একবার বলিয়াছিলেন, "ও (শ্রীশ্রীমা) রাগ করলে এখানকার সব নষ্ট হয়ে যাবে।" শারদাপ্রসন্নকে (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) মন্ত্র-গ্রহণের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,

"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের এসব কথার অর্থ কি, কি ভাব হইতে তিনি এসব বলিয়াছিলেন, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে; তাঁহার ও তাঁহার সন্তানগণের কথা অবলম্বনে আমরা নিজের মতো অনুমান মাত্র করিতে পারি। মনে হয়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের এই-সব কথাকেই অন্যভাবে প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন তাঁহার 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে, যেখানে মা-কালী সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "লীলা মার, আমি মাত্র লীলার আধার।"

ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমাকে মা-কালীরূপে 'সর্বদা সত্য সত্য' দেখিতেন, নিজেই বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাও আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতেন মা-কালীরূপেই; শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগের পর তিনি একবারই কাঁদিয়া উঠিয়া-ছিলেন এবং তাহার ভাষা, 'মা-কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!' তাই বলিয়া লীলায় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি যে সম্পর্ক তাহা কখনও ব্যাহত হইত না, তাঁহাদের বাহ্যাচরণ নিখুঁতভাবে তাহারই অনুগামী হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী শিবানন্দের 'মা' ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; আবার তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই এই শ্রীরামকৃষ্ণ।" স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের প্রণামমন্ত্রে লিখিয়াছেন, "যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা"—ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির অভেদত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণেরই উপমা অবলম্বনে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রহ্ম এবং শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার শক্তি বলিয়াই বলিয়াছেন, "ঠাকুর চৈতন্য-স্বরূপ, মা চিন্তা-স্বরূপিণী।" চিন্তারূপেই ব্রহ্মে শক্তির প্রথম প্রকাশের কথা পাই উপনিষদে—"তদৈক্ষত বহু স্যাম্"।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত কথাটির অর্থ কিছুটা অনুমান করা যায়। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি অভেদ হইলেও লীলার সব কিছুই শক্তির এলাকাধীন। লীলা মায়েরই, বিকশিতশক্তিসমন্বিত চৈতন্যেরই; যে-অবস্থায় শক্তির বিকাশ নাই, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি মিশিয়া এক, সে-অবস্থায় লীলা বলিয়া কিছুই নাই।

লীলাদেহেও অভেদ

আর একটি দৃষ্টিকোণ হইতেও দেখা যায়। ব্রহ্মে তাঁহার শক্তির প্রকাশ থাকুক বা না থাকুক, কোন অবস্থাতেই, নিত্য বা লীলায়, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির পৃথক অস্তিত্ব সম্ভবই নয়। স্বরূপতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা অভেদ —সে-স্বরূপের সহিত জীবও অভেদ, তাহা জীব-জগৎ-ঈশ্বর সকলেরই স্বরূপ। কিন্তু লীলায়? লীলাতেও ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তির পৃথক অস্তিত্ব নাই—উভয়ই সদাসংযুক্ত। যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, কল্পনা করি, অনুভব করি—নিজের সম্বন্ধে বা জগৎ সম্বন্ধে বা ভগবান সম্বন্ধে, তাহা চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত শক্তিরই—মায়েরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সত্যলাভের পর মায়ের ইচ্ছায় যাঁহারা নিত্য হইতে লীলার রাজ্যে ফিরিয়া আসেন, তাঁহারা নিজের মধ্যে, জগতের মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে সর্বত্রই এই চৈতন্যকেই বা চৈতন্যের সহিত বিকশিত শক্তিকেই, ঈশ্বরকেই, মাকেই দেখিয়া থাকেন; 'সর্বভূতস্থমাত্মানম্' বা 'সর্বভূতস্থমীশ্বরম্'।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বভূতে চৈতন্যকে এবং মা-কালীকে প্রত্যক্ষ করিতেন, আবার অদ্বয় স্বরূপেও চলিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীমাও বলিয়াছেন, "জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়, কিছুই থাকে না।" আবার পরক্ষণেই বলিয়াছেন, "মা, মা, শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে! এই তো সোজা কথাটা।"

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় দেখিয়াছিলেন: দেহ মা, প্রাণ মা, মন মা; স্থল মা, জল মা, অন্তরীক্ষ মা; স্থূল মা, সূক্ষ্ম মা, কারণ মা, আবার এসবের পারেও সেই নির্গুণা মা। অহঙ্কার-মন-বুদ্ধির ভিতর দিয়া আমাদের যাহা কিছুর অনুভূতি তাহা সবই মা—চৈতন্যের সহিত, ব্রহ্মের সহিত সদাসংযুক্ত তাহার শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে স্বরূপে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা অভেদ, লীলাদেহেও তাই—উভয়েই ব্রহ্মশক্তি, ঈশ্বর, মা-কালী। অবতারলীলায় স্থূলদেহে যখন তাঁহারা ছিলেন, তখন লীলার জন্য পরস্পরের প্রতি বাহ্য ব্যবহার তাঁহারা যেরূপই করুন না কেন, এ অভেদবোধ তাঁহাদের থাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমাকে মা-কালীরূপে এবং মা-কালীর সঙ্গে নিজেকে অভেদ বলিয়া দেখিতেন। শ্রীশ্রীমা ভাব চাপিয়া আমাদের সকলেরই ধরা-ছোঁয়ার মতো অতি সাধারণ পল্লীবাসিনী মা হইয়াই প্রায় সর্বক্ষণ থাকিলেও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ তাঁহার সত্যদ্রষ্টা সন্তানগণ ছাড়াও কোন কোন ভাগ্যবান কখনো কখনো তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপেই দেখিয়াছেন; শ্রীশ্রীমা নিজেও বলিয়াছেন, "যেই ঠাকুর সেই আমি।" যোগীন-মা একদিন দেখিয়াছিলেন, মা গভীর সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর সে-অবস্থায় যেরূপ আচরণ করিতেন, ঠিক সেরূপ আচরণই করিতেছেন। জয়রামবাটীর ভানুপিসীকে মা একদিন গান গাহিয়া শুনাইতেছেন (ভানুপিসীর সহিত শ্রীশ্রীমায়ের আবাল্য হৃদ্যতা ছিল); ভানুপিসী লক্ষ্য করেন, মায়ের কণ্ঠস্বর সেদিন হুবহু শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—লীলায় ভক্তও

তথাপি মা-কালীরূপে এ অভেদবোধের পাশাপাশি আর একটি বোধও থাকিত, যাহার কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন, "এর ভেতর দুটি আছে—একটি মা-কালী, অপরটি

তাঁর ভক্ত"; এ ছাড়া বোধ হয় অবতার-লীলাই হয় না। এই শেষোক্ত ভাবাবলম্বনেই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই 'ভক্ত'-ভাবে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ মা-কালীর 'শ্রীরামকৃষ্ণে' বিন্দুমাত্র 'আমি'-বোধ নাই, সেখানকার দেহমন তো বটেই, 'আমি'ও মায়ের লীলার আধার মাত্র। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 'শ্রীম'-কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন: আমার কি ইচ্ছা আছে বল দেখি? 'শ্রীম' বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনিয়াছিলেন যে ভক্তি-ভক্ত লইয়া থাকিবার ইচ্ছা তাঁহার রহিয়াছে। সেই কথা তিনি বলিলে শ্রীরামকৃষ্ণ সংশোধন করিয়া দিলেন: না, আমার নয়, মায়ের ইচ্ছা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবারে 'শ্রীম'কে এই বিশেষ কার্যের জন্যই আনিয়াছিলেন; তাই 'শ্রীম' তাঁহার কথা ঠিকমত বুঝিলেন কিনা তাহা পরে প্রশ্ন করিয়া প্রয়োজনীয় স্থলে সংশোধন করিয়া দিতেছেন - এরূপ দৃষ্টান্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে' আরো পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীমা—'আপন মা'

শ্রীশ্রীমায়ের আচরণে ও কথায় মা-কালীর সহিত অভেদভাব কদাচিৎ প্রকাশ পাইত—তাহাও অতি সাধারণভাবে: বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই আমার সন্তান, আমিই তো সব হয়ে রয়েছি; অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত কথারই পুনরাবৃত্তিতে—"এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কারো সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।" এ প্রকাশ কদাচিৎ; প্রায় সর্ব-ক্ষণই জগজ্জননীর সহিত তাঁহার অভেদত্বের ভাব প্রকাশ পাইত অপার মাতৃস্নেহরূপে। আর এরূপ হইত বলিয়াই তাঁহাকে আমরা সকলেই অতি আপনার বলিয়া ভাবিতে পারি—সুখে-দুঃখে, পাপে-পুণ্যে, আধ্যাত্মমার্গের অতি উচ্চে এবং অতি নিম্নে দাঁড়াইয়া, সর্বাবস্থাতেই সকলেই তাঁহার কাছে 'মা' বলিয়া গিয়া দাঁড়াইতে পারি, এবং কোন অবস্থাতেই কাহাকেও 'মা বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলে' তিনি 'না' করিতে পারেন না। তাঁহার এই বিপুল-উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহের প্লাবন ক্ষেত্র-বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাকেও ঠেলিয়া প্রবাহিত হইয়াছে—এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ সে-সব ক্ষেত্রে খুশীই হইয়াছেন, কারণ তখন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে এই মাতৃত্বের উদ্বোধনই চাহিতেছিলেন যাহা তাঁহার লীলাবসানের পর জগৎকল্যাণসাধন-কার্যে তাঁহারই প্রতিনিধিত্ব করিবে। ছেলে যখন আকুল হইয়া 'মা' বলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, মায়ের কাছে তখন ছেলেরই প্রাধান্য —নিজের নিয়ম নাকচ করিয়াও তিনি তখন ছেলের আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করেন। সন্তান-স্নেহ মা-বাপ উভয়েরই সমান ঠিকই, তবে বাপের শাসনটুকুও মায়ের স্নেহে নাই—"মাকে ডাকবে তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না" (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)।

তবে তাঁকে অতি আপনার বলিয়া ভাবা চাই, আপন মা ভাবিয়া 'মা' বলিয়া তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়ানো চাই। এই একান্ত আপনার বলিয়া বোধটুকু আনা ভক্তির সর্ববিধ পথেরই সার কথা। জগজ্জননী শ্রীশ্রীমাকে অতি আপনার বলিয়া ভাবা সহজও, ইহাতে সহায়তা করে আমাদের পার্থিব মায়ের স্নেহের রূপ যাহা তাঁহারই স্নেহের আংশিক প্রকাশ; যাঁহারা তাঁহার স্থূলশরীরে থাকা-কালীন তাঁহার স্নেহের স্পর্শ সাক্ষাৎভাবে

পাইয়াছেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ঘটনায় যাঁহার ইচ্ছাই চরম কথা, যাঁহার ইচ্ছাই—কঠিন বাস্তবের রূপ নেয়, এবং যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই বাস্তব-রূপে প্রতিভাত স্বপ্ন নিমেষে ভাঙিয়া যায়, তাঁহার প্রতি এই আপনার বোধটুকু আনিতে পারিলে আর কোন ভয় নাই। তিনিই সব করিয়া দিবেন বা শুদ্ধ বুদ্ধিরূপে, শক্তিরূপে অন্তরে প্রকাশিত হইয়া সব করাইয়া লইবেন—"ভাববে আমার একজন মা আছেন, তাহলেই হবে।"

শিখধর্ম ও গুরু নানক

১

শিখ শব্দের অর্থ শিষ্য, বাবা শব্দের অর্থ পিতা, গুরু। বাবা নানকের শিষ্যগণই শিখ নামে, এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মই শিখধর্ম নামে পরিচিত।

মুসলমানধর্মের প্রভাব যখন উত্তর ভারতে প্রবল, সেই সময়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশ জুড়িয়া শিখধর্মের উৎপত্তি ও রূপলাভের ইতিহাস। একদিকে মুসলমানধর্মের একেশ্বর-বাদ, অপর দিকে হিন্দুদের নির্গুণ নিরাকার-ব্রহ্ম ও বহু সম্প্রদায় কর্তৃক আরাধিত সাকার ঈশ্বরের বহু নাম-রূপ ; এসবের দ্বারা, বিশেষ করিয়া এ সবগুলির পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অনুষ্ঠানপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত তৎকালীন বিভ্রান্ত মানসে সামঞ্জস্যবিধানের উদ্দেশ্যেই, হিন্দুমুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্যেই, শিখধর্মের উৎপত্তি। কবীর এই মিলনপ্রচেষ্টার অগ্রদূত হইলেও, কবীরের বহু গাথা শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ-সাহেব'-এ স্থান পাইলেও, নানকই শিখধর্মের যথার্থ গুরু। বিভিন্ন ধর্মমতের, বিভিন্ন অনুষ্ঠান-পদ্ধতির ঊর্ধ্বে যে শাশ্বত ধর্ম, তাহাকেই নিজজীবনে রূপায়িত করিবার পর ধর্মের সেই মূল কথাগুলিকেই সর্বজনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তিনি।

যদিও শিখধর্ম হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়-গুলির ন্যায় বেদের উপর নির্ভরশীল নয়, তাহার পৃথক ধর্মগ্রন্থ আছে, তথাপি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ভারতীয় চিত্তে মুসলমানধর্মের প্রভাবে উদ্ভূত বিভ্রান্তিকালে গুরু নানক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন বেদান্তের মূল কথাগুলিরই উপর ; স্বামী বিবেকানন্দ যাহা করিয়াছেন আরো ব্যাপক, আরো গভীর ভাবে—খৃষ্টধর্মের প্রভাবে উদ্ভূত আরো অধিক মোহবিস্তারকারী বিভ্রান্তিক্ষণে। নিবেদিতার ভাষায়, "যুগপরিবর্তনকালে উদ্ভূত বিভ্রান্তিগুলির প্রত্যুত্তররূপে" স্বামী বিবেকানন্দ "অধ্যাত্ম হিন্দুধর্মের যে পতাকা তুলে ধরে-ছিলেন, যা আদর্শস্থানীয়, যা গতিশীল এবং যা জাতি- ও প্রথাগত সর্ববিধ বাহ্যানুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে," "লিখিতই হোক আর অলিখিতই হোক, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সন্ত ও আচার্যগণের বাণীও ছিল তাই।" উত্তর-পশ্চিম ভারতে কবীর ও নানক ছাড়া প্রায় একই কালে একই কাজ করিয়াছেন পূর্বভারতে শ্রীচৈতন্য, দক্ষিণভারতে রামানন্দ ও বল্লভাচার্য।

ধর্ম যে শুধু মত ও বাহ্যানুষ্ঠানমাত্র নয়, ধর্ম যে অন্তরের জিনিস, উপলব্ধির জিনিস, সেই কথাই নানক প্রচার করিয়াছেন :

"ধর্ম তালিদেওয়া জামায় নাই, যোগীর পরিহিত বেশে নাই, অঙ্গে লিপ্ত ভস্মেও নাই ; কর্ণে পরিহিত কুণ্ডলে, মুণ্ডিত মস্তকে অথবা শৃঙ্গনিনাদের মধ্যেও ধর্ম নাই। জাগতিক অপবিত্রতার মধ্যে পবিত্র থাক, ধর্মলাভের পথ

খুঁজিয়া পাইবে। কেবল শব্দরাশি ধর্ম নয়—যিনি সব মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখেন, তিনিই ধার্মিক। সমাধিস্থানে বা শ্মশানে পর্যটন করাই ধর্ম নয়, ধ্যানের ভঙ্গিতে বসিয়া থাকাও নয়, বিদেশভ্রমণ বা তীর্থে অবগাহনও ধর্ম নয়—জাগতিক অপবিত্রতার ভিতর পবিত্র থাক, ধর্মের পথ খুঁজিয়া পাইবে।"

"দয়াকে তোমার মসজিদ কর, আন্তরিকতাকে প্রার্থনাকালে বিছাইবার বস্ত্র কর, যাহা ন্যায়- ও আইনসম্মত তাহাকে কোরান কর, শিষ্টাচারকে উপবাস কর—তাহা হইলেই তো তুমি মুসলমান! সম্যক ব্যবহারই তোমার কাবা, সত্যই তোমার আধ্যাত্মিক গুরু, সৎকর্মই তোমার প্রার্থনা। ভগবানের ইচ্ছাই তোমার জপমালা।"

নানক বলিয়াছেন, ভগবান সর্বধর্মের, সর্বশাস্ত্রের, সর্ববিধ সাধনপদ্ধতির উর্ধ্বে। তিনি এক। একমাত্র তিনিই আদিতে ছিলেন, জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেরই অন্তরে একমাত্র তিনিই আছেন, তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়াই ধর্ম :

"সৃষ্টির আদিতে ভগবান ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; স্বর্গ-মর্ত্য, দিন-রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য ছিল না ; 'প্যারাডাইস' ও পাতালপ্রদেশ, মুসলমানদের স্বর্গ-নরক, হিন্দুদের স্বর্গ-নরক ও পুনর্জন্ম বা জন্ম-মৃত্যু—কিছুই ছিল না। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেহই ছিলেন না। একমাত্র ভগবানই ছিলেন। তখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি কোন জাতি ছিল না ; যজ্ঞ ছিল না, 'পবিত্র ভোজ' ছিল না, পবিত্র তীর্থসলিলে অবগাহনও ছিল না। বেদ স্মৃতি প্রভৃতিও ছিল না, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থও ছিল না—কোন শাস্ত্রই ছিল না। তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন।"

"সেই ভগবানকে স্মরণে রাখিও, তাঁহাকে অবহেলা করার ভাব হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল।"

নানক বলিয়াছেন ভগবান সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী ; সগুণ নির্গুণ, সাকার নিরাকার সবই :

"নিজের অন্তর খুঁজিয়া দেখ, ভগবান সেইখানেই রহিয়াছেন।"

"নানকের বিনীত ঘোষণা—তিনি সমুদ্রে আছেন, স্থলে আছেন, উর্ধ্ব-অধঃ সর্বত্রই আছেন।"

"ভগবান! তোমার অনন্ত চক্ষু, আবার তুমি চক্ষুহীন ; তোমার সহস্র কর্ণেন্দ্রিয়, আবার কোন ইন্দ্রিয়ই তোমার নাই ; তোমার অনন্ত রূপ, আবার কোন রূপই নাই তোমার ; হে জ্যোতিঃস্বরূপ, বিশ্বের সব কিছুর জ্যোতিই তোমার—তোমার ভাতিতেই সব কিছু ভাতিমান হয়!"

২

পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর শহর হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তাল-ওয়ান্দি গ্রামে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে নানক জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি এখনো আছে, তবে নানকের সম্মানার্থে উহা 'নানকানা সাহিব' নামে পরিচিত। হিন্দু ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রী) পরিবারে তাঁহার জন্ম ; পিতার নাম কালু, মায়ের নাম তৃপ্তা। নানকের আট-নয় বছর বয়সের সময় উপনয়নের আয়োজন হইলে নানক উহাতে প্রতিবাদ করেন। এই বয়সেই তিনি বলিয়াছিলেন, বাহ্য উপবীত ধারণে কি প্রয়োজন? যথার্থ উপবীতের "করুণাই হইল তুলা, চিত্তপ্রসাদ সূত্র, ইন্দ্রিয়সংযম গ্রন্থি, আর সত্যই সূত্রের পাক।" কথাগুলি পরবর্তীকালে গাথারূপে

শিখধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাল্যকালে তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে তিনি যাইতেনও, তবে পাঠে তাঁহার মনোযোগ ছিল না। গ্রামের চারিদিকে অরণ্য, সেখানে মাঝে মাঝে বহু সাধুসন্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত; নানক সেখানেই ঘুরিতেন অধিকাংশ সময়, সাধুসন্তদের সঙ্গে মিশিতেন, তাঁহাদের কাছে অনেক কিছু শিখিতেনও। পাঠে তাঁহার এই অবহেলা দেখিয়া পিতা তাঁহাকে জেলার শাসনকর্তার কাছে কর্মে নিয়োগ করেন; শাসনকর্তাটি ছিলেন একজন শিক্ষিত মুসলমান। তাঁহার কাছ হইতেই নানক মুসলমানধর্মের সার তত্ত্বগুলি জানিতে পারেন।

১৪ বৎসর বয়সে সুলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পরে দুইটি পুত্রলাভও হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে কর্ম ও সংসার ছাড়িয়া তিনি পরিব্রাজক-জীবন বরণ করেন এবং সাধনান্তে ঈশ্বরের দর্শন, এবং প্রচারের জন্য আদেশ লাভ করিয়া ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার পোষাকের বৈশিষ্ট্য ছিল—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বেশই তিনি ধারণ করিতেন, বোধ হয় হিন্দু-মুসলমানের মিলনোদ্দেশ্যেই।

তাঁহার প্রচারে জাতি-ধর্ম বা স্ত্রী-পুরুষগত কোন ভেদেরই স্থান ছিল না, তিনি বলিতেন, "সকলেরই অন্তরে একই ভগবান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তাঁহারই আলোক প্রত্যেক হৃদয়ে। আমাদের বোধশক্তির, আমাদের জ্ঞানের, এমন কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা তিনিই।"

তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, ভগবান-লাভের উপায় কোন জটিল পদ্ধতি নহে, উপায় সরলতা ও আন্তরিকতা। মানুষ বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করুক; কিন্তু তাহার মন যেন সর্বক্ষণ ভগবানে থাকে—ভগবৎ-স্মরণ যেন সর্বদা থাকে। তাহা হইলেই ভগবান তাহাকে দুঃখকষ্ট ও পুনর্জন্মের কবল হইতে মুক্তি দিবেন।

ভগবানের নামজপের উপর খুব জোর দিতেন তিনি। বলিতেন, "সরল মনে আন্তরিকভাবে ভগবানের নাম জপ করিলেই ভগবানে মন স্থির হইবে।" নূতন মন্ত্র "ওয়া গুরু"। হিন্দুধর্মের যে কয়টি মূল বিষয় নানক শিখধর্মে রাখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তত্ত্ব হিসাবে সৃষ্টিতত্ত্ব ও কর্মবাদ বা পুনর্জন্মবাদ, এবং অনুষ্ঠান হিসাবে জপই প্রধান। সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত আনন্দময় অবস্থায় ওঠাই যে আমাদের লক্ষ্য, সে বিষয়েও দৃষ্টিকে সজাগ রাখিতে বলিতেন তিনি: "সকলেই সুখ চায়, কেহই দুঃখ চায় না। সুখের সঙ্গী হয়েই মহাদুঃখ আসে, কিন্তু বিকৃতবুদ্ধি আমরা তাহা বুঝি না। সুখ ও দুঃখকে যে সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারে, সেই-ই আনন্দ পায়।"

বলিতেন, শুধু আলোচনায় হয় না, সংশয় কাটাইবার জন্য, ভগবানলাভের জন্য সাধনা প্রয়োজন, "ভগবানকে শুধু কথায় পাওয়া যায় না। সৎকার্যকে তোমার জমি কর, ভগবৎ-কথারূপ বীজ সেখানে বপন কর, সত্যরূপ বারি সিঞ্চন করিয়া চল সেখানে—তাহা হইলেই বিশ্বাস অঙ্কুরিত হইবে। তখন মূর্খেরও বোধগম্য হইবে স্বর্গ ও নরকে কি তফাত।"

নানককে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি হিন্দু না মুসলমান?" তাহা হইলে উত্তরে তিনি বলিতেন, "আমি সেই এক ভগবানের উপাসক—যে ভগবানের কাছে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া কিছু নাই।"

পরিব্রাজক প্রচারকরূপেই তিনি বাকী

জীবন কাটাইয়াছেন। মাঝে মধ্যে গৃহে আসিয়া আত্মীয়গণের খোঁজখবর লইয়া যাইতেন। আত্মীয়গণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতে তিনি দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত, এবং কথিত আছে পশ্চিমে মক্কা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহের সৎকারের জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয়বিধ শিষ্যেরাই সমভাবে দাবী জানাইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

৩

তাঁহার শিষ্য ও সেবক অঙ্গদকেই তিনি আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রদান করিয়া যান। গুরু নানকের পর পঞ্চম গুরু অর্জন ও দশম গুরু গোবিন্দই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২) শিখদের পবিত্র ভাষা গুরুমুখীর বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। তৃতীয় গুরু অমর দাস (১৫৫২—৭৪) জাতি-প্রথা নির্মূল করিবার জন্য 'লঙ্গড়' বা সাধারণ পাকশালা প্রবর্তন করেন। চতুর্থ গুরু রামদাস (১৫৭৪-৮১) রামদাসপুর নগরী (পরে ইহাই অমৃতসর নামে খ্যাত) স্থাপন করিয়া সেখানকার স্বর্ণমন্দিরের কাজ আরম্ভ করেন।

পঞ্চম গুরু অর্জন (১৫৮১-১৬০৬) শিখ-ধর্মপুস্তক 'গ্রন্থসাহেব'-এর মূল 'আদি গ্রন্থ'-সংকলন এবং শিখধর্মের বিস্তারসাধন করেন; তাঁহারই সময়ে শিখগণ সম্পদ, রাজনীতি ও শক্তিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বলা যায়, তাঁহার সময় হইতেই শিখগুরু কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে নয়, লৌকিক বিষয়েরও (ফকিরি এবং আমিরি) গুরুরূপে গণ্য হন। ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫)। ৭ম গুরু হররাই (১৬৪৫-৬১), ৮ম গুরু হরকৃষণ (১৬৬১-৬৪), ৯ম গুরু তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)।

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮) শিখজাতিকে সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন; 'খালসা' তন্ত্রের তিনিই প্রবর্তক। শিখদের কৃপাণ-দীক্ষা ও 'সিংহ' পদবী গ্রহণ করানোর প্রবর্তক তিনিই। তিনিই এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত গুরুপরম্পরা তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে 'গ্রন্থসাহেব' স্থাপন করেন।

গ্রন্থসাহেব প্রধানতঃ নানকের গাথা লইয়াই হইলেও অপর নয়জন গুরু প্রত্যেকেই ইহাতে কিছু না কিছু যোগ করিয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান সাধুসন্তের কিছু বাণীও ইহাতে বিধৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও যুব-সম্প্রদায়

স্বামী আদিনাথানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত যুগ-ধর্মের মূল কথা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। আমরা সর্বপ্রথম আত্মার মুক্তি চাই এবং বিশ্বাস করি জগতের সেবাই উহার প্রকৃষ্ট উপায়।

হিন্দু-সাধনার চরম অবদান জীব-ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি। বর্তমান যুগে স্বামীজীর উদাত্ত-কণ্ঠে এই মহতী বাণী আবার উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা জীবনানন্দভূত সেই সর্বাত্মকত্বের অববোধ। তিনি শুনাইলেন :

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে
সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে,
এ সবার পায়।"

স্বামীজী এই বাণীর মূর্ত প্রতীক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে ও বিবেকানন্দের জীবনে সেই আত্মোপনিষদের এক অভিনব মানব-ভাষ্য প্রণীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নব-যুগের নবধর্মের অন্তর্গত সেই পাশ্চাত্য humanism-কে (মানবতাকে) একটি অতি গভীর তত্ত্বের আলোকে উজ্জ্বল ও পরিশুদ্ধ করা হইয়াছে। সত্য ধর্মসাধনা ও মানব-প্রীতি এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সমানার্থবোধক হইয়াছে। বিবেকানন্দ 'চরিত্র'কেই মানব-ধর্ম-সাধনার সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। ধর্মের শিক্ষা অনুশীলনের উদ্দেশ্য চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন। তিনি বলিতেন : "Education is the manifestation of perfection already in man". এবং "Religion is the manifestation of divinity already in man." (মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা-প্রকাশই শিক্ষা এবং মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব-প্রকাশই ধর্ম)। অসীম আত্মপ্রত্যয়, অদম্য কর্মশক্তি ও তাহার সহিত 'ত্যাগ' বা পরার্থে আত্মবিসর্জন—ইহাই সুপ্ত মহামানবত্বকে উদ্বোধিত করিতে পারে।

ইহা ভুল ধারণা যে, ধর্ম মানুষকে পঙ্গু করিয়া দেয় অথবা ইহা মনুষ্য-সমাজের সর্ববিধ উন্নতির পরিপন্থী হয়। ধর্ম মানুষকে যথার্থ স্বার্থশূন্য করে, পরহিতব্রতী করে আর আত্ম-প্রত্যয় জাগাইয়া অসীম শক্তির অধিকারী করে। যেমন 'test of pudding is in eating' (পিষ্টকের আস্বাদ খাইলেই বোঝা যায়), তেমনই ধর্মসাধনা করিলেই স্বীয় জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ ফল অনুভূত হইবে। যাহারা ধর্মের নিন্দা করে, বুঝিতে হইবে কোন অনুভূতি তাহাদের জীবনে আসে নাই। ধর্মের নিন্দাবাদ তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক। বাস্তব দৃষ্টিতে অনেকের কাছে আইনস্টাইনের Theory of Relativity-ও নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। উচ্চস্তরে না উঠিলে বহু জিনিসের অপরিহার্যতা বুঝা যায় না। 'কবিসত্তার' প্রয়োজন বুঝিতে হইলে কবিত্ব-প্রতিভা ও অনুশীলন থাকা চাই। তেমনই ধর্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে 'ধর্মানুভূতি' থাকা চাই। তবেই উহার অপরিহার্যতা বুঝা যাইবে।

বিবেকানন্দের অন্য একটি সাধনমন্ত্র ছিল 'individuality' বা মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও স্বশক্তির উদ্বোধন। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যক্তির ক্ষুদ্র আত্মাভিমান নহে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পশ্চিম হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহার অর্থ আজকাল দাঁড়াইয়াছে আপনাকে স্বাধীন ও বড় করা, যাবতীয় নিয়ম-সংযমের আচারের নিষ্ঠার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্তি দিয়া বড় করা। ইহা মানব-প্রকৃতির বিদ্রোহের ফল। উহা পাশ্চাত্য জগতে চলিতেছে, এদেশেও তাহারই অনুকরণে অনুশীলিত হইতেছে। কিন্তু হিন্দু-সাধনা একটি ভিন্ন রাস্তা দিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন করিয়াছে। উহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্বামীজী সর্বক্ষেত্রে বৈদান্তিক সাধনার মর্যাদা দিয়াছেন এবং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সব সমস্যার সমাধান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। পরানুকরণ তিনি ঘৃণা করিতেন। হিন্দুর জাতীয় বৈশিষ্ট্যে গৌরববোধ আমাদের জাতীয় জয়যাত্রার পথে দিঙ্‌নির্ণয় করুক, ইহাই তাঁহার কাম্য ছিল। তিনি বলিয়াছেন :

'I have never quoted anything but Upanishads and of the Upanishads it is that one idea—strength." (আমি উপনিষদ্ ব্যতীত অন্য কিছুই উল্লেখ করি নাই এবং উপনিষদেরও সেই এক কথা—শক্তি)। এই 'আত্মশক্তি' আমাদের জন্মগত অধিকার। ইহা জাগাইবার উপায় তিনিই বলিয়া দিয়াছেন।

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

এই 'আত্মশক্তি'র উদ্বোধন-মন্ত্র গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছিলেন—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ
সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"

চাই নিজের উপর বিশ্বাস, দৃঢ় সংকল্প, একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয়সংযম।

স্বামীজী বলিতেন: 'মনের একাগ্রতা হইলেই সকল শক্তি স্ফুরিত হয়।' সুতরাং মনকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। সুপ্ত অনন্ত শক্তি জাগাইবার উপায়—সত্যপালন, সংযম ও একাগ্রতা।

যেমন শারীরিক ব্যায়াম না করিলে পূর্ণ স্বাস্থ্যের প্রাণপ্রদ স্পর্শ অনুভূত হয় না, তেমনই স্বামীজীর নির্দেশিত পথে অভ্যাস না করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে না, শুধু কথায়ই থাকিয়া যাইবে। এই আত্মোপলব্ধি বা নিজের আসল রূপের মহিমার দিব্যানুভূতি যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই ব্যক্তিস্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডী পার হইয়াছেন। সেই অসীম আত্মস্ফূর্তির এমনই গুণ যে, সে-অবস্থায় আত্মা স্ববলে বিশ্বযজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়া থাকে। বিবেকানন্দ আত্মার সেই পরিপূর্ণতা-প্রাপ্তিকেই প্রকৃত individuality বা স্বরূপ-মহিমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আজ ধর্মকে মনুষ্যত্ব-বিকাশের পরিপন্থী বলিয়া যাঁহারা ঘোষণা করেন, তাঁহাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিই ইহার মূলে বর্তমান। ধর্ম আনিয়া দেয় সেই অখণ্ড মানবতার বোধ, যাহার ফলে আমরা বলিতে পারি, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

স্বামীজী যখন ঘোষণা করিলেন :

'The only God in Whom I believe is the sum-total of all souls and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races.' তাঁহার এই আধ্যাত্মিকভাবসমৃদ্ধ বাণী হইতে আমরা বর্তমানকালোপযোগী উদার সাম্যবাদের পরিচয় পাই না কি? দরিদ্রের পতিতের জন্য

এত বড় দরদী প্রাণ আর কাহার আছে? এই আলোকস্তম্ভ বর্তমান থাকিতে আমরা সাম্যবাদ অন্য কোথা হইতে শিখিতে যাইব? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করা যেমন বুদ্ধির স্বল্পতার পরিচায়ক, এই মহান্ বৈদান্তিক সাম্যনীতির সন্ধান পাইয়া পাশ্চাত্যের ধার করা জিনিস লইয়া গৌরব বোধ করাও তাই।

Eternal vigilance is the price of liberty.—এই সঙ্গে কর্মজীবনে আমাদের মনে রাখিতে হইবে স্বামীজীর সতর্ক বাণী ও অমোঘ নির্দেশ। 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহা-বীর্যের দ্বারা মহৎ কাজ হইয়া থাকে।' স্বামীজীর এই বাণী দেশপ্রেমিক, দেশসেবায় নিয়োজিত যুবসম্প্রদায় যেন সর্বদা স্মরণ রাখেন। বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত যুগধর্ম যেন তাঁহাদের জীবনে মূর্ত হয়—ইহাই প্রার্থনা। এভাবেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করিতে আমরা সক্ষম হইব।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবফলে জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে; যদিও তাহা এখনো বিরাট রূপ পরিগ্রহ করে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে করিবেই।

ভারতের যুবসম্প্রদায়! ভারতের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকারী তোমরাই, অমৃতের পুত্র তোমরা। স্বামীজীর অমোঘ বাণী বিশ্বাস কর, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইবেই। তোমাদেরই ত্যাগ, তপস্যা, বীর্যবত্তা একদিন এই বিরাট সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবে। দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া নিজের অন্তরের গভীরতার দিকে, তোমার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত—আজিও জগতের সর্বোচ্চ—চিন্তারাশির দিকে ফিরিয়া তাকাও এবং 'তোমার নিজের কল্যাণের জন্য, তোমার দেশের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য' উহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হও। 'ওঠ, জাগো, লক্ষ্যলাভের আগে থামিও না'—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

"সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে, তোমরা সব করিতে পার।"

"একটা মানুষ যদি তৈরী হয় তো লাখ বক্তৃতার কাজ হবে।"

"জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশী মূল্যবান।"

"চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মহাপ্রভুর ভাবধারা ও বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

এই ভাবের অলৌকিকত্বকে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণও যে নতমস্তকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তার পরিচয়ও তাঁদের রচনায় চিহ্নিত হ'য়ে আছে। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বৃন্দাবনের চৈতন্যভক্তগণ কেবল রাধা-ভাবে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবকে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন, এবং এইখানেই তাঁদের তত্ত্বদৃষ্টিরও উন্মেষ ঘটেছে। সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী তিনজনই তাঁদের রচনায় শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণরূপী ভগবান ব'লে অভিহিত করেছেন। তাঁদের ভক্তির অঞ্জলি চৈতন্যপাদপদ্মে অপরিসীম আনন্দানুভূতির সঙ্গেই অর্পণ করেছেন। তবে উপাস্য করেছেন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে। তাঁদের বন্দনার কয়েকটি শ্লোক আলোচনা করলেই তাঁদের সাধনা ও মানসানুভূতির স্বরূপটিকে আমরা দেখতে পাবো।

সনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে'র মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করেছেন এইভাবে—

নমঃ শ্রীগুরুকৃষ্ণায় নিরুপাধিকৃপাকৃতে।
যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোঽভূৎ তন্বন্
প্রেমরসং কলৌ॥

—কলিতে প্রেমরস দান করার জন্য দেহরূপে যিনি শ্রীচৈতন্য হ'য়ে দেখা দিয়েছেন, সেই অহেতুক করুণাময় শ্রীকৃষ্ণরূপ গুরুকে নমস্কার।

ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয় শ্লোকে সনাতন আবার বলেছেন,—

স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥

যিনি নিজভাব থেকে স্বীয় ভক্তগণের নিজের প্রতি ভাব আলোচনা ক'রে সেই ভাবের প্রতি লোভহেতু অপরূপ ভক্তরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই স্বর্ণকান্তি সন্ন্যাসিবেশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শ্রীহরি শচীনন্দনের জয়।

রূপ গোস্বামী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে চৈতন্যদেবের মহিমা প্রচার করেছেন। তাঁর 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'র প্রথমেই যথার্থ ভক্তিময় নিষ্ঠার সঙ্গে রচিত চৈতন্য-বন্দনার যে শ্লোকটি দেখা যায়, তাতে চৈতন্যদেব স্বয়ং হরিরূপেই তাঁর কাছে দেখা দিয়েছেন :

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥

—আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হ'য়েও যাঁর প্রেরণা হৃদয়ে গ্রহণ ক'রে এই গ্রন্থের রচনাকর্মে প্রবর্তিত হয়েছি সেই চৈতন্যদেব শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনা করি।

'বিদগ্ধমাধবে'র নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে রূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবের প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে যেমন অপরূপ কবিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তেমনি তাঁকে হরিরূপেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন :

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

—বহুকাল যাবৎ যা দেওয়া হয়নি, সেই উন্নত উজ্জ্বল রসে-ভরা নিজের সেই ভক্তিসম্পদ দান

করবার জন্য যিনি অশেষ কৃপায় কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, সুবর্ণ অপেক্ষাও অপূর্ব দ্যুতি-সম্পন্ন সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়-কন্দরে পরিস্ফুট হোন।

আর জীব গোস্বামীর বন্দনায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চিন্তামণি ও পূর্ণ-শুদ্ধ রসবিগ্রহস্বরূপ :

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

তিনি আরও বলেছেন, কলির মালিন্যযুক্ত সর্ব-ভাবহীন জীবকে উদ্ধার করবার জন্যই করুণা-ধাম রসপুরুষ শ্রীহরি গৌরাঙ্গদেব পরিজন দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে নবদ্বীপধামে আবির্ভূত হয়েছেন।*

তিনি 'সর্বসংবাদিনী'তেও চৈতন্যনামধারী শ্রীভগবানকে কলিযুগে বৈষ্ণবগণের একমাত্র উপাস্য ব'লে নির্ণয় করেছেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বন্দনায়ও সেই একই ভাব ও সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায় :

হরিঃ দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্যং রাধাপ্রিয়তরসখীবাপ্তুমাভতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুবপরগৌরৈক-
তনুভাব
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং
যাস্যতি পুনঃ॥

—যিনি গোষ্ঠে দর্পণে নিজের অনুপম দেহমাধুর্য দেখে রাধাভাবে তা আস্বাদন করবার জন্য শ্রীরাধার শুভ্রকান্তি গ্রহণ ক'রে গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি কি আমার নয়নপথের পথিক হবেন?

শ্রীচৈতন্য তাঁর জীবনের আচরণ দিয়ে যে-অধ্যাত্মচিন্তার দ্বার সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, তাতে প্রেমের দিকটিই একান্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছিল; তাই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ ভাগবত এবং রাধাকৃষ্ণকে উপজীব্য ক'রেই শাস্ত্রগ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ভাষাও নিলেন তাঁরা সংস্কৃত; নবদ্বীপ ও তার আশেপাশের চৈতন্যপরিকরদের মতো বাংলা ভাষাকে তাঁদের মধ্যে কেউ গ্রহণ করলেন না। তা ছাড়া, ধর্মীয় সাধনার বেদীভূমিতে শ্রীচৈতন্যের অন্ততঃ তিন চার শ' বৎসর পূর্ব থেকেই রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই-জন্যও রাধাকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে তাঁরা কেবলমাত্র চৈতন্যদেবকে উপাসনার উপেয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারলেন না। গোস্বামিগণ শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচললীলাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট লীলার কথাই তাঁরা স্তবরচনার সময় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ভিত্তিটি যখন তাঁরা গ'ড়ে তোলেন, তখন বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা এবং কৃষ্ণলাভের উপায়কেই প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। সনাতনের 'বৃহৎ ভাগবতামৃতে', রূপগোস্বামীর অলংকারের পটভূমিকায় কৃষ্ণলীলার রসচর্যামূলক গ্রন্থ-গুলিতে, এবং জীবগোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ' ও বিভিন্ন টীকায় এই দিকটারই একান্ত সমর্থন পাওয়া যায়। গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত 'হরিভক্তিবিলাসে'ও কৃষ্ণপ্রাপ্তিরই উপায় নির্ধারিত হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে সনাতন নিজেই ঐ গ্রন্থটি সংকলন ক'রে আত্মপ্রচারবিমুখ গোপাল ভট্টের নামে প্রচার করেছিলেন* গৌড়ীয় বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-

---

* বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং রসময়পুরুষং ধাম কারুণ্যরাশে-
র্জাবং পুরুন্ রসবিতুমিহ শ্রীহরিং রাধিকাদ্যৈঃ।
উদ্ধর্তুং ভাবসন্ধ্যান্ কলিমলমলিনান্
সর্বভাবেন হীনান্
জাতো যো বৈ স্বধাপঃ পরিজননিকরৈঃ
শ্রীনবদ্বীপমধ্যে।

* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—(পূর্বার্ধ) ৪র্থ সংস্করণ : ডঃ সুকুমার সেন। পৃঃ ৩০৮

চিন্তাকে একটি ব্যাপকতর দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার সব চেয়ে বেশী কৃতিত্ব জীবগোস্বামীর। কৃষ্ণলাভের উপায়স্বরূপ মানব-মনের ভক্তি ও প্রীতিকে কিভাবে পঞ্চম পুরুষার্থের স্তরে উন্নীত করা যায়, তারই দিক নির্দেশ করেছেন তিনি তাঁর ছয়টি সন্দর্ভে। রঘুনাথ ভট্ট কোনো গ্রন্থ লিখেছিলেন কি না জানা যায় না; তবে তিনি ভাগবতপাঠের একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। সনাতনের ভাগবতের টীকা 'বৈষ্ণবতোষণী'র আনুগত্যে এই রঘুনাথ তাঁর সুমধুর কণ্ঠে ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর 'দানকেলি চিন্তামণি' গ্রন্থটি প্রেম-সাধনার বিরত রূপ হিসেবেই রচনা করেছিলেন মনে হয়। অপর দিকে, আমরা পূর্বেই বলেছি, নবদ্বীপের পরিকরগণ একমাত্র গৌরাঙ্গপারম্যবাদ গ্রহণ ক'রে কেউ কেউ নাগরীভাবের সাধনায় আত্মমগ্ন হয়েছিলেন। এ কথা ঠিক যে, তাঁরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতো সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে কেউ গ্রহণ করতে চাননি। মনে হয়, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস তাঁদের প্রত্যেকের পক্ষেই একটি অসহনীয় দুঃখের ব্যাপার হয়েছিল। এইখানেই বৃন্দাবনের গোস্বামী ও নবদ্বীপ-পরিকরগণের মধ্যে আদি পার্থক্য ব'লে মনে করি। তা'ছাড়া গৌড়-ভক্তগণ এক এক জনকে পূর্বজন্মের দৈবত সূত্রে বেঁধে দিয়ে শ্রীচৈতন্যলীলার প্রাধান্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এই দুই মতবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য-বিধান করতে চেয়েছিলেন, এবং বেশ কিছুটা সফলকামও হয়েছিলেন। তবে এ আমাদের মানতে হ'বে যে, নবদ্বীপের ভক্তগণ কৃষ্ণজ্ঞানেই চৈতন্যদেবকে পূজা করতেন। এদিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যেন চিরকালের একটি নির্ঝরস্বরূপ (eternal spring)। বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ,—ভারতের এই দু'টি অংশের ভক্তহৃদয়গুলিকেই শ্রীকৃষ্ণের স্বমহিমার মাধুর্য-ধারায় যেন সিঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু এ-কথাও আমাদের ভাবতে হ'বে যে, নবদ্বীপে সহজিয়া সাধনার ধারা চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই প্রবর্তিত হ'য়েছিল এবং এই সূত্র ধরেই মনে হয় স্বকীয়া ও পরকীয়া-সাধনার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। জীব গোস্বামী পরে স্বকীয়া-তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতেও দ্বিধা করেননি। বৈষ্ণব পদাবলী তো পরকীয়া-তত্ত্বেরই ছন্দ-মধুর রসরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বকীয়া ও পরকীয়ার দ্বন্দ্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছিল দেখতে পাই। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাঙালী কবি বৈষ্ণব-ভক্ত সুপণ্ডিত রাধামোহন ঠাকুর পরকীয়া-তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে সফলকামও হয়েছিলেন।

সব চেয়ে বড় দ্রষ্টব্য এই যে, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ দার্শনিক ভিত্তিতে একটি ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে বলেই আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন; কারণ তাঁরা জানতেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং ভাষা সংস্কৃত না হ'লে তাঁদের ধর্মমত সর্বভারতীয় গুরুত্ব লাভ করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, —'চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহারা কৃষ্ণলীলা-স্মরণেও কৃষ্ণ-উপাসনার ব্যবস্থা দিলেন, এবং চৈতন্যলীলা-বর্ণনায় ও চৈতন্যপূজার দিক দিয়া গেলেন

না। এই কারণে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্র ও অনুশাসন—

আসিন্ধু নদীতীর আর হিমালয়
বৃন্দাবন মথুরাদি যত দেশ হয়

সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।'*

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই ভারতব্যাপী বিস্তৃতি সত্ত্বেও গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবগণ কোনরূপ দার্শনিক চিন্তার দিক দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি, কেবল অন্তরের নির্মল ভক্তিরসধারায় অভিষিক্ত করতে চেয়েছেন তাঁকে।

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর 'চৈতন্য-চরিতামৃতের ভূমিকা'র অন্তর্গত 'ভজনাদর্শ—গৌড়ে ও বৃন্দাবনে' নামক প্রবন্ধে উভয় স্থানের ভক্তগণই যে চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের ভজনাদর্শে আস্থাবান ছিলেন, তাই সপ্রমাণ করতে চেয়েছেন। এতে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তত্ত্বাদর্শ-প্রতিষ্ঠায় বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ যে-পথে পদচারণা করেছেন, তাতে এ-কথা আমাদের বলতেই হ'বে যে, কৃষ্ণকেন্দ্রিক উপাসনাকেই তাঁরা জীবনে ও মননে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। জীবগোস্বামী 'হরিনামামৃতব্যাকরণ' রচনা করেছিলেন. কিন্তু চৈতন্যনামামৃতব্যাকরণ রচনা করেননি। তবে প্রসঙ্গতঃ এইটুকু বলা যায় যে, উভয় দলের অন্তরের গভীরে চৈতন্যদেব সমান শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিরাজ করতেন; এবং এইজন্য একদলের সঙ্গে অন্যদলের কোনোরূপ মতবিরোধের সূত্রপাত হয়নি।

কিন্তু এ আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের এই রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক উপাসনার ধারাটিই খুব একটা সুদূরপ্রসারী রূপ লাভ করেছিল।

---

* বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ) ৪র্থ সংস্করণ: ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ-৩১৬

গুরু নানকের জন্মদিনে

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

হে ঋষি, হে মহাপ্রাণ
জনমের শুভ ক্ষণে
স্মৃতি সম তব জ্ঞান ও কর্ম
উড়াক জয়নিশান।
সত্য পথের পরিচয় দিলে
সাম্যের জয়গানে
হাত মিলাইতে শিখায়েছ তুমি
হিন্দু-মুসলমানে
আমাদের মাঝে তোমার আশিস
আজো গাহে জয়গান
হে ঋষি, হে মহাপ্রাণ।

যা দিয়েছো তুমি
তুলনা নাহি যে তার;
কি দিব তোমার
পায়ে পূজা উপচার—
শুধু মিনতি জানাই তোমার চরণে
মিলনের সুর বাজে যেন মনে
সবাকার প্রাণ পরশে যে সুর—
যুগে যুগে অম্লান,
হে ঋষি, হে মহাপ্রাণ!

রাজগৃহ

স্বামী শুভ্রানন্দ

রাজগৃহের অধুনাতন নাম রাজগীর। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাম গিরিব্রজ, বসুমতী, বাগমতী, বার্হদ্রথপুর ও বিম্বিসার-পুরী—বৌদ্ধসাহিত্যে রাজগৃহ এবং জৈন-সাহিত্যে কুশাগ্রপুর ও বৃষরপুর। রাজগৃহ নামের উপর তিনটি মত প্রচলিত। রাজার গৃহ—তাই নাম হয়েছে রাজগৃহ। অন্যমতে পর পর বহুবংশীয় রাজগণ এখানে বহুকাল বাস করে রাজ্য শাসন করেন, এজন্য ইহাকে বলে রাজগৃহ। পুরাণে আছে, মগধরাজ জরাসন্ধ এখানে ১০৮ জন বিজিত রাজাকে একটি ঘরে বন্দী করে রাখেন, এজন্যই নাম হয়েছে রাজগৃহ। গিরিব্রজ অর্থাৎ পাহাড়ে তৈরী দুর্গ। ইহা এমন একটি সুবিস্তৃত সমতলভূমি, যার চারদিক ৬টি উচ্চ পাহাড়ে পরিবেষ্টিত। বসুমতী, বাগমতী, বার্হদ্রথপুর ও বিম্বিসারপুরী বিভিন্ন রাজার নামানুকরণে বিখ্যাত। হিউয়েঙচঙ্ বলেছেন—এইস্থানে সুগন্ধিজাতীয় একপ্রকার কুশ (খশ খশ) প্রচুর উৎপন্ন হ'ত, তাই নাম হয়েছে কুশাগ্রপুর।

আজকাল যোগাযোগ-ব্যবস্থার কল্যাণে রাজগীর যাতায়াত অতি সহজ। কলকাতা-পাটনা রেললাইনের, বখ্‌তিয়ারপুর জংশন থেকে শাখা লাইনে মাত্র ৩৩ মাইল দক্ষিণে রাজগীর স্টেশন অবস্থিত। তাছাড়া বিহারের যে-কোন বড় শহর থেকে বাসে কিংবা ট্যাক্সিতেও যাওয়া যায়। টুরিস্ট বাসও আছে—পাটনা থেকে খাওয়া-দাওয়া সহ প্রতি টিকিট ১৮'০০ এবং খাওয়া ছাড়া মাত্র ১৩'০০। পৌঁছে থাকারও অসুবিধা নেই—ডর্মিটরী, ডাকবাংলো, টুরিস্ট লজ, ধর্মশালা, যুবক-ছাত্রাবাস, বিভিন্ন আশ্রম, পাণ্ডাদের বাড়ী ও হোটেল সবই আছে।

রাজগীর নালান্দা তথা মগধের ইতিকথা বলেছেন পুরাতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শাল, হিউয়েঙ্‌চঙ্, ফাহিয়েন, ডঃ রমেশ মজুমদার, বেণীমাধব বড়ুয়া, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারানাথ প্রভৃতি। আজ বলা যায়, প্রাচীন আর্য সভ্যতার চেয়ে আর্যেতর সভ্যতা বেশী হীন ছিল না। রাজা রাবণ, মগধের জরাসন্ধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভগদত্ত এবং গয়াসুর প্রভৃতি কেহই আর্যবংশসম্ভূত নন। এঁদের সভ্যতা সংস্কৃতির জ্ঞান ছিল উচ্চস্তরের। রাজধানী লঙ্কার সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। মগধরাজ জরাসন্ধ অত্যন্ত সাহসী ও পরাক্রমশালী ছিলেন। ৮৬টি দেশ তাঁর অধীনে ছিল। সে সময় সকল রাজা তাঁকে সম্ভ্রম ও ভয় করে চলতেন। জরাসন্ধ সমস্ত রাজ্য প্রভু শিবের নামে উৎসর্গ করে নিজে তাঁর সেবায়ত হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

ধার্মিক রাজা বিম্বিসার সকল ধর্ম-সম্প্রদায়-কেই যোগ্য সম্মান প্রদান করতেন; তাঁর রাজত্বে বিশাল রাজগৃহে রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিধিব্যবস্থাও ছিল গৌরবের উচ্চ শিখরে—সুখসমৃদ্ধিতে প্রজাপুঞ্জ ছিল পরিপূর্ণ। অজাতশত্রুর রাজত্বে রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ১৮ কোটি। তিনি বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্মে স্বীকৃতি দান করেন। বর্তমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ যেভাবে

প্রচারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসর পূর্বেই রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু তার প্রচলন করেন। সেই মেলাকে 'সমাজ' বলা হ'ত। তাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলা, নৃত্য-গীত কিছুরই অভাব ছিল না। নিকটস্থ পুরান কীর্তির দ্রষ্টব্যস্থল গিরিয়াক গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে সেই অনুযায়ী বড় মেলা হয়। বৌদ্ধধর্ম মহাসম্মেলনীর প্রথানুযায়ী আজও বিখ্যাত বেণুবনে প্রতি ৩ বৎসর অন্তর মলমাসে বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ইহা একমাসব্যাপী স্থায়ী হয়। লক্ষ লক্ষ লোক সেই মেলায় যোগদান করে থাকেন। শোনপুরের হরিহরছত্রের মেলার পর এই মেলাই বিখ্যাত।

আর্যেতর ধর্মনীতি, রাজনীতি, বিদ্যাচর্চা, বাণিজ্য ও শিল্পকলার নিদর্শন মহেঞ্জদরো, হরপ্পা, তক্ষশীলা ও রাজগৃহ। প্রাচীনতম প্রত্নতত্ত্বের প্রথম তিনটি বর্তমানে বিদেশ—যাতায়াত কঠিন। একমাত্র রাজগৃহ ভারতে। এই রাজগৃহ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর দান অফুরন্ত, প্রাগৈতিহাসিক—প্রাগার্য* যুগেও ইহা সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু ষোলকলায় পূর্ণ হয় রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বে। গুপ্তযুগ ও পালযুগ পর্যন্ত তা অক্ষয় থাকে। রাজগীর যে শুধু প্রাগার্য যুগের ও বৌদ্ধজগতের গৌরব-পতাকা বক্ষে ধারণ করে দণ্ডায়মান তা নয় — জৈনধর্ম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের উজ্জল মহিমাও তার ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। জৈন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়—চব্বিশজন তীর্থঙ্করের প্রত্যেকেই এই রাজগৃহের বিভিন্ন পাহাড়ে বিভিন্ন সময়ে তপস্যাদি করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। ২০তম তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতের জন্মস্থানও এখানে। মহাবীরও এখানকার বিপুলগিরিতে ধর্মপ্রচার করেন এবং তাঁর ৩২ বৎসব সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যে এই পবিত্র রাজগৃহেই উদ্‌যাপন করেন দীর্ঘ ১৪টি চাতুর্মাস্য ব্রত। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ১১ জনের মরদেহ এখানে পরিত্যক্ত হয়। আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য পাশাপাশিই থাকে। একটি না থাকলে অন্যটির মর্যাদা বুঝা দায়। জটিলা-কুটিলা, জগাই-মাধাই না থাকলে লীলা-পোষ্টাই হয় না। রাজগৃহের গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত রূপের পাশেই একটি কলঙ্কিত চিত্রও বিদ্যমান। বৌদ্ধধর্মের বিভেদ ঘটে এই রাজ-গৃহেই। বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট শিষ্য এবং পূর্বাশ্রমের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত মতবিরোধ হওয়ায় অন্য সংঘ গঠন করেন। আর দেবদত্ত শুধু এখানেই ক্ষান্ত হননি, বুদ্ধদেবকে নিহত করা'বার চেষ্টাও করেন। সেই কুখ্যাত স্থানটির নাম মদকুক্ষি।

অনেক সাধনা-সংস্কৃতি ও বৈভবের কাহিনী রাজগীরে সময়ের অপেক্ষায় আবদ্ধ ছিল। আজ তারা মুক্ত। ৮।১০ মাইল দূর থেকেই দেখছি আকাশে হেলান-দেয়া কালো পাহাড়-শ্রেণীর শিখরে বসে সাদা মন্দিরগুলি হাতছানি দিচ্ছে—পথিক এসো, কত যুগ-যুগান্তর ধরে কত পুরাণ, কত ইতিহাস বক্ষে ধারণ করে বসে আছি; এসো, দেখো—তৃপ্ত হও। এখন স্টেশনে নেমেই মনে হল, আহা! কত মহা-পুরুষ—সাধুসন্ত এখানে চিরশান্তি লাভ করেছেন!

* আর্যগণ বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন অথবা ভারত হইতেই বাহিরে গিয়াছিলেন, তাহার সঠিক কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান-সহায়ে এ বিষয়ে এখনো দ্বিমত। —সঃ

রাজগীর একদিনে দেখে শেষ করা যায় না। অন্ততঃ পক্ষে সাতটি দিনের প্রয়োজন। রেলস্টেশন এবং বাসস্টেশনের পূর্বদিকে রাজগীর বাজার ও গ্রাম। রাস্তার ডানদিকে দিগম্বর জৈন ও বাঁদিকে শ্বেতাম্বর জৈন মন্দির। এদিক সেদিক বাড়ীঘর, আশ্রমাদি, থানা ও হাসপাতাল। বাজার থেকে পুরান রাজপথ এবং স্টেশন থেকে আর একটি পথ সোজা দক্ষিণে দেড় মাইল গিয়ে একত্র হয়ে পাহাড়ে পাদদেশে পৌঁছেছে। এই দেড় মাইলের মধ্যে এক মাইল পর্যন্ত ছিল নূতন রাজগৃহ; বাকী আধ মাইল বেণুবন। বৌদ্ধশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ টীকাকার বুদ্ধ-ঘোষ বলেছেন, রাজগৃহ রাজা মান্ধাতা কর্তৃক স্থাপিত। হিউয়েঙ্‌চাঙ্‌ বলেছেন—নূতন রাজগৃহ তৈরি করেছিলেন রাজা বিম্বিসার; কিন্তু ফাহিয়েন বলেছেন, রাজা অজাতশত্রু। হিউয়েঙ আরো বলেছেন - কুশাগ্রপুরে প্রায়ই আগুন লাগত। অনেক বাড়ীঘর পুড়ে গিয়ে নগর অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। বিম্বিসার আইন জারি করলেন যে, যার বাড়ীতে আগুন লাগবে, তাকে নগরের বাইরে গিয়ে বাস করতে হবে —ভেতরে স্থান হবে না। দৈবক্রমে একবার রাজপ্রাসাদেই অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল। তাই রাজা আইন-শৃঙ্খলা ও ন্যায়-নীতি রক্ষার্থে স্বয়ং নগরের বাইরে চলে গেলেন ও নূতন রাজগৃহের পত্তন করলেন। হিউয়েঙচাঙ-এর সময়ও নূতন রাজগৃহে বড় বড় অট্টালিকা ছিল। এখন শুধু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ—আছে মাত্র চারদিকে প্রাচীরের পরিচয়। এক পাশে গুপ্তি মহা-রাণীর ছোট্ট একটি মন্দির আছে—আর আছে একটি শিবলিঙ্গ; পূজা হয়। প্রাচীর দেখলে সত্যি মনে হয় এ কাজ দৈত্য-দানব ছাড়া মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর স্তরে স্তরে সাজিয়ে চুন-সুরকি ছাড়াই ইহা নির্মিত। দেয়ালটির দৈর্ঘ্য ৩ মাইল এবং প্রশস্ত ১০।১২ ফুট। প্রায় দেড়শ' ফুট দূরে দূরে এক একটি স্তম্ভ। দেয়ালের এক একটি পাথর ৫ ফুট-৭ ফুট।

প্রাচীরের ও রাস্তার পূর্বদিকে আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত বার্মীজ বৌদ্ধ মন্দির। তার দক্ষিণে রাস্তার পাশেই ভগবান বুদ্ধের স্তূপ। এই পূতাস্থির স্তূপ রাজা অজাতশত্রু কর্তৃক নির্মিত। কুশলে চিতাভস্ম চুরি হয়ে গেলে রাজা এখানে এই ভাবে সুদৃঢ় স্তূপ নির্মাণ করেন। পূর্বদিকে জাপানীদের মন্দির। ইহা বর্তমান কালে তৈরী। দ্বিতল বাড়ী, সম্মুখে ফুলের বাগিচা। উজ্জ্বল ধাতু-মূর্তিটি অতি অপূর্ব। এই মন্দিরের পিছনে পর্বতগাত্রে দেখা যায় মখদুম কুণ্ড, মখদুম গুহা, মসজিদ, কয়েকটি সরাইখানা ও বাড়ীঘর। গৌতম বুদ্ধ এই গুহায় প্রথমবার এসে বাস করেন। দেবদত্তও এখানে তপস্যাদি করেন এবং দেহ-রক্ষা করেন। অনেক কাল পরে বিহার-শরিফের একজন ফকির মখদুম শাহ এখানে এসে তপস্যাদি করেন। তারপর থেকেই স্থানটি মুসলমান অধিকারে আসে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কুণ্ডের নাম ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড। স্থানটি অতি মনোরম। পাহাড়ের নীচে সবুজ বনরাজিতে চারিদিক আবরিত। কুণ্ডের জল গরম—তিনটি ধারায় বহির্গত। মুসলমান যাত্রিগণ এখানে স্নান-দান করেন। বখতীয়ার খিলজী ও পুত্র মহম্মদ যখন রাজগৃহ তথা মগধ অধিকার করেন ও ধ্বংস করেন, তখনই রাজ-গৃহের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্পকলার অবনতি ঘটে। বুদ্ধস্তূপ, বেণুবন, জাপানী মন্দির, জরাসন্ধকী বৈঠক প্রভৃতির এধার ওধার যেসব কবরখানা দেখা যায় সেগুলিতে এবং মসজিদে সে ধ্বংসের স্বাক্ষর আজও রয়েছে।

রাজপথের উপর প্রকাণ্ড বটগাছ—নাম ধুনিবট। গাছ সুন্দর। সমানভাবে চারদিকে বিস্তারিত। গোড়াটি প্রশস্ত করে বাঁধানো। নিদাঘের খরতাপে হাজার হাজার লোক এর শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কোন পর্ব-উপলক্ষে বা মেলায় বহু লোক খাওয়া থাকা এবং রাত্রি যাপন করেন। প্রবাদ আছে, কোন সাধুর ধুনির কাঠগুলি থেকেই নাকি বটগাছটি উদ্ভূত হয়ে তীর্থযাত্রীদিগকে ছায়া দান করতে থাকে। সেজন্য নাম 'ধুনিবট'।

পশ্চিমে দেখতে পাবেন চমৎকার বাঁধানো একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে উপবন তৈরী হয়েছে—সরকারী বাগান। চারপাশের অঞ্চল নিয়ে ছিল রাজা বিম্বিসারের সখের বেণুবন। পুকুরের পশ্চিম তীরে কালো পাথরের সুন্দর ও বড় বুদ্ধমূর্তি এবং উত্তর ধারে একটি আরো বড় শুভ্র মর্মরমূর্তি—শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত চন্দ্রাতপের নীচে। পুকুরটির চারধারে সুন্দর লাল মাটির রাস্তা ও ফুলের বাগিচা—মাঝে মাঝে দর্শনার্থীদের বিশ্রামস্থল। সে সময় রাজা বাগানের সীমানা বাঁশঝাড় দিয়ে সাজিয়েছিলেন—এজন্য একে বেণুবন বলে। পুষ্করিণীর নাম ছিল 'কলন্দ-নিবাত'। বিম্বিসার গুরু বুদ্ধদেবকে এ বাগান সমর্পণ করেন। বেণুবন বুদ্ধদেবের অতি প্রিয় ছিল। এখানে অনেক বিহার ও স্তূপ ছিল। বুদ্ধদেব এই সঙ্ঘারামে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার অনেকগুলি ত্রিপিটকে স্থান লাভ করেছে। সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের দেহরক্ষার পর তাঁদের ভস্মাবশেষের উপর স্তূপনির্মাণ হয় এখানেই। ভিক্ষু আনন্দের স্তূপও কাছেই ছিল। বেণুবনের পশ্চিমে ছিল শীতবন। আজকাল ফাঁকা মাঠ ও বাড়ীঘর। শীত-বনের পশ্চিমধারে একটি শ্মশান। একটি বৌদ্ধ স্তূপ আছে—খৃঃ পূঃ ২৭২ অব্দে তৈরী। ইহা সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত।

এবার আমরা সেই রাজপথে ফিরে আসি—পাহাড়ের পাদদেশে, যেখানে পুরান রাজ-গৃহের উত্তর দিকের প্রবেশপথ। ভেতরে বিশাল সমতলভূমি—জঙ্গলাকীর্ণ; কোথাও বা সরকারী বনানী। চারদিকে গিরিপ্রাকার। অর্থাৎ সত্যিই প্রকৃতিদেবী অতি পরিপাটিরূপে এই নগরীরক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এইরূপ আরো তিনটি প্রবেশপথ আছে, তার বিবরণ আমরা পরে পাব। পর পর পাহাড়। নীচ থেকে আঁকা-বাঁকা পথ সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে সানুদেশে—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের শ্বেত মন্দিরের পাদমূল পর্যন্ত। দূর থেকে দেখতে বেশ সুন্দর। প্রবেশপথের ডাইনে ও বামে পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে দেউলের পর দেউল দণ্ডায়মান।

অনেকের ধারণা, রাজগীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও পুরাতত্ত্বের জন্য বিখ্যাত; এ কারণেই লক্ষ লক্ষ লোকের সেখানে যাতায়াত। কিন্তু আসলে তা অর্ধ-সত্য। বৌদ্ধ- ও জৈনধর্মাবলম্বীদের তো কথাই নেই, সমগ্র বিহারের জনসাধারণও সেখানে যায় কেবল তীর্থদর্শনমানসে—ঋষিনামাঙ্কিত কয়েকটি কুণ্ড আর বিভিন্ন দেবমন্দিরের আকর্ষণে। অবশ্য নালন্দায় যারা যায়, তারা মাত্র পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের আকর্ষণেই যায়। রাস্তার এপাশ-ওপাশে দোকানপাট, পর্যটককেন্দ্র, হোটেল ও ছোট ছোট ঘর-বাড়ী। ডানদিকে (পশ্চিমে) বৈভারগিরি। গিরির পদপ্রান্তে সরস্বতী নদী প্রবাহিত। এখানে নদীর দু'কূল বাঁধানো। সুন্দর দু'টি সেতু নদীর উপর শোভাবর্ধন

করছে। ওপারে ৮।১০টি কুণ্ডে অনেকগুলি জলধারা। নাম শতধারা বা সাতধারা। তার মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড সমধিক বিখ্যাত। এটি উষ্ণ-প্রস্রবণ। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসু দু'বার রাজগীর গিয়েছেন। কুণ্ডের জল পরীক্ষা করে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং বিস্তৃত বিবরণও দিয়েছেন। সংক্ষেপে জলের গুণ এই যে—তাতে রেডিয়াম আছে। আরো আছে লোহা, তামা, গন্ধক। অনেক দুরারোগ্য রোগ এ জলে আরোগ্য হয়, বিশেষতঃ বাত বেদনা ও হজমের অসুখে অব্যর্থ। হাল আমলে এ জলের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ১৯৫৪ সালে সরকার ও দানশীল ব্যক্তিগণ সেগুলো বাঁধিয়ে, চৌবাচ্চা তৈরি করে অতি সুন্দরভাবে ব্যবস্থাদি করেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে ঐ ব্রহ্মকুণ্ডের উৎসমুখই খোলা আছে; অন্য দু'টি ঠাণ্ডা জলের ধারাও আছে —অতি ক্ষীণ। বাদবাকী সব একেবারেই বন্ধ। বহুশত লোক প্রতিদিন ব্রহ্মকুণ্ডের জলে স্নান ক'রে তৃপ্তি লাভ করেন। পূজা-অর্চনাও করে থাকেন। কুণ্ডের অগ্নিকোণে হংসতীর্থে ভগবান বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও গণেশ আছেন এবং দক্ষিণে বিষ্ণুর আর একটি মূর্তি। আর এক স্তর উপরে যজ্ঞকুণ্ড, শিব ও লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির। শ্বেত পাথরের লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি অতি মনোমুগ্ধকর। এখানে উল্লেখ-যোগ্য, রাজগীরের সব মূর্তিই অপূর্ব কারুকার্য-খচিত—সৌন্দর্যময়! অবশ্য এসব দেবদেবীর মূর্তি অনেক পরের। কুণ্ড ও মন্দিরাদির উত্তরে-দক্ষিণে দু'টি অশ্বত্থবৃক্ষ—যাত্রীদের শীতল ছায়াদানে রত। তার উপরের স্তরে ধর্মশালা। স্থানটির সামগ্রিক রূপ অতি অপূর্ব! আরো একটু উপরে জরাসন্ধকী বৈঠক। পাথরে বাঁধানো চত্বর। রাজা জরাসন্ধের রাজত্বে ইহা নগররক্ষীদের ব্যারাক ছিল। পাশে বৈভার-গিরি চড়াইয়ের রাস্তা। সেখানে প্রাচীন ও আধুনিক ৬টি জৈন মন্দির। মন্দিরে রক্ষিত প্রাচীন মূর্তি অতি মনোহর—সুন্দর স্বর্গীয় চিত্রে চিত্রিত। এর মধ্যে অনেকগুলি খৃঃ পূঃ ৮ম ও ৫ম শতাব্দীর। খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীর নির্মিত একটি শিবমন্দিরও বিদ্যমান—ভগ্না-বস্থায়। গর্ভমন্দিরে শিবঠাকুর এখনও আছেন। অনেকের ধারণা এই প্রাচীন শিব আচার্য শঙ্করের কিংবা ৫ হাজার বৎসর পূর্বের জরাসন্ধের প্রতিষ্ঠিত। সুমুখে আছে প্রকাণ্ড নাটমন্দির—গ্রেনাইট পাথরের। চারদিকে সুরক্ষিত প্রাচীর। আরো আছে সন্ধ্যাদেবীর মন্দির, কেদারতীর্থ, গরম জলের নির্ঝর ও রাজকীয় উদ্যান। পর্বতচূড়ার দক্ষিণ পাশে হল—পিপ্পলি গুহা, সপ্তপর্ণী স্তূপ, সপ্তপর্ণী গুহা (১,১৪৭ ফুট)। পিপ্পলি গুহাতে বুদ্ধদেব, সারিপুত্র ও ভিক্ষু মহাকাশ্যপ বাস করতেন। গুহাটির মাপ ৮৫ ফুট থেকে ৮১ ফুট, উচ্চতা ২২ থেকে ২৮ ফুট। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। তাতে কয়েকটি কুটির আছে। এখানে মুসলমানদের ৫টি কবরও আছে। আরো উপরে সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে প্রথম বৌদ্ধধর্ম-সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই মহা-সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের ছয় মাস পরে। সভাপতি ছিলেন মহাকাশ্যপ। গুহা ও মণ্ডপটি তৈরি করেন রাজা অজাত-শত্রু। সুমুখে যে ঘর প্রস্তুত করা হয়, তাতে ৫০০ ভিক্ষুর স্থানসঙ্কুলান হ'ত। এই গুহাতে ৯টি কুটির। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটক প্রথম এখানেই রচিত হয় অনুমান খৃঃ ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ শতকে। গুহাটি পাহাড়ের অভ্যন্তরে কতদূর পর্যন্ত লম্বমান তা বলা শক্ত; বর্তমানে

আর কেহ প্রবেশ করতে পারে না। বুদ্ধদেব এখানে অনেকদিন বাস করেন এবং শিষ্যদের মধ্যে উপদেশ বিতরণ করেন। গুহার দ্বার-দেশ থেকে উত্তরে সুবিস্তৃত মাঠ, নদী-নালা ও সমতলভূমির মনোরম দৃশ্য দেখে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন।

ডানদিকের বর্ণনা হ'ল, এখন প্রবেশপথের বাঁ-দিকের কথা। এই বিপুলগিরির পদতলেও সেইরূপ পাঁচটি কুণ্ডে গরম ও ঠাণ্ডা জলের ছয়টি ধারা বর্তমান। একটির নাম সূর্যকুণ্ড। এগুলির জলও খুব ভাল—রোগনিবারক। তা ছাড়া আছে ৮টি দেবদেবীর মন্দির, একটি স্তূপ ও একটি গুহা। মধ্যবর্তী অশ্বত্থবৃক্ষটি হ'ল ক্লান্ত ও শ্রান্ত যাত্রীদের বিশ্রামস্থল। জরাসন্ধকী বৈঠকের ন্যায় এপাশেও একটি প্রহরীদের ব্যারাকের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। গিরিতে (১,০৩৬ ফুট) উঠবার রাস্তাটি ইদানীং কালের তৈরী। আগাগোড়া সুন্দর সোপানা-বলীতে শোভিত। জৈনগণ প্রত্যেক পাহাড়ে এইভাবে রাস্তা ও মন্দির তৈরি করেছেন। সব পাহাড়ের উপর থেকেই চারদিকের সমতলের দৃশ্যাবলী অতি সুন্দর। গিরির উপরে একটি গণেশের ও একটি নবগ্রহের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সানুদেশে আছে একটি বড় গুহা ও ৬টি আধুনিক জৈন মন্দির—বিভিন্ন তীর্থঙ্করদের।

এবার আমরা প্রাচীন নগরীর ভেতরে প্রবেশ করব। সুমুখেই শিখগুরুদ্বারা। ভোর ৪টা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত গ্রন্থসাহেব পাঠ করা হয়—উচ্চশক্তিসম্পন্ন মাইক্রোফোন সহযোগে। সেই পাঠের শব্দ বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায়, একটি পবিত্র প্রভাব সৃষ্টি করে। রাজগীরকে সর্বধর্মসমন্বয়ের স্থান বলা যেতে পারে। ইতঃপূর্বে আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও শিখ ধর্মের পরিচয় পেয়েছি। এছাড়া বৈষ্ণবপন্থী, কবীরপন্থী, উদাসী-সম্প্রদায় ও আজীবক সম্প্রদায় এখানে আছেন। আজীবক সম্প্রদায়ের গুরু গোশালের আগমন এখানে অনেকবার হয়েছে। অবশ্য আজ পর্যন্ত রাজগীরে খৃষ্টান ধর্মপ্রতিষ্ঠান যায়নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতিদেবী ৬টি পাহাড়ের দ্বারা রাজগীরে দুর্গ নির্মাণ করেছেন। ঐ সব পাহাড়ের ওপর দিয়ে আবার মনুষ্য-নির্মিত বৃহৎ প্রাচীরও হয়েছিল। এখনও তার ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের দ্বারা তৈরী এই প্রাচীর। চুন-সুরকি ব্যতীত স্তরে স্তরে সাজিয়ে সুদৃঢ়-ভাবে ইহা গঠিত। দৈর্ঘ্য ৩০ মাইল, প্রস্থ ১৮ ফুট ও উচ্চতা ১২ ফুট। এই প্রাকার অতিক্রম করে পাহাড়ের নীচে পাওয়া যায় পরিখা বা খাদ। ইহাই পূর্বে সরস্বতী নদী ছিল। নগরের জলনিকাশের পথও ছিল এই নদী। তীরে এবং রাস্তার দুপাশে শ্মশান। বৈভারগিরির ধারে পাওয়া যায় ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির। একটি হ'ল জরা রাক্ষসীর। বর্তমানে সেখানে মহিষমর্দিনীর মূর্তি দেখা যায়। অন্য একটি ধ্বংসাবশেষকে বলা হয় বলরামের মন্দির—মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। আরো এগিয়ে পাওয়া যায় সোনাভাণ্ডার। এই গুহাগুলির ভেতরের পাথর ভাল না হলেও সামনের গুলি এতই কঠিন ও মসৃণ যে, গোলা-বারুদেও নাকি তার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। প্রবাদ, রাজা বিম্বিসারের ইহা স্বর্ণভাণ্ডার—গুপ্তধন আছে, নিকটস্থ দুর্বোধ্য শিলালেখ যে পাঠোদ্ধার করতে পারবে সেই অধিকার করবে এই লুক্কায়িত ধন। কিন্তু সে-লেখার নাকি উদ্ধার হয়েছে। অন্যান্য গুহার মত এখানেও

বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে পুরাকালের বিষ্ণু, বুদ্ধ এবং ৪র্থ খৃষ্টাব্দে নির্মিত জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি আছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রমাণ করেছেন যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় একই গুহামন্দিরের সংস্কার সাধন করেছেন। প্রাচীন নগরীর বাঁ-দিকে প্রথমই বিপুলগিরি, পরে (মধ্যে) রত্নগিরি, তারপরে (দক্ষিণপ্রান্তে) গৃধ্রকূট বা শৈলগিরি। রত্নগিরিতে আছে ৪টি মন্দির—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। একটি প্রাচীন শিবমন্দিরও বর্তমান; এই পাহাড়ের নীচে অর্থাৎ পুরান রাজগৃহের মাঝখানে 'মনিয়ার মঠ'—পাটনা-গয়া রাস্তার উপর। এদিক-সেদিকে শ্রীফলের বন। ইউকেলিপ্টাসের বাগানও আছে। মঠটি প্রায় দুর্গের মত—অতি সুরক্ষিত ছিল। প্রাচীরবেষ্টিত। ইহা খৃঃ পূঃ ৬০০ শতাব্দীর। খননে এখানে ৫টি স্তর পাওয়া গেছে—ভিন্ন ভিন্ন যুগের তৈরী। উপরের স্তরগুলিতে যথাক্রমে জৈন, বৌদ্ধ, শৈব দেবালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। নীচে দেখা যায় নাগ-নাগিনী-পূজার ধ্বংসাবশেষ। খৃঃ পূঃ ২০০ শতাব্দীর মণিনাগ আবিষ্কৃত হয়েছে। আর ১৯ ফিট নীচে পাওয়া যায় প্রাচীন যুগের আরো ৩টি মূর্তি। তাছাড়া বাইরের দেয়ালে ছিল বহু মূর্তি—নাগ-নাগিনী, শিব, গণেশ প্রভৃতি। যক্ষ-যক্ষিণীর প্রতীক পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি মূর্তি ও চিত্র অতি সুন্দর কারুকার্যখচিত। খননকালে অনেক মাটির বাসন-পত্র, ঘড়া-কলসীও পাওয়া গেছে। বাসন প্রভৃতি জীব-জন্তু, নাগ-নাগিনীর চিত্রে চিত্রিত। পশ্চিমে পাওয়া গেছে স্ত্রী-পুরুষের বিশিষ্ট চিত্র ও মণিনাগের চিত্রাঙ্কিত বিবিধ সামগ্রী। এতে প্রমাণিত হয়, আর্য, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায় বিভিন্ন যুগে ইচ্ছানুসারে একই অতি প্রাচীন দেবালয়ের সংস্কার করে, পূজা-অর্চনা ও সাধন-ভজন করে এসেছেন। এই সব আবিষ্কৃত বাসন-পত্র, চিত্রাবলী ও মূর্তি খৃঃ পূঃ যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি-স্থাপত্যকলার এক একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে অনেক কঙ্কালও আবিষ্কার করেছেন। শিবপূজায় হয়তো পশুবলি হ'ত। রাজা জরাসন্ধের শিবভক্তি প্রসিদ্ধ। রাবণ রাজাও শিব-উপাসক ছিলেন। অনার্যগণ আর্য বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্পর্শে আসবার পূর্বে পূজা-অর্চা করতেন একমাত্র শিবের। আশুতোষ শিবের পূজা—সহজ ধর্ম। তিনি ভোলানাথ—সহজেই ভুলে যান মানুষের ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অত্যাচার। পৌরাণিক যুগ বাদ দিয়ে বর্তমান যুগে দেখা যায়, কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে নেপাল ভুটান হয়ে নাগাল্যাণ্ড পর্যন্ত পাহাড়ী জাতি এবং আদিবাসীদের মধ্যে শিবপূজার প্রচলন সর্বত্র —অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা থাক আর না-ই থাক। এমন অনেক জাতি আছে হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের এতটুকু সামঞ্জস্য নেই, কিন্তু শিবপূজায় তারা অনুরক্ত।

আরো দক্ষিণে প্রাসাদনগরী। ইহা আর একটি প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত—মাটির প্রাচীর। লম্বায় ৩ মাইল, উচ্চতায় ৩০ফুট। দ্বার ছিল ৪টি। অতি সুরক্ষিত। সন্ধ্যার পর নগরে প্রবেশ করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। একবার রাজা বিম্বিসার কোন কারণবশতঃ সময়ে ফিরতে পারেননি, এজন্য তাঁকেও নাকি প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি—বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে প্রাসাদ-নগরীতে প্রবেশ করেন। এই স্থানের ধ্বংসাবশেষে অনেক স্তূপ, কূপ, পগার, প্রাচীন লিপি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণে

একটি ঘর ছিল ২০০ বর্গফুটের—বন্দিশালা। পূর্তবিভাগ এখানে একটি শিকল (হাতকড়া) উদ্ধার করেছেন। অনুমান অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকেও এখানেই আবদ্ধ রাখেন। বিম্বিসার এখান থেকে গৃধ্রকুট পর্বতে ভ্রমণরত বুদ্ধদেবকে দর্শন করতেন।

রাজগৃহের উত্তরের ফটকে আমরা এসেছি। এসে পৌঁছেছি এখন নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে, প্রাসাদে। প্রাসাদনগরীর তিনদিকে বাকী তিনটি প্রবেশপথ—পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্বে। পশ্চিমে হ'ল বৈভারগিরি ও সোনা-গিরির মধ্যস্থল। ইহার সম্মুখে বিরাট মাঠ—রণভূমি বা মল্লভূমি। প্রাসাদ থেকে দূরত্ব দেড় মাইল। এখানেই নাকি ভীম ও জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘ ১৮ দিন। অবশেষে রাজা নিহত হন। রণভূমির মাটি অতি কোমল ও উজ্জ্বল শুভ্র। প্রবাদ আছে, যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় রাজা জরাসন্ধ প্রচুর পরিমাণে ঘি ও দুধ দিয়ে মাটিকে এরূপ নরম ও সাদা করেছিলেন। আজও বিহারের কুস্তিগিরগণ এই রণভূমির মাটি শ্রদ্ধা সহকারে নিয়ে যান এবং গাত্রে লেপন করেন। অদূরে একটি ঠাণ্ডা ও স্বাদু জলের নির্ঝর আছে। আরো আছে পর্বতোপরি একটি স্থান–চোপপাত। ইহা অমর ঝরনার নিকটবর্তী। এখানে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হ'ত–পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দিয়ে। চোপপাত—অর্থাৎ চোরপ্রপাত। রণভূমির ৬ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান আছে, ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের জন্য বিখ্যাত। নাম জেঠিয়ান। প্রবেশপথের দক্ষিণের পাহাড়টি সোনাগিরি। সোনাগিরির সানুদেশে ৩টি জৈন মন্দির ও ১টি তপোবন অবস্থিত। তপোবনে গরম জলের একটি ঝরনা ও ঋষভ-দেবের প্রাচীন মন্দির বর্তমান। পাণ্ডাগণ বলেন এই বিগ্রহ থেকে শিলাজতু নির্গত হয়ে থাকে। পাহাড়টিকে পুরাণে ঋষিগিরি এবং রত্নাচল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতীত কালে নাকি মূল্যবান রত্নাদি পাওয়া যেত। রাজগৃহের অন্যান্য পাহাড়েও এই প্রবাদ প্রচলিত।

দক্ষিণের প্রবেশদ্বার সোনাগিরি ও উদয়-গিরির মধ্যস্থল। এদিকে বাণগঙ্গা নামে একটি নদী প্রবাহিত। মহাভারতে আছে, রাজা জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে সাথে নিয়ে এদিকে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর রথের অশ্ব অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে বাণের দ্বারা পাতাল থেকে গঙ্গা উত্তোলন করেন। তৃষ্ণার্ত ঘোড়া গঙ্গাজল পান করে সুস্থ হয়। এই সেই বাণগঙ্গা—যেখানে পুণ্যার্থিগণ স্নান-দান করে থাকেন। একটি বিশ্রামাগার আছে। স্থানটি অতি মনোরম! পথের দক্ষিণ প্রান্তে উদয়গিরি—পাটনা-গয়া রাস্তার উপর। প্রথম বিশ্রামাগার। পাশেই পাহাড়ে উঠবার রাস্তা। উদয়গিরির উপর দুটি জৈন মন্দির। একটি শ্বেতাম্বর ও অন্যটি দিগম্বর সম্প্রদায়ের। শিখর থেকে দূরদূরান্তবিস্তৃত মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখে স্তম্ভিত হতে হয়! অতি চমৎকার সে-প্রকৃতির রূপাবলী! সর্বাধিক সৌন্দর্যময় হল সূর্যোদয়—তাই জৈনদের দেওয়া নাম উদয়-গিরি। তাছাড়া এই পাহাড়টি বৃষভগিরি, পাণ্ডবগিরি ও গিরিব্রজ নামে খ্যাত।

পূর্বদিকে প্রবেশপথের দক্ষিণে উদয়গিরি ও উত্তরে গৃধ্রকূট পর্বত। রাজা অজাতশত্রু ও শ্রীগুপ্ত দেবদত্তের পরামর্শে বুদ্ধদেবকে যেখানে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেই স্থানটি অতিক্রম করে পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে পাওয়া

যায় জীবকাম্রবন। আম্রবন রাজবৈদ্য জীবকের। তিনি অতি উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসক ছিলেন; অস্ত্র-চিকিৎসাও ভাল জানতেন। পুরাতত্ত্ব বিভাগ আম্রবনে অনেক ঔষধ-পত্র আবিষ্কার করেছেন। ঔষধের বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার বাগানও সেখানে ছিল। অদ্যাপি নাকি বাগানে জড়ি-বুটির গাছ পাওয়া যায়। আম্রবনটি জীবক গুরু বুদ্ধদেবকে অর্পণ করেন। বনে অনেক বিহার ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বুদ্ধদেব এখানে ১,২৫০ জন ভিক্ষুসহ বসবাস করেছেন। আম্রবনের ১ মাইল অন্তর গৃধ্রকূট পর্বতে চড়াইয়ের রাস্তা। এই রাস্তা তৈরি করেন রাজা বিম্বিসার। গৃধ্রকূট বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের মহাতীর্থ। গৌতমের জন্মস্থান হিমালয়ের কোলে কপিলবস্তু নগর (খৃঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দ), বাসস্থান শ্রাবস্তীর জেতবন ও নির্বাণস্থান মল্লরাজ্যের কুশীনগর (খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দ) অবজ্ঞাত। কিন্তু অবতার বুদ্ধদেবের বহুস্মৃতি-বিজড়িত গিরিব্রজের গৃধ্রকূট ও বেণুবন আজও সগৌরবে সমভাবে সমাদৃত। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে গোরক্ষপুরের অনুপ্রিয় গ্রামে সন্ন্যাস, নেপালের বৈশালীতে 'আড়ার-কালামের' এবং রাজগৃহে উদ্রেকের নিকট শাস্ত্রাদি শিক্ষালাভ করেন।* তারপর উরু-বিল্বে গিয়ে সত্যলাভ করেন এবং ঋষিপত্তনের মৃগোদ্যানে ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদানের প্রধান কেন্দ্র ছিল রাজগৃহ বা গিরিব্রজ। পুনরায় বুদ্ধদেব রাজগৃহে ফিরে এসে জীবনের অধিকাংশ কাল গৃধ্রকূট ও বেণুবনে যাপন করেন। রাজা বিম্বিসারও তাঁকে রাজসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। তাঁর জগদ্বিখ্যাত বহু শিষ্য এই গিরিব্রজের; এখানেই তাঁরা পবিত্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হ'ন। প্রথম ধর্মমহাসম্মেলনের সভাপতি মহাকাশ্যপ, প্রধান বক্তা কুমার কাশ্যপ এই রাজগৃহের ব্রাহ্মণ-সন্তান। সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়নও এখানকারই শিষ্য—নালন্দার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। এই দু'জন মহান শিষ্যই ছিলেন বুদ্ধদেবের দুটি হস্তস্বরূপ। কাজেই রাজগীর যে সাধনা-সংস্কৃতি-বৈভবের কেন্দ্রস্থল, একথা বলাই বাহুল্য। পুরাতত্ত্ব বিভাগ এখানে অনেক চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেছেন; এক মাইল উপরে দুইটি স্তূপ আছে। আরো কিছু উপরে পাওয়া যায় দুটি গুহা; ১মটি ভিক্ষু আনন্দ, সারিপুত্র প্রভৃতির এবং ২য়টি স্বয়ং বুদ্ধদেবের। এখানে তিনি বহুদিন ধর্মশিক্ষা দান করেন। সেই উপদেশই 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামে বিখ্যাত হয়েছে। রাজা বিম্বিসার এখানেই তাঁর উপদেশবাণী শ্রবণ করতেন। উপদেশের স্থল—সমতল পাথর দিয়ে বাঁধানো। গৃধ্রকূট পর্বতের সানুদেশে অশোক স্তম্ভ আছে। স্থানটির নাম ছঠাগিরি - ১,১৪৭ ফুট উচ্চ। বর্তমানে এই পাহাড়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। ভারত ও জাপান সরকার সমবেত ভাবে এই উন্নয়নকার্যে যোগদান করেছেন। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত 'রোপ-ওয়ে' এবং মন্দির প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। ভ্রমণ-রত বুদ্ধদেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে শিষ্য দেবদত্ত উপর থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়েছিলেন এই গৃধ্রকূটেই। সৌভাগ্যক্রমে হত না হলেও তিনি বেশ আহত হয়েছিলেন। পাহাড়ের দক্ষিণ তরাই-অঞ্চলে একটি মৃগোদ্যান ছিল—নাম মদ্দকুচ্ছি। পাশে পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণী-পরপারে মোরনিবাপ ময়ূরস্থান।

---

* এই উভয় পণ্ডিতই ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

স্বামীজীর স্মৃতি*

বিরজা দেবী

[অনুবাদক : স্বামী চেতনানন্দ]

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমদিকে স্যানফ্রান্সিসকো শহরের রিজেমন হলে স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতের আদর্শ' এই পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বক্তৃতা দেন। ইহার প্রথম বক্তৃতার দিনে তাঁর বক্তৃতা শুনবার মহান সুযোগ আমার হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁকে জোর করে বক্তৃতা-মঞ্চে যেতে হত। স্বামীজীর আগমন প্রতীক্ষা করে আমি হলে বসেছিলাম এবং মনের ভিতর একটু সংশয় জাগছিল যে আমি তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছি ত? কিন্তু আমার সকল সংশয়ের নিরসন ঘটল যখন স্বামীজীর সেই রাজোচিত মূর্তিখানি হলে প্রবেশ করল। তিনি প্রায় দীর্ঘ দুঘন্টা যাবৎ ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে বলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে, তাঁর নিজেরই দেশে—যাতে আমরা তাঁকে একটু ভাল-ভাবে বুঝতে পারি এবং তিনি যে মহান সত্য শিক্ষা দিলেন উহার কণিকাও যেন আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। বক্তৃতার পরে স্বামীজীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল; স্বামীজীর সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে আমার ভাবতরঙ্গ উপচে পড়ছিল। আমি একটি কথাও বলতে পারলাম না, কেবল দূরে বসে তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম এবং বক্তৃতার হিসাবনিকাশরত সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দ্বিতীয় দিন বক্তৃতার পরেও আমি সেইরূপ অপেক্ষা করছিলাম এবং দূর থেকে স্বামীজীকে লক্ষ্য করছিলাম; কিন্তু তিনি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম এবং তিনিও একটা চেয়ারে বসলেন। তিনি বললেন, "মহাশয়া, আপনি যদি একাকী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তবে আপনি টার্ক স্ট্রীটে আমার ফ্লাটে যাবেন—সেখানে টাকাপয়সার এইসব ঝামেলা নাই।"

আমি তাঁকে বললাম যে আমি তাঁর একান্ত দর্শনাভিলাষী। তিনি অনুমোদন করে বললেন, "কাল সকালে আসুন", এবং আমি তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চলে এলাম। প্রায় সমস্ত রাত্রিটাই আমার মনের মধ্যে প্রশ্নাবলীর তোলপাড় হয়েছিল; কতকগুলি জটিল প্রশ্ন মাসের পর মাস আমার জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, তবুও আমি কারও কাছে উহার জন্য সাহায্য চাইনি। পরদিন সকালে ফ্লাটে এসে শুনলাম যে, স্বামীজী এখুনি বাইরে বেরুবেন, সুতরাং কারও সাথে দেখা হবে না। আমি বললাম যে, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন, কারণ তিনিই আমাকে আসতে বলেছেন; সুতরাং আমাকে উপরে যেতে দেওয়া হল এবং আমি সামনের একটা বৈঠকখানা ঘরে বসলাম। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজী একটা লম্বা কোট ও একটা ছোট কাল টুপী পরে মৃদুস্বরে স্তব আবৃত্তি করতে করতে সেখানে ঢুকলেন। ঘরের বিপরীত দিকে একটা চেয়ারে এসে তিনি বসলেন এবং তাঁর সেই

* Vedanta Kesari পত্রিকায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

তুলনাহীন সুরে স্তোত্রপাঠ করতে লাগলেন। পরে আমায় আপ্যায়ন করলেন। আমি একটা কথাও বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, কেবল কাঁদতে লাগলাম এবং ক্রমাগত অশ্রুকণা গড়াতে লাগল। স্বামীজী আরও কিছু সময় ধরে স্তোত্রপাঠ করলেন এবং তারপর বললেন, "আগামী কাল ঠিক এই সময়েই আসবেন।"

এইভাবে সেই পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল এবং সেই মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে বিনা জিজ্ঞাসায় আমার জীবনের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান ঘটেছিল এবং প্রশ্নাবলীও মীমাংসিত হয়েছিল। স্বামীজীর সহিত আমার সেই প্রথম সাক্ষাৎ থেকে আজ দীর্ঘ চব্বিশ বছর হতে চলল, কিন্তু তবুও উহা আমার স্মৃতিপটে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে রয়েছে। প্রায় একমাস ধরে প্রতিদিন স্বামীজীকে দেখবার এক মহান সুযোগ আমার ঘটেছিল—তাঁরই পরিচালিত টার্ক স্ট্রীটের সেই মধুময় ধ্যানের ক্লাসগুলিতে।

ক্লাসের পরেও আমি তাঁর কাছে থাকতাম এবং তাঁর খাবার তৈরির কাজে সহায়তা করতাম এবং এমন কি তিনি আমাকে রান্নাঘরে ঢুকবার অনুমতি দিতেন ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজগুলি করিয়ে নিতেন। রান্না করবার সময় তিনি বেদান্ত আলোচনা করতেন আর সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্রাদিও আবৃত্তি করতেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬১তম শ্লোকটি তিনি অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করতেন—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥' অর্থাৎ 'হে অর্জুন, অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতকে মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় চালিত করছেন।' তিনি এইগুলি সংস্কৃতে অনর্গল আবৃত্তি করতেন এবং উহা আলোচনা করবার জন্য মাঝে মাঝে থেমে যেতেন। তিনি ছিলেন মহান্ এবং তাঁর চরিত্র ছিল এমনই বিভিন্নমুখী যে, কখনও দেখা যেত যেন ঠিক শিশুদের মত, আবার কখনও গর্জনকারী বেদান্তসিংহ; কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন সহৃদয় প্রেমময় পিতা। তাঁকে স্বামীজী বলে ডাকতে আমাকে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ভারতীয় শিশুদের মত 'বাবাজী' বলে ডাকতে। একদিন এক বক্তৃতার শেষে তাঁর সহিত পথে চলতে চলতে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম—আমার মনে হল তিনি এক অতিকায় পুরুষ এবং সাধারণ মানুষের চাইতে তাঁর আয়তন ছাড়িয়ে গেছে আর পথের লোকগুলিকে দেখাচ্ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র অর্থাৎ বামনের মত। তাঁর ছিল এমনই রাজকীয় চেহারা যে পথের লোকেরা তাঁর জন্য পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াত। এক সন্ধ্যায় বক্তৃতার পরে স্বামীজী আমাদের দশ-বার জনকে নিয়ে আইসক্রীম খাওয়ার জন্য একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকলেন। স্বামীজী আইসক্রীম সোডার চেয়ে আইসক্রীম খেতে ভালবাসতেন। পরিচারিকা আদেশ ভুল শোনায় স্বামীজীর জন্য আইসক্রীম সোডা নিয়ে হাজির হল; কিন্তু পরে ভুল বুঝতে পেরে সে স্বামীজীর জন্য উহা পাল্টে দিতে চাইল। দোকানের মালিক ইহার জন্য পরিচারিকাকে একটু ভর্ৎসনা করলেন, কিন্তু স্বামীজী উহা শুনতে পেয়ে দোকানের মালিককে ডেকে বললেন, "আপনি ঐ নিরীহ বালিকাটিকে গাল দেবেন না; যদি আপনি ঐ বালিকাটিকে আর গালি দেন তবে আমি আপনার সব আইসক্রীম

সোডা খেয়ে ফেলব।"

টার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে একমাস থেকে স্বামীজী আলামেডাতে চলে যান এবং হোম অব্ ট্রুথ (Home of Truth)-এ কিছুদিন থাকেন। সুন্দর বাগান-পরিবেষ্টিত ঐ বিরাট বাড়ীটাতে স্বামীজী আনন্দ সহকারে ধূমপান করতে করতে বাগানে বেড়িয়ে বেড়াতেন। ঐ বাড়ীটার প্রবেশপথেই ছিল একটা বড বারান্দা, সেখানে স্বামীজী কখনও কখনও বসতেন এবং আমাদের সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ইস্টার সানডের রাত্রিটা ছিল পূর্ণিমা, নিস্টিরিয়া ফুল পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং উহা বস্ত্রের ন্যায় বারান্দাটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। স্বামীজী সেখানে এসে বসলেন এবং ধূমপান করতে করতে মজার গল্প বলতে শুরু করলেন; তারপর তিনি বললেন, কি করে চিকাগোতে জুতা পরবার সময় তাঁর পায়ের আঙ্গুলে চোট লাগে এবং উহার জন্য একজন মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কাহিনী খুব মজা করে বললেন, "হায়, আমার পায়ের আঙ্গুল, বড় সাধের আঙ্গুল। যখনি আমি ঐ মহিলা ডাক্তারের কথা মনে করি তখনই আমার পায়ের আঙ্গুলে ব্যথা শুরু হয়।" তারপর আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে 'ত্যাগ' সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। "ত্যাগ?" স্বামীজী বলে উঠলেন, "তোমরা শিশু, তোমরা ত্যাগের মাহাত্ম্য কি বুঝবে?" আমাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, "আমরা কি এতই শিশু যে, আমরা উহা শুনবার অধিকারী নই?" স্বামীজী কিছু সময় মৌন হয়ে রইলেন; তারপর একটি অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনাময় ভাষণ দিলেন। তিনি প্রকৃত শিষ্যদের গুণাবলী এবং কি করে তারা ঠিক ঠিক গুরুর শরণাগত হয়—সে সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, আর উহা ছিল পাশ্চাত্য জগতে এক নূতন শিক্ষা। আলামেডাতে প্রতি রবিবার বিকালে স্বামীজী নিজের জন্য ভারতীয় প্রণালীতে হিন্দুদের আহার্য বস্তু তৈরি করতেন, সুতরাং পুনরায় উহাতে যোগ দিবার এবং তাঁর ভোজনাংশ গ্রহণ করবার সুযোগ আমার জুটে গেল। যদিও স্যানফ্রান্সিস্‌কো এবং আলামেডাতে স্বামীজীর সকল সাধারণ বক্তৃতাগুলিতে আমি উপস্থিত থাকতুম, কিন্তু তবুও স্বামীজীর সহিত সেই ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শটাই আমার কাছে বড ভাল লাগত। একদিন কিছু সময় মৌন থাকার পর স্বামীজী বলে উঠলেন, "ভদ্রে, উদারচেতা হও; সব সময় দুটো পথ দেখতে চেষ্টা কর। যখন আমি খুব উচ্চে (অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তাতে) উঠি তখন বলি, 'সোঽহং'; কিন্তু যখন আমার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় (অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তাতে নেমে আসি) তখন বলি, 'মা, তুমি আমাকে কৃপা কর।' তাই বলি—সব সময় দুটো পথ দেখতে চেষ্টা কর।" আর একদিন তিনি বলেছিলেন, "সাক্ষিস্বরূপ হতে শিক্ষা কর। যদি দুটো কুকুর পথে মারামারি করে এবং আমি যদি সেখানে যাই তবে আমিও উহাতে লিপ্ত হয়ে যাব; কিন্তু আমি যদি শান্তভাবে ঘরে বসে থাকি তবে সাক্ষিস্বরূপ হয়ে ঐ বিভীষিকাময় সংগ্রাম জানালা দিয়ে দেখতে পাব। তাই বলি—এই জগতে নির্লিপ্ত হয়ে সাক্ষিস্বরূপ হতে শিক্ষা কর।" স্বামীজী আলামেডাতে তুকের হলে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। একদিন তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মানুষের চরম লক্ষ্য'। এই অদ্ভুত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শেষ করবার কালে তিনি তাঁর হাতখানা বুকের উপর রেখে জোরে বললেন,

"আমি-ই ঈশ্বর।" শ্রোতাদের উপর তখন একটা ত্রস্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল এবং কেউ কেউ ভাবছিল এরূপ মারাত্মক কথা বলা স্বামীজীর পক্ষে ধর্মদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একদিন স্বামীজী রীতিবহির্ভূতভাবে একটা জিনিস করে ফেলেছিলেন এবং উহা আমাকে কিছুটা আঘাত দিয়েছিল। তিনি উহা দেখে বললেন, "ভদ্রে, তোমরা বাইরের এই ছোট বিষয়গুলিকে সুন্দরভাবে দুরস্ত করতে চাও; কিন্তু জেনে রেখ, বাইরের ঐ নিখুঁত আদব-কায়দায় কিছু যায়-আসে না—ভিতরের বস্তুই আসল।"

উঃ! কত অল্প-পরিমাণেই না আমরা স্বামীজীকে বুঝেছি! তিনি প্রকৃত যে কি ছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নাই। সময় সময় তিনি আমাকে কত কি বলতেন, আর আমি অজ্ঞানতাবশতঃ বলে উঠতাম—স্বামীজী, আমি ওভাবে চিন্তাই করিনি। আর তিনি বেশ মজা করে হেসে বলতেন, "আচ্ছা, তাই না কি!" তাঁর ভালবাসা ও সহিষ্ণুতা ছিল অতুলনীয়। তখন স্বামীজীর শরীর বিশেষ ভাল ছিল না এবং বক্তৃতার পর বক্তৃতা তাঁর শরীরকে জবাব দিচ্ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, এইরূপ মঞ্চোপরি বক্তৃতা তাঁর আর ভাল লাগে না এবং আবেগভরে বলতেন, "এইরূপ সাধারণ বক্তৃতা আমাকে শেষ করে ফেলেছে। ঠিক হল, আটটার সময় আমাকে 'প্রেম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে, অথচ সে সময় আমার 'প্রেম' সম্বন্ধে কোন ভাবই উঠল না।" আলামেডাতে বক্তৃতা শেষ করে স্বামীজী ক্যাম্প টেইলরে যান এবং আরও কয়েকদিন পরে পূর্বদিকে (অর্থাৎ নিউইয়র্কের দিকে) যান এবং আমরা আর কোনদিন তাঁকে ক্যালিফোর্নিয়াতে দেখি নাই। আমরা যে কয়জন তাঁর সেই পবিত্র সংস্পর্শে এসেছিলাম—কোনদিনই ভুলতে বা অনুভব করতে পারব না যে, তিনি চিরকালের জন্য আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি আমাদের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে রয়েছেন আর তাঁর সেই বাণীও আমাদের কাছে অমর হয়ে রয়েছে। যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে বলেছিলেন, যদি আমি কোনদিন পূর্বের ন্যায় মানসিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ি তবে তাঁকে ডাকতে এবং স্মরণ করতে; তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এমন কি শত শত মাইল দূর হলেও তিনি আমার কথা শুনবেন। আর সত্যি বলতে কি, তিনি এখনও উহা শোনেন।

"সেই দেশটি ধন্য যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, তাঁরাও ভাগ্যবান যাঁরা এই পৃথিবীতে তাঁর সময় জীবিত ছিলেন এবং আশীর্বাদপুষ্ট, শতধারায় আশীর্বাদপুষ্ট অল্প কয়েকজন যাঁরা তাঁর পাদমূলে বসেছিলেন।"

ভগিনী ক্রিষ্টিন

রোমের মনস্বী সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

"ধ্বংসের চিরন্তন গতিপথ আমাদের সকলেরই লক্ষ্য করিতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত, এবং বুঝা উচিত কোনপ্রকার ক্ষতি বিশ্বজগৎ সমর্থন করে না। বিশ্বপ্রকৃতি জগতের উপাদানগুলিকে মোমের মত ব্যবহার করে। কোন উদ্দেশ্যে এখন একটি ঘোড়া তৈয়ারী হইল, কিছুক্ষণ পরে উহাকে গলাইয়া একটি বৃক্ষমূর্তি তৈয়ারী করিতে দেখা গেল, তৎপরে মানুষ, তাহার পর আবার অন্য কোন জিনিস। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য উপাদানগুলি এক এক শ্রেণীর জীব বা বস্তুতে পরিণত হয়। এইরূপ মূর্তি-পরিবর্তনে উপাদানগুলির কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না।" (৭ম ভাগ, ২৩ সূত্র)। "জন্মমৃত্যু প্রকৃতির এক রহস্য এবং উহাদের মধ্যে বেশ একরূপ সাদৃশ্যও আছে, কারণ সৃষ্টিতে যে উপাদানগুলি একত্রীভূত হইয়াছিল, মৃত্যুতে সেইগুলিই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে" (৪র্থ ভাগ, ৫ম সূত্র)। "এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রই একমাত্র সৎ বস্তু যাহা আমাদের জীবন-নীতিকে পার্থিব প্রভাব হইতে শুদ্ধ ও মুক্ত রাখিতে পারে।" তোমার ইচ্ছামত যে-কোন আবহাওয়া বা অবস্থার মধ্যে আমাকে ফেল না কেন, যদি আমার দৈবসত্তা ঠিক থাকে, এবং নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে, তাহা হইলে আমার শাশ্বত সত্তার কোন ক্ষতি হইবে না, আমিও ধীর স্থির থাকিতে পারিব। (অষ্টম ভাগ, ৪৫ সূত্র)

স্টোয়িক মতবাদ স্বীকার করে—সকল প্রকার অনুভূতি আত্মার স্থূল সংস্কার সৃষ্টি করে, কিন্তু বিচারশক্তিই স্থির করে সেই সকল অনুভূতি সত্য বা মিথ্যা, শুভ বা অশুভ। মতামত-গঠনের যে শক্তি মানুষকে শুদ্ধ বা পবিত্র রাখে, যুক্তিবাদী জীবের শাশ্বত সত্তার বিপক্ষে বা তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন মত করিতে উহাই বাধা দেয়। (৩য় ভাগ, ৯ম সূত্র)

"আহত হইয়াছ এরূপ অনুমান করিও না, তাহা হইলেই তোমার অভিযোগ দূর হইবে; অভিযোগ করা থেকে বিরত থাক, তাহা হইলে তোমাকে আঘাত পাইতে হইবে না (৪র্থ ভাগ, ৭ম সূত্র)।" দার্শনিক সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস এইরূপ কথাগুলি বলিয়া দুর্বোধ্য শাস্ত্রীয় উপদেশ কার্যকরী নীতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। মার্কাস অরেলিয়াস তাঁহার 'মেডিটেশনে' যে-সকল কার্যকরী উপদেশ দিয়াছেন, অবশেষে তিনি সেই-সকল উপদেশের অনেক উর্ধ্বেই উঠিয়াছিলেন। রাজার অধিকার বিষয়ে অ্যানিটসথেনেসের মন্তব্য তিনি কত আনন্দের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—"সৎকাজের জন্য নিন্দিত হওয়া রাজকীয় ব্যাপার (৭ম ভাগ, ৩৬ সূত্র)।" কৃতজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি কিরূপ নিপুণভাবে ব্যর্থ করিয়াছেন। একজন ফরাসী লেখক কৃতজ্ঞতার সংজ্ঞা দিয়াছেন—কৃতজ্ঞতা সৎকর্মের সুদ আদায়। মার্কাস অরেলিয়াস বলিয়াছেন—"এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা তোমার কোন উপকার করিলে তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা দাবি করিবে। আর একশ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা কি ভদ্র! তাহারা তোমার কোন উপকার করিলে

তাহাদের ব্যবহার ও চোখের দৃষ্টিতে বুঝা যাইবে যে তাহারা তোমাকে অধমর্ণ বলিয়াই মনে করে। আর এক প্রকারের লোক আছে তাহারা বুঝিতেই পারে না যে, তাহারা কাহারও কোন উপকার করিতেছে। ইহারা দ্রাক্ষালতার মত ফল ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট, এক গুচ্ছ আঙ্গুরের জন্য কেহ যে তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিবে তাহারা কোন দিন সে আশাও করে না। দ্রুতগামী অশ্ব বা কোন শিকারী কুকুর যখন তাহার কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে, তখন সে কোনরূপ শব্দ করে না, নীরবেই কাজ করিয়া থাকে; কিংবা কোন মৌমাছি যখন কিছু মধু প্রস্তুত করে, তখন সেও কোন শব্দ করে না। সুতরাং প্রকৃত যে মানুষ সে কোন দয়ার কার্য করিয়া তাহা বলিয়া বেড়ায় না, অধিকন্তু সুযোগ পাইলেই ঐরূপ কর্মই করিয়া থাকে, যেমন দ্রাক্ষালতা পরবর্তী ঋতুতে আবার আঙ্গুর উৎপন্ন করে। আমরা সেইসকল বিজ্ঞ লোকেরই অনুসরণ করিব, যাঁহারা উপকার করিয়া মনে রাখেন না।" (৫ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সূত্র)

মার্কাস অরেলিয়াস সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"যে-লোক চীৎকার করিয়া বলে আমি তোমার সহিত সরলভাবেই ব্যবহার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহাকে কিরূপ শূন্যগর্ভ ও ঘৃণার্হ দেখিতে হয়! শোন বন্ধু, এরূপ বৃথা দম্ভের প্রয়োজন কি? তোমার কার্য দ্বারাই তোমার মনের পরিচয় দাও, তোমার মুখমণ্ডলই তোমার বাক্যের সাক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি চাই—সাধুতা ও সরলতা দেহ ও মনের সহিত এরূপ মিলিত হইবে যে, ইহা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রকাশিত হইবে।" (একাদশ ভাগ, ১৫শ সূত্র)

মার্কাসের চিন্তাসূত্রে গ্রথিত আর একটি উজ্জ্বল রত্ন—"প্রতিশোধের প্রকৃষ্ট পন্থা—আঘাতের অনুকরণ না করা।" (৬ষ্ঠ ভাগ, ৬ষ্ঠ সূত্র)

প্রার্থনার ফললাভের কি উদার কল্পনা!—"এই লোকটি···কোন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দেবতাদিগের স্তবস্তুতি করে; তোমার প্রার্থনা হওয়া উচিত যাহাতে তোমার মনে ঈদৃশ ইচ্ছার উদয় না হয়। আর একজন তাহার পুত্রের মৃত্যুনিবারণকল্পে ভক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতে চাই, ঐরূপ মৃত্যুর আশঙ্কাই যেন আমার হৃদয়ে না জাগে। ভক্তি-প্রকাশের এইরূপ পদ্ধতিই হওয়া উচিত।" (নবম ভাগ, ৬০ সূত্র)

দর্শনশাস্ত্র প্রধান প্রধান যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছে, মার্কাস সেইসব প্রশ্নের কিরূপ সমাধান করিয়াছেন এইবার তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। অমঙ্গলের উৎস কোথায়, ইহা লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেক বাকবিতণ্ডা আছে। সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রমাণের বিরুদ্ধে অমঙ্গলের বর্তমানতা একটি অমোঘ যুক্তি। স্টোয়িকেরা সাহসভরে এই অমঙ্গলের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—এই জগৎ দোষস্পর্শশূন্য, নিখুঁত। যাহা অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়, তাহা সর্বজনীন মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন। এই বিষয়ে মার্কাসও প্রাচীনপন্থী। কিন্তু অত্যধিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার তিনি নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"তোমার শশা কি তিক্ত লাগিতেছে? উহা এক পার্শ্বে রাখিয়া দাও। তোমার পথ কি কণ্টকাকীর্ণ? তাহা হইলে কণ্টকগুলি এড়াইয়া চল। এই পর্যন্তই ভাল। কিন্তু ইহার পর আর জিজ্ঞাসা করিও না—ঐগুলি লইয়া

জগতের লোক কি করিবে? প্রকৃতি-বিজ্ঞানী (Natural Philosopher) ঐরূপ প্রশ্ন শুনিলে তোমাকে উপহাস করিবে। ছুতারকে তাহার কারখানায় করাতের গুঁড়ার জন্য দোষারোপ করা কিংবা দর্জিকে তাহার দোকানে ছাঁট কাপড়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেরূপ বুদ্ধিমানের কাজ নয়, জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্বের জন্য অনুযোগ করাও সেইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।" এপিক্টেটাস বলিয়াছেন—"লক্ষ্যচ্যুত হইবার জন্যই যেমন লক্ষ্যবস্তু স্থাপিত হয় না, সেইরূপ জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব নিছক অমঙ্গল করিবার জন্য নহে।"

অর্থাৎ পৃথিবীতে বিশুদ্ধ অমঙ্গল কোথাও নাই, সকল প্রকার অশুভই কোন না কোন শুভকার্যের সূচনা করে। (৮ম ভাগ, ৫৫ সূত্র)

মার্কাস অরেলিয়াস মাঝে মাঝে বলিতেন —"সর্বজনীন নীতিই (Universal Laws) এ জগৎ চালিত করিতেছে।" আবার কখনও কখনও বলিতেন—"দেবতারাই সকল জিনিস সুপরিচালিত করেন।" কোন মতেরই উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন না। জগৎসৃষ্টি ও পরিচালনার মুখ্য কারণ দেবতাগণ বা অণু-পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ, ঈশ্বর বা কোন অনিশ্চিত ও অবর্ণনীয় ঘটনা, তাহা তিনি জোর করিয়া বলিতেন না। যদিও মার্কাস অরেলিয়াস দেবতাদিগকেই সৃষ্টির কারণ বলিয়া মাঝে মাঝে প্রচার করিতেন, তাহা হইলেও তিনি বলিতেন—"যদি কোন দৈবঘটনাতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতেও মানুষের কিছু আসে যায় না।" ভবিষ্যৎ জীবন বা জন্মান্তর সম্বন্ধেও তিনি কোন কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলেন নাই। মানুষের আত্মা দেবতারই অংশবিশেষ, সুতরাং উহা অবিনশ্বর। কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ আবার নূতন দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি না এবং সে বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান থাকে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর মার্কাস অরেলিয়াস কোথাও দেন নাই। তবে তিনি বলিতেন—"ইহজীবনের সহিতই আমাদের সংস্রব। ভাগ্যক্রমে যদি তোমরা তিন সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাক বা তোমাদের ইচ্ছামত ত্রিশ হাজার বৎসর বাঁচ, তাহা হইলেও মনে রাখিও যে-জীবন তোমরা এখন যাপন করিতেছ, সেই জীবনই তোমাদের নষ্ট হইবে, অন্য কোন জীবন হইতে তোমরা বঞ্চিত হইবে না; যে-জীবন তোমরা হারাইবে, সে-জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবন তোমাদের ছিল না।" (২য় ভাগ, ১৪ সূত্র)

এরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেও জীবনের নশ্বরতা দেখিয়া তিনি মহতী এক নীতি আবিষ্কার করেন। চার্বাকদের মত তিনি বলেন নাই—"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" অথবা "Eat, drink and be merry, for to-morrow we may die." কিংবা "এ জীবন মজা লোটার জন্য।"

বলিতেন—"এই জীবনের সদ্ব্যবহার কর, কারণ আর একটিও জীবন আমাদের হাতে নাই।" তিনি আরও বলিতেন—"আমাদের কর্তব্যকর্মগুলি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি—এই জ্ঞানই মৃত্যুকালে আমাদের সান্ত্বনা। যদি পবিত্রভাবে আমাদের জীবন যাপন করিয়া থাকি তাহা হইলে সন্তুষ্ট চিত্তেই আমরা মরিতে পারিব; আমরা দীর্ঘায়ু হই বা অল্পায়ু হই, তাহাতে কিছুই আসে যায়

না। উহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

এপিকিওরিয়াস তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিতেন—"ভোজে তৃপ্ত হইয়া অভ্যাগতরা নিমন্ত্রণবাড়ী হইতে যেভাবে বিদায় গ্রহণ করে, তোমরাও সেইরূপ ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।" স্টোয়িকেরাও বলেন—"কোন অভিনেতা তাঁহার অভিনয়কাল শেষ হইলে মঞ্চ হইতে যেভাবে প্রস্থান করেন, তুমিও ইহলোক হইতে সেইভাবে প্রস্থান করিবে।"

মার্কাস অরেলিয়াসও তাঁহার 'মেডিটেশনের' দ্বাদশ ভাগের ৩৬ সূত্রে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন—"শোন বন্ধু, তুমি এই বৃহৎ শহরের একজন অধিবাসী মাত্র। তুমি এই শহরে পাঁচ বৎসরই বাস কর বা তিন বৎসরই বাস কর, তাহাতে তোমার কি আসে যায়? তুমি যদি এই শহরের আইনকানুন মানিয়া থাক, তোমার এখানে অল্পকাল বা দীর্ঘকাল বাস করিবার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যে প্রকৃতিদেবী তোমাকে এই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিই যদি তোমাকে এই স্থান হইতে অপসারণের আদেশ দেন, তাহাতে এমন কি কষ্ট হইবে তোমার? তুমি বলিতে পার না—কোন স্বেচ্ছাচারী রাজা বা কোন বিচারবুদ্ধিহীন বিচারক তোমাকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিতেছে। না, একথা তুমি বলিতেই পার না। মঞ্চাধ্যক্ষের ইঙ্গিতে যেমন কোন অভিনেতা উৎফুল্ল হৃদয়ে মঞ্চ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তোমাকেও সেইরূপ এই পৃথিবীরূপ মঞ্চ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে—তিনটি অঙ্কে মাত্র আমি অভিনয় করিতে পারিয়াছি, পঞ্চম অঙ্কের পূর্বেই আমাকে চলিয়া যাইতে বলা হইল কেন? ভাল কথা, তিন অঙ্কেই যে তোমার জীবনের অভিনয় শেষ হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে যাঁহার আদেশে তুমি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলে, তিনিই এখন তোমার প্রস্থানের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তোমার আগমনের জন্য যেমন কেহই তোমাকে দায়ী করে নাই, তোমার প্রস্থানের জন্যও কেহই তোমাকে দায়ী করিবে না। সুতরাং সন্তুষ্টচিত্তেই প্রস্থান কর, কারণ যিনি তোমার প্রস্থানের ব্যবস্থা করিলেন, তিনি তোমার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন।"

এইরূপ অনেক কথাই আমরা মার্কাস অরেলিয়াসের চিন্তাসূত্রগুলিতে (Meditations) দেখিতে পাই। এগুলিকে অনেকে প্রশংসা করিয়াছেন আবার কেহ কেহ অল্পাধিক নিন্দাও করিয়াছেন। সমগ্র 'মেডিটেশন' পাঠ করিলে কিন্তু বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"সহজ হবি, সহজ হবি,
ওরে মন সহজ হবি,
কাছের জিনিস যে দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি।
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল পাবি॥"*

* The Meditations of Marcus Aurelius. Translated from the Greek by Jeremy Collier. Revised with introduction and notes by Alice Zimmern. এই পুস্তকখানি হইতে প্রবন্ধটির উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

সর্বজনের জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী

স্বামী জীবানন্দ

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রসিদ্ধ এই মন্ত্র—আদ্যাশক্তি পরমা জননীর উদ্দেশে প্রণতি-নিবেদন।

দেবীসূক্তে আছে, অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্ নিজেকে এই আদ্যাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেছিলেন, তাই তো বলতে পেরেছিলেন:

"ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।" ইত্যাদি।

তাঁর উপলব্ধিতে তিনি সকলের জননী, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রী—এই ভাব পরিস্ফুট।

সর্বভূতে মাতৃরূপে বিরাজিতা চিন্ময়ী প্রকৃতিই অসীমস্নেহময়ী জননী সারদাদেবী-রূপে এসেছিলেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে দেখা যায়, তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা নিচ্ছেন। মানবীয় দৃষ্টিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী। যিনি সুদীর্ঘকাল সর্বধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে সাধনার ফল এবং জপের মালাটি পর্যন্ত সারদাদেবীর পাদপদ্মে নিবেদন ক'রে জগতে মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি দেবমানব—নরদেহধারী শ্রীভগবান।

কোন্ শক্তিবলে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা নিয়েছেন? চিন্ময়ী পরমা প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন বোধ না করলে কোন মানবীর পক্ষে, তিনি যেরূপ মহীয়সীই হোন কেন, একি সম্ভব?

তিনি স্বয়ং মহাশক্তি ব'লেই জন্মদিনে সেবক-সন্তানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সকলের হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে—যারা এসেছে, যারা আসতে পারেনি, যারা ভবিষ্যতে আসবে—সকলের পূজা গ্রহণ করবেন। শ্রীশ্রীমা বললেন, "আজ বিশেষ দিন। আমার জানা অজানা সকলের হয়ে ফুল দাও।" সেবক পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর মা বললেন, "ঠাকুর, সকলের ইহকাল পরকাল দেখো। আমি সকলের মা, আমি আর কি ব'লব।"

একটি সন্তানের জননী না হয়েও সকলের যিনি জননী, সবাই যাঁর সন্তান, তিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, নরলীলায় শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গিনী।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষকে—সমস্ত নর-নারীকে, এমনকি পশু-পাখি-পিপীলিকাটিকে পর্যন্ত তিনি তাঁর অনুপম মাতৃভাব দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন।

সন্তানের প্রতি কী অসীম স্নেহ শ্রীশ্রীমায়ের! তিনি সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা করেন, ক্ষমা ক'রেই নিশ্চিন্ত থাকেন না, শরণাগত সন্তানের সমস্ত দোষকে গুণে পরিণত করেন। তাই-তো স্বামী অভেদানন্দজী মাতৃস্তোত্রে লিখেছেন, 'দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।' মায়ের এমনি মহিমা, এমনি কৃপা, পতিতপাবনী গঙ্গার মতো তিনি সকলকে পবিত্র করছেন! ভালো মন্দ সকল সন্তানের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের যে স্নেহ, তার দৃষ্টান্ত অন্যত্র সুদুর্লভ। "জগতে সবাই আমার সন্তান"—তাঁর এই কথা থেকেই বোঝা যায় তাঁর স্নেহের প্রসার কতখানি। আচার্য শঙ্করের

"নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।"

ইত্যাদি স্তোত্রে জগজ্জননী অন্নপূর্ণার নিত্যা-

নন্দকারিণী বরাভয়দায়িনী পবিত্রতাদায়িনী যে মূর্তি ফুটে উঠেছে, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে তারই ছবি দেদীপ্যমান!

শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘশক্তি—সঙ্ঘের পালয়িত্রী, রক্ষয়িত্রী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মহাশক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা যেন একই মুদ্রার এ পিঠ, ও পিঠ। আবার বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি এবং সূর্য ও সূর্যের দীপ্তি যেমন পৃথকভাবে চিন্তা করাই যায় না, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমাকে আলাদা ক'রে ভাবা যায় না, তাঁরা একই সময়ে সমভাবে চিত্তে সমুদ্ভাসিত হন, তাই স্বামী সারদানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের প্রণামমন্ত্রে বলেছেন,

"যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥"

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ীভাবে অর্চিতা হন। সমস্ত দেবতার সমষ্টিশক্তিস্বরূপা জগজ্জননী দুর্গার ঘনীভূত চিন্ময় বিগ্রহ কি সচ্চিদানন্দময়ী সর্বদেবদেবীস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদা? তাই কি স্বামীজী তাঁকে বলেছেন 'জ্যান্ত দুর্গা'? শ্রীশ্রীমা দুর্গতিনাশিনী। তিনি সর্ববিধ দুর্গতি, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা দূর ক'রে পরমানন্দ দান করেন। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের নয়নে তাই তিনি দুর্গা—'অগ্নিবর্ণা তপসা জ্বলন্তী', আবার 'বহুশোভমানা উমা হৈমবতী'!

কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী—একই আদ্যাশক্তি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সাধকের চিত্তে উদ্ভাসিত হন। মহাশক্তি কখনও মুক্তিদায়িনী, কখনও দুর্গতিনাশিনী, কখনও ধনদায়িনী, কখনও জ্ঞানদায়িনী। শ্রীশ্রীমা-ও ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণের ধ্যাননেত্রে ও ভক্তদের মানসপটে নানারূপে নানাভাবে সুপ্রকট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে 'জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী' বলেছেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলেছেন, "মায়ের নাম জপ করি, মা আনন্দময়ী ব'লে! তাঁর নামে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ধনদৌলত সবই লাভ হয়। ৺চণ্ডীতেও আছে, তিনি ঋদ্ধি সিদ্ধি সবই দিতে পারেন।" আরও বলেছেন, "ঠাকুর ও মাকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখবি। মনে রাখবি, ঠাকুরের কৃপা না হ'লে মাকে পাওয়া যায় না, আবার তেমনি মায়ের কৃপা না হ'লেও ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী। মায়ের কাছে শক্তি চাইতে হয়। শক্তি না হ'লে কোন কাজ হয় না।"

স্বামীজী শেষদিকে একদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম ক'রে বলেছিলেন, "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই!"

পরমকরুণাময়ী শ্রীশ্রীমা সন্তানের কল্যাণের জন্য অসুস্থ অবস্থাতেও কত উদ্বিগ্ন থাকতেন, তারই একখানি অপূর্ব চিত্র নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে রয়েছে:

মা রাত্রে জেগে আছেন মনে ক'রে সেবক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, আপনি কি ঘুমাননি, ঘুম কি হচ্ছে না?" উত্তরে মা বললেন, "কি আর করি, বাবা? ছেলেরা সব ব্যাকুল হয়ে ধরে এবং আগ্রহ ক'রে তখন দীক্ষাটি নিয়ে যায়, কিন্তু কেউ নিয়মিত জপ করে না, নিয়মিত কেন কেউ বা কিছুই করে না। তা বাবা, যখন তাদের ভার নিয়েছি, তখন আমাকেই তো তাদের দেখতে

হবে। তাই জপ করি আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—'ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও, ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখো, এ সংসারে বড় দুঃখকষ্ট।'"

এই সব কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীমা অতি ধীরে ধীরে উঠে বসতেন, আবার বলতেন, "এত আগ্রহ ক'রে মন্ত্রটি তো নিয়ে গেল, কিন্তু কিছু করে না কেন? এমন আর কি শক্ত! একটু অভ্যাস ক'রে করতে থাকলেই তো কেমন আনন্দ আসে! আহা, যোগেন (যোগেন-মা) ও আমি বৃন্দাবনে যখন ছিলুম, কি আনন্দেই কত জপ করতুম! চোখে মুখে মাছি বসে ঘা ক'রে দিত। কোন হুঁশ হ'ত না। সে-সব কী দিনই গেছে।"

মা বলতেন, "বাবা, যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো"—অর্থাৎ সৎ কাজে অর্থাদি দান করো, আর অর্থ না থাকে জপ করো। আরও বলতেন, "এত জপ করলামই বলো আর তপ করলামই বলো, তাঁর কাছে এসব কিছুই নয়। মহামায়া দয়া ক'রে পথ ছেড়ে না দিলে জীবের কার কি সাধ্য? হে জীব, কেবল শরণাগত হও, তবেই তিনি দয়া ক'রে পথ ছেড়ে দেবেন।" শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই কথাই রয়েছে—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" তিনি শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণ-পরায়ণা।

ওড়িশায় দুর্ভিক্ষের সময় (১৯১৮) শ্রীশ্রীমায়ের হৃদয় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনগণের জন্য কেমন কেঁদেছিল, এই কথাগুলিতে বোঝা যায়:

শ্রীশ্রীমা চিঠিতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ শুনে চোখের জল ফেলছেন ও বলছেন, "ঠাকুর, লোকের দুঃখকষ্ট আর দেখতে শুনতে পারিনে। তাদের দুঃখজ্বালার অবসান কর।" স্বামী সারদানন্দজীর দুর্ভিক্ষের সেবাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলছেন, "শরতের দিল দেখলে? যেন বাসুকি—যেখানে জল পড়ে, শরৎ আমার সেখানেই ছাতা ধরে! শরতের মতো অমন দিলদরিয়া লোক, জীবের দুঃখে এত প্রাণ কাঁদা—সকলকে পালন করছে, অন্নদান করছে, যেন পালনকর্তা! ঠাকুর, রাশ ঠেলে দাও, সকলকে দেবার জন্যে তার দু'হাত ভ'রে দাও।"

অনেকে বলেন, শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় উপবেশন ক'রে যাঁদের তাঁর কৃপালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করতেন, মা তাঁকেই যেন সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। আসল কথা এই—প্রত্যেকের সুখদুঃখাদির সহিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রগাঢ় সমবেদনা ছিল। প্রত্যেকের মনের ভাব ধরবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। বৃদ্ধা মজুরনীর রোজগারী পুত্রের চিরবিরহে শোকে অভিভূত হয়ে মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছিলেন। সংসার অনিত্য, শোক ক'রে কী হবে—ইত্যাদি না ব'লে তার শোক যেন নিজের শোক, এইভাবে অনুভব করেছিলেন, তার রুক্ষমাথায় তেল ও এক কোঁচর মুড়ি দিয়েছিলেন এবং আবার আসতে বলেছিলেন। সান্ত্বনা-দানের এমনি অজস্র ঘটনা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে আছে। আর্তের আর্তি তাঁর নিজেরই যেন!

সংসারে নানা ঝামেলার মধ্যে অবস্থান ক'রে কিভাবে ভগবান লাভ করতে হয়, শ্রীশ্রীমা তাঁর জীবনে তা দেখিয়ে গেছেন। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততার দৃষ্টান্ত তাঁর মহিমান্বিত জীবন। পদ্মপত্রে জলের মতো অসংসক্ত-অনাসক্ত এ মহাজীবন!

প্রাচীনঐতিহ্যমণ্ডিত সুপবিত্র ব্রাহ্মণকুলোদ্ভবা হয়েও তিনি কুলমর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে সর্বসংস্কার-

বিমুক্ত ছিলেন, তাঁর মধ্যে কোনপ্রকার গোঁড়ামির ভাব ছিল না ; তাই দেখা যায় বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ধর্মের নরনারী তাঁর কাছে সমভাবে সমাদৃত হচ্ছেন। বর্তমানে যখন ভারতীয় মহান্ আদর্শের দ্বারে নানা সংঘাত এসে করাঘাত করছে, তখন নারী-জাতির সম্মুখে শ্রীশ্রীমায়ের সর্বভাবে ভাস্বর জীবনটি অতুলনীয় দিগ্‌বর্তিকাস্বরূপ।

অচিন্তনীয় বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারিণী তিনি—যুগকল্যাণে নরদেহে অবতীর্ণা মহাশক্তি জগজ্জননী। তিনি পূর্বে সীতারূপে এসেছিলেন, তা-ও তাঁর কথাতেই পাওয়া যায়। সকল অবস্থাতেই তাঁর অন্তরে 'আনন্দের পূর্ণঘট' বসানো থাকত এবং সর্বদা তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণভাবে বিভোর দেখা যেত।

"রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥"

জননী মোর এলে !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

আমার আঁধার জীবন মাঝে জ্যোতির আলো জেলে,
বিশ্বময়ী মূর্তি ল'য়ে জননি মোর এলে !
সকল রূপে স্বরূপ ধ'রি,
উঠলে জেগে বিশ্ব ভ'রি,
স্নেহ-সরস হৃদয়খানি ধরায় দিলে মেলে !

স্থূলে তুমি, সূক্ষ্মে তুমি—ব্যষ্টি-সমষ্টিতে,
নেমে এলে কৃপার বশে আজ যে আচম্বিতে !
আছ তুমি যে দিকে চাই,
তুমি ছাড়া আর কিছু নাই,
সর্বব্যাপী প্রকাশ তোমার হেরি সর্বভিতে !

বিহঙ্গ আজ গান ধরেছে মিলন-মধুর-সুরে,
জীবনভরা বিষাদ-ব্যথা গেল যে কোন্ দূরে !
তোমার আগমনীর গানে,
মন ছুটেছে তোমার পানে,
তোমার আবির্ভাবের সাড়া জাগলো জগৎ জুড়ে !

চিরদিনের মা তুমি গো—আর ত' কেহ নহ,
এমনি ক'রেই হৃদয়ে মোর চিরদিনই রহ !
এমনি ক'রেই আঁধার টুটে,
আলোক তোমার উঠুক ফুটে,
তোমার রাতুল-চরণ-তলে প্রণাম আমার লহ !

আবার চাঁদের দেশে ঃ

(অ্যাপোলো-১২)

শিবদাস

এই মাস চারেক আগে অ্যাপোলো-১১ যানে চড়ে নীল আর্মস্ট্রং ও এড্‌উইন অ্যালড্রিন চাঁদে নেমে ফিরে এলেন, মানুষের সাধনার বিপুল জয়গানে মানুষের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত ক'রে। সম্প্রতি আবার অ্যাপোলো-১২ মহাকাশযানে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের দ্বিতীয় অভিযান সফল করে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন রিচার্ড গর্ডন (মূল যানের চালক), চার্লস কনরাড (অভিযানের নেতা) ও অ্যালেন বীন (চন্দ্রযানের চালক)। চাঁদে নেমেছিলেন কনরাড ও বীন। গত ১৪ই নভেম্বর যাত্রা করে ২৪৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে যাওয়া-আসা নিয়ে পাঁচ লক্ষ মাইল মতো পথ চলা শেষ করে তাঁরা পৃথিবীতে ফিরেছেন গত ২৫শে নভেম্বর।

এই দ্বিতীয় অভিযানে যাত্রা-ও প্রত্যাবর্তন-পথের প্রায় সব বিবরণই আগের অ্যাপোলো-১১ অভিযানের মতো, যার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে এ-অভিযানের কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আছে, বিশেষ করে সেগুলিই আলোচনা করা যাবে এখানে।

গত ১৪ই নভেম্বর, রাত্রি ৯-৫৩ মিনিটে[১] অ্যাপোলো-১২ আমেরিকার কেপ কেনেডি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়। অ্যাপোলো-১১র মতই বিশালকায় বিপুলশক্তি স্যাটার্ন-৫ রকেট তাকে ১১ মিনিটের মধ্যেই ১৮০ মাইল ওপরে তুলে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করে এবং যানটি দ্বিতীয়বার পৃথিবী পরিক্রমা করার মুখেই তাকে চন্দ্রাভিমুখী ক'রে ঘণ্টায় প্রায় ২৫ হাজার মাইল বেগে মহাশূন্যে ছুঁড়ে দেয়।

চাঁদের কাছে পৌঁছানোর জন্য অ্যাপোলো-১১ মহাশূন্যে এমন একটি পথ বেছে নিয়েছিল (free return trajectory), যে পথে চলার সময় যানের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেলে চাঁদে নামা হত না বটে কিন্তু চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ার কোন ভয় ছিল না, চাঁদকে ছাড়িয়ে সূর্যের দিকে চলে যাবারও না ;—চাঁদের ওপাশে গেলে সেখানে চাঁদ ও পৃথিবীর একমুখী টান তাকে পৃথিবীতেই নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে আনতো। অ্যাপোলো-১২ কিন্তু সে পথ ধরল না ; কারণ এবারে অভিযাত্রীরা চন্দ্রযানকে চন্দ্রপৃষ্ঠে ঠিক একটি নির্দিষ্ট স্থানে নামাতে চায় একটুও এদিক-ওদিক না করে,— আগের পথে গেলে যা সম্ভব হবে না। তাই তারা বিপদের ঝুঁকি নিয়েই নতুন পথ ধরল (hybrid trajectory)। অবশ্য এমন ব্যবস্থা ছিল, মাঝপথে যদি দেখা যায় যন্ত্রযানের (Service Module) ইঞ্জিন অচল হয়েছে, তাহলে অভিযাত্রীরা চন্দ্রযানের ইঞ্জিন চালিয়ে পথ বদল করে নিরাপদ পথ ধরতে পারবেন।

যাত্রার প্রারম্ভেই এক অনর্থপাত। যানটি যখন উৎক্ষিপ্ত হল, তখন কেপ-কেনেডি অঞ্চলে খুব দুর্যোগ, ঝঞ্ঝাবাত চলছিল। তা উপেক্ষা করেই যান উঠল— এতে তার কি করবে ?

---

১ প্রবন্ধে উল্লিখিত সব সময়ই ভারতীয় সময়।

তাছাড়া যাত্রার 'মাহেন্দ্রক্ষণ' (Window)[২] এসে গিয়েছিল, যার মধ্যে যাত্রা না করতে পারলে সে ক্ষণের জন্য আরো দুদিন অপেক্ষা করতে হবে, সেবারেও না পারলে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। ওঠার পরই উৎক্ষেপণ-পরিচালন-কেন্দ্র থেকে পরিচালক দেখলেন, সর্বনাশ, যান থেকে তথ্য আসাই বন্ধ হয়ে গেছে! বলে উঠলেন, "একি হল, আমি যে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি! যানের ওপর বাজ পড়ে এরকম হল নাকি?" সত্যিই বাজ পড়ে যানের ভিতরকার যন্ত্রগুলিতে বিদ্যুৎ-চলাচল অল্প কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যানের ভেতর যাত্রীরাও বিপদের সঙ্কেত পেয়েছিলেন—বিপদসূচক অনেকগুলি লাল আলো জ্বলে উঠতে দেখে; কিন্তু অবিচলিত থেকেই উত্তর দিলেন তাঁরা, "আমাদের হতবুদ্ধি হবার সময় নেই এখন, আমরা এগিয়ে চলেছি।" অল্পক্ষণের মধ্যেই অবশ্য সব আবার আপনা আপনি ঠিক হয়ে যায়। বাজ পড়েছিল এটা তখন অনুমান করে নেওয়া হল; কিন্তু তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছিলেন কনরাড ২০শে নভেম্বর; চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে উঠে চন্দ্রযান যখন মূলযানের (Command Module) সঙ্গে সংযুক্ত হতে চলেছে, দুটি যানের ব্যবধান খুব কমে এসেছে, তখন কনরাড বলে উঠলেন, "ঐ যে দেখা যাচ্ছে, মূলযানের মাথার দিকে খানিকটা জায়গার রং জ্বলে গেছে! ওখানটাতেই বাজ পড়েছিল তাহলে।"

চাঁদের পথ ধরার কিছু পরেই ১৫ই নভেম্বর রাত্রি ১-১২ মিনিটের সময়ে অভিযাত্রীরা চন্দ্রযানকে মূলযানের পিছন থেকে সামনে নিয়ে এলেন, অ্যাপোলো-১১ যেভাবে করেছিল সেভাবে। এবারের চন্দ্রযানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'Intrepid,' অর্থাৎ 'নির্ভীক'। পৃথিবী ও চাঁদের বিপরীতমুখী আকর্ষণ সেখানে যানটির উপর সমপরিমাণ, সেই 'গোধূলি'-ক্ষেত্রে (Twilight) যানটি পৌঁছল ১৭ই নভেম্বর রাত্রি ৭-৮ মিনিটে (পৃথিবী তখন ২,১১,৩২২ মাইল দূরে, চাঁদ ৩৮,৯৩৩ মাইল), এবং চাঁদের পাশ দিয়ে চাঁদের ওপারে গিয়ে চন্দ্রপরিক্রমা শুরু করল ১৮ই নভেম্বর সকালে। চাঁদের ৭০ মাইল ওপর দিয়ে সারা দিনরাত চাঁদকে বার বার পরিক্রমা করার পর পরদিন (১৯শে) সকালে কনরাড ও বীন মূলযান থেকে চন্দ্রযানে প্রবেশ করলেন; কিছু পরে মূলযান থেকে চন্দ্রযানকে বিচ্ছিন্ন করা হল।

এবারের এই বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি আগের বারের থেকে আলাদা। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে দুটি যান আলগা করার পর মূলযান চন্দ্রযানকে সামনের দিকে একটু জোর দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল। এই একটু ঠেলে দেওয়ায় চন্দ্রযান 'ঈগলের' সামান্য গতিবৃদ্ধির ফলে যেখানে তার

---

২ চাঁদ নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীও নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই বহুবিধ বহুমুখী গতির হিজিবিজির মধ্যে হিসেব করে পৃথিবী থেকে গিয়ে চাঁদের ওপর কোন বিশেষ স্থানে নামার পক্ষে চাঁদ ও পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ অবস্থান খুবই উপযোগী হয়। এই সব উপযোগী অবস্থানগুলির মধ্যেও আবার বাছাবাছি আছে, বিশেষ তিথিতে তা পড়া চাই; কারণ চাঁদের যেখানটায় নামা হবে সেখানে তখন চাঁদের প্রভাতকাল হওয়া চাই; অর্থাৎ সেখানকার দিক্‌চক্রবাল থেকে ৫° ডিগ্রী হতে ২০°-র মধ্যে সূর্য থাকা চাই, যাতে আলোও থাকে এবং যাত্রীদের সেখানে উঁচু-নীচু সহজে বোঝার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে বস্তুর ছায়াও খুব লম্বা হয়ে পড়ে। সব দিক থেকে যাত্রার বিশেষ উপযোগী সময়গুলিকে মহাকাশবিজ্ঞানের অভিধানে 'Window' বলে।

অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকে যে-কোন সময় যাত্রা করে চাঁদের যে-কোন স্থানে নামা সম্ভব, কিন্তু তাতে এত বেশী জ্বালানি চাঁদ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে, যা বর্তমানে সম্ভব নয়।

নামার কথা ঠিক সেখানে নামতে পারেনি। এবারে তাই দুটি যান আলগা করার পর মূলযান গতি কমিয়ে নিজেই একটু পিছিয়ে এসে চন্দ্রযান থেকে বিচ্ছিন্ন হল; এতে চন্দ্রযান 'নির্ভীকে'র গতিতে কোন তারতম্য ঘটাতে হল না।

মূলযান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর চন্দ্রযান 'নির্ভীক' আপন গতিবেগে কিছুক্ষণ চন্দ্র পরিক্রমা করার পর ১২-১৬ মিনিটের সময় নিজের ইঞ্জিন চালু করে চাঁদে নামতে লাগল, চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করল দুপুর ১২-২৪ মিনিটে (১৯শে)। নামল চাঁদের ঝঞ্ঝাসাগরে ঠিক পূর্বপরিকল্পিত স্থানেই[৩]—আড়াই বছর আগে আমেরিকার যাত্রিহীন যান 'সার্ভেয়ার-৩' যেখানে নেমেছিল এবং এখনো যেখানে আছে, তা থেকে মাত্র ৬০০' ফুট দূরে। এবারকার অভিযানের বিশেষ লক্ষ্যই ছিল সার্ভেয়ার-তিনের খুব কাছে নামা—যাতে চন্দ্রযান থেকে নেমে সেটির কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় ও তার কিছু অংশ খুলে সঙ্গেও নিয়ে আসা যায়। 'নির্ভীকের' অবতরণ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হল, সে লক্ষ্যলাভ হল।

সার্ভেয়ার-৩ নেমেছিল একটি বড় গর্তের মধ্যে; চন্দ্রযান সে গর্তটির ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে নামল ওপাশের কিনার থেকে মাত্র ২০' ফুট দূরে। কনরাড বলেছেন, "যদি ২০' পিছিয়ে নামতাম, তাহলে গর্তের মধ্যেই নামতে হত।"

চন্দ্রযান 'নির্ভীক' চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করার প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে, বিকাল ৫টা ১৪ মিনিটের সময় (১৯শে) প্রথমে কনরাড চন্দ্রপৃষ্ঠে নামলেন, বীন নামলেন ৫-৪৪ মিনিটে। নামার পর অ্যাপোলো-১১ অভিযাত্রীদের মতো আগেই কিছু চাঁদের পাথর কুড়িয়ে যানে রাখলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা বসালেন চাঁদের ওপর। তারপর যান থেকে একটা যন্ত্রের প্যাকেট বের করলেন, যার ওজন পৃথিবীতে ১২৬ কিলো; চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের ছয়-ভাগের একভাগ ব'লে চাঁদে তার ওজন মাত্র ২১ কিলো। এর ভেতর অনেকগুলো যন্ত্র ছিল যা অভিযাত্রীরা চাঁদে বসিয়ে এলেন—একটা ছোট-খাট পরীক্ষাগারই স্থাপন করলেন সেখানে যা একবছর ধরে সব সময় চালু থাকবে। যন্ত্রগুলিকে শক্তি যোগাবে একটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র। এবারের অভিযানের এও একটি বৈশিষ্ট্য; আগের অভিযানে যে-যন্ত্র চাঁদে রেখে আসা হয়েছে, তার শক্তির উৎস সূর্য-কিরণ, তাই চাঁদের দিনের বেলা তা সক্রিয় থাকে, রাতে নিষ্ক্রিয় (চাঁদে দিন ৩৪০ ঘণ্টায়,

৩ চন্দ্রপৃষ্ঠে ২°৯৩° দক্ষিণে, ২৩°৪৫° পশ্চিমে (উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৭৬ সংখ্যার ৫২৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চাঁদের মানচিত্রে '৮' চিহ্নিত স্থান)। খালি চোখে দেখে অ্যাপোলো-১২-র এই অবতরণ স্থানটি সম্বন্ধে মোটামুটি খানিকটা ধারণা করতে পারি আমরা। পূর্ণিমার দিন চাঁদের যে দিকটি আমরা গোল থালার মতো দেখতে পাই (শুধু একটি দিকই দেখতে পাই আমরা) তার ঠিক মাঝখান দিয়ে ওপর নীচে লাইন টেনে চাঁদকে যদি দুভাগ করি, তাহলে তার বাঁদিকে যে অনেকটা কালো দাগ দেখা যায়, তার- একেবারে বাঁদিক ঘেঁষা অধিকাংশই হল ঝঞ্ঝাসাগরের এলাকা। ডাইনে-বাঁয়ে আর একটা রেখা টেনে (এটিকে চাঁদের বিষুবরেখা বলা হয়) চাঁদকে যদি আমরা ওপরে-নীচে সমান দুভাগ করি, তাহলে এই দুটি রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করছে সেখান থেকে, চাঁদের এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে, এই বিষুবরেখা ধরে বাঁ-দিকে এগিয়ে গেলে চাঁদের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাঁ-কিনারার মাঝামাঝি পৌঁছুবার খানিকটা আগেই 'নির্ভীক'-এর অবতরণ-স্থলের কাছাকাছি পৌঁছুব। আসলে অবতরণ-স্থানটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে যতখানি খানি বাঁয়ে, অবতরণ-স্থানটি থেকে বাঁ-কিনারার দূরত্ব তার আড়াইগুণেরও বেশী, চাঁদকে ফুটবলের মতো বর্তুলাকার না দেখে থালার মতো গোলাকার দেখি বলেই এরকম মনে হবে। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে ঈগল' নেমেছিল কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রায় এতখানিই দূরে, ডাইনে (০°৭° উত্তরে, ২৩°৬° পূর্বে); আগে যে ২৪টি যাত্রিহীন যান চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করেছে, তারও অধিকাংশই নেমেছে এই বিষুবরেখার কাছাকাছি—৪টি ছাড়া আর সবই বিষুবরেখার ১০° ডিগ্রী উত্তর বা দক্ষিণের এলাকাতেই। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অ্যাপোলো-৮, ১০, ১১ ও ১২ সব যাত্রিবাহী যানগুলি যাত্রাও করেছিল পৃথিবীর বিষুবরেখার ওপর থেকেই।

রাতও তাই)। চাঁদে এই প্রথম পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার হল।

যন্ত্রের প্যাকেটটিকে বের করে কনরাড ও বীন যান থেকে ১,০০০´ দূরে বয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্যাকেট খুলে যন্ত্রগুলি বের করে বসাতে লাগলেন। এতটা দূরে বসাবার কারণ, তাঁরা যখন চন্দ্রযানের ওপরের অংশ চালু করে ফিরে যাবেন, তখন তার ইঞ্জিন যে-বেগে গ্যাস ও আগুন ছড়াবে, তার কোন প্রতিক্রিয়া যেন যন্ত্রগুলিকে নষ্ট করতে না পারে। প্রথমে তাঁরা বসালেন (১) বেতার-গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র, যা অন্য যন্ত্রগুলি দ্বারা আহৃত তথ্য গ্রহণ করবে এবং বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠাবে। একই সঙ্গে তিনটি যন্ত্রের সংকেত পাঠাবার মতো ব্যবস্থা এতে করা আছে; প্রয়োজন হলে পৃথিবী থেকে নির্দেশ পেয়ে কোন একটি বিশেষ যন্ত্র থেকে তথ্য আহরণ করে পাঠাবার ব্যবস্থাও আছে। এরই কাছে একটু দূরে বসালেন (২) পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র ; 'প্লুটো-নিয়াম ২৩৮' এতে শক্তি সঞ্চার করবে। এই শক্তি উৎপাদক যন্ত্রটির চারিদিকে এটিকে কেন্দ্র করে ১০০´ দূরে দূরে তাঁরা পাঁচটি যন্ত্র বসালেন ; বেতারযন্ত্র এবং এই পাঁচটি যন্ত্রকে শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন তার দিয়ে। যন্ত্রগুলি হল : চাঁদের কম্পন মাপার জন্য (৩) ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র (Seismo-metre) ; (৪) চাঁদের চৌম্বকক্ষেত্র মাপার যন্ত্র (Magnetometre) ; (৫) সূর্য থেকে চাঁদে যে-সব পরমাণু আসছে তা নির্ণয়ের যন্ত্র (Solar wind Spectrometre) ; (৬) চাঁদের আবহমণ্ডল নেই ; তবু, খুব পাতলা ভাবে খুব অল্প পরিমাণ কোন গ্যাস চন্দ্রপৃষ্ঠের পাথর থেকে বা চাঁদের অভ্যন্তর থেকে বেরুতে পারে, সূর্য থেকেও চাঁদে আসতে পারে ; যদি তা হয়, তাহলে সেগুলি কোন্ কোন্ গ্যাস তা জানার এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করার যন্ত্র (Cold Cathode Gauge) ; এবং (৭) আয়ন-কণা পরিমাপক যন্ত্র (Suprathermal Ion Detector)।

যন্ত্রগুলি বসাবার পর কনরাড ও বীন চন্দ্র-পৃষ্ঠ থেকে পাথর ও চাঁদের মাটি সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। আগের অভিযানেও চাঁদের মাটি আনা হয়েছিল, তবে তা এলোমেলোভাবে কুড়িয়ে ; এবারে প্রত্যেকটি স্থান থেকে মাটি বা পাথর নেবার জন্য খোড়ার আগে ও নেবার পরে সেখানকার ফটো তুলে নেওয়া হল। এবারে পাথর আনাও হয়েছে বেশী, প্রায় ৪০ কিলো।

এই সব কাজ সেরে কনরাড ও বীন যানে ফিরে গেলেন। প্রায় চার ঘণ্টার মত সময় লাগলো তাঁদের। তারপর খাওয়া দাওয়া করে প্রায় ৯ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে দ্বিতীয় বার চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের জন্য তৈরী হলেন। আগের পোষাকে আঁটা অক্সিজেন প্রভৃতি ৪ ঘণ্টার কিছু বেশীক্ষণ চলার মতো হিসেব করে দেওয়া ছিল। অবশ্য প্রথম বারে দেখা গেছে চাঁদে অভিকর্ষ কম বলে অক্সিজেন কম লাগে, হিসাবের চেয়ে বেশী সময় চলতে পারে দেওয়া অক্সিজেনে। এবারে আবার নতুন করে অক্সিজেন সঙ্গে নেওয়া হল। যানের ভেতরে পোষাক পরা থেকে শুরু ক'রে ফিরে এসে পোষাক খোলা পর্যন্ত এই অক্সিজেনই তাঁদের শ্বাস নেবার একমাত্র অবলম্বন। যানের ভেতরের জন্য অবশ্য ৪০ ঘণ্টা শ্বাস নেবার মত অক্সিজেনের ব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার জন্য কনরাড চন্দ্রপৃষ্ঠে নামলেন ২০শে নভেম্বর সকাল ৯-৩১ মিনিটে, বীন ৯-৪০ মিনিটে। তারপর

সোজা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সার্ভেয়ার-৩ যে গর্তটার ভেতর রয়েছে, তার কিনারায়। দেখলেন গর্তটির কিনারা ধাপে ধাপে নেমে গেছে। নামার পথ ঠিক করে নিয়ে তাঁরা নামতে লাগলেন। তাঁদের বলে দেওয়া হয়েছিল, এই গর্তে নামার সময় খুব সাবধান, প্রতি পদক্ষেপ দেখে দেখে যেন নামেন তাঁরা; কারণ চাঁদের ওপরে যে-পরিমাণ ধূলো জমে আছে, এখানে তার চেয়ে বেশী থাকারই সম্ভাবনা, তাছাড়া পিছলিয়ে পড়ে যাবার ভয়ও আছে। কিন্তু ওঁরা চলার সময় দেখলেন তা নয়, বরং এখানকার জমি ওপরের চেয়ে বেশী শক্ত। দেখলেন, গর্তটির ভেতরকার জমি লাঙ্গল-চষা ক্ষেতের মত দেখাচ্ছে।

সার্ভেয়ার ৩-এর কাছে যেতেই পৃথিবী থেকে প্রশ্ন হল "যানটির রং কেমন দেখছ?" কনরাড বললেন, "হালকা তামাটে (light tan)।" যানটির রং ছিল সাদা ও ফিকে নীল; চাঁদে আড়াই বছর প্রচণ্ড গরম ও ঠাণ্ডায় থেকে তা তামাটে হয়ে গেছে। চাঁদে দিনে তাপমাত্রা ওঠে প্রায় ২৪০° ফারেণহিটে, রাত্রে নামে শূন্যের নীচে ২৭৯° ডিগ্রীতে; ৫০০° ডিগ্রীরও বেশী তফাত দিনে ও রাতে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল সার্ভেয়ার-৩ চাঁদে নামার সময় বার দুই লাফিয়ে ওঠে, পায়াগুলো একটু হড়কে যায়, চাঁদের বুকে তার দাগ সার্ভেয়ারের পাঠানো ছবিতেই ছিল; এখনো সে দাগগুলি চাঁদে আছে কি না, থাকলে কি অবস্থায় আছে, তা জানার জন্য বিজ্ঞানীরা উদ্‌গ্রীব। কনরাড দেখলেন, দাগ এখনো আছে—ছবি তুললেন। আশপাশের জমির ছবি, সার্ভেয়ার-৩-এর ছবি, সবই তুললেন। আড়াই বছর চাঁদে থাকার পর পৃথিবীর বস্তুর ওপর কি প্রতিক্রিয়া হল, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সার্ভেয়ার-৩-এর কিছু অংশ তাঁরা খুলে নিলেন—এ্যালুমিনিয়াম টিউব খানিকটা, টেলিভিসন কামেরাটি, বিদ্যুৎ-সরবরাহের তার কিছুটা এবং একখণ্ড কাঁচ। দেখলেন, সার্ভেয়ারের কাঁচ একখানিও ভাঙ্গেনি।

সার্ভেয়ার-৩ চাঁদে নামার সময় এবং নামার পরও কিছুদিন কেবল যে ছবি তুলে পাঠিয়েছিল তাই নয়, একটা হাতল দিয়ে চাঁদের মাটি খুঁড়ে তুলে এনে যানের ভিতরকার স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষাগারে তা পরীক্ষা করে পরীক্ষার ফলাফল পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। যাত্রিহীন যান হলেও সার্ভেয়ার-৩-এর নিরাপদে চাঁদে নেমে এইসব তথ্যসংগ্রহ ক'রে পৃথিবীতে পাঠানোর গুরুত্ব ছিল তখন খুবই বেশী—তা প্রভূত সহায়তা করেছে চাঁদে মানুষ নামার কাজে।

এসব কাজ সেরে, সেখান থেকেও কিছু পাথর সংগ্রহ করে কনরাড আর বীন ফিরে এলেন চন্দ্রযানে, চার ঘণ্টার মধ্যেই।

চন্দ্রপৃষ্ঠে দ্বিতীয় বার নামা ও কাজ করার সময় অভিযাত্রীরা তৃষ্ণার্ত বোধ করেছিলেন। মাঝে একবার বিশ্রামও করতে হয়েছিল তাঁদের। কনরাড একবার পড়েও গিয়েছিলেন। এবারে চাঁদে নেমে তাঁরা বলেছিলেন, চাঁদের এ অঞ্চলে ধূলো খুব বেশী; কাঁচের টুকরোও তাঁদের চোখে পড়েছিল। দুবারে মিলে তাঁরা চাঁদে হেঁটে বেড়িয়েছেন আট ঘণ্টারও বেশী। যান থেকে ১২০০′ দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন; অবশ্য ৩০০০′ ফুট পর্যন্ত গিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে আসার মতো ব্যবস্থা ছিল।

চন্দ্রযানে ফিরে আসার পর কনরাড ও বীন—বিশ্রাম করলেন কয়েক ঘণ্টা। তারপর ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৭-৫৫ মিনিটের সময় চন্দ্রপৃষ্ঠে যান নামার ৩১½ ঘণ্টা পরে চন্দ্রযানের

ইঞ্জিন চালু করে চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করলেন। ওপরে উঠে মূল যানের (Command Module) সঙ্গে তাঁদের যান সংযুক্ত হল সাড়ে তিনঘণ্টা পরে, রাত্রি ১১-৩১ মিনিটের সময়। কম্যাণ্ড মডিউলে এসে রিচার্ড গর্ডনের সঙ্গে মিলিত হলেন তাঁরা ; গর্ডন এতক্ষণ একা একাই চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল ওপরে থেকে দুঘণ্টায় একবার করে চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করেই চলেছিলেন।

মূল যানে ফিরে আসার পর আর একটি কাজ করা হল। চাঁদ থেকে আনা পাথর ও অন্যান্য জিনিসপত্র চন্দ্রযান থেকে সরিয়ে আনার পর যানটিকে বিচ্ছিন্ন করে, যেখানে কনরাড ও বীন যন্ত্রপাতি বসিয়ে এসেছিলেন, সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি লক্ষ্যের দিকে তাগ করে চালিত করা হল (বেতার-নিয়ন্ত্রণে)--যাতে সেটা সেখানে চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ে। এর ফলে যে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবে (১৬০০ পাউণ্ড টি-এন-টি বিস্ফোরণের সমান জোরের ধাক্কা), তাতে চাঁদের জমি কেঁপে উঠবে। সে-কম্পনের বেগ চাঁদে বসানো যন্ত্র ধরেছিল এবং পৃথিবীতে পাঠিয়েও ছিল ; চাঁদের মাটি কেঁপে-ছিল প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত। এই তথ্যটুকুরও গুরুত্ব অনেক। কারণ যন্ত্রটি পরে যা সব কম্পনের তথ্য পাঠাবে, সে-কম্পনের উৎস যন্ত্র থেকে কতদূরে এবং উৎস-মুখে তার জোর কতখানি, তা এখনো সঠিক জানার উপায় নেই, তা অনুমান-সাপেক্ষ ; চন্দ্রযান আছড়ে ফেলে যে-কম্পন সৃষ্টি করা হল, তাতে কিন্তু বিজ্ঞানীরা দুই-ই জানতে পারলেন, যার ফলে, তাঁরা মনে করেন, চাঁদের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে খুব মূল্যবান ইঙ্গিতও পেয়েছেন ; তবে তা যে কি, তা এখনো ভেঙ্গে বলেননি।

এরপর চাঁদের চারপাশে আরো একদিন ধরে ঘুরলেন তিনজন মিলে, চাঁদের অনেক ফটো তুললেন সেখান থেকেই। তারপর পৃথিবীর দিকে ফেরা শুরু করলেন ২২শে নভেম্বর রাত্রি ২-১৮ মিনিটে।

পৃথিবী থেকে যাত্রার সময় চাঁদের দিকে ঠেলে দিয়েই বিরাটকায় সাটার্ন-৫-এর সব অংশই অ্যাপোলো-১২ যান থেকে খসে গিয়েছিল ; ছিল শুধু চন্দ্রযান (দুই অংশ সংযুক্ত হয়ে), মূল যান ও যন্ত্রযান। চন্দ্রযানের নীচের অংশ তো চাঁদেই রেখে আসা হয়েছিল, অপর অংশটিকে চাঁদে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল, ফেরার সময় অবশিষ্ট ছিল শুধু মূল যান ও যন্ত্র-যান। গত ২৫শে নভেম্বর পৃথিবীর আবহ-মণ্ডলের কাছাকাছি এসে রাত্রি ২টার সময় চন্দ্রযানকেও বিচ্ছিন্ন করে কেবল মূল যান যাত্রী তিন জনকে নিয়ে আবহমণ্ডলে (পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০,০০০' ফুট ওপরে) প্রবেশ করল রাত্রি ২-১৪ মিনিটে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করল রাত্রি ২টা ২৮ মিনিটে।

যাত্রীদের এবারেও আগের মত ২১ দিন আলাদা রেখে দেওয়া হবে, চাঁদ থেকে পৃথিবীর জীবের পক্ষে মারাত্মক কোন জীবাণু তাঁরা সঙ্গে এনেছেন কি না দেখার জন্য—যদিও, আগের বারে যা দেখা গেছে, তার সম্ভাবনা নেই। এবারেও যদি দেখা যায় চাঁদে সেরূপ কোন জীবাণু নেই, এর পরবর্তী কোন চন্দ্রাভিযানের যাত্রীদের এভাবে আর নির্জনবাস করতে হবে না।

অন্তঃসূর্য

শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা

[অনুপ্রত্নাস আয়বঃ, পদং নবীয়ো অক্রমুঃ-
রুচে জনন্ত সূর্যম্ ॥ সাম পূর্বার্চিক—৬. ২. ৬ ;
ঋগ্বেদ – ৬. ২৩. ২ ।]

দিব্যশক্তির অধিকারী, হে মানব !
অনুগামী নয়,
তুমি অগ্রণী হও !
অনুভবের বল নিয়ে
স্বয়ং নূতন সৃজন-আধার প্রস্তুত করো !
তুমিই তোমার সূর্য হও !

আপন পথের নির্মাতা হও তুমি
স্বয়ং বিধাতা হও নিয়ম ও চেতনার
'অনন্ত ক্ষমতা আছে সবারি মাঝে'
এই আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করো অন্তরে !
তুমিই তোমার সূর্য হও !

তোমার যাত্রাপথের পদচিহ্ন
যেন মুছে না যায় কোনো দিন, কোনো কাল,
বন্ধ করো না গতি বাধা-বিঘ্ন এলে,
নিত্য নূতন আলোক-রশ্মিতে
তোমার প্রতিভাকে স্বয়ং জ্যোতি-স্নাত করো !
তুমিই তোমার সূর্য হও !

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক

স্বামী তথাগতানন্দ

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন একজন অসাধারণ বীরপুরুষ, কিন্তু বীরত্বের মহিমার সঙ্গে মনুষ্যত্বের মিলনেই আদর্শ চরিত্র সৃষ্ট হতে পারে, তাঁর জীবনে আমরা দেখি এই মিলন। এই কঠিন-বীর্য নির্ভীক যোদ্ধার জীবনে আমরা দেখি তাঁর শত্রুদের প্রতি ক্ষমাশীল উদার ব্যবহার। সত্যিই তিনি ছিলেন আর্তত্রাণ-পরায়ণ নারায়ণ. চিত্তবৃত্তির এই উদারতা তাঁর জীবনকে মহিমান্বিত করেছে। তাঁর অপরাজেয় পৌরুষের সঙ্গে ছিল হতভাগাদের প্রতি অশ্রুতপূর্ব ক্ষমা. তাঁর যৌবন শুধু শৌর্যেই বৃহৎ নয়, ঔদার্যেও ছিল মহৎ। মহৎ চরিত্রের এটি একটি ধর্ম। বাহুবলের সঙ্গে হৃদয়বত্তার সংযোগেই মহৎ চরিত্রের সৃষ্টি। ঋষি নারদের উক্তিতে তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। বাল্মীকিকে তিনি বলেছিলেন রামসম্পর্কে—'কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।' রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

"কহ মোরে, বীর্য কার
 ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের
 অঙ্গদের মত।
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে
 কে হয়নি নত।
সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে
 একান্ত নির্ভীক
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম।"

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁর শত্রুর প্রতি উদার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

রামচন্দ্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করার বাসনা রাজা দশরথ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছেন। অযোধ্যার সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত। বশিষ্ঠ প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ পুরোহিত-গণ আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যস্ত। রাম ও সীতা পূর্বরাত্রে বশিষ্ঠের উপদেশে উপবাস করেছেন। কৌশল্যা আনন্দের সহিত মাঙ্গলিক কাজে ব্যস্ত। এমন সময় রামের প্রতি কৈকেয়ী সেই কঠিন আদেশ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় রামচন্দ্র কৈকেয়ীর প্রতি বিন্দুমাত্র অসৌজন্য প্রকাশ করেননি। বিচলিত হ'লেও দুঃখকে ভাবে বা ভঙ্গীতে প্রকাশ করেননি। 'ধারয়ন্ মনসা দুঃখম্' (২. ১৯. ৩৫)—কবি এইভাবে তাঁর মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন।

যথারীতি কৈকেয়ীকে প্রণাম করে বন-গমনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। অবশ্য রামচন্দ্রও মানসিক দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। স্বভাবতই স্থানে স্থানে কৈকেয়ীর প্রতি তাঁর বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কৈকেয়ীর হাতে তাঁর মাতার লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কা করেছেন। বনবাসযাত্রার কালে লক্ষ্মণকে এইজন্য তিনি অযোধ্যায় থাকার জন্য বলেছিলেন। ৩১ সর্গের ১১, ১২, ১৩ ও ১৭ শ্লোকে এবং ৫৩ সর্গের ৬-১৫ শ্লোকে শ্রীরাম দশরথ ও কৈকেয়ীর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন, এমনকি কৈকেয়ীর কৌশল্যা ও সুমিত্রাদেবীর

প্রতি অতি হীন কার্যের সম্ভাবনার কথাও ভেবেছেন।

"ক্ষুদ্রকর্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষাদন্যায়মাচরেৎ।
পরিদদ্যাদ্ধি ধর্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্॥"

(২।৫৩।১৮)

অবশ্য এসব ভাবান্তরের মধ্যে শ্রীরামকে আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে ধরতে পারি। তবুও এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এসব তাঁর স্বগতোক্তি। লক্ষ্মণ ও ভরত যখনই কৈকেয়ীর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন, তখনই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। দশরথ ও কৈকেয়ীর সম্বন্ধে সকলেই কঠোর সমালোচনা করেছেন। প্রাজ্ঞ বশিষ্ঠ পর্যন্ত কৈকেয়ীকে তিরস্কার করেছেন। চিত্রকূট পর্বতে ভরত তাঁর মার সম্পর্কে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেছেন। এমনকি হত্যা করার কথাও বলেছেন, কিন্তু ধর্ম ও শ্রীরামের ভয়ে নিজেকে শান্ত রেখেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের উদার মনোভাব ও মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে দশরথ ও কৈকেয়ীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলাতে।

"যুক্তমুক্তং চ কৈকেয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্ ২।১১১।২৯॥" শুধু তাই নয়। তাঁরা ধর্মশীল। কত উচ্চ অন্তঃকরণ হ'লে ধর্মশীল বলা যায় কৈকেয়ীকে। ভাবাবেগে বা ক্ষণিক দুর্বল মুহূর্তে এসব কথা বলা হয়নি। শেষকালে ভরতের অযোধ্যাযাত্রার পূর্বে আবার শ্রীরাম ভরতকে বলেছেন কৈকেয়ীর প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্য। শুধু মৌখিক স্তোকবাক্য নয়, সীতাদেবীও নিজের নামে এই দুরূহ কর্তব্যের ভার ভরতকে দিয়েছেন।

"কামাদ্বা তাত লোভাদ্বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যং চ মাতৃবৎ॥"

(২।১১২।১৯)

"মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি॥" (২।১১২।২৭)

"ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন॥"

(২।১১২।২৮)

বালিবধ নিয়ে সাধারণ মানুষের অনন্তকাল ধরে নানা আলোচনা চলেছে। আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না এখানে। শুধু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মৃত্যুপথযাত্রী বালীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কথাটি বলতে চাই। আমরা শুধু বালীর জন্য শোক করে থাকি, কিন্তু ভুলে যাই শ্রীরাম প্রাণাপেক্ষা সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে তাঁর চারিত্রিক বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিতে বলেছিলেন, আবার প্রজাদিগকে শান্ত করার জন্য অপাপবিদ্ধা সীতাকেও বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। প্রাণসমপ্রিয় লক্ষ্মণকেও বর্জন করেছিলেন। আমরা এঁদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সীতা বা লক্ষ্মণ কোনদিন একটি দুর্বল মুহূর্তের জন্যও শ্রীরামের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র দোষারোপ করেননি। শ্রীরামের একটিমাত্র তীরের আঘাতে বালী মাটিতে পড়ে যান। বালী তখন শ্রীরামকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন অধর্মাচরণের জন্য। কিন্তু অসহায় মুমূর্ষু বালীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র। বালী সন্তুষ্টচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

"ন দোষং রাঘবে দধ্যৌ ধর্মেঽধিগতনিশ্চয়ঃ॥

(৪।১৮।৪৪)

প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রাঞ্জলির্বানরেশ্বরঃ।"

(৪।১৮।৪৪)

"যদযুক্তং ময়া পূর্বং প্রমাদাদ্বাক্যমপ্রিয়ম্।
তত্রাপি খলু মাং দোষং কর্তুং নার্হসি রাঘব॥"

(ঐ, ৪৬)

এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় বালীর প্রিয়তমা স্ত্রী তারা শ্রীরামের বিরুদ্ধে একটা কথাও

বলেননি, যদিও তিনি স্বামীর মৃতদেহের উপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন, তবুও সেই ঘোর দুর্দিনে শ্রীরামের চরিত্র-মাহাত্ম্যকে ভোলেননি। শ্রীরাম শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বালী শ্রীরামকে সুগ্রীব ও পুত্র অঙ্গদের ভার দিয়েছেন। "তারেয়ো রাম ভবতা রক্ষণীয়ো মহাবলঃ ॥···ত্বং হি গোপ্তা চ শাস্তা চ কার্যাকার্যবিধৌ স্থিতঃ (৪।১৮।৫২, ৫৩)॥ তারাও শ্রীরামকে 'নিবাসবৃক্ষঃ সাধূনাং আপন্নানাং পরা গতিঃ (৪।১৫।১৯-২০)" বলেছেন, সমুদ্রলঙ্ঘনের পূর্বে বিভীষণ যখন রাবণকে পরিত্যাগ করে শ্রীরামের কাছে আসেন তখন লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি অনেকেই তাঁকে পরিত্যাগ করার জন্য শ্রীরামকে অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু আশ্রিতবৎসল শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে শুধু গ্রহণ করেননি, তিনি এমনকি রাবণকেও স্থান দিতে চান।

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥
(৬।১৮।৩৩)

আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যা ভয়ং ময়া।
বিভীষণো বা সুগ্রাব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম্॥"
(ঐ, ৩৪)

যুদ্ধে রাবণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। শ্রীরাম ইচ্ছা করলেই সেদিন রাবণকে হত্যা করতে পারতেন। সেদিন রাম তাঁর শত্রুর প্রতি অহৈতুকী অনুকম্পা দেখিয়ে রাবণকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছেন। মহৎ চরিত্রেই এমন ঔদার্য দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে কর্ণবধের কথা স্মরণীয়। সেখানে কর্ণের কাতর অনুরোধেও বিরুদ্ধপক্ষ ক্ষমা করেননি, রথচক্রকে মেদিনী-গ্রাস থেকে তোলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। 'ত্বং মুহূর্তং ক্ষম পাণ্ডব' (১০।১১৬, মহাভারত) বলে কর্ণ আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু শ্রীরামের প্রবল পরাক্রমে পর্যুদস্ত মৃত্যুপথ-যাত্রী রাবণ কর্ণের মতন কোন আবেদন জানাননি। রাবণ দম্ভের প্রতীক। তাঁর নিজের বক্তব্য থেকেই সেকথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

"দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ং তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ॥"
(৬।৩৬।১১)

তথাপি শ্রীরাম রাত্রিতে বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছেন রাবণকে।

"কৃতং ত্বয়া কর্ম মহৎ সুভীমং হতপ্রবীরশ্চ
কৃতস্ত্বয়াহম্।
তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য ন ত্বাং
শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি॥
প্রযাহি জানামি রণার্দিতস্ত্বং প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চ
ররাজ লঙ্কাম্।
আশ্বস্য নির্যাহি রথী চ ধন্বী তদা বলং
প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ॥" (৬।৫৯।১৪২-৪৩)

রাবণবধের পর বিভীষণের মনে একটা প্রতিক্রিয়া আসে। ভাইয়ের শেষকৃত্য করার জন্য শ্রীরামের কাছে অনুমতি চান। এখানেও শ্রীরামের অপরিসীম মনুষ্যত্ববোধ। তিনি বিভীষণকে বলছেন, "মৃত্যুতে সকল শত্রুতার অবসান হয়। এরপর আর ঘৃণা করাও উচিত নয়।" আমি সফলতা লাভ করেছি, কেন আমি তাঁর উপর আর বিদ্বেষভাব রাখব? মৈত্রীবন্ধনজনিত আমরা উভয়ে এখন এক হয়েছি। সেজন্য তিনি তোমার বড়ভাই হ'লেও আমারও। তোমার তাঁর প্রতি শেষ কর্তব্য নিশ্চয় করা উচিত। তুমি না করলে আমি নিশ্চিত করব। জগতের ইতিহাসে এ দৃশ্যের তুলনা নেই।

গোবিন্দরাজ টীকায় বলছেন ঃ

"তব যথা ভ্রাতা তথা মমাপি ভ্রাতা,
মদ্‌ভ্রাতৃভূতস্য তব ভ্রাতৃত্বাৎ
ত্বমস্য দোষং দৃষ্টাবেদহমেব করিষ্যামি।"

সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে দশরথকে আমরা দেখি—দশরথ রামকে উপদেশ দিয়েছেন, সীতাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। সে সময় দেখি শ্রীরাম দশরথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন কৈকেয়ী ও ভরতের মঙ্গলের জন্য।

ক্ষমা দেবদুর্লভ গুণ। অসহায় শত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারে প্রকৃত বীর। দুর্বলের ক্ষমা করার সাধ্য নাই। মহাত্মা গান্ধীও তাই বলেছেন। অগ্নি-প্রবেশের প্রাক্কালে সীতার প্রশ্ন ছিল শ্রীরাম কেন এমন যুদ্ধ করলেন যদি তাঁর মনে সীতা সম্পর্কে সন্দেহই ছিল। তার উত্তরে শ্রীরাম বলেছেন যে, যুদ্ধ জয় করে তাঁর কুলগৌরব রক্ষা করেছেন এবং পৌরুষবলে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন।

"যৎ কর্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ষণাং প্রতিমার্জতা।
তৎ কৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা ॥
নির্জিতা জীবলোকস্য তপসা ভাবিতাত্মনা।
অগস্ত্যেন দুরাধর্ষা মুনিনা দক্ষিণেব দিক্ ॥
বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ ॥
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদং চ সর্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গং চ পরিমার্জতা ॥"
(৬।১১৫।১৩-১৬)

ভগবান ব্যাসদেবকৃত শ্রীরামচন্দ্রাষ্টক থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

"ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতং।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥"

'তদ্দূরে তদন্তিকে চ'

শ্রীআশুতোষ দাস

তুমি হৃদয়ে ভাসিয়া হাসিয়া লুকাও, ছুটিয়া পলাও ধরিলে!
ফুটিয়া, এমনি পলকে মুদিয়া পড় গো পরশ করিলে ॥
তুমি বাড়াইয়া দাও দেখিবার আশা চকিত চপল প্রকাশে,
হারাইয়া যাও মেলিলে নয়ন অসীম অতল আকাশে!
তুমি ক্ষণিক সুরভি রাখিয়া, ক্ষণ-রূপরেখা আঁকিয়া
গোপনে থাকিয়া স্বপনে ডাকিয়া দাও নীরবতা ঢাকিয়া—
তুমি শুধু দিয়ে দেখা, ফেলে যাও একা ফিরে নাহি চাও স্মরিলে ॥

কি যে অভিনব প্রিয়-উৎসব, শেষ হয় তা কি স্মরণে?
কিবা অনুপম পিয়াসা পরম থেকে যায় স্মৃতি-ক্ষরণে।
তুমি বিস্মৃতিভরা স্মৃতি গো, চপলতা তবু স্থিতি গো,
বিয়োগেরও গীতি মিলনেরও সুর, বিরাগ মেশানো প্রীতি গো!
তুমি হাত ছেড়ে দাও তবু কাছে রও, কোলে তুলে নাও পড়িলে ॥

সাগর মেলায়

শ্রীমহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় প্রতি বছর বাৎসরিক পরীক্ষার শেষে কলকাতায় পূজ্যপাদ পিতৃদেবের কাছে ছুটি কাটাতে যেতাম। দেখতাম ভাগীরথীর কূলে কূলে নৌকাগুলি গঙ্গাসাগর-যাত্রি-প্রতীক্ষায় নিশান উড়িয়ে জলে ভাসছে। পত্ পত্ শব্দে পতাকা উড়ত—আমার মনটিও গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে পাখা মেলে দিতে চাইত।

করুণারূপিণী গঙ্গা আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন এতদিন পরে। যেন এতদিনে মহামুনি কপিলের কৃপা হ'ল! কলকাতার 'আউটরাম' ঘাট থেকে 'রিভার গঙ্গা' স্টীমারে গঙ্গাসাগর অভিমুখে যাত্রা করলাম। স্টীমারে তিলধারণের ঠাঁই নেই। বহু কষ্টে পেলাম একটু বসবার আসন। স্টীমার ছাড়ার সাথে সাথে যাত্রীরা 'গঙ্গা মাঈকী জয়! মহামুনি কপিলকী জয়!' ইত্যাদি ধ্বনিতে আমাদের যাত্রার সেই শুভ মুহূর্তটি কলমুখরিত করে তুলল।

জনপদ থেকে বহুদূরে সাগরকূলের পাতালে মহামুনি কপিল কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। এইখানেই মহাতেজা মুনিবর সগররাজার ষাট হাজার পুত্রকে ভস্মীভূত করেছিলেন। দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে ইক্ষাকুবংশের বাহুর পুত্র সগর ছিলেন আদর্শ নরপতি। অপুত্রক থাকায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। সুদীর্ঘকাল শিবের তপস্যা-শেষে শিবের বরে শৈব্যার গর্ভে একটি এবং বৈদর্ভীর গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র লাভ করলেন। শুভক্ষণে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। তাঁর ষাট হাজার পুত্র সসৈন্যে সর্বসুলক্ষণ অশ্বের রক্ষক হিসাবে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞ পণ্ড করার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র অলক্ষিতে যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখলেন। সেখানে অশ্বকে দেখতে পেয়ে মদগর্বী রাজকুমারেরা মহাতেজা মুনি-বরকে কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করায় মুনির

"বাহিরায় দুই চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেক কুমারসকল॥"

দেবর্ষি নারদের মুখে এ সংবাদ পেয়ে সগর-রাজা শোকে মুহ্যমান। অবশিষ্ট বংশধর অংশুমানের বহু স্তবস্তুতিতে কপিল তুষ্ট হয়ে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দিলেন, অসমাপ্ত যজ্ঞ সমাপ্ত হল, কিন্তু ভস্মীভূত ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধার তখনি সম্ভব হল না:

"মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগরকুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার॥
শিবে তুষ্ট করিয়ে আনিবে সুরধুনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি॥"

দিলীপের পুত্র ভগীরথের কঠোর তপস্যায় তুষ্টা হয়ে পতিতপাবনী গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করে সাগরসঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রমে এসে মুক্ত করলেন সগররাজার ষাট হাজার পুত্রকে।

তাই আজও কপিল মুনির আশ্রম পবিত্র ও পুণ্য। গঙ্গা ও কপিল মুনির মাহাত্ম্যে সাগরদ্বীপ মহীয়ান। মকর সংক্রান্তিতে চব্বিশ পরগণার অন্তর্বর্তী সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে ও মহামুনি কপিলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তপস্যাভূমি দর্শনার্থে লক্ষ লক্ষ

তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। এ যাত্রাপথ সঙ্কটময় তবু কোন বছরই পুণ্যার্থীদের স্নান ও দর্শনের উৎসাহে কিছুমাত্র ভাটা পড়ে না। আসমুদ্র হিমাচল থেকে আগত গৃহী ও ত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়ে থাকে।

যাত্রাপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরম উপভোগ্য। প্রকৃতিদেবী যেন তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়েছেন ভাগীরথীর দুই তীরে।

তর্ তর্ কল্ কল্ পত্ পত্ শব্দে স্টীমার টল্‌তে টল্‌তে সমুদ্রানুসন্ধানে তীব্রবেগে অগ্রসর হচ্ছে; জল ফুলে ফুলে উঠছে, তরঙ্গ আবর্ত রচনা করে কূলে উচ্ছল আঘাতে ভেঙে পড়ছে। মৃদু শব্দ করে বাতাস বইছে। শ্বেতবর্ণের অসংখ্য সমুদ্রপক্ষী মাছের আশায় স্টীমারের পিছু নিয়েছে। কেউ কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামুদ্রিক মাছ শিকার করছে। নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। সব মিলিয়ে সে মাঝদরিয়ায় নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললাম।

রাত একটায় মাঝসমুদ্রে সাগরদ্বীপে স্টীমার ভিড়ল। দ্বীপটি বিজলীর আলোকমালায় সজ্জিত। রাত্রে স্টীমারের ডেকে আশ্রয় নিলাম। প্রত্যূষে নৌকাযোগে কপিল মুনির মন্দিরের কাছে পৌঁছুলাম।

সাগর মেলাটি স্বল্পপরিসর, বালুস্তূপের উপর বিশাল জনসমুদ্রের গগনভেদী শব্দে বেশ জম-জমাট হয়ে উঠেছে। প্রাতঃস্নান সেরে পূজা-ও দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সকলেই ব্যস্ত। বহু-কষ্টে মুনিজীর দর্শন ও পূজা করলাম। ছোট মন্দিরে পাথরের তিনটি ধ্যানস্থ মূর্তি বিরাজিত —সর্বাঙ্গ সিন্দূরে চর্চিত। নিকটেই নিশ্চল সগর রাজার অশ্বের প্রস্তরমূর্তি। তদানীন্তন মহামুনির তপোবন সমুদ্র গ্রাস করে নিয়েছে—অবশিষ্টটুকুও ক্রমশঃ গিলছে। মেলায় হোগলাপাতার অসংখ্য অস্থায়ী যাত্রিনিবাস—শীত, বৃষ্টি ও ঝড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা অবশ্য তাদের নেই। তবু ক্ষণভঙ্গুর ছাউনিতে যাত্রীর ভিড। সুদূর মেদিনীপুর ও চব্বিশপরগনা অঞ্চলের অসংখ্য দোকান-পসারীও যোগ দিয়েছে—যাত্রীদের সব রকমের চাহিদা মেটাতে। আর বসেছে রেসটুরেন্ট, ভোজনালয় ও নামকরা মিষ্টির দোকান। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও সুব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকে অন্নসত্র খুলেছে, কম্বলও বিতরণ করছে।

সাগর থানা পুণ্যার্থীদের সকল অসুবিধা দূরীকরণে সদা ব্যস্ত। তবে বৃহৎ ব্যবস্থায় কিছু না কিছু ত্রুটি থাকবেই, তা নিয়ে ঢাক ঢোল বাজাবার কিছু নেই। কালের পরিবর্তনে মেলার রূপটিরও পরিবর্তন হয়েছে।

পূর্ণিমার স্নান সেরে মুনিজীকে শেষ প্রণাম জানিয়ে স্টীমারে ফিরে এলাম। আমাদের 'রিভার গঙ্গা' ছাড়ল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম মন্দিরটির দিকে। ক্রমে মন্দিরচূড়া অদৃশ্য হল, কিন্তু স্মৃতিতে তা স্পষ্ট হয়েই রইল।

অলিম্পিক ক্রীড়া

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন গ্রীসদেশে আর্যজাতির এক শাখার সভ্যতা বিস্তৃত, তখন খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দ হইতে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী যাবৎ গ্রীক দেবতা জুপিটারের পবিত্র নামে এই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতি চারি বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইত। স্বাধীন সচ্চরিত্র গ্রীক নাগরিক এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার অনুমতি লাভ করিত। বর্তমান ফরাসী দেশ হইতে সাহারা এবং বসফরাস সাগরের বহু পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত জনপদের এবং সমগ্র গ্রীক জাতির প্রতিনিধিগণ এই ক্রীডায় যোগদান করিতেন। এমনকি গ্রীস যখন রোমের পদানত তখনও এই ক্রীড়া অব্যাহত ছিল। কিন্তু ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈজন্তিয়ামের ধর্মান্ধ খ্রীষ্টান সম্রাট্ প্রথম থিওডেসিয়াস খ্রীষ্টধর্মের স্বার্থে এই ক্রীড়া বন্ধ করিয়া দেন। বর্তমানকাল পর্যন্ত ২৯৩টি ক্রীডার সঠিক বিবরণী রক্ষিত আছে এবং পাওয়া গিয়াছে।

পর পর কয়েকবার ভূমিকম্প সত্ত্বেও এই ক্রীড়াক্ষেত্রের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা খ্রীষ্টানদের হাতে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। প্রায় ১০০০ বৎসর অলিম্পিয়া নিশ্চিহ্ন ছিল। তারপর সর্ববিদ্যা-বিশারদ জার্মানীর প্রত্নতাত্ত্বিক আর্নেস্ট কার্টিজ ও ফ্রাইডরিস্ অ্যালডারের প্রযত্নে এলুসীর এই বিশ্ববিশ্রুত ক্রীড়াক্ষেত্রটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারন পিয়ারী ডি কৌবা-রটিন নামক এক অত্যুৎসাহী ক্রীড়ামোদীর অক্লান্ত প্রযত্নে এই প্রাচীন বিশ্বজনীন ক্রীড়া পুনঃপ্রচলিত হয়। ১৮৯৬ খ্রী: হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চার বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্বাধীন রাজ্যই এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। পূর্বে গ্রীসদেশের এলুসী ক্ষেত্রে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইত কিন্তু বর্তমানে ইহা বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়; অবশ্য অলিম্পিয়া হইতে অনির্বাণ আলোক-বর্তিকা ক্রীড়াক্ষেত্রে আনা হয়। গ্রীসদেশে এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার উদ্ভব বলিয়া তাহাকে এখনো এই মর্যাদা দেওয়া হইতেছে। পূর্বে স্ত্রীলোকের এই ক্রীড়াক্ষেত্রে যাইবার অধিকার ছিল না, বর্তমানে সকলেই অংশ গ্রহণ করিতেছেন। পূবে পুরস্কার ছিল মাত্র পবিত্র জুপিটার-মন্দিরেব অলিভপাতার বিজয়-মাল্য; বর্তমানে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি-নির্মিত পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। এই ক্রীড়া এক বিশ্বমহামেলার সৃষ্টি করে; সেখানে রাজনীতি বা জাতীয় স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করিয়া সকল দেশের লোকের মেলামেশা ও ভাববিনিময়ের, বিশ্বমৈত্রীর পথ প্রশস্ত করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

মাত্র ৭২ বৎসর এই ক্রীড়া পুনরনুষ্ঠিত হইতেছে, তবুও ইতিমধ্যেই তিনবার, ১৯১৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে পৃথিবীজোড়া হিংসা দ্বেষ ও হত্যালীলা চলিতে থাকায় এই ক্রীড়া বন্ধ ছিল।

আজ আমরা সুসভ্য বলিয়া গর্ব করিতেছি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া

নানাভাবে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখিবার ও শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিয়া চলিয়াছি। সভ্যতার পথে পূর্বাপেক্ষা বহুদূর অগ্রসর বলিয়া আমাদের গর্ব সত্ত্বেও আধুনিক কালেই এই নির্দোষ ক্রীড়া তিনবার বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ সালেও গ্রীকজাতি যে উচ্চ নৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সত্যই বিস্ময় জাগে। তখন গ্রীসদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ও চারি পার্শ্বের রাজ্যের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। তথাপি পিসা ও এলিস রাজ্যের দুই যুদ্ধলিপ্ত রাজা ৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যে পবিত্র অলিম্পিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন তাহা বরাবরই অতি যত্নে উভয় পক্ষ কর্তৃক অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে সকল রাজাই এই ক্রীডার সময় বিবাদ-বিসংবাদে বা যুদ্ধে বিরত থাকিত। এমনকি যে-কোন অলিম্পিয়া-যাত্রীকে সকল জনপদের মধ্য দিয়াই নিরাপদে যাইতে দেওয়া হইত। ইহার ব্যতিক্রম হইলে জরিমানা করা হইত এবং তাহা অনাদায়ও থাকিত না। এমনকি ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ, যদিও খুব প্রতাপশালী ছিলেন, তথাপি তাঁহার সৈন্যগণ একবার এথেন্সবাসী অলিম্পিয়া-যাত্রীর যথা-সর্বস্ব অপহরণ করায় জরিমানা দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই।

অলিম্পিক ক্রীড়া নির্বিঘ্নে পরিচালিত হইবার জন্য সকলের মধ্যে যে চুক্তি হইত তাহা অতি বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষিত হইত; আর কোনও প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এইভাবে রক্ষিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা গ্রীকজাতির উন্নত নৈতিক মানেরই সাক্ষ্য দেয়। এমনকি গ্রীস যখন রোমের অধীন তখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বৈজন্তিয়ামের সম্রাট কনস্টেন্টাইনের খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের ১০০ বৎসর পর পর্যন্তও অবাধে এই ক্রীডা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

তীর্থগামী

শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রাণের মাঝে রয়েছ জানি
　　মানে না তবু মন,
খুঁজি, যেখানে তুমি আপন রূপে
　　ভোলাও ত্রিভুবন,
ওগো　নয়ন-বিমোহন॥

চলেছি তাই তীর্থগামী
গাহিয়া গান দিবসযামী;
ধেয়ানে যারে পাইনে তারে
করি　গানেতে আবাহন॥

অগম গিরি অভ্র ঘিরে,
তুষার নদী উৎস নীরে,
ঢেউ-এর শিরে, বনগভীরে
শুনি　মুরলী-মূরছন॥

শ্রান্ত পায়ে পৌঁছে দ্বারে
পরাণ কাঁপে আবেগ-ভারে,
নয়ন ঝরে পুলক-ধারে
পেয়ে　নয়ন-বিমোহন
　　পুণ্য দরশন॥

সমালোচনা

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ)—অজাতশত্রু। প্রকাশক রামকৃষ্ণ কৃষ্টি পরিষদ, ৫১ নং জয়পুর রোড, দমদম, কলিকাতা ৩০। পৃষ্ঠা ১৭২; মূল্য পাঁচ টাকা।

ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে লীলা-কাহিনী পুস্তকখানিতে সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকটির আবেদন পাঠকচিত্ত স্পর্শ করিয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ ইহাই প্রমাণ করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পুঁথি, কথামৃত, ভক্তমালিকা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পুস্তকের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগৃহীত, তবে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কিছু কিছু কল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৩৭৬)—প্রকাশক: সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা—৯০+২৮।

এবারের বিদ্যামন্দির পত্রিকায় সুলিখিত রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'সেবা-মূর্তি ভগিনী নিবেদিতার জীবন-চিত্র', 'অচিন রশ্মির স্বরূপ', 'রবীন্দ্রনাথ—প্রকৃতিরই কবি', 'The Changing Indian Family', 'শ্রীশ্রীবিবেকা-নন্দ-বন্দনম্'।

'আমাদের কথা'য় মহাবিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

সন্দীপন (নবম সংখ্যা, ১৩৭৬) প্রকাশক: সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা—১০২+৩৮।

রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দিরের মুখপত্র সন্দীপন তাহার পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

সন্দীপনের প্রত্যেকটি রচনাই সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য হইলেও নিম্নলিখিত লেখাগুলি বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে: 'ভারতের আত্মার প্রতিভূ', 'জাতীয় সংহতি: সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে', 'ভারত ও বিশ্বের বিবেকানন্দ', 'I am the Eternal Witness', 'Some Views on Education', 'আধ্যাত্ম-চিন্তনম্'।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা (দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ. চৈত্র, ১৩৭৫)—বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, ৭৫ ও ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪ হইতে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা ৫০।

পত্রিকাটিতে যে-সমস্ত প্রবন্ধ. কবিতা, গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, সবই পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীর ছাত্রগণের। প্রত্যেক রচনাই সুসম্পাদিত এবং পড়িবার মতো। কয়েকটি লেখা পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি: মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্মৃতিতীর্থে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, দেখে এলাম অমৃতসর, প্রার্থনা (কবিতা)। 'আমাদের কথা' প্রবন্ধে বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা পরি-লক্ষিত হয়।

মহাজীবন (মাসিক পত্র, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৭৬)—৮, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৬। মূল্য প্রতি সংখ্যা সত্তর পয়সা।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁহার জীবন ও বাণী অনুধ্যানের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটির আবির্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উপযুক্ত রচনাসম্ভারে পত্রিকার মান উন্নত করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখা আছে।

রূপালোক (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৬)—সম্পাদক: সুবল রায়, মহেশ্বরপুর (সখের বাজার), পো: বাওয়ালী, জেলা ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১৬, মূল্য ৩০ প.।

বর্তমানে পল্লীগ্রামে দরিদ্র রিক্ত অবহেলিত মানুষের নানা সমস্যা পত্রিকাটির সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এবং অন্যান্য গল্প ও কবিতার মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা আছে। মহা-পুরুষগণের বাণী-সংকলনও পত্রিকার আদর্শ অনুযায়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা : গত অক্টোবর মাসে (ক) **মালদহে** ১৮,৯৮৯ কেজি চাল, ৬১ কেজি চিড়া, ২৮ কেজি গুড়, ২১ কেজি লবণ, ১০৫ কেজি আটা এবং ১০০ খানি কম্বল মিশন কর্তৃক ৩৩টি গ্রামের ৪,৯৮৪ জন বন্যার্তের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। (খ) **মুর্শিদাবাদে** ৭টি গ্রামের ৩,৭৮৭ জন বন্যা-পীড়িতের মধ্যে ৩৫,৭৮৮ কেজি চাল ও ৫০ পাউণ্ড চা বিতরিত হইয়াছে। (গ) **জলপাইগুড়িতে** ১২টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১টি মহাবিদ্যালয়ে ১,৮৫০টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেওয়া হইয়াছে ; শহরের উপকণ্ঠে কতকগুলি নূতন গৃহের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে।

কাছারে বন্যার্তসেবা : শিলচরে অক্টোবর মাসে মিশন কর্তৃক ৬০৬ কেজি চাল, ৭০ খানি কম্বল এবং ১৩৪ খানি বস্ত্রাদি ১২টি গ্রামের ৯১টি পরিবারের ৬০০ ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে।

অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা : গুণ্টুর জেলার চিরালায় দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য এ পর্যন্ত ২২টি গৃহের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং একটি কূপ খনন করা হইয়াছে।

সাম্প্রতিক সাইক্লোনের অব্যবহিত পূর্বে চিরালায় একটি তন্তুবায় কলোনী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যায়। উক্ত কলোনীর ১৮০ জনকে ৩০০ কেজি চাল দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা : সুরাটে যে-সব নূতন কলোনী নির্মিত হইয়াছে, সেগুলিতে রাস্তা, সমাজমন্দির, জলসরবরাহ এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য কার্য ভালভাবে অগ্রসর হইতেছে।

গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৯ গুজরাটের গভর্ণর শ্রীমন্নারায়ণ ফুলপাড়া ও নভগাম কলোনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারাচ্চা ও কামরেজ ক্যাম্পও তিনি পরিদর্শন করেন।

বিবেকানন্দ সৎসঙ্গ ভবন

রায়পুর আশ্রমে গত ১৩ই নভেম্বর, ১৯৬৯ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বিবেকানন্দ সৎসঙ্গ ভবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি আশ্রমের প্রার্থনা-গৃহেরও ভিত্তিস্থাপন করেন।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া : রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন গুরুকুল-প্রথায় সুপরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রেরা সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে, ও কিছু ছাত্র আংশিক অথবা পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া অবস্থান করে এবং বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রগণ এখানে শরীর-মনের সুষম বিকাশসাধনের সুযোগ লাভ করে। পড়াশুনার সঙ্গে স্বাস্থ্যচর্চা প্রার্থনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রোগীর পরিচর্যা, এবং নৈশবিদ্যালয়-পরিচালনা প্রভৃতি কাজ তাহারা নিষ্ঠার সহিত করিতে অভ্যস্ত হয়।

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৯১ জন

আশ্রমিকের মধ্যে ৫৯ জন সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ লাভ করে ; ১০ জন আংশিক এবং ২২ জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছিল। বিদ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত গ্রন্থসংখ্যা ৩,৫৯০। ৩টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়। লাইব্রেরীর টেক্সটবুক সেকসন-এ ২,৬৫৮ খানি পাঠ্যপুস্তক আছে, ১,৭১৯টি বই লইয়া বিদ্যার্থীরা পড়াশুনা করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে প্রতিমায় শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ও অন্যান্য পুণ্য দিনগুলি বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি-উৎসব পূর্ব বৎসরের মতো পালিত হইয়াছে। স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্র-দিবস প্রভৃতি যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করা হয়।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ' ; সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকের আলোচ্য বর্ষের ছাত্র-সংখ্যা ৫৬০। ছাত্রগণের মধ্যে ১৬৫ জন সিভিল, ৩০২ জন মেকানিক্যাল ও ৯৩ জন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করে।

শিল্পপীঠের গ্রন্থাগারে ৪,৫০০ খানি পুস্তক আছে ; ৫টি দৈনিক সংবাদপত্র ও ৬টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, শিল্পপীঠের দুই জন ছাত্র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ফাইন্যাল ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

শিল্পপীঠের ছাত্রগণ উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া জলপাইগুড়ির বন্যার্ত অঞ্চলগুলির পলিটেক্‌নিক ছাত্রদের সেবাকার্যে দান করিয়াছিল।

রাঁচি : রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-হাসপাতালের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৮—মার্চ, ১৯৬৯) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই স্যানাটোরিয়াম রাঁচি রেলওয়ে স্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে ২৭৯ একর স্বাস্থ্যকর ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। বর্তমানে ২৫০টি শয্যার মধ্যে ২২৮টি সাধারণ ওয়ার্ডে, ১৩টি কেবিনে ও ৯টি কুটিরে।

এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে ; এখানে সর্বপ্রকার যক্ষ্মারোগের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সুব্যবস্থা আছে।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৬০৩, তন্মধ্যে ৩৫৮ জনকে এ বছর ভরতি করা হয় এবং বৎসরের প্রথমে ছিল ২৪৫ জন। ৩৪৭ জন রোগী হাসপাতাল হইতে ছাড়া পায় এবং বর্ষশেষে ২৫৬ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকে। ১২২ জন রোগীর অস্ত্রোপচার, এক্স-রে বিভাগে ৪,৯২২টি এক্স-রে এবং ল্যাবরেটরিতে ১৬,৩০২টি পরীক্ষা করা হয়। বহির্বিভাগে ৬২১ জন যক্ষ্মারোগী এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত ১,৩৩৫ ব্যক্তি চিকিৎসা লাভ করিয়াছে।

৮০ জন দরিদ্র রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে, ১৪ জনকে আংশিক খরচে চিকিৎসা করা হইয়াছে। ৩৬ জন রোগী আরোগ্য-লাভের পর আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছে ; স্যানাটোরিয়ামে ইহাদিগকে নানাপ্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর

বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়া জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের জন্য স্থাপিত অবৈতনিক হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীতে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা : নূতন ৬,০০৭, পুরাতন ৭,৯১৮।

দরিদ্র রোগীদের জন্য আরও ফ্রি-বেডের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, এ বিষয়ে আমরা বদান্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উৎসব-সংবাদ

ফরিদপুর—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৯শে নভেম্বর স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে প্রতিমায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। সারাদিন পূজাদিতে অতিবাহিত হইবার পর সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে শ্রীকরুণাময় অধিকারী, শ্রীমতী উমা দেবী ও অন্যান্য শিল্পিগণ মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২০শে নভেম্বর অপরাহ্নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করিয়া সকলকে তৃপ্তিদান করেন। সর্বশ্রেণীর নরনারীই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দের প্রচারকার্য

গত ১৬ই আগস্ট (১৯৬৮) হইতে ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস-হোম—বেলঘরিয়া, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান—কলিকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—শিলং, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গৌহাটী, লাবান হরিসভা—শিলং, দিনহাটা, হেলাপাকড়ী, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—জলপাইগুড়ি, রামকৃষ্ণ আশ্রম—তিনসুকিয়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম—কুচবিহার, রামকৃষ্ণ আশ্রম—আলীপুর দুয়ার জং, মণ্ডলঘাট, প্রধানপাড়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম—মাথাভাঙ্গা, জল্পেশ্বর, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ধুবড়ী, ময়নাগুড়ি মোড়, বিবেকানন্দ পল্লী—বার্ণেশ, বালাপাড়া ইত্যাদি স্থানে হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, ভারতীয় নারী ও মাতা সারদা দেবী, ভারতে শক্তিপূজা, জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ, ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে মোট ৪০টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৯টি ছায়াচিত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বামী চৈতন্যানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি, গত ৯ই নভেম্বর রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় স্বামী চৈতন্যানন্দ (পরমেশ মহারাজ) ৭২ বৎসর বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত দুই মাস যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সারা জীবনই বারাণসী সেবাশ্রমের কর্মী ছিলেন; পরে সেবাশ্রমের শিবালা শাখা-কেন্দ্রটি পরিচালনা করিতেন। তিনি অকপট, কষ্টসহিষ্ণু এবং মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামী ঘনানন্দের দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৬ই নভেম্বর বেলা ১১টা ৫৭ মিনিটে (লণ্ডন সময়) স্বামী ঘনানন্দ ৭১ বৎসর বয়সে লণ্ডনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া তিনি গত ১১ই

অক্টোবর হাসপাতালে ভরতি হন; ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছিলেন, কিন্তু নূতন উপসর্গ দেখা দেওয়ার ফলে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট হইতেই সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন; সেখানে কিছু-কাল 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পরে সিংহলে শিক্ষাকার্যে কিছুকাল ব্রতী হন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মরিশাসে নূতন কেন্দ্র খুলিবার জন্য তিনি সেখানে প্রেরিত হন। কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ-মানসে মরিশাস হইতে তিনি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে চলিয়া আসেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিবার পর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সেখানেই থাকিয়া যান এবং লণ্ডনে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার গড়িয়া তোলেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি লণ্ডনেই অতিবাহিত করিয়াছেন; মধ্যে তিন বার ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজীতে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা অভয় পদে মিলিত হইয়া শাশ্বত শান্তিলাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

খিদিরপুর 'সুরবিতান' শ্রীরবীন বসুর পরিচালনায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভগিনী নিবেদিতার জন্মোৎসব পালন করিয়াছে।

পরলোকে খগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়

বেলুড়নিবাসী খগেন্দ্রকৃষ্ণ রায় গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০. ১১. ৬৯) সকাল সওয়া নয়টার সময় ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বেলুড় মঠের সন্নিকটে তাঁহার বাস-স্থান ছিল; প্রায় ২৪ বৎসর দুইবেলা বেলুড় মঠে যাওয়া তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৬ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর, বুধবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর ১১৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান হইবে।

বর্ষসূচী

৭১তম বর্ষ

(১৩৭৫-মাঘ হইতে ১৩৭৬-পৌষ)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য ৭৲

প্রতি সংখ্যা ৭০ প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৭৫ হইতে পৌষ—১৩৭৬)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা